সূচীপত্র

অনুবাদকের কথা

ক্রিস্টোফার কডওয়েলের আসল নাম ক্রিস্টোফার সেন্ট জন স্প্রিগ। জন্ম ইংলণ্ডের পাটনি শহরে ১৯০৭ সালের ২০ অক্টোবর। লেখাপড়া শেখেন ইলিঙের সেন্ট বেনেট রোমান ক্যাথলিক কলেজে। অল্প বয়সেই কাব্য ও বিজ্ঞানের দিকে আগ্রহ দেখা যায়। সতের বছর বয়সে স্কুলের পড়া শেষ করে রিপোর্টার হিসাবে ইয়র্কশায়ার অবজার্ভার কাগজে তিন বছর কাজ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন এই পত্রিকার সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক। তারপর লণ্ডনে ফিরে 'বৃটিশ মালয়' পত্রিকা সম্পাদনা করেন এবং ভাইয়ের সঙ্গে একটি বিমানবিষয়ক পুস্তক প্রকাশন সংস্থা গড়ে তোলেন। পঁচিশ বছর বয়সের আগেই বেশ কিছু ছোট গল্প, কবিতা, ডিটেকটিভ উপন্যাস ও বিমানবিদ্যার উপর পুস্তক রচনা করেন। ১৯৩৪-এর শেষ দিকে মার্কসবাদ সম্বন্ধে পড়াশুনা সুরু করেন। ১৯৩৫ এর মে মাসে কডওয়েল ছদ্মনামে একটি গুরুগম্ভীর মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস লেখেন। নাম 'দিস মাই হ্যাণ্ড'। কর্ণওয়ালে কিছুদিন কাটিয়ে লণ্ডনে ফিরে এসে ইলিউশন অ্যাণ্ড রিঅ্যালিটির খসড়া করেন। ডিসেম্বরে লণ্ডনের পূর্বাঞ্চলে পপলারে বাসা নেন এবং কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। এর কয়েক মাস পরে প্যারিসে যান 'পপুলার ফ্রন্ট' আন্দোলন সম্পর্কে সরাসরি অভিজ্ঞতালাভের উদ্দেশ্যে। ইতোমধ্যে জুলাই মাসে স্পেনে গৃহযুদ্ধ সুরু হয়ে যায়। সেখানকার পপুলার ফ্রন্ট সরকারকে সাহায্য করার জন্য নভেম্বর মাসের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির পপলার শাখা কিছু অর্থ সংগ্রহ ক'রে একটি অ্যাম্বুলেন্স কেনে। ফ্রান্স পার হয়ে স্পেন সরকারের হাতে সেটি তুলে দেওয়ার জন্য কডওয়েলকে নির্বাচিত করা হয়। সেই দায়িত্ব পালনের পর সেখানকার আন্তর্জাতিক বাহিনীর বৃটিশ বিভাগে তিনি যোগ দেন। তারিখটা ছিল ১৯৩৬ সালের ১১ ডিসেম্বর।

স্পেনের গৃহযুদ্ধে পপুলার ফ্রন্ট সরকারকে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করতে ইংলণ্ড, ফ্রান্স বা যুক্তরাষ্ট্র কেউই রাজি ছিল না। জার্মানী ও ইতালির কথাই ওঠে না। সেখানে তখন ফ্যাসিবাদ কায়েম। কিন্তু স্পেনের সেই দুর্দিনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে পপুলার ফ্রন্ট সরকারের হয়ে লড়াই করতে এসেছিলেন অনেক স্বেচ্ছাসেবক। তাঁদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল আন্তর্জাতিক ব্রিগেড। স্পেনের গৃহযুদ্ধ শুরু হয় ১৭ই জুলাই ১৯৩৬। আগষ্টে ফ্যাসিবাদী দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে উত্তরের যোগাযোগ সম্পূর্ণ। নভেম্বরে বিদ্রোহী ফ্রাঙ্কো মাদ্রিদ দখলের হুমকি দেয়। স্পেনের কাবালেরো সরকার ৬ই নভেম্বর গোপনে মাদ্রিদ ছেড়ে ভালেনসিয়ায় আশ্রয় নেয়। কিন্তু সরকারী পঞ্চম রেজিমেন্টের স্পর্ধিত আহ্বানে সাড়া দিয়ে জনসাধারণ হাতে তুলে নিল অস্ত্র। মাদ্রিদের পথে পথে রক্তক্ষয়ী

সংগ্রাম ইতিহাস গড়ে তুললো। সে ইতিহাস ফ্যাসিবাদের কাছে মাথা নীচু না করার ইতিহাস, দুটি মাত্র শব্দে তা অমর হয়ে আছে। NO PASSARAN!

১৯৩৬-এর ডিসেম্বরে মিয়াজা জুন্টার নেতৃত্বে মাদ্রিদ রক্ষা পেল। জানুয়ারী ১৯৩৭ ফ্যাসিস্তরা দক্ষিণ উপকূলের ভ্যালেনসিয়া শহরের সঙ্গে স্থলপথে যোগাযোগ বন্ধ করার জন্য জারামা নদী বরাবর আক্রমণ শুরু করল। জারামা পরিসীমার উপর চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে ফ্রাঙ্কোবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭। ১২ই ফেব্রুয়ারী সকালে ১৫ নম্বর ব্রিগেডের বৃটিশ ব্যাটেলিয়ন বিদ্রোহী-দের মুখোমুখি দাঁড়ায়। সান মার্তিনের দিকের রাস্তার দক্ষিণ ধারে একটা টিলার উপর তারা ঘাঁটি করে। দিনের প্রথম সাত ঘণ্টা এই ঘাঁটি তারা রক্ষা করে।

এই দিনের যুদ্ধে কডওয়েল যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের সম্মান অর্জন করেন। তখন তাঁর বয়স উনত্রিশ। তাঁকে শেষ দেখা যায় সহযোদ্ধা সঙ্গীরা যাতে নিরাপদে পিছনের দিকে সরে যেতে পারে সেই উদ্দেশ্যে টিলার উপরে মেশিনগান হাতে লড়াই চালাচ্ছেন। আক্রমণকারী মুররা তখন মাত্র ত্রিশ গজ দূরে। সেদিন ছিল ১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭।

কডওয়েলের মৃত্যুর পর তাঁর ইলিউশ্যন অ্যাণ্ড রিঅ্যালিটি (১৯৩৭), স্টাডিজ ইন এ ডায়িং কালচার (১৯৩৮), ক্রাইসিস ইন ফিজিক্স (১৯৩৯) এবং ফারদার স্টাডিজ ইন এ ডায়িং কালচার (১৯৪৯) প্রকাশিত হয়। কডওয়েল যখন স্পেন রওনা হন ইলিউশন তখন যন্ত্রস্থ। বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিজীবী মহলে একটা সাড়া পড়ে যায়। আলোচনা-সমালোচনার ঝড় বইতে থাকে। শোনা যায় মরিস কর্নফোর্থ, লেভি, জর্জ টমসন প্রভৃতি বৃটেনের বিখ্যাত বিখ্যাত সব মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীরাও কডওয়েল মার্ক্সিস্ট কি না সেই বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। মডার্ন কোয়ার্টার্লি পত্রিকায় এই বিষয়ে বিস্তারিত সন্ধান মিলবে।

সাহিত্য সম্পর্কে, বিশেষতঃ কাব্য সম্পর্কে বস্তুবাদী আলোচনার ক্ষেত্রে ইলিউ-শন অ্যাণ্ড রিঅ্যালিটির স্থান প্রথম সারিতে। উপশিরোণামায় বইটিকে বলা হয়েছে 'কাব্যের উৎস সন্ধানে আলোচনা'। কাব্য প্রসঙ্গে লেখকের বক্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন দুরূহ তাঁর বিষয়বস্তু তেমনি বিস্তৃত এলাকায় লেখকের চিন্তার প্রসার। অনেক বছর ধরে বার বার করে পড়তে হয় বইটি এবং প্রতিবারেই নতুন নতুন চিন্তা পাঠককে যে ভাবিয়ে তোলে একথা অনেকেই বলেন। অক্সফোর্ডের গ্রীক ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ও মার্কসবাদী ইংরেজ বুদ্ধিজীবি জর্জ টমসন বইটিকে 'আমাদের কালের অন্যতম মহান পুস্তক' বলেছেন।

বইটিতে কডওয়েল বলছেন শিল্পের সমালোচনা করতে হলে সমালোচককে তার

"বাইরে' গিয়ে দাঁড়াতে হয় এবং 'বাইরে' থেকে সেটিকে দেখতে হয়। কিন্তু শিল্প হল সমাজের সৃষ্টি। সুতরাং শিল্পে 'বাইরে' দাঁড়ানোর অর্থ হল সমাজের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ানো। শিল্প সমালোচনার ক্ষেত্রে একটা পরিপ্রেক্ষিতের বা বিশ্বদৃষ্টির মধ্যে বিভিন্ন মূল্যগুলির সমন্বয় করতে হয়। এই বিশ্বদৃষ্টি একটা সক্রিয় দৃষ্টি, অর্থাৎ শিল্পের সঙ্গে এক সক্রিয় জীবন্ত সম্পর্ক; সেটা মন সম্পর্কে বা সমাজ সম্পর্কে দৃষ্টি নয়। সেটা শিল্প সম্পর্কে দৃষ্টি। সমাজের মতাদর্শগত উৎপন্নগুলির পরস্পরের মধ্যকার সাধারণ সক্রিয় সম্পর্কগুলি এবং মূর্তজীবনধারণের সঙ্গে তাদের সক্রিয় সম্পর্কটি একমাত্র ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ভিত্তিতেই উপলব্ধি করা সম্ভব। কাব্য সম্পর্কে আলোচনার ভিত্তি হিসাবে সেই কারণে কডওয়েল এই ঐতিহাসিক বস্তু-বাদকেই বেছে নিয়েছেন।

বইটিতে বারোটি পরিচ্ছেদ। প্রথম তিনটিতে ইতিহাসের দিক থেকে কেমন করে কাব্যের জন্ম থেকে পুরাণের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আধুনিক কাব্যের উদ্ভব ঘটল তা কডওয়েল দেখিয়েছেন। কারণ গতির মধ্য দিয়ে ছাড়া আধুনিক কাব্যকে অর্থাৎ বুর্জোয়া যুগের কাব্যকে বোঝা সম্ভব নয়। নানা জাতি, নানা ভাষা এই বুর্জোয়া চলনের সঙ্গে জড়িত হয়ে গিয়েছে। লেখকের মাতৃভাষা ইংরেজি। সেই ভাষার সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়। তাছাড়া অর্থনীতির ক্ষেত্রে বুর্জোয়া বিপ্লবের নেতৃত্ব দেয় ইংলণ্ড। পরবর্তী কালে আমেরিকা তাকে ছাড়িয়ে গেলেও বুর্জোয়া বিপ্লবের অধিকাংশ পর্যায়টা ইংলণ্ডেই উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল। সেই কারণেই ইংরেজি কাব্যের ইতিহাসই লেখকের আলোচনার মুখ্য ক্ষেত্র। তিনটি পরিচ্ছেদে সেই আলো-চনাকে তিনি বেঁধেছেন। তারপর কাব্যের একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলিকে সূত্রায়িত করে এগিয়ে গেছেন সমাজ, অর্থাৎ মানুষ ও বাস্তব সম্পর্কে বিশ্লেষণে। কারণ ভাষার নিজস্ব প্রকৃতি এবং সমাজের সঙ্গে কাব্যের সক্রিয় সম্পর্কের মধ্য থেকেই কাব্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি উদ্ভূত। জগৎ ও 'আমি' এই দুইয়ের মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়ে আলোচনা করে তিনি দেখিয়েছেন যে এটি দ্বন্দ্বমূলক। কাব্য যে দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ভূত হয় তা হল যে দ্বন্দ্ব সমাজকে চালিয়ে নিয়ে যায় এবং বাস্তব জীবনে ও মানুষের প্রকৃত চেতনার মধ্য দিয়ে যে দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি ঘটাতে হয়, সেই দ্বন্দ্বটিরই একটি বিশেষ রূপ।

কাব্যের রচয়িতা কবি। কবির নিজের সহজপ্রবৃত্তি ও তাঁর অভিজ্ঞতার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তা থেকে তিনি এক প্রাতিভাসিক অলীককল্পনার জগৎ গড়ে তুলতে বাধ্য হন। অর্থাৎ, বিষয়ী ও বিষয়ের বিচ্ছেদ ঘটে। একটি পরিচ্ছেদে কবির মানস এবং এই অলীককল্পনার জগতের মধ্যকার সম্পর্ক এবং অন্য একটি পরিচ্ছেদে

স্বপ্নের সঙ্গে কাব্যের পার্থক্য বিশ্লেষণ করে কডওয়েল দেখিয়েছেন এই দ্বন্দ্বের ফলে কি ভাবে কবি এক হিতকর বিহ্বলতার মধ্যে প্রবেশ করেন। এই অবস্থা থেকে কবি আরোগ্যলাভ করতে পারেন যদি আবার তিনি সেই জগতে প্রবেশ করতে পারেন যেখানে বিষয়ী ও বিষয় আবার হয়ে ওঠে সামাজিক এবং সেই কারণে তা সচেতন। আর জীবনের সঙ্গে কবির সম্পর্কও আবার হয়ে ওঠে স্বাধীন, বিপ্লবী ও শ্রমসাধ্য। এর পরের পরিচ্ছেদে লেখক দেখিয়েছেন বিভিন্ন শিল্পগুলির সংগঠন কিভাবে গড়ে ওঠে। শেষ পরিচ্ছেদে কাব্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা করে কডওয়েল দেখিয়েছেন যে শিল্প হল মানুষের নিজেকে বাস্তবায়িত করার একটি শর্ত এবং সেই শর্তটি আবার মানুষের বাস্তবগুলির অন্যতম।

কডওয়েল পড়তে গেলে বিষয়বস্তুর এই দুরূহতা ছাড়াও আছে ভাষার ব্যবধান। ফলে অনেক বাঙলাভাষী পাঠকের কাছে তা নাগালের বাইরে। সেই ব্যবধানের মধ্যে একটা সেতু তৈরির দুঃসাহসী ইচ্ছা অনেক দিন ধরে মনের মধ্যে ছিল। সেটাই রূপ পেয়েছে এই অনুবাদ প্রচেষ্টার মধ্যে। কডওয়েল অনুবাদ করা যে কত কঠিন কাজ তা যে কোনও পাঠকই জানেন। সাধ্যমত চেষ্টা করা গেল, এইটুকু শুধু বলি। সাফল্যের বিচার পাঠক সাধারণ করবেন।

এই অনুবাদের কাজে অনেকে অনেক ভাবে আমায় উৎসাহ দিয়েছেন ও সাহায্য করেছেন। তাঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ফরাসী উদ্ধৃতিগুলির নির্ভরযোগ্য অনুবাদের জন্য কবি অরুণ মিত্রের কাছে আমার অকুণ্ঠ ঋণ। অধ্যাপক কৃষ্ণ চক্রবর্তী ও সুধীর ঘোষের উৎসাহের জন্যই যে অনুবাদটির প্রকাশ সম্ভব হল সে কথা বলা বাহুল্য। অত্যন্ত দুরূহ এই গ্রন্থ ছাপানোর ঝুঁকি নেবার জন্য প্রকাশক সুনীল ঘোষকে আমার অকৃত্রিম ধন্যবাদ। আত্মীয় পরিজন বন্ধু সহকর্মী এত মানুষের সোৎসুক সজাগ সক্রিয় সহানুভূতি পেয়েছি এই কাজে যে তাঁদের কাছে ঋণ স্বীকারের মত ভাষা আমার জানা নেই। সেই কবির কথাতেই বলতে হয়,—

"বহে যাহা মর্ম-মাঝে রক্তময়
বাহিরে তা কেমনে দেখাব?"

রঞ্জন ঘোষ

জীবনী-বিষয়ক টীকা

এই পুস্তকটি আমাদের কালের মহান পুস্তকগুলির অন্যতম। এটি সহজপাঠ্য নয়। পুস্তকটি গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে হয়, টীকা করতে হয় এবং বার বার নতুন করে অধ্যয়ন করতে হয়। পাঠক তখন দেখতে পাবেন যে যত বারই তিনি পুস্তকটি অধ্যয়ন করুন না কেন প্রত্যেক বারেই তিনি চিন্তার নতুন খোরাক পাচ্ছেন।

লেখক Christopher St. John Sprigg ইয়েলিং-এর বেনেডিকটাইন স্কুলে লেখাপড়া করেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল ২০ অক্টোবর ১৯০৭, পাটনিতে। সাড়ে ষোল বছর বয়সে স্কুল থেকে বেরিয়ে তিনি তিন বছর ইয়র্কশায়ার অবজার্ভার পত্রিকায় সংবাদদাতার কাজ করেছিলেন। তারপর তিনি লণ্ডনে ফিরে আসেন এবং প্রথমে সম্পাদক হিসাবে ও পরে অন্যতম পরিচালক হিসাবে এক বিমান বিষয়ক প্রকাশন সংস্থায় যোগ দেন। অসংখ্যবার পরিবর্তন যোগ্য এক গীয়র তিনি উদ্ভাবন করেন, অটোমাইল ইঞ্জিনিয়ার পত্রিকায় যার ডিজাইনগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলি বহুল পরিমাণে বিশেষজ্ঞদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। তিনি বিমান বিদ্যার উপর পাঁচটি পাঠ্যপুস্তক, সাতটি গোয়েন্দা উপন্যাস এবং কিছু কবিতা ও ছোট গল্প প্রকাশ করেছিলেন। এ সবই তিনি করেন পঁচিশ বছর বয়সের পূর্বেই।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে Christopher Caudwell ছদ্মনামে তিনি তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস 'দিস মাই হ্যাণ্ড' প্রকাশ করেন। এই বইটি থেকে বোঝা যায় যে মনোবিদ্যা তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন, কিন্তু তাঁর জ্ঞানকে জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত করতে তিনি তখনও সফল হন নি।

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে কিছু কিছু মার্ক্সবাদী ক্লাসিক রচনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে এবং কর্ণওয়ালে পরের গ্রীষ্মকাল কাটাবার সময় মার্ক্স, এঙ্গেলস ও লেনিনের রচনার মধ্যে তিনি ডুবে থাকেন। লণ্ডনে ফিরে আসার অল্পকাল পরেই তিনি Illusion and Reality-র প্রথম খসড়া শেষ করেন। তারপর ডিসেম্বর মাসে পপলার'এ বাসা নেন এবং পরে কমিউনিস্ট পার্টির পপলার শাখায় যোগ দেন। পপলারে তাঁর কমরেডদের অনেকেই ছিলেন ডক-

আবক, সবহারাপন্থী। শান্তস্বভাব, মিতভাষী, বই-লিখে-জীবিকা-উপার্জন-করা যুবকটি সম্পর্কে তাঁরা কিছুটা সন্দেহপরায়ণ ছিলেন; কিন্তু তিনি করণীয় সব কাজে নিজের অংশটুকু পালন করেন বলে কিছু দিনের মধ্যেই তাঁকে এরা নিজেদেরই একজন হিসাবে গ্রহণ করেন।

পপুলার ফ্রন্ট সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালাভের জন্য পার্টিতে যোগ দেওয়ার কয়েকমাস পরে তিনি প্যারিসে যান এবং নতুন উদ্যম ও উৎসাহ নিয়ে সেখান থেকে ফিরে আসেন। জীবিকার জন্য উপন্যাস রচনা ছাড়াও তিনি Illusion and Reality নতুন করে লেখেন, পরবর্তীকালে Studies in a dying culture নামে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি সম্পূর্ণ করেন এবং The crisis in physics লিখতে শুরু করেন। ঘড়ির কাঁটা ধরে তিনি কাজ করতেন। সারাদিন টাইপরাইটার নিয়ে কাজ করার পর বিকেল পাঁচটায় বাড়ি থেকে বেরোতেন এবং কোনও খোলা জায়গায় সভায় বক্তৃতা দেওয়ার জন্য বা ক্রিস্প্ স্ট্রীট মার্কেটের মোড়ে ডেলি ওয়ার্কার বিক্রি করার জন্য শাখা অফিসে যেতেন।

ইতোমধ্যে স্পেনের গৃহযুদ্ধ সুরু হয়েছে। একজন নেতৃস্থানীয় কর্মী হিসাবে কডওয়েলকে নিয়ে পপলার শাখা প্রচার অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়ল। একটা এ্যাম্বুলেন্স কেনার মত টাকা তাঁরা নভেম্বর মাসের মধ্যে সংগ্রহ করলেন এবং সেটিকে ফ্রান্স পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কডওয়েল নির্বাচিত হলেন। স্পেনীয় সরকারের হাতে সেটি তুলে দেওয়ার পর তিনি ইন্টার-ন্যাশনাল ব্রিগেডে যোগ দিলেন এবং জারামায় যুদ্ধরত অবস্থায় ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৭ তিনি মারা যান।

স্পেন থেকে এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "নিজেকে পুরানো সৈনিকের মত অনুভব করতে সুরু করেছি এবং আমাদের সেকশনে মেসিনগান—শিক্ষক হিসাবে ইতোমধ্যেই কাজ করছি। আমি গ্রুপের রাজনৈতিক প্রতিনিধি, দেওয়াল-পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক এবং আরও একটা রাজনৈতিক কাজ আছে, অতএব বুঝতেই পারছেন আমার অবসর সময়টা ভালোমতই ঠাসা।" এর পর তিনি পপলার' এর খবর জানতে চেয়েছেন তা সে যত তুচ্ছই হোক। আরও লিখেছেন, "এই দূর দেশে যেখানে স্থানীয় এ্যানার্কিস্ট ট্রেড ইউনিয়নস' এর অফিসে আমাদের লেবার পার্টি গ্রুপ কমিউনিস্ট পলিটি-ক্যাল কমিশার'এর ঘরে জমায়েত হন সেখানে দেশের লেবার পার্টি নেতৃত্বের মানসিক গঠনটাকে কল্পনা করা কঠিন।"

তাঁর মৃত্যু সংবাদ দেন একজন সহকর্মী ব্রিগেডিয়ার, তাঁরই ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং

পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি মারা যান। "প্রথম দিন, একটা পাহাড়ের উপরে জন'এর সেকশন ঘাঁটি রক্ষা করছিল। সব দিক থেকেই তাদের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে উঠেছিল: প্রথমে গোলন্দাজ বাহিনী পরে বিমান, তার পরে শত্রুপক্ষের তিনটি মেশিনগান। তারপর বিপুল সংখ্যায় মুর'রা পাহাড়টা আক্রমণ করলে। জন তার মেশিনগানের খুবই সদ্ব্যবহার করছিল, কিন্তু যেহেতু জন সহ আমাদের সঙ্গীদের খুব অল্প কয়েকজনই মাত্র তখন বেঁচেছিল কোম্পানী কম্যাণ্ডার সেইজন্য পিছু হঠার আদেশ দিলেন। তার সেকশনের একজনের সঙ্গে পরে আমার যোগাযোগ হয়েছিল। পিছু হঠার সময় তিনি আহত হন এবং তিনিই আমায় বলেন যে জনকে শেষবার যখন তিনি দেখেন তখন মুররা ত্রিশ গজ দূরে, আর জন পশ্চাদপসরণকারী সঙ্গীদের আড়াল করার জন্য লড়াই করছে। পরের সাতদিন সেই ফ্রন্টে আমি যখন ছিলাম তখন তার সম্পর্কে সকলের কাছে আমি খোঁজ নিই, কিন্তু কেউ তাকে আর দেখেনি। পাহাড় থেকে জন যে আর নামতেই পারেনি এটা খুবই স্পষ্ট।

উপন্যাস ও বিমানবিদ্যার উপর পাঠ্য পুস্তকগুলি ছাড়া কডওয়েলের সব বই-ই তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত। স্পেনে রওনা হওয়ার সময় Illusion and Reality ছাপার কাজ চলছিল। Studies in a Dying Culture প্রকাশিত হয় ১৯৩৮এ, Poems এবং The Crisis in Physics ১৯৩৯এ এবং Further Studies in a Dying Culture ১৯৪৯ এ।

The Crisis in Physic এর এক সমালোচনায় প্রফেসর জে. বি. এস. হলডেন লিখেছেন: "বিজ্ঞান সম্পর্কে কডওয়েলের কিছু বলার আছে এবং বাস্তবিকই সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যদিও তিনি মাত্র অর্ধেকটা বলেছেন। আমার বিশ্বাস এই বইটি আগামী কয়েক পুরুষ ধরে দার্শনিকদের ভাবনার খনি হয়ে থাকবে।" Illusion and Reality সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। বুর্জোয়া মনোবিদ্যার মার্কসবাদী সমালোচনার ভিত্তিতে নন্দনতত্ত্বের মৌলিক সমস্যাগুলি সম্পর্কে প্রণালীবদ্ধভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে সেগুলির এক সার্বিক সমাধান রচনার জন্য প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে এক নতুন মোড় ফেরার নির্দেশক এটি। তার অর্থ এই নয় যে বইটিতে কোন ভুল নেই। বরং বিপরীতভাবে, লেখক যে তত্ত্বগুলির নিন্দা করছেন সেই তত্ত্বগুলির প্রভাব থেকে লেখক নিজেকে এখনও মুক্ত করতে পারেন নি। বেঁচে থাকলে তিনি নিজেই সর্বপ্রথম এটা ধরতে পারতেন। Further Studies' এ চেতনার উপর তাঁর প্রবন্ধটি থেকেই সেটা স্পষ্ট। সেই প্রবন্ধে

পুরোনো মনোবিদ্যার পুরাণভিত্তিক বিষয়গুলিকে তিনি পরিত্যাগ করেছেন এবং প্যাভলভের সাপেক্ষ প্রতিবর্তক্রিয়ার তত্ত্ব [Theory of conditional Reflexes] যা মনোবিদ্যার বস্তুবাদী বিজ্ঞানের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার্য বলে এখন মনে করা হয় সেই তত্ত্বটিকে গ্রহণ করেছেন।

কডওয়েল ছিলেন একজন প্রতিভাসম্পন্ন মানুষ, কিন্তু প্রতিভাবান হয়েও তাঁর স্বল্পায়ু জীবনে যা তিনি আরম্ভ করেছেন তা সাঙ্গ করতে পারেননি। এক স্বাভাবিক প্রতিভাসম্পন্ন চিন্তাশীল হিসাবে শুরু করে তিনি হয়ে উঠেছিলেন এক কর্মী মানুষ। লেখক হিসাবে তাঁর জীবনের সর্বাধিক উৎপাদনশীল অধ্যায়টি যে পপলার-এ তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপের সমকালীন এটা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। এবং ট্রাজেডি শব্দটির প্রকৃত অর্থে তাঁর মৃত্যু একটা ট্রাজেডি, কারণ তার মধ্য দিয়েই তাঁর জীবন সম্পূর্ণতালাভ করেছিল। কমিউনিস্ট হিসাবেই তিনি বেঁচেছিলেন, কমিউনিস্ট হিসাবেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

ভূমিকা

এই পুস্তকটি কেবল কাব্য সম্পর্কেই নয়, কাব্যের উৎস সম্পর্কেও। কাব্য ভাষা দিয়ে রচিত হয় এবং সেই কারণে পুস্তকটি ভাষার উৎস সম্পর্কেও। ভাষা এক সামাজিক উৎপাদ, মানুষের পরস্পরের সঙ্গে ভাববিনিময় করার এবং পরস্পরের মধ্যে প্রত্যয় উৎপাদিত করার উপকরণ; অতএব, কাব্যের উৎস সম্পর্কে আলোচনা সমাজ সম্পর্কে আলোচনা থেকে আলাদা করা যায় না।

সাহিত্য সমালোচনায় একটি সাধারণ অনুমিত সত্য এই যে সাহিত্যের উৎস হল এক অপ্রাসঙ্গিক বা গুরুত্বহীন বিষয় এবং সাহিত্যকে সাহিত্যের নিজস্ব পরিভাষা অনুসারে পুরাপুরি সমালোচনা করা যেতে পারে। প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনায় এই ধরনের এক দর্শন এক সময় কিছুদিন প্রচলিত ছিল —d'Holbach এর যান্ত্রিক বস্তুবাদ, আজকের দিনের বেশির ভাগ বৈজ্ঞানিক যেটাকে অজ্ঞাতসারে গ্রহণ করেছেন। মনে করা হত যে জড়কে জড়ের নিজস্ব পরিভাষা অনুসারেই পুরাপুরি বর্ণনা করা যায় এবং মানুষ যেহেতু জড় দিয়ে গড়া তাই এই আখ্যাসূচক পদগুলি তাকেও বর্ণনা করতে পারবে। বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ ইত্যাদি যে সব গুণের কোনও বিষয়ীগত বা মানসিক উপাদান আছে, জড় থেকে সেই সমস্ত গুণগুলিকে বাদ দেওয়ার মধ্য দিয়ে এই দর্শন শুরু হল। ভর, আয়তন, স্থান ও কালকে বিষয়গত 'বস্তুগত' বস্তুনির্ভর গুণ বলে গণ্য করা হত—জড় তার নিজের পরিভাষা অনুসারেই বর্ণিত; তারপর আইনস্টাইন প্রমাণ করলেন যে এগুলি নির্ধারণ করার সময় দ্রষ্টা নিজেই এগুলির মধ্যে প্রবেশ করেন। আইনস্টাইন অবশ্য সেই একই চেষ্টা করলেন একটা অনপেক্ষ আখ্যাসূচক পদ, Tensor সৃষ্টি করার জন্য। কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানীদের অনির্দেশ্যতার সূত্র [Principle of Indeterminacy] দেখাল যে tensor আবার দ্রষ্টার উপর নির্ভরশীল। আধুনিক পদার্থবিদ্যার মতে সমীকরণ ছাড়া কোনও কিছুই আর অনপেক্ষ রইল না—আর এই সমীকরণগুলি হল চিন্তা। স্পষ্টতঃই যান্ত্রিক বস্তুবাদ বলেই যে তার এই অপ্রত্যাশিত ফল দেখা গেল তা নয়, তার কারণ হল এই যে সেটা যথেষ্ট পরিমাণে বস্তুবাদী নয়। চিন্তা এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণগুলিতে জড়' এর বাস্তবতা বিবর্জিত একটা দ্বিতীয় ও কাল্পনিক অস্তিত্ব আরোপ করার জন্য যান্ত্রিক বস্তুবাদীরা সঙ্গে সঙ্গে

অ-বস্তুনির্ভর বাস্তবের একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত করলেন, যা তাদের পদ্ধতির ভিত্তিটারই বিরোধিতা করে।

যান্ত্রিক বস্তুবাদ যখন জড়'এর বিষয়গত বা ধ্যানগত দিকটিকে বিকশিত করছিল ভাববাদ তখন তার সক্রিয় বা বিষয়ীগত দিকটিকে বিকশিত করছিল। ভাববাদ হয়ে উঠল ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির [Sensuosness] আলোচনা, আর ইন্দ্রিয়বেদিতা [Sensing] হল একটা সক্রিয় প্রক্রিয়া। মানুষের পরিচিত যে জগৎ সেটা কেবলমাত্র জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সংক্রান্ত গুণগুলি [sensory qualities] দিয়ে—রূপ [forms] প্রত্যয় [concepts], ধারণা [ideas] দিয়ে গঠিত বলে দেখান হল। প্রথমে কান্ট একটা অজ্ঞাত বস্তু আসলে বা thing-in-itself স্বীকার করে নিয়েছিলেন, কিন্তু হেগেল সেটাকে চূর্ণ করলেন এবং বাকি রইল কেবলমাত্র ধারণা, মানুষের মস্তিকের মধ্যে নয়, তার বাইরে এর অস্তিত্ব—অনপেক্ষ ধারণা [The absolute idea]। অনপেক্ষ হওয়ার কারণে তা হল বিষয়গত; বিষয়গত হওয়ার কারণে তা হল বস্তু-নির্ভর [material]। ভাববাদ বস্তুবাদ হয়ে উঠল, কিন্তু যেহেতু সুরু থেকেই তা বিষয়গত, ধ্যানলব্ধ জড়কে বাদ দিয়েছিল সেই কারণে তা হল হেগেল এর লজিকের কঠোর নিয়মাধীন, অশরীরী বস্তুবাদ, সঙ্গে রইল চিন্তা দ্বারা নির্ধারিত এক স্বয়ংসম্পূর্ণ কাঠামো [Structure]।

এটা ঘটার কারণ এটাই যে বস্তুবাদে বিষয়কে বিষয়ী থেকে পৃথক করা হয়েছিল এবং ধ্যানের দিক থেকে গণ্য করা হয়েছিল, আর ভাববাদে বিষয়ীকে নিশ্চয়ই সক্রিয়ভাবে গণ্য করা হয়েছিল কিন্তু তা সক্রিয় ছিল একটা শূন্যের উপর, নিছক অবভাসের [appearance] উপর। এইটি বুঝতে পারার ফলে মার্ক্স এই প্রত্যয়ে পৌছলেন যে বিষয়ী-বিষয় সম্পর্কটি একটি সক্রিয় সম্পর্ক, মানুষের জন্ম হল বিষয়ের উপর প্রয়োগের [practice] ফল, ইন্দ্রিয়বেদিতা হল কোন কিছুর ইন্দ্রিয়বেদিতা। মানুষ হল বিষয়ী এবং প্রকৃতি হল বিষয়, তত্ত্বকে এই দুইয়ের সংগ্রাম থেকে সৃষ্ট বলে দেখা হল।

কিন্তু এই প্রত্যয় এখানেই থেমে থাকতে পারে না। কারণ একবার যখন এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, বিষয় থেকে বিষয়ীকে বিমূর্ত করে তোলার ফলে দর্শনের ভুলগুলি ঘটেছে তখন এটাও পরিষ্কার হয়ে গেল যে সক্রিয় বিষয়ী-বিষয় সম্পর্কটি প্রকৃতির মধ্যে জীবনযাপন করা মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়। বিমূর্ত প্রকৃতির মধ্যে এক বিমূর্ত মানুষ নয়, মানুষ প্রকৃতই যেভাবে জীবনযাপন করে ও আচার ব্যবহার করে সেই মানুষ, সেই মানুষ যাকে বিমূর্তভাবে ভাবনা চিন্তা করার আগে মূর্তভাবে জীবনযাপন করতে হয় এবং সেই কারণে

বস্তুর বিমূর্ত চিন্তাগুলি তার মূর্ত জীবনযাত্রার চিহ্ন বহন করে। মার্ক্স দেখলেন যে দর্শনের ক্ষেত্রে ভোগের মধ্যে যে বিষয়ীকে পৃথক করা হয়েছে সেটা মূর্ত জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে দর্শন-সৃষ্টিকারী শ্রেণীর সচেতন অস্তিত্ব এবং সমাজের অবশিষ্ট অংশের অচেতন ক্রিয়ার [actions] মধ্যে যে অনুরূপ বিচ্ছেদ ঘটেছে তারই বিমূর্ত প্রতিফলন। চেতনার ক্ষেত্রে তত্ত্ব ও প্রয়োগের বিচ্ছেদ ঘটেছে, কারণ সামাজিক বাস্তবের ক্ষেত্রে তারা বিভক্ত হয়ে গেছে।

এইভাবে মার্ক্সের কাছে মনে হল যে মূর্ত জীবনযাত্রার ফলগুলি, যার মধ্যে দর্শন একটি ফল, বুঝতে হলে প্রাথমিক কাজ হল মূর্ত জীবনযাত্রাকে বোঝা। একদিকে রয়েছে মূর্ত জীবনযাত্রা, তত্ত্ব ও প্রয়োগ দুটিই যার অন্তর্ভুক্ত, আর অপরদিকে রয়েছে মূর্ত জীবনযাত্রার তত্ত্ব, যা তত্ত্ব ও প্রয়োগের মূর্ত সম্পর্কটিকে তত্ত্বে পরিণত করার চেষ্টা করে।

মূর্ত জীবনযাত্রা কঠিন স্ফটিক নয়। কোনও কারণে পরস্পরের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক গড়ে উঠে। এই মানবসম্পর্কগুলির বিষয়ে আলোচনার একটি সাধারণ রূপ হল সমাজবিদ্যা। মানবসম্পর্কের-সমষ্টি কালের সীমানায় পরিবর্তনহীন নয়, বরং তা দ্রুত পরিবর্তিত হয়। কোনও নির্দিষ্ট যুগে মানুষে মানুষে সম্পর্কগুলিকে যে সাধারণ নিয়মগুলি নির্ধারিত করে, এবং এক যুগ থেকে আর এক যুগে এই সম্পর্কগুলির যে পরিবর্তন ঘটে তাই দিয়ে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্বটি গঠিত।

যান্ত্রিক বস্তুবাদ ও ভাববাদ যে দর্শনেরই বৈশিষ্ট্য তা নয়, বিজ্ঞান, নন্দনতত্ত্ব ও মানুষের ইতিহাসেও তা প্রকাশ পায়। মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে যান্ত্রিক বস্তুবাদে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তি যদি কাব্য আলোচনা করেন তা 'হলে কাব্যকে ব্যবহারের [behaviour] একটা রূপ হিসাবে তিনি গণ্য করেন; দর্শনের ক্ষেত্রে যান্ত্রিক বস্তুবাদে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তি যদি আলোচনা করেন তাহলে কাব্যকে তিনি মানুষের দেহের মধ্যে সংগঠিত বস্তুর মধ্যে যে "নান্দনিক" বোধ অন্তর্নিহিত তারই পরিতোষ সাধন ছাড়া অন্য কিছু বলে গণ্য করবেন না। ভাববাদীদের অবস্থানটি সাধারণতঃ কাব্য বিচারের ক্ষেত্রে বেশি উপযুক্ত বলে মনে করা হয়, সেটি আবার সত্য, সুন্দর বা মঙ্গলের নিজস্ব পরিভাষা অনুসারে ব্যাখ্যা করা হয়।

শিল্পের ব্যাপারে কেউ যদি যথার্থই আগ্রহী হন তাহলে তাঁর পক্ষে এই সব আক্রমণকে প্রতিহত করা খুব শক্ত নয়, যদিও এই আক্রমণগুলি প্রায়ই যেমন কুহেলিকাময় সেই রকম অবিরত। কিন্তু যাঁরা পুরাপুরি শিল্পের চৌহদ্দির মধ্যে থাকেন এবং "বিশুদ্ধ" নান্দনিক আলোচ্য বিষয়গুলি ছাড়া

অন্ত কিছু স্বীকার করতে রাজী নন তাঁদের পদ্ধতির মধ্যে ও দৃষ্টিভঙ্গীতে একই ত্রুটি দেখা যায়।

শিল্পের ক্ষেত্রে যান্ত্রিক বস্তুবাদীরা শিল্পকর্মকে একটা বিচ্ছিন্ন বিষয় হিসাবে দেখেন এবং এমন একটা শিল্পতত্ত্ব খাড়া করার চেষ্টা করেন যা থেকে বিষয়ী বা শিল্পীকে বাদ দেওয়া হয়েছে, একটা তত্ত্ব যা শিল্পের করণ কৌশল বা রূপের পরিভাষা অনুসারে দেখা হয়েছে। মনে করা হয় যে শিল্পের যে করণকৌশল, ও "বিমূর্ত" গুণগুলি শিল্পীনিরপেক্ষভাবে পরীক্ষা করা যায় তার সবগুলিকে যখন বার করা যাবে এবং তত্ত্বে পর্যবসিত করা যাবে তখন শিল্প তার নিজের পরিভাষা অনুসারেই বর্ণিত হবে। এ হল আচারবাদ [formalism]' এর তত্ত্ব এবং এটা সুস্পষ্ট যে তত্ত্ব হিসাবে দর্শনে যেমন যান্ত্রিক বস্তুবাদ, নন্দনতত্ত্বে এটাও সেইরকম। এই দার্শনিকদের মত আচারবাদীদেরও শেষ পর্যন্ত থাকে কেবল বিষয়ীগত বাস্তবগুলি—থাকে কেবল প্রত্যয়, ধারণা, ছক এবং নিয়ম।

শিল্পের ক্ষেত্রে ভাববাদীরা শিল্পকর্মকে বিষয়ীগত বলেন, শিল্পরসিক বা শিল্পীর মনের 'অনুভূতি' বলে মনে করেন এবং পুরাপুরি সেই ভিত্তির উপর খাড়া করে শিল্পের এক তত্ত্ব দেখার চেষ্টা করেন। তারা বিশ্বাস করেন যে নান্দনিক আবেগ শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত ও প্রশ্নের অতীত, সেটা পুরাপুরি তাঁদের অভ্যন্তরেই থাকে এবং শিল্পের কোনরকম সমালোচনা হয় ব্যক্তিগত ও বিষয়ীগত। এটা হল আবেগবাদের তত্ত্ব।

এটা যে কেবল দর্শনের ক্ষেত্রে ভাববাদীদের তত্ত্বেরই অনুরূপ তাই নয়, তাদের তত্ত্বের মতই এই তত্ত্বও এক ভুতুড়ে বস্তুবাদে গিয়ে শেষ হয়। Ogden ও Richards-এর তত্ত্ব থেকে যেমন দেখা যায় যে নান্দনিক আবেগ শেষ পর্যন্ত coenaesthesiaতে পর্যবসিত হয়, এবং সেটা আবার কোন-কোন স্নায়ুর উত্তেজনা মাত্র[1]। আচারবাদ 'যেমন কতকগুলি ধারণা' হয়ে উঠে আবেগবাদও সেইরকম 'শরীরবিদ্যা' [physiology] হয়ে উঠে।

হেগেল যখন এই দ্বন্দ্বকে শেষ সীমা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন যেখানে মার্ক্স এক নতুন স্তরে তার সমাধান করলেন, তখনও পর্যন্ত প্রত্যক্ষবাদ [positivism] বা প্রতিভাসবাদের একটা জোড়াতালি দেওয়া আপোষ [phenomenalism] সম্ভব ছিল। একমাত্র সম্পর্কটিকেই বাস্তব করায়

১। দ্রঃ Ogden and Richards : Meaning of Meaning, and Richards : Principles of Literary Criticism.

এই আলোর বিষয়ী-বিষয়গত সম্পর্কের সমস্যাটির সমাধান করেছিল। এবং ফলে কেবলমাত্র প্রতিভাসেরই [phenomena] অস্তিত্ব রইল।

এই সমাধান কোন সমাধানই নয়। যেহেতু কেবলমাত্র কতকগুলি অবভাসেরই [appearances] অস্তিত্ব রইল অতএব কোনও বাস্তব (মন বা বস্তুর মত) নেই যা অবভাসকে সংগঠিত করতে পারে বা মূল্য দিতে পারে, এবং সবগুলির বৈধতাই সমান। অবভাসের সংখ্যা যেহেতু অসংখ্য, অতএব অবভাসের সেই সংগঠনগুলিও, বিজ্ঞান, তত্ত্ব বা সত্য বলে যা পরিচিত, সেগুলিও বিধিবহির্ভূত ও অপ্রতিষ্ঠিত [arbitrary and unfounded]।

প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষবাদ সর্বদাই অসাধু এবং প্রথম থেকেই গোপনে অন্য এক বাস্তবকে (সাধারণতঃ মনকে) গঠনতন্ত্রটির [system] মধ্যে নিয়ে আসে তাকে সংগঠিত করার এবং কিছুটা বৈধতার মান দেওয়ার উদ্দেশ্যে। 'কাজের সুবিধা' বা 'সম্ভাব্যতা' এই ধরনের কোন নামের আড়ালে এই বাস্তবকে লুকিয়ে রাখা হয়। প্রত্যক্ষবাদ এইভাবে প্রকৃতপক্ষে সাধারণতঃ মুখচোরা ভাববাদ বা কখনও কখনও (অজ্ঞেয়তাবাদের রূপে) মুখচোরা বস্তুবাদ। এমন কি হেগেলবাদের সঙ্গে তুলনাতেও প্রত্যক্ষবাদ একটা অধঃপতন সূচিত করে এবং দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে সমস্যাটির যে বাস্তব সমাধান করা হয়েছে তার তুলনায় সেটা আরও বেশি অধঃপতন সূচিত করে।

অতএব প্রত্যক্ষবাদ ও নন্দনতত্ত্বে শিল্পকর্মের বিশুদ্ধ উপভোগক্রিয়া হিসাবে, "শিল্পের জন্য শিল্প" হিসাবে দেখা দেয়। অবশ্যই এ থেকে শিল্পকর্মগুলির মধ্যে বা শিল্পকর্মগুলিকে উপভোগ করার মধ্যে আদৌ কোন পার্থক্যসূচক মাপকাঠি [standard of discrimination] পাওয়া যাবে না, এবং সেই কারণে, প্রকৃতপক্ষে নান্দনিক ক্ষেত্রে সমস্ত প্রত্যক্ষবাদীরা একটা কিছু সাংগঠনিক সূত্র গোপনে নিয়ে আসে, সেটা সাধারণতঃ আবেগবাদী (ব্যক্তিত্বের বা আবেগের বাস্তবতার সমন্বয় সাধন) কিন্তু কখনও কখনও তা আকারগত (ছন্দ বা রূপ)।

নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে সুপরিচিত ইংরেজি রচনাগুলিকে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, সমস্ত লেখকরা তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশুদ্ধ নন্দনতত্ত্ববাদী থাকেন এমনকি তাঁরাও একটা অংশে আবেগবাদী অবস্থান গ্রহণ করেন এবং তারপর অন্য একটি অংশে আচারবাদী নির্ণায়ক ব্যবহার করেন, এবং এই দুই দৃষ্টিভঙ্গীর সুস্পষ্ট দ্বন্দ্বের সমন্বয় ঘটানর কোন চেষ্টা না করেই তাঁরা এটা করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কঠোরভাবে নন্দনতত্ত্বগত দৃষ্টিভঙ্গী বজায় রাখেন নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে এমন ইংরেজ লেখক দুর্লভ। সাধারণভাবে তিনি শিল্পের ক্ষেত্রের বাইরে

থেকে এমন সব চিন্তা আমদানি করেন যেগুলির উৎস হল মনোবিদ্যাগত, ইতিহাসগত বা এমন কি বৈদিক, এবং যেহেতু কিছু কিছু চিন্তা তার তত্ত্বের দিক থেকে ভাববাদী হতে পারে (যেমন উদাহরণস্বরূপ, মনঃসমীক্ষণ) এবং অন্য কিছু কিছু চিন্তা বস্তুবাদী (যেমন উদাহরণস্বরূপ, শারীরবিদ্যা, বা ডারউইনীয় জীববিদ্যা), এবং যেহেতু এগুলি দেকার্ত,স্পিনোজা, হেগেল এবং এমন কি মার্ক্স'এর মত পরস্পরের থেকে অনেক দূরের এবং নিদারুণভাবে পরস্পরের বিরোধী উৎস থেকে নেওয়া তত্ত্ববিদ্যামূলক [metaphysical] মতবাদের সঙ্গে মিশ্রিত করা যেতে পারে ফলে তার ফলটা যা দাঁড়ায় সেটা লক্ষ্য করার মত। বিশেষ জ্ঞান অর্জন করা উপকারী, সমন্বয় সাধন অপরিহার্য ; সার সংগ্রহতত্ত্ব [eclecticism] এই দুটিকেই এড়িয়ে যায় এবং দুটি জগতেরই যথাসাধ্য ক্ষতি করে এবং আধুনিক চিন্তার সেটা একটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ।

কাব্যের এই আলোচনা সম্পর্কে প্রথম থেকেই বিশুদ্ধ নান্দনিক বিষয়-গুলির [categories] কোনও সীমাবদ্ধতা আমরা বাতিল করে দিচ্ছি। কেউ যদি পুরাপুরি নন্দনতত্ত্বের চৌহদ্দির মধ্যে থাকতে চান তাহলে তাঁকে হয় শিল্পকর্মের স্রষ্টা না হয়ত রসগ্রাহী হতে হবে। একমাত্র এই সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেই নন্দনতত্ত্ব "বিশুদ্ধ" থাকে।

কিন্তু যখনই কোন ব্যক্তি শিল্পের উপভোগ বা শিল্পসৃষ্টি থেকে শিল্পের সমালোচনার ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন তখনই এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে তিনি শিল্পের ক্ষেত্রের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, তিনি "বাইরে" থেকে শিল্পকে দেখতে শুরু করেছেন। কিন্তু শিল্পের বাইরে কি? মুক্তা যেমন শুক্তির উৎপন্ন শিল্প সেইরকম সমাজের উৎপন্ন এবং শিল্পের বাইরে গিয়ে দাঁড়ানর অর্থ হল সমাজের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ান। শিল্পের বিশুদ্ধ উপভোগ বা সৃজন করা থেকে শিল্পের সমালোচনার পার্থক্য এই যে তার একটা সমাজবিদ্যামূলক উপাদান থাকে। শিল্প সমালোচনায় এমন এক পরিপ্রেক্ষিত বা বিশ্ব দৃষ্টিতে মূল্যগুলি ক্রমানুসারে স্থাপিত ও সমন্বয়িত হয় যেটা বাইরে থেকে শিল্পের সঙ্গে একটা সক্রিয় জীবন্ত সম্পর্ক এবং সেটা শিল্প সম্পর্কে এক নিরুত্তাপ ধ্যান নয় এবং সেই কারণে এর সঙ্গে জড়িত থাকে এক শিল্পদৃষ্টি যা সক্রিয় এবং বিস্ফোরণাত্মক, কর্মশক্তিপূর্ণ বিষয়বস্তু যুক্ত। এবং এটা শিল্প সম্পর্কে একটা দৃষ্টি, সমাজ সম্পর্কে বা মন সম্পর্কে নয়।

কিন্তু পদার্থবিদ্যা, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, জীববিদ্যা, দর্শন ও মনোবিদ্যা—এগুলিও সমাজের উৎপন্ন, এবং সেই কারণে লক্ষ্য রাখা দরকার যে একটা নির্ভরযোগ্য.

সমাজবিদ্যার সাহায্যে নানা মতের সারসংগ্রহকারী এক মতবাদের ফাঁদে না পড়ে বা শিল্পকে মনোবিদ্যা বা রাজনীতির সঙ্গে গুলিয়ে না ফেলে শিল্প সমালোচনা যাতে এই সমস্ত ক্ষেত্র থেকে সংগ্রহ নির্ণায়কগুলিকে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়। নির্ভরযোগ্য সমাজতত্ত্ব একটিই মাত্র আছে—যা সমাজে উৎপন্ন মতাদর্শগত গুলির পরস্পরের সঙ্গে সাধারণ সক্রিয় সম্পর্কটি ও মূর্ত জীবনযাত্রার সঙ্গে তাদের সাধারণ সক্রিয় সম্পর্কটিকে স্পষ্ট করে তুলে ধরে—তা হল ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। সেই কারণে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ হল এই আলোচনার ভিত্তি।

সমাজের সঙ্গে তাদের সাধারণ সম্পর্কের দিক থেকে অন্যান্য শিল্পগুলি আলোচনা যদিও করা হয়েছে তবুও আলোচনাটিকে একটি বিশেষ শিল্পের উপর, কাব্যের উপর মুখ্যতঃ কেন্দ্রীভূত করাটাই বাঞ্ছনীয় মনে হয়েছে, যেহেতু তার প্রাচীন ইতিহাস এবং আজকের দিনে তার কিছুটা অপ্রচলিত হয়ে উঠতে থাকা রূপটা নন্দনতত্ত্বের ছাত্রদের কাছে সংকটময় সমস্যাবলী তুলে ধরছে, তাছাড়া লেখকের কাছে এই শিল্পটি সব থেকে বেশি আকর্ষণীয় হওয়ার ঘটনাটিও এই কর্তব্যে লেখককে বিশেষ আগ্রহ যুগিয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

কাব্যের জন্ম

১

মানব মনের প্রাচীনতম নান্দনিক কার্যকলাপের মধ্যে কাব্য অন্যতম। কোন জাতির প্রথম যুগের সাহিত্যে একটা পৃথক সৃষ্টি হিসাবে যখন এর অস্তিত্ব চোখে পড়ে না তার কারণ এই যে সমগ্র সাহিত্যের সঙ্গে সেটা তখন সমব্যাপ্তশীল; ইতিহাস, ধর্ম, যাদু এবং এমন কি আইনেরও তা সাধারণ বাহন। কোন সভ্যজাতির প্রথম যুগের সাহিত্য যেখানে রক্ষিত হয়েছে সেখানে দেখা যায় যে তা রূপের দিক থেকে প্রায় পুরাপুরি কাব্যধর্মী—অর্থাৎ, ছন্দোবদ্ধ বা মাত্রাবদ্ধ [metrical]। গ্রীক, স্ক্যান্ডিনেভিয়, এ্যাংলোস্যাক্সন, রোমান্স, ভারতীয়, চীনা, জাপানী ও মিশরীয় মানুষেরা হল এই সাধারণ সূত্রের উদাহরণ।

কোন আধুনিক অর্থেই এই কাব্য "বিশুদ্ধ" কাব্য নয়। একে সাধারণ মুখের ভাষার একটা উন্নীত রূপ আমরা বলতে পারি। এটাকে কাব্যের একটা পর্যায় সজ্ঞা অবশ্য আমরা বলছি না। একটা আচারগত গঠনের [formal structure] সাহায্যে এই উন্নীতকরণ প্রকাশ পায়—মাত্রা, মিল, অনুপ্রাস, সমদীর্ঘ শব্দাংশ দ্বারা রচিত পংক্তি, নিয়মিত শ্বাসাঘাত বা পরিমাণ, স্বর সংগতি—যে সব কারুকৌশল কাব্যকে সাধারণ মুখের ভাষা থেকে পৃথক বলে সূচিত করে এবং তাকে এক রহস্যময়, সম্ভবতঃ যাদুধর্মী জোয়াল ছাপ দেয়। আচারধর্মিতার কারণে যে পুনরাবৃত্তি, রূপক ও বিরোধালংকার থাকে, সেগুলিকে আমরা মূলতঃ কাব্যধর্মী বলে গণ্য করি।

এই সামান্যীকরণকে সাধারণভাবে স্বীকার করা হয় এবং দু একটার বেশি তার উদাহরণ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। ঈশ্বরতত্ত্ব বিষয়ক রচনা এবং জোতদারদের জন্য নির্দেশাবলী রচনার জন্য হেসিয়ড একটা কাব্যধর্মী কাঠামো ব্যবহার করার কথা স্বাভাবিক বলে মনে করেছিলেন। সোলোন তাঁর রাজনৈতিক ও পরিষদীয় প্রবন্ধগুলি স্বাভাবিক ভাবেই মাত্রাবদ্ধ করে রচনার কথাই চিন্তা করেছিলেন। ভারতের আর্যজাতির তত্ত্ববিদ্যামূলক ভাবনাচিন্তা পদ্যে রচিত হয়েছিল। মিশরীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যরক্ষা রূপের দিক থেকে

কাব্যধর্মী। ধর্ম প্রায় সময়েই ছন্দ বা মাত্রায় কথা বলেছে। এবং ঠিক যেমন অভিজাতদের ইতিহাসের জয়গান-করা কাব্যধর্মী বেদগানের জন্মস্তব থেকে মহাকাব্যের সৃষ্টি হয়েছিল, সেইরকম ছন্দোবদ্ধ রূপে বাঁধা প্রথম যুগের কৃষি-বিষয়ক আচার-অনুষ্ঠান হয়ে উঠল এথেনীয় ট্র্যাজেডি ও কমেডি এবং শেষ পর্যন্ত অনেক উত্থান-পতনের রকমফের ঘটার পর আজকের দিনের অপেরাতে কাব্যধর্মী নাটক ও ক্রীসমাস উৎসবের মূকাভিনয় হয়ে টিকে আছে।

জাতিতত্ত্বমূলক গবেষণা থেকে আরও দেখা গেছে কিভাবে কোনও রক্ষণ-যোগ্য শব্দ—আবহাওয়া বিষয়ক প্রবাদ, কৃষিজীবির ডাকের কথা, যাদুমন্ত্র, বা আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্মের মধ্যে অপেক্ষাকৃত মার্জিত সূক্ষ্মতা—সমস্ত জাতির মধ্যে সর্বকালে উন্নীত ভাষার দিকে এগিয়ে গিয়েছে। লোক যত সচেতন-ভাবে সাহিত্যমুখী হয়ে উঠেছে কালক্রমে এই উন্নীত ভাষাকে কাব্য নামে পরিচিত সাহিত্যের একটি বিভাগের বিশিষ্ট বাহন হিসাবে ততই একপাশে আলাদা করে রাখা হয়েছে, এবং বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন মাত্রায় লেখার ও বলার অন্যান্য ধরনের ব্যবহারের থেকে একে পৃথকভাবে সূচিত করা হয়েছে। যে কোনও সভ্য যুগে কাব্যের যেটি বিশিষ্ট রূপ তা সমস্ত সাহিত্যের আদিম রূপ। সাহিত্য আলোচনার জন্য কাব্যের আলোচনা সেইকারণে মৌলিক কাজ হতে বাধ্য।

আদিম মানুষদের মধ্যে প্রথাভিত্তিক অনুষ্ঠানগুলিতে আমরা সাধারণতঃ এই যে উন্নীত ভাষা দেখতে পাই, কথাগুলি লিপিবদ্ধ হলে সেটা লোপ পেয়ে যায়। শব্দগুলিকে সংগীত বা অমার্জিত ছন্দের সঙ্গে—সুর করে আবৃত্তি করার সঙ্গে মিলিয়ে এই উন্নীতকরণ করা হয়। খুব নিশ্চিত না হলেও এটা ধরে নিতে ইচ্ছা হয় যে ছন্দোবদ্ধ বা মাত্রাবদ্ধ ভাষা, লিপি আবিষ্কারের পূর্বে, সব সময়েই এক ধরনের অমার্জিত সঙ্গীতের সঙ্গে মিলিয়ে ব্যবহার করা হত। আর বাস্তবিকই এটা মনে করলে খুব অসঙ্গত হয় না যে সঙ্গীত আদিম কাব্যের সমকালেই সৃষ্ট হয়েছিল এবং অঙ্গভঙ্গী ও লাফান, অর্থহীন শব্দ ও শীৎকার এবং লাঠি ও পাথর ঠুকে কৃত্রিম কোলাহল সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত আদিবাসীদের এক দৈহিক ছন্দই হল নৃত্য, কাব্য ও সঙ্গীতের সাধারণ উৎস। এই তত্ত্বের অনেক প্রমাণ আফ্রিকায় পাওয়া যেতে পারে। যেমন ধরুন একটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ উদাহরণ হল Rattray বর্ণিত Ashanti দের কথাবলা-ঢাক, যা বার্তা পাঠায়। সাংকেতিক শব্দ মালার সাহায্যে নয় কিন্তু, বর্ণমালাহীন আদিম মানুষের পক্ষে সেই ধরনের বিমূর্ত চিন্তা অসম্ভব। ঢাকের উপর কথা

বলার ছন্দ ও শব্দগ্রামের [pitch] অনুকরণ করে এটা করা হয়, ঢাকগুলি তাতে আক্ষরিক অর্থে কথা বলে।

যাই হোক, এই ধরনের অনুমান যতই চিত্তাকর্ষক হোক না কেন তার উপর আমাদের ভিত্তি গড়াটা বিপজ্জনক, রীতিমত প্রমাণ করার পক্ষে তা বড় বেশি ব্যাপকার্থক। সেইজন্য যেটুকু ধরে নেওয়া যায় তা হল এই যে, উদ্গীত ভাষার একটা বিশেষ রূপ থেকে সাধারণ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সভ্য মানুষের লিখিত সাহিত্যের আবির্ভাব। এই উদ্গীত ভাষা প্রথম দিকে প্রায় সমস্ত ঐতিহ্যবাহী সাহিত্যকে একচেটিয়া করেছিল এবং সভ্যতা যত এগিয়ে গিয়েছে ততই তার নিজেরই একটি কোণে সেটি আবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

এই উদ্গীত ভাষাকে তার প্রথম দিকের পর্যায়ে সংগীত ও নৃত্যের সঙ্গে সাধারণতঃ সংশ্লিষ্ট দেখা যায়। এমন কি পেরিক্লিসের কালের এথেন্সের আত্মসচেতন সাহিত্যও কাব্য ও সঙ্গীতের মধ্যে কোন প্রকৃত পার্থক্য লক্ষ্য করেছিল বলে মনে হয় না। সমস্ত ধরনেব গ্রীক কাব্যেরই নিজের উপযুক্ত সাংগীতিক আনুষঙ্গিক এবং নাট্যকাব্যের ক্ষেত্রে নৃত্যগত আনুষঙ্গিক ছিল। আজও আবছা ভাবে সেই যোগসূত্রটা বজায় আছে। সঙ্গীত ও কাব্য নিজের নিজের অধিকারে অনেকদিন ধরেই টিকে আছে কিন্তু গীত ও নৃত্যেব সঙ্গীতের এলাকায় সীমারেখাটা অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভাষার এই পৃথকীভবন [differentiation] ও বিশেষীকরণ [specialisation] অবশ্য সমস্ত সভ্য মানুষের ক্রিয়ারই বৈশিষ্ট্য। সভ্যতার বিকাশের অঙ্গ হল এক অবিরাম পার্থক্য সৃষ্টিকারী শ্রম বিভাজন, যা অবিরাম সমন্বয় সাধনকারী সামাজিক অর্থনীতির বুননের পরিপন্থী নয়, বরং তারই হেতু। মানব দেহ যেমন তার বিভিন্ন অংশগুলির বিশেষীকরণের ফলে জেলিফিশ'এর থেকে বিস্তারিত স্নায়ুতন্ত্র [elaborate nervous system] দ্বারা আরও বেশি উন্নতভাবে সমন্বয়িত, যার থেকে কোন অংশকে বিচ্ছিন্ন করে নিলেও সেটা বেঁচে থাকে সেইরকম সমাজের উৎপাদনের ভিত্তি যত আরও বেশি বেশি করে একীভূত হতে থাকে একই সঙ্গে তার বিস্তারিত ভাব এবং পৃথকীভবনও ততই বাড়তে থাকে। যে কোন সভ্যতাকেই সামগ্রিকভাবে দেখলে এটা চোখে পড়বে যে তার অর্থনৈতিক ভিত্তি যতই বিস্তারিত হয় ও পরস্পরকে ভেদ করে [interpenetrates] ততই তার সমস্ত সাংস্কৃতিক উপরি কাঠামোর [superstructure] দিক থেকে সেটা আরও বেশি বেশি করে পৃথকীভূত হতে থাকে। কাব্য, যা উপজাতির

অর্থনীতিতে ছিল সমস্তরকম কার্কর্মলাপের বাহন আধুনিক সংস্কৃতির সমৃদ্ধ বিস্তারলাভের মধ্যে তা উপন্যাস, ইতিহাস ও নাটকের পাশাপাশি আর একটি কার্যকলাপ হয়ে উঠে। এই বিকাশ কেবল যে কাব্যের অর্থ বোঝারই একটা সূত্র আমাদের দেয় তাই নয়, ঘটনাগুলি যেমন যেমন ঘটতে থাকে সেই রকম পর পর যদি সেগুলিকে আমরা অনুসরণ করি তাহলে মানুষের জীবনে সমস্ত শিল্প ও বিজ্ঞানের তাৎপর্য সম্পর্কেও একটা সূত্র পাওয়া যায়। মানুষের সমাজ যেহেতু বিকশিত হতে থাকে সেই কারণে এটাও আমরা আশা করি যে তার শিল্পেও সেই অনুযায়ী একটা বিকাশ দেখতে পাওয়া যাবে এবং সেই কারণে মানুষ, সমাজ ও সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত যে গুণগুলি এই বিকাশকে সম্ভব করেছিল, সেগুলিকে তা আরও বেশি বেশি স্পষ্ট করে উদ্‌ঘাটিত করবে।

২

কোন নির্দিষ্ট সমাজ অন্য একটি সমাজের থেকে যে আরও বেশি উন্নত সেটা কিভাবে আমরা বিচার করব? সেটা কি জৈব বিবর্তনের প্রশ্ন? ফিশার দেখিয়েছেন যে "যোগ্যতার" ["fitness"] একটি মাত্রই সংজ্ঞা আছে যেটি জৈবিক দিক থেকে সমর্থিত, আর তা হল অন্যান্য প্রজাতি সমেত পরিবেশের বিনিময়ে সংখ্যাবৃদ্ধি। মানুষের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উৎপাদনের স্তরের উপর নির্ভর করতে বাধ্য—এটা যত বেশি উন্নত হবে মানুষ তত বেশি তার পরিবেশের উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে।

কিন্তু মানুষের ত' একটিমাত্র প্রজাতি—হোমো স্যাপিয়েনস—এবং তার অর্থনৈতিক উৎপাদনের স্তর বিভিন্ন স্থানে অসম এবং বিভিন্ন মাপের স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থার মধ্যে তার বিকাশ ঘটে। মানবজাতির ক্ষেত্রে এই প্রজাতি অভ্যন্তরস্থ পার্থক্যটিই অন্যান্য প্রজাতি থেকে মানুষকে পৃথক করেছে এবং আমরা যে ক্ষেত্রটির ব্যাপারে আগ্রহী—সংস্কৃতির ক্ষেত্রটিতে—জৈবিক মাপকাঠিকে আর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ রাখছে না। ঐতিহাসিক কালে মানুষের আপেক্ষিকভাবে স্থির জৈবিক গঠনের উপর আরোপিত অ-জৈবিক পরিবর্তন সাহিত্যের ইতিহাসের উপজীব্য। এই বিকাশ অ-জৈবিক এই কারণেই যে তা অর্থনৈতিক। এ হল প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রামের কাহিনী, যে সংগ্রামে প্রকৃতির উপর এবং নিজের উপর তার ক্রমবর্ধমান আধিপত্য, সহজাত কোন

দেহের উন্নতির জন্য ঘটেনি, তা ঘটেছে যন্ত্রপাতি, লেখনি ব্যবহারের কৌশল, ভাষা, সামাজিক ব্যবস্থা, মূলধন এবং হস্তান্তরযোগ্য বাহ্যিক গঠন ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতির কারণে। এই উত্তরাধিকার হল "মানবিক গুণগুলির" বিপুল স্তূপ সঞ্চয়, যা দেহকোষের দ্বারা হস্তান্তরিত [somatically transmitted] হয় না, হয় সামাজিকভাবে। একে ব্যবহার করতে হলে স্বাভাবিক বুদ্ধির দরকার হয়, কিন্তু এটা একটা আকারদানকারী শক্তি [plastic force] যা এই বিকাশমান ও হস্তান্তরিত আকারগুলিকে স্ফীত করে। এইভাবে দেখলে সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক উৎপাদন থেকে বা সামাজিক সংগঠন থেকে কাব্যকে পৃথক করা যায় না। এবং এ দুটি একত্রিতভাবে সাধারণ জৈবিক গুণগুলির তীব্র বিরোধিতা করে।

অতএব যুগধর্মের দিক থেকে কাব্যকে একটা জাতিগত, রাষ্ট্রগত, জনিগত [genetic] বা প্রজাতিগত কিছু হিসাবে দেখলে চলবে না, তাকে অর্থনীতিগত ভাবে দেখতে হবে। শ্রম বিভাজনের জটিলতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিকাশ এবং সেই কারণে কাব্যগত বিকাশ বাড়বে বলে আমরা আশাকরি, কারণ শ্রমবিভাজনের উপরই তার ভিত্তি। এখনও পর্যন্ত কোনও নান্দনিক মাপকাঠি প্রচলিত হয়নি। জটিলতা কোন নান্দনিক নির্ণায়ক নয়। এই গুণটি শ্রমের বিভাজন ও সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই মাত্র।

আদিম মানুষের মধ্যে—যে জনসমাজের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উৎপাদন তার খাদ্যসংগ্রহ বা পশুশিকার ও মৎস্য শিকারের প্রাথমিক পর্যায় পার হয়নি সেই ক্ষেত্রে—ইতিহাসের দিক থেকে আরও উন্নত জনসমাজের তুলনায় ক্রিয়ার ক্ষেত্রে পৃথকীভবন আরও কম। যেটুকু পার্থক্য থাকে তা হল লিঙ্গভেদ, বয়সের পার্থক্য ও বিবাহসম্বন্ধী শ্রেণী বা টোটেমগত গোষ্ঠীর পার্থক্য। উপজাতির প্রতিটি সভাই তার লিঙ্গ, বয়স বা টোটেম অনুযায়ী যে সামাজিক, যাদুগত ও অর্থনৈতিক কাজের উপযুক্ত সেই কাজ করতে পারে—অবশ্য যদি সে আনুষ্ঠানিক দিক থেকে অপবিত্র না সমাজবহিষ্কৃত না হয়। সেই কারণে তাদের আনুষ্ঠানিক ভাষা ও তাদের শিল্প যে সমভাবে অ-পৃথকীভূত থাকে এবং কাব্য বা উদ্গীত ভাষা যে তাদের যৌথজ্ঞানের সাধারণ বাহন হয় এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

পৃথকীভবনের প্রক্রিয়াটি যথাযথভাবে কি রকম হয় সে বিষয়ে নৃতাত্ত্বিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। এমন কি অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের সংস্কৃতিও আজকাই এমন এক যুগের সৃষ্টি যেখানে বহুই ঐতিহাসিক বিকাশ ঘটেছে,

প্রকৃতপক্ষে পরিব্যাপ্তিবাদীরা [diffusionists] এর মধ্যে পরোক্ষ বিপরীত প্রভাবের চিহ্ন দেখতে পান। প্রক্রিয়াটিকে ফ্রেজার যেভাবে দেখেছেন তা হলে এই যে চতুর আদিম মানুষ যাদুভিত্তিক কাজের অধিকারটি আত্মসাৎ করে নেয় এবং সেইভাবে সে পুরোহিত বা দেবতা-রাজা হয়ে ওঠে। এই মতটি কিন্তু অবিশুদ্ধ, কারণ ব্যক্তিবিশেষের চতুরতার সাহায্যে স্থায়ী শ্রেণী সৃষ্টি করা যায় না যদি না সেগুলি সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কোন ভূমিকা পালন করে। প্রকৃতপক্ষে, কৃষিভিত্তিক সংগঠনে একটা গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণী হওয়ার কারণে দেবতা-রাজার কাজটাই ছিল তাই, কিন্তু ফ্রেজার তার উল্লেখ করেন নি!

অতীতের দিকে যুক্তিকে প্রসারিত করে আদিম উপজাতিকে ডার্কহাইম দেখেছেন গোষ্ঠীচেতনাসম্পন্ন একটা সমসত্ত্ব একক হিসাবে আর লেভি-ব্রুহ্ল এই গোষ্ঠীচেতনাকে "প্রাক্-তর্কশাস্ত্র সম্মত" ["prelogical"] হিসাবে দেখেছেন। এই ধরনের আদিম উপজাতিকে ডার্কহাইম প্রায় পুরাপুরি অ-পৃথকীভূত বলে কল্পনা করেছেন যাতে করে সেই উপজাতির সদস্যদের যেন উপজাতির যৌথ-প্রতিনিধিত্বের ছাপ ছাড়া নিজস্ব কোনও চরিত্র নেই বা স্বাতন্ত্র্য নেই, আর সেই যৌথ-প্রতিনিধিত্বের ছাপটা হল দমনমূলক এবং ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তাকে তা খর্ব করে।

এটি একটি বিমূর্ত ধারণা, যেহেতু এই ধরনের কোনও সমসত্ত্ব উপজাতি আজকালকার দিনে দেখতে পাওয়া যায় না। এই ধরনের বিমূর্তকরণ হল সেই সীমা যা সমাজ কখনই পুরা মাত্রায় লাভ করে না। চরিত্র বা "টাইপ" সৃষ্টির ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ক্রিয়া এবং জনিগত গঠনের মধ্যকার যোগসূত্র সম্পর্কে এই মতাবলম্বীদের স্পষ্ট ধারণা যদি থাকত তাহলে এঁরা অন্যান্য অনেক নৃতাত্ত্বিকের মত পৃথকীভবনকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যভবনের [individuation] সঙ্গে গুলিয়ে ফেলতেন না, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্যটা হল জনিগত, একটা বিশেষ ধরনের জনিসমষ্টির ফল। জীববিদ্যার দিক থেকে বলতে গেলে সেগুলি হল "প্রকরণ" [variations]। কিন্তু সামাজিক পৃথকীভবনের অর্থ হল এই যে সামাজিক উৎপাদনে ব্যক্তি একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এই পৃথকীভবনটি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যভবনের ঠিক নঞর্থক ধারণা হতে পারে, কারণ এর দ্বারা ব্যক্তিকে একটি ছাঁচের মধ্যে ফেলা যেতে পারে—সে ছাঁচ খনিশ্রমিকের, ব্যাঙ্কের কেরাণী, আইনজীবি বা ধর্মযাজকের ছাঁচ হতে পারে—যে ছাঁচ ব্যক্তির নিজস্ব ব্যক্তিসত্তার [individuality] খানিকটা

অংশকে চাপা দিতে বাধ্য। একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি হয়ে উঠার পরিবর্তে সে হয়ে পড়ে একটা টাইপ বা ক্যারিক্যাচার। একটা উত্তরলব্ধ বৈশিষ্ট্য একটা অধিক ছাঁচের মধ্যে জোর করে ফেলা হয়। পৃথকীভবন যত বেশি হয় ছাঁচটাও তত বেশি বিশেষীকৃত হবে এবং উপযোজনও [adjustment] তত বেশি বেদনা-দায়ক হবে। ইয়ুং দেখিয়েছেন মনোবিদ্যার দিক থেকে একটি মানসগত ক্রিয়াকে [psychic function]—যে মানসগত ক্রিয়া জন্মগতভাবে সব থেকে বেশি প্রকাশীয় এবং সেই কারণে অর্থনীতির দিকে যেটি সব থেকে অর্থকরী হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি সেই ক্রিয়াটিকে বাড়িয়ে তুলে এই প্রক্রিয়াটি ঘটে। এই ক্রিয়ার অতিবৃদ্ধি আর নির্বাচিত পেশাদার ব্যক্তিরূপের উদ্দেশ্যের সঙ্গে তাকে উপযোজিত করার [accomodation] ফলে অন্যান্য মানসগত ক্রিয়াগুলির কার্যকরতা হ্রাস পায়, যেগুলি কালক্রমে প্রধানতঃ অচেতন হয়ে উঠে এবং সচেতন ব্যক্তিত্বের এক বিরোধী শক্তি হিসাবে অচেতন স্তরে কাজ করে। এই কারণেই সেই বিশেষ "আধুনিক অস্বস্তি ও স্নায়ুরোগের" [neuroses] জন্ম। এক নির্ভেজাল অর্থনৈতিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সুসমাচারের সৃষ্টি, বিংশ শতকের এই সভ্যতা, শেষ অবধি এইভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিরোধী হয়ে উঠেছে। যে ব্যক্তিরূপের কাজকর্মের একটা বিনিময়-মূল্য আছে সেই ব্যক্তিরূপের উপযোগী একটা অনুকূল ক্রিয়ার [favoured function] ছাঁচ দেওয়ার জন্য ব্যক্তিকে জোর করার দ্বারা এটা জন্মগত সম্ভাবনাগুলির পূর্ণ বিকাশকে বাধা দেয়; যাতে করে একটা ক্ষতিকর বৈসাদৃশ্য হিসাবে আমরা (টি. ই. লরেন্সের মত) বেদুইনদের মত কোন যাযাবর সভ্যতার দিকে মুখ ফেরাই। এই সভ্যতায় জন্মগত ব্যক্তিগতসত্তাকে, মানুষের চরিত্রকে সব থেকে বেশি সম্মান দেওয়া হয় এবং তা সব থেকে বেশি উন্নত; অথচ এই সভ্যতার মধ্যেই অর্থনৈতিক পৃথকীভবন ন্যূনতম পর্যায়ের।

এর অর্থ কি এই যে জৈবিক ব্যক্তিসত্তা অর্থনৈতিক পৃথকীভবনের বিরোধী এবং সভ্যতা, "স্বাধীন" সহজপ্রবৃত্তিগুলির পায়ের বেড়ি—যা ফ্রয়েড, এ্যাডলার, ইয়ুং ও ডি. এচ. লরেন্সের মত শিল্পীরা সংশ্লিষ্ট অর্থে দাবি করেছেন? না, অর্থনৈতিক পৃথকীভবনের ফলেই বিশেষীভবনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে এবং যেসব বৈশিষ্ট্য বা "প্রকরণ" দিয়ে একটি জৈবিক ব্যক্তির "পার্থক্য" গঠিত সেগুলির সব থেকে বেশি বিস্তারিত বিকাশের সুযোগ তা থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সুযোগের পূর্বসিদ্ধান্ত হল এই যে, অর্থনৈতিক ক্রিয়াগুলির সমগ্র পরিসর থেকে যে কোন ব্যক্তি অবাধে নির্বাচন করতে পারে। আধুনিক

সভ্যতার শ্রেণীভিত্তিক গঠনের কারণে সেখানে এই ধরনের অবাধ নির্বাচনের কোনও অস্তিত্ব নেই। কোনও ব্যক্তির মাতাপিতার উপার্জন এবং তাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্ত তাঁদের যে ব্যয় হয় তার প্রায় সমমূল্যের পেশা গ্রহণ করার দিকেই সেই ব্যক্তির উপর প্রবল চাপ কাজ করে। শুধু তাই নয়, সামান্ত আয়ের সম্ভাবনা আছে এমন কোনও পেশার দিকে (যেমন, কাব্য-রচনা) প্রচুর প্রবণতা থাকলেও যথেষ্ট মাত্রায় উপার্জনের সম্ভাবনা আছে এমন কোন পেশাকে (যেমন, নতুন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সংগঠিত করা), অল্প প্রবণতা থাকা সত্ত্বেও গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। আর বেকারের জীবন, আজকের দিনের লক্ষ লক্ষ মানুষের যা অনৈচ্ছিক ক্রিয়া, সমস্ত উপকারী প্রকরণের গতিরুদ্ধ করে।

সভ্যতা তার পৃথকীভবনের কারণেই যে জনিগত ব্যক্তিসত্তাকে রুদ্ধগতি করে তা নয়; বরং বিপরীতভাবে, তার জটিলতাই তার বিকাশে নতুন নতুন সম্ভাবনা যোগায় এবং "আদর্শ বিচ্যুতি"র [standard deviation] পরিমাণকে বাড়িয়ে তোলে। সভ্যতার একটি ঘটনা—সমাজের মধ্যে শ্রেণীগুলির বিকাশ এবং ব্যক্তির পক্ষে ক্রিয়া নির্বাচনের ক্রমবর্ধমান সীমাবদ্ধতা—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশকেই প্রতিহত করে, অথচ বর্তমান উৎপাদিকা শক্তিগুলি সামাজিক সম্পর্কের এক অধিকতর তরল [Fluid] ব্যবস্থার মধ্যে সেগুলির বিকাশের জন্ত আরও বেশি সুযোগ দিতে পারত। সমস্ত ধীশক্তি ও প্রতিভাকে [talents and gifts] "অবাধ" বাজারের অমোঘ ও কঠিন নিয়মগুলির অধীন এক পণ্য করে তুলে পুঁজিবাদ এখন ব্যক্তির সেই স্বাধীন বিকাশকেই প্রতিহত করে, যেটা এর বিপুল উৎপাদিকা শক্তিগুলি মুক্ত হলে সহজেই ঘটাতে পারত। এর ফলে সভ্যতা সহজপ্রবৃত্তিগুলিকে নিষ্পেষিত করছে বলে যে নালিশগুলি উঠেছে এবং ফ্রয়েড, ইয়ুং ও এ্যাডলার যেগুলির অনুসন্ধান করেছেন সেগুলি দেখা দেয়।

যে সভ্যতায় এই অনমনীয়তা ব্যধিগ্রস্ত হয়ে উঠেছে এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পতনোন্মুখ মিশরীয় ও রোমান সাম্রাজ্যের মতো প্রায় পুরাপুরি লোপ পেয়েছে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অপেক্ষাকৃত বেশি স্বাধীনতার সুযোগ সত্ত্বেও সেই সভ্যতাকে অর্থনৈতিক উৎপাদনের নিম্নতর স্তরে থাকা "বর্বরদের" হাতে, ভেঙে পড়তে দেখে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। যে সংস্কৃতিতে উৎপাদিকা শক্তিগুলি মানুষের বন্দী চরিত্রের মত অচল সামাজিক সম্পর্কের লৌহশৃঙ্খলের সঙ্গে বৃথা কলহের ফলে নিজেদেরই দুর্বল করে তুলছে এই শ্রেণী, অনমনীয়তা

হল সেই সংস্কৃতির অর্থনৈতিক ভিত্তির সামগ্রিক ভাঙনেরই প্রতিফলন।

ডার্কহাইমের মতে উপজাতির অর্থনীতি যেরকম অপৃথকীভূত সেই রকম তার চেতনাও কঠিন স্ফটিকের মত এবং অপৃথকীভূত। কিন্তু ডার্কহাইমের এই ধারণাটির অনপেক্ষতার মধ্যে অর্থনৈতিক পৃথকীভবনের ভিত্তি হিসাবে জমি-গত ব্যক্তিসত্তার তাৎপর্যের কথাটা বাদ পড়ে গেছে। ঠিক যেমন সমাজের বিধিনিষেধগুলির সঙ্গে সভ্য মানুষের সহজপ্রবৃত্তিগুলির লড়াইয়ের তত্ত্বের মধ্যে ব্যক্তিসত্তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের পথ হিসাবে অর্থনৈতিক পৃথকীভবনের গুরুত্বটিকে তুচ্ছ করে দেখা হয়। নিজেদের বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে "অর্জিত" ও "সহজাত" [acquired and innate] বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে জীববিজ্ঞানীদের সেই বিখ্যাত বিতর্কের সঙ্গে এই ঘটনার তাৎপর্যপূর্ণ সাদৃশ্য জীববিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করবেন।

উপজাতির যৌথ প্রতিরূপ দিয়ে যৌথ মন গঠিত আর ব্যক্তিগত প্রতিরূপ দিয়ে ব্যক্তির মন গঠিত। প্রথমটির দমনমূলক চরিত্র থাকার কারণে এই দুটির মধ্যে ডার্কহাইম পার্থক্য টেনেছেন। এই ভুলটি সমকালীন দর্শনের মূলগত ভুল ছাড়া অন্য কিছু নয়, স্বাধীনতার প্রকৃতি সম্পর্কে সমকালীন দর্শনের ভুল ধারণার ফলে তা অবিরাম এক বিবর্ণ নঞর্থক ধারণার [Stale antithesis] জন্ম দিয়ে থাকে। সমাজের বিকাশের ফলে যে চেতনা সম্ভবপর হয়েছে তার প্রকৃতিটাই যে দমনমূলক তা নয়; বরং বিপরীতভাবে, এই চেতনা, বিজ্ঞান ও শিল্পের মধ্যে প্রকাশিত সেই উপায়, যার সাহায্যে মানুষ স্বাধীনতা অর্জন করে। সামাজিক চেতনা হল সামাজিক শ্রমের ফল এবং তার সাহায্যকারী। সামাজিক শ্রমের মতই সামাজিক চেতনাও মানুষের স্বাধীনতা লাভের উপকরণ [iñstrument]। সমাজের দ্বারা যে সহজ-প্রবৃত্তিগুলি অভিযোজিত হয়নি সেগুলিই মূলতঃ স্বাধীন একথা ঠিক নয়; বরং বিপরীতভাবে অরূপান্তরিত সহজপ্রবৃত্তিগুলিই মানুষকে অন্ধ প্রয়োজন ও অচেতন বাধ্যবাধকতার দাসত্বের দিকে ঠেলে দেয়।

তা সত্বেও, সামাজিক চেতনাকে কখনও কখনও দমনমূলক বলে মানুষের মনে হয়েছে—কিন্তু কেন? কারণ, সেই চেতনা এখন আর সামাজিক সত্তার প্রতিনিধিত্ব করে না; কারণ, সামাজিক সহযোগিতার সমগ্র প্রক্রিয়াটির মধ্যে সেটি এখন আর স্বাধীনভাবে সৃষ্ট হয় না। এই ধরনের চেতনা হল শ্রেণী বিরোধের ফল। এটা সেই শ্রেণীর চেতনা যে শ্রেণী শ্রম-বিভাজনের বিকাশের ফলে এবং সম্পত্তির উপর নিরঙ্কুশ অধিকারের ফলে

অর্থনৈতিক উৎপাদন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং সেই কারণে পঙ্গু ও অচল হয়ে পড়েছে। এই চেতনা এখন সামাজিক ঘটনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ হওয়ার পরিবর্তে বিশেষ সুযোগ সুবিধার শক্ত ঘাঁটি হয়ে উঠেছে এবং সেই কারণে সমাজের বাকি অংশের ঘাড়ে তাকে দমনমূলকভাবে চাপিয়ে দিতে হবে। ডার্কহাইম এটা দেখতে পান না যে আদিম জনসমাজে এই ধরনের দমনমূলক গোষ্ঠিচেতনা খুবই কম চোখে পড়ে এবং পরিশীলিত সভ্যতার মধ্যেই সেটা সব থেকে বেশি দেখা যায়।

প্রথম দিকের কাব্যের (যে কাব্য উপজাতির জ্ঞান ও কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জীর স্থূল বিবরণও বটে) সঙ্গে শ্রমবিভাজনের ফলে অর্থনৈতিক পৃথকীভবন প্রায় ঘটেনি এমন এক সমাজের অবস্থার যোগসূত্রটি ইতোমধ্যেই লক্ষ্য না করে পারি না। আদিম সমাজে মানুষের জনিগত ব্যক্তিসত্তা বাস্তব রূপ পায় সাধারণ এক শারীরিক লক্ষণের মত—চওড়া কপাল বা ধ্যাবড়া পায়ের পাতার মত। সকল যুগেই কাব্যের মধ্যে একটা সহজ ও সরাসরি কিছু থাকে বলে মনে হয়, অপেক্ষাকৃত অপরিণত মানুষ ভালো কাব্য রচনা করতে পারে, সাহিত্যের অন্যান্য রূপের থেকে কাব্যের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বেশি ব্যক্তিগত ও আবেগগত মর্মবস্তু থাকে—এ সব কথা মনে রেখে আমরা ইতোমধ্যেই অনুমান করতে পারি যে কাব্য ব্যক্তির জনিগত সহজপ্রবৃত্তিমূলক অংশটিকে বিশেষভাবে প্রকাশ করে। উপন্যাস যেভাবে প্রকাশ করে সেভাবে নয়। উপন্যাস ব্যক্তিকে একটা অভিযোজিত জাতিরূপ হিসাবে, একটা সামাজিক চরিত্র হিসাবে, সমাজের মধ্যে মানুষ যে বাস্তব রূপ লাভ করে সেইভাবে তাকে প্রকাশ করে। সেই কারণে উপন্যাসের মত শিল্পের একটি রূপ একমাত্র সেই সমাজেই দেখা দিতে পারে যেখানে অর্থনৈতিক পৃথকীভবন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে পার্থক্য সেটাকে বাস্তব রূপ গ্রহণ করার সুযোগ দেয় যা ব্যক্তিমানুষকে এই দিক থেকে ব্যবহার করার পক্ষে উপযোগী ও মূল্যবান। কোনও মূলগত পার্থক্য থাকে না, শুধু গতিমুখের পার্থক্য। কিন্তু এই পার্থক্যটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য এবং আমরা বারে বারে এই প্রসঙ্গটিতে ফিরে আসব। এই অর্থে কাব্য হল প্রকৃতির সন্তান, যেমন উন্নত উপন্যাস হল আধুনিক সংস্কৃতির পরিশীলনের সন্তান।

জনিগত ব্যক্তিসত্তাকে সামাজিক পৃথকীভবন থেকে যান্ত্রিকভাবে পৃথক করার বিপদ সম্পর্কে আবারও সাবধান করে দেওয়া উচিত। একটি অপরটি অর্জন করার উপায়। ট্র্যাজেডিতে, নাট্য-কবিতায় এবং মহাকাব্যে এই দুটি

প্রকাশিত হয়, কারণ যখন কোন সমাজে দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে তখন এদের সম্মৃদ্ধি দেখা যায়। যে সমাজে পুরানো শ্রেণী-বৈশিষ্টগুলিতে ফাটল ধরেছে এবং মানুষের অন্তর্নিহিত ব্যক্তিসত্তা, তার অভিরাগ [passion], তার সহজপ্রবৃত্তি, তার অন্ধ আকাঙ্ক্ষাগুলি হল সেই সব উপায় যার সাহায্যে নতুন অর্থনৈতিক ক্রিয়া, নতুন পৃথকীভবন, নতুন আদর্শ আত্তিকরণ, আদর্শায়িত ও কাব্যায়িত হয়। সামাজিক কাব্যের এই ধরনের মানুষ হল ওদিসিউস, ঈদিপাস ও হ্যামলেট। এবং এই মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডিগুলি যেসব সমস্যার সমাধান করে সেইগুলি এই ধরনের এক পরিবর্তনকালেরই বিশেষ সমস্যা।

এই ধরনের সমস্ত সমস্যাই হল স্বাধীনতার প্রকৃতি বিষয়ক সমস্যা এবং সেই কারণে ট্র্যাজেডি প্রয়োজনের প্রশ্নটিকেই প্রচণ্ড তীব্রতার সঙ্গে তুলে ধরে, যদিও প্রত্যেক সংস্কৃতিতেই প্রয়োজনের দিকটা ভিন্ন ভিন্ন হয়, কারণ প্রত্যেক সংস্কৃতিতেই প্রয়োজন ভিন্ন ভিন্ন পথে মানুষের উপর চাপ দেয়। যে-প্রয়োজন ঈদিপাসকে চালিত করে আর হ্যামলেটকে যে-প্রয়োজন চালিত করে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন, আর এই পার্থক্যটা এথেনীয় ও এলিজাবেথীয় যুগের মধ্যকার পার্থক্যকেই প্রকাশ করে। এই একই প্রয়োজন—কিন্তু তত্ত্ববিদ্যাগতভাবে তুলে ধরা হয় এবং তার সমাধানও অন্য এক জগতের জন্য মুলতুবি রাখা হয়—ধর্মেরও স্থির উপজীব্য—সু ও কু'র কথা বলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম যে-সমস্যাটি সমাধানের জন্য তুলে ধরে সেই সমস্যা। বিভিন্ন ধর্ম "পাপ"এর বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছে তার দ্বারা যে সমাজ সেই ধর্মের জন্ম দিয়েছে সেই সমাজের বিকাশের স্তরকে প্রকাশ করে।

৩

জাতিতত্ত্ববিদরা যে জনসমাজের মধ্যে বসবাস করেছেন সেখানে লক্ষ্য করেছেন যে সমস্ত প্রাণীরই মতন সমস্ত মানুষেরও সুস্পষ্ট খাওয়া আছে। গিলেন ও স্পেন্সার লক্ষ্য করেছেন যে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মধ্যে বিশেষ ধরনের সামাজিকভাবে উপকারী দক্ষতার জন্য মানুষ খ্যাতিলাভ করে এবং সেই দক্ষতা যে পরিমাণে তারা প্রয়োগ করে তা থেকে প্রমাণ হয় যে পৃথকীভবন ইতোপূর্বেই সেখানে বর্তমান। কিছুটা শ্রমবিভাজন দেখা দিয়েছে কিন্তু তা তখনও প্রধানতঃ জন্মিগত। যে সংগ্রহ [complex] প্রত্যেক প্রজন্মকে নির্দিষ্ট ছাঁচ দেয় এবং একটা শ্রেণী গড়ে তোলে সেই সংগ্রহের দ্বারা এটা উৎপন্ন হয় না।

আজকের যে গড়পড়তা খাদ্য সংগ্রহকারী বা মৃগয়াজীবী উপজাতির মধ্যে কাব্য হল যাদুমন্ত্র, প্রার্থনা ও ইতিহাস, তাকে আমরা এইভাবে, যে ধাত্রের (matrix) মধ্যে কাব্যের জন্ম হয়েছিল সেই ধাত্রের একটা খণ্ডিত জাতিরূপ হিসাবে দেখতে পারি। এই অপৃথকীভূত-গোষ্ঠী সামাজিক ক্রিয়াগুলিকে এবং সেই-কারণে চিন্তাগুলিকে একযোগে ভাগ করে নেয় এবং সেই "আদিম নিষ্ক্রিয় সহানুভূতির" ডোরে বাঁধা থাকে যেটা লক্ষ্য করেছেন কোহ্‌লের নরবানরদের মধ্যে এবং ম্যাকডুগাল যেটাকে মানুষের একটা বিশেষ সহজপ্রবৃত্তি বলে মনে করেন। এই গোষ্ঠীর মধ্যে দেখা দেয় উদ্গীত ভাষা যা হল মানুষের অভিজ্ঞতার মধ্যে যা কিছু স্মরণযোগ্য সেই সবকিছুরই সাধারণ বাহন। নীরস পুঁথির মধ্যে ভাষাকে যে ভাবে দেখা যায় সেই ভাবে এই ভাষাকে আমরা দেখব না; আমরা তাকে সেইভাবে দেখব যেভাবে প্রথমে তার জন্ম হয় এবং যেভাবে ঢাকের ছন্দোবদ্ধ আঘাতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নৃত্য ও ভঙ্গীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে, গোষ্ঠী-উৎসবের প্রচণ্ড আবেগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যুগে যুগে এই ভাষা তার গোষ্ঠীজীবন যাপন করেছে। এই গোষ্ঠী-উৎসব ছিল ঐতিহ্যের এমন এক উৎস যার মধ্যে জীবিত গোষ্ঠীই যে কেবল অংশগ্রহণ করত তা নয়, যে মৃত পূর্বপুরুষদের আত্মারা সেই উপজাতির প্রধান শক্তি ছিল তারাও তাতে অংশগ্রহণ করত। এই অপৃথকীভূত সমাজ থেকেই শ্রমবিভাজনের ফলে পুরোহিত, আইনজ্ঞ, প্রশাসক ও সৈন্যের পক্ষে উপযুক্ত শ্রেণী-জাতিরূপগুলি দেখা দেয় এবং একইভাবে আদিম নৈশ নৃত্যগীতানুষ্ঠানের (corroboree) উদ্গীত ভাষা, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ঈশ্বরতত্ত্ব, আইন, অর্থনীতি এবং সাংস্কৃতিক মূলধনের পক্ষে উপযুক্ত অন্যান্য বিভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই বিভক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে প্রত্যেক বিভাগই একটা বিশেষ বাক্‌বৈশিষ্ট্য ও সাহিত্যিক-আক্রমণ পদ্ধতি উদ্ভাবন করে যা অন্যান্য বিভাগের বিশেষ বাক্‌বৈশিষ্ট্য ও সাহিত্যিক আক্রমণ পদ্ধতির থেকে কেবল ভিন্নই নয়, কথ্য ভাষার অনুরূপ সামগ্রীগুলি থেকেও ভিন্ন। কিন্তু এই বিভাগগুলি পরস্পর অসম্পৃক্ত বিভাগ নয়। তাদের বিকাশ অন্যান্য বিভাগগুলিকে এবং কথ্যভাষাকেও পারস্পরিক-ভাবে ও অবিরাম প্রভাবিত করে, কারণ সবগুলিরই মূল রয়েছে বাস্তব সামাজিক জীবনের একই বিকাশমান সংগ্রহের মধ্যে।

আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা উদ্গীত ভাষার কথা বলি। কিন্তু এই পর্যায়ে এই বিশেষণটির দ্বারা মূল্য বিচারের কোন প্রভাব সূচিত করতে দেওয়া উচিৎ নয়। বিবর্তনের কোন নির্দিষ্ট পর্যায়ে কোন নির্দিষ্ট জনসাধারণ

যে বিশেষ উক্তিভাবটি গ্রহণ করেন তাকে ছন্দঃশাস্ত্র, সংগীত ও নৃত্য-বিষয়ক আনুষঙ্গিকের বা কলুষিত উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত নয় এমন বিশেষ বিশেষ শব্দ ব্যবহারের বিষয়গত পরিভাষায় সংজ্ঞা দেওয়া যায়। কোন ভাষার উপর ছন্দ আরোপ করলেই যে সেই ভাষার উন্নতি ঘটবে তার কোন যুক্তি আমরা এখনও দেখতে পাইনি। ছন্দঃশাস্ত্রের যে কোন সহায়িকা পুস্তক পড়লেই প্রকাশের বাহন হিসাবে বাধা না দেওয়া কথ্য ভাষার থেকে কাব্য যে নিকৃষ্ট একথা মনে করার যথেষ্ট যুক্তি পাওয়া যাবে কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমরা ছন্দের কারণে উৎকর্ষতা বা অপকর্ষতার দাবি করছি না, কেবল একটা গুণগত পার্থক্য যে ঘটে সেইটুকু দাবি করছি। ভাষার উৎকর্ষতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যই যদি না হয় তাহলে ভাষাকে ভিন্ন ধরনের করতেই বা হবে কেন, এই প্রশ্ন যদি করা হয় তাহলে তার একটা উত্তর দেওয়া যেতে পারে। ছন্দের ক্রিয়া নিছক স্মৃতিসহায়কও [mnemonic] হতে পারে। ছন্দোবদ্ধ বচনের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা স্পষ্টতই তাই, যেমন—

Red at night,
The Shepherds delight
Red in the morning,
The shepherds warning.

বা

Ne'er cast a clout,
Till may is out.

এক সময় মনে করা হত যে আদিম মানুষদের মধ্যে 'মনোযোগের বিশেষবৃত্তি' (faculty of attention) দুর্বল এবং ছন্দোগত ছক (rhythmic pattern) তাদের বিক্ষিপ্ত মনোযোগকে ধরে রাখে। অল্প কয়েকজন নৃতত্ত্ববিদ এই মত স্বীকার করবেন। মনোযোগ কোন "বিশেষবৃত্তি" নয়, তা হল প্রাণিগত জীবনের একটা সহজপ্রবৃত্তিগত উপাদান, আর এইটুকু শুধু বলা যায় যে বুদ্ধি (intelligence) যে ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম সেক্ষেত্রে এটা বেশি শক্তিশালী। একজন আধুনিক বৈজ্ঞানিক তাঁর গবেষণাকে যে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করেন, পাখির জন্য ওৎ পেতে বসে থাকা বিড়াল বা সীলমাছের জলনিঃশ্বাসের ছিদ্রটি লক্ষ্য করার সময় কোন এস্কিমোর ক্ষেত্রেও অন্ততঃ সেই পরিমাণ মনোযোগ দেখা যায়। আচারানুষ্ঠান, নাট্যানুষ্ঠান, বা নৃত্য— আদিম মানুষ যাতে যাতে আগ্রহী সেই সেই ক্ষেত্রে তারা অধিকতর সজ্ঞ

গোষ্ঠীর থেকে বেশি পরিমাণ দীর্ঘস্থায়ী মনোনিবেশে সক্ষম। মেলানেশিয়ানদের মধ্যে রিভার্স তাঁর গবেষণা চালাবার সময়ের কথা প্রসঙ্গে লিখেছেন যে একবার তথ্য সংগ্রহের জন্ত একজনকে প্রশ্ন করতে করতে তিনি নিজে ক্লান্ত হয়ে পড়েন অথচ তাঁর তথ্য সরবরাহকারী তখনও রীতিমত উৎসাহী এবং তথ্য যোগাতে প্রস্তুত রয়েছেন। অথচ দুজন সভ্য মানুষের মধ্যে যখন কোনও সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় তখন প্রায় সর্বদাই দেখা যায় যে উত্তরদাতাই প্রশ্নকর্তার থেকে আগে ক্লান্ত হয়ে পড়েন।

আদিম মানুষের উন্নীত ভাষাকে, যেটা আনুষ্ঠানিক পোষাকে কথ্য ভাষা-তুল্য তাকে আমরা কাব্য বলি এবং আমরা দেখেছি কিভাবে বিবর্তনের পথে তা গদ্যধর্মী হয়ে উঠল এবং ইতিহাস, দর্শন, ঈশ্বরতত্ত্ব, গল্প ও নাটকে বিভক্ত হয়ে পড়ল। এ থেকে একটা প্রশ্ন দেখা দেয়। সেটা এই যে, অপৃথকীকৃত অর্থনীতি থেকে কাব্যর জন্ম ; কাব্য কি কখনো তারই একটা প্রতিফলন ছাড়া অন্য কিছু এবং স্বীয় অধিকারে বর্তমানকালে কাব্যের অস্তিত্বের কোন ন্যায়সঙ্গত যুক্তি আছে কি ? এখনও যে তার অস্তিত্ব বজায় রয়েছে এটা কোন পূর্ণাঙ্গ উত্তর নয়। যেহেতু বিবর্তনের ধারায় লুপ্তপ্রায় অঙ্গাদির ছড়াছড়ি দেখা যায় এবং কাব্য সেই রকম একটা কিছুও হতে পারে। যত দিন যাচ্ছে কাব্যের পাঠকগোষ্ঠীও ততই ছোট হয়ে আসছে। সাহিত্যের মধ্যে একমাত্র এইটিই উন্নীত ভাষাকে প্রাণপণে আঁকড়ে আছে। এটা অধঃপতনের একটা নিছক লক্ষণ হতে পারে, যেন মানসিক প্রতিবন্ধীর মত কাব্য এখনও উপযুক্ত বয়স হওয়া সত্ত্বেও শিশুর আধো-আধো ভাষায় অস্ফুট কথা বলে চলেছে আর সংসারের অন্য মানুষদের সাবালক জগতে জীবিকা উপার্জন করতে হচ্ছে।

কাব্য যে টিকে আছে সেটা একটা আপতিক ঘটনা। মানুষ কথা বলে, প্রাচীনকালের গল্প বলে, জ্ঞানগর্ভ বচন আওড়ায় এবং সে সব লোপ পেয়ে যায়। কাব্য তার উন্নীত ভাষায় টিকে থাকে এবং সেই কারণে সামাজিক কথাবার্তার অবশিষ্ট অংশ থেকে অত্যন্ত কৃত্রিম একটা পার্থক্য টেনে তাকে আমরা "সাহিত্য" বলে মনে করি। এ থেকে আবার আমরা কাব্যের ভাষা উন্নীত ভাষা কেন, কেন সেটা টিকে থাকে, কেন তার এক আপেক্ষিক অপরিবর্তনীয়তা ও চিরকালীনতা থাকে—এসব কথা ভুলে যেতে পারি।

আদিম কাব্য পরবর্তীকালের "সাহিত্যের" ধাত্র ততটা নয় যতটা তার একটা মেরু (Pole)। যৌথ ও ঐতিহ্যধর্মী প্রকৃতির কারণে এইটিই টিকে আছে

এবং আমরা যারা এর মধ্যে আদিম মানুষের একমাত্র সাহিত্য দেখতে পাই সেই এক স্বর্ণযুগের কথা কল্পনা করার দিকে আমাদের নিয়ে যায় যেখানে দৈববাণীর বক্তারাও মহাকাব্যের ভাষায় কথা বলে।

এই অন্য মেরুটির প্রকৃতি কি ধরনের? কোন আধুনিক মন আদিম দৃষ্টি পর্যালোচনা করে যখন দেখে যে সমস্ত অস্পষ্ট আশা-আকাঙ্ক্ষা, ধর্মীয় অলীক-কল্পনা, পুরাণভিত্তিক বিশ্বতত্ত্ব ও যৌথ আবেগ ছন্দোবদ্ধ ভাষার মেরুতে গিয়ে জমা হয়েছে তখন অন্য মেরুটিকে বিজ্ঞানের মেরু বলে মনে করাই তার পক্ষে স্বাভাবিক। এই মেরুটি হবে বিশুদ্ধ বিবৃতির মেরু, আবেগ বর্জিত ঘটনা-সমষ্টির মেরু: বংশানুক্রম, জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত হিসাব, লোকগণনার বিবরণ এবং সহজ সরল বাস্তবকে আয়ত্তে আনার উদ্দেশ্যে অন্যান্য যে সব সাহিত্যধর্মী সৃষ্টি হয় সেগুলি এই মেরুতে জমা হয়।

কিন্তু আদিম মানুষের কাছে বিজ্ঞানকে কাব্যের বিপরীত বলে মনে হওয়া সম্ভব নয়। বিজ্ঞানকে সাহিত্যের একটা শাখা বলে সে চেনে না, বিজ্ঞানকে সে জানে কেবল প্রয়োগ [practico] হিসাবেই, একটা করণকৌশল, নৌকা তৈরির বা গাছ লাগানোর পথ হিসাবেই জানে। এই প্রয়োগবিদ্যা এক ধরনের মূক অনুসরণের মধ্য দিয়েই সব থেকে ভালো করে এবং সব থেকে সহজে শিক্ষা করা যেতে পারে। যেহেতু কর্ম হল উপজাতির সমস্ত সদস্যেরই সাধারণ কাজ। পক্ষপাতিত্বহীন এবং নিছক বাস্তবের এক নিরুত্তাপ বাহন হওয়ার উদ্দেশ্যে কোনও বিবৃতি দেওয়ার ধারণা আদিম মনের কাছে অপরিচিত। শব্দ ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করে, এ ক্ষমতা প্রায় যাদুধর্মী, নিরুত্তাপ বিবৃতি শব্দ থেকে এই ক্ষমতাকে বর্জন করছে এবং তার জায়গায় বহির্বাস্তবের এক দর্পণ-প্রতিবিম্ব হাজির করছে বলে তাদের মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত-বস্তু আর তার দর্পণ-প্রতিবিম্বের মধ্যে অপকর্ষতা ছাড়া আর কি পার্থক্য থাকতে পারে? আদিম মানুষ শব্দের মধ্যে বাস্তবের যে প্রতিরূপের [image] সন্ধান করে সেটা ভিন্ন ধরনের: সেটা হল একটা যাদুধর্মী খেলা-ঘরের প্রতিরূপ (puppet image) মানুষ যেমন শত্রুর প্রতিকৃতি তৈরি করে সেই রকম, তার উপর ক্রিয়া ক'রে মানুষ বাস্তবের উপর ক্রিয়া করে।

এইভাবে আদিম মানুষ "আলোকচিত্রধর্মী" বৈজ্ঞানিক বিবৃতিতে তার আগ্রহের অভাবের অনুকূলে যুক্তি পায়। এই বৈজ্ঞানিক বিবৃতি হল চিন্তার ইতিহাসে পরবর্তীকালের বিমূর্তকরণ, বিজ্ঞানের সমস্ত শাখাই এই লক্ষ্যে পৌঁছতে চাইছে, কিন্তু একমাত্র গণিতের বিষয়বস্তুতেই তা পুরোপুরি অর্জিত

করেছে, সম্ভবতঃ তখনও পারে নি যতক্ষণ না ফ্রিনিশিয়া মাথেমাটিকার সংখ্যানৈপুণ্যে তা অনূদিত হল।

আদিম সংস্কৃতির সাহায্যে গঠিত মনের কাছে এই বর্ণহীন বিবৃতি অপরিচিত সামগ্রী, এবং উদ্দেশ্যহীন ভাষা আদিম মানুষ বোঝে না। ছন্দোবদ্ধ ভাষার উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট—সেই ভাষার মধ্য দিয়ে সে এক অভ্যন্তরীণ শক্তি অনুভব করে; দেবতাদের সঙ্গে যোগসূত্র অনুভব করে যাতে সে মনে জোর পায়। অ-ছন্দোবদ্ধ ভাষার উদ্দেশ্যও সমানভাবে সুস্পষ্ট। তার জন্য একটা ক্রিয়া সন্ধানের কোন প্রশ্ন উঠে না। সমস্ত জৈবিক পরিস্ফুরণের ক্ষেত্রেই যেমন দেখা গেছে সেই রকম ভাবে ক্রিয়াটিই (function) অঙ্গ (organ) সৃষ্টি করেছে এবং তাকে আকার দিয়েছে। আদিম মানুষের ব্যক্তিত্বকে প্রসারিত করার জন্য, প্রতিবেশীদের সঙ্গে তার ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধ ঘটানর জন্য, পলায়ন, নিশ্চলতা বা আক্রমণের কারণে নিজের ইচ্ছার সঙ্গে সংগতি ঘটানর জন্য তাদের ইচ্ছাকে নোয়ানর জন্য প্রয়োজনীয় অঙ্গভঙ্গীর ও ঘোঁৎ জাতীয় শব্দের (grunts) জন্ম দিয়ে থাকতে পারে। এবং এই ঘোঁৎ-জাতীয় শব্দ শেষ পর্যন্ত সুস্পষ্ট ও সুবিন্যস্ত উক্তি (articulate speech) হয়ে উঠল। প্রকৃতপক্ষে মানুষের কথ্যভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে স্যর রিচার্ড প্যাজেট-এর সম্ভবপর তত্ত্বের ভিত্তি এই অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত যে, সঙ্গীদের মনে যে প্রতিরূপ আরোপ করার ইচ্ছা মানুষের হত সেগুলিকে সে তার জিহ্বা ও কণ্ঠযন্ত্রের অন্যান্য সঞ্চালনযোগ্য অংশসমেত অঙ্গভঙ্গী দ্বারা অনুকরণের চেষ্টা করত।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, অ-ছন্দোবদ্ধ ভাষার ক্রিয়া ছিল প্রত্যয় উৎপাদন (persuade)। আদিম সমাজে যৌথ আবির্ভাব থেকে তার সমস্ত শক্তি-সঞ্চয়-কারী ছন্দোবদ্ধ ভাষার যৌথ মনোভাবের সঙ্গে ব্যক্তিগত ইচ্ছার প্রসারণ হিসাবে উদ্ভূত এই ব্যক্তিগত ক্রিয়াটির বৈপরীত্য দেখান যায়। কাব্যের ছন্দই তার গোষ্ঠীগত অনুষ্ঠানকে আরও সহজ করে তোলে, যেমন ধরুন ছোট ছেলেদের শেখানর উদ্দেশ্যে গুণের নামতা মুখস্থ করানর সময় তাতে ছন্দ আরোপ করা হয় যাতে গণিত কাব্যধর্মী হয়ে ওঠে।

বিপরীত মেরুগুলি পরস্পরকে যেমন ভেদ করে সেই রকম এই দুটিও পরস্পরকে ভেদ করে। কিন্তু দৈনন্দিন মুখের ভাষার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা অ-ছন্দোবদ্ধ ভাষা মোটামুটিভাবে হল একান্ত প্রত্যয় উৎপাদনের ভাষা এবং যৌথ ভাষার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা ছন্দোবদ্ধ ভাষা হল মনমানসের

আবেগের [public emotion] ভাষা। আদিম সংস্কৃতির স্তরে এইটিই হল ভাষার ক্ষেত্রে সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য।

৪

কাব্য হল বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে গান, আর বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সেটাই গান যা ছন্দের কারণে একযোগে [in unison] গাওয়া হয়, যা যৌথ আবেগ প্রকাশ হওয়ার পক্ষে উপযুক্ত। "উদ্গীত" ভাষার রহস্যের মধ্যে এটি একটি।

কিন্তু উপজাতির একটা যৌথ আবেগের প্রয়োজনই বা কেন? বাঘ, শত্রু, বা বৃষ্টি বা ভূমিকম্প যখন দেখা দেয় তখন সেটা সহজ প্রবৃত্তির দিক থেকে একটা সাপেক্ষ [conditioned] ও যৌথ সাড়া জাগায়। সকলেরই বিপদ, সকলেই ভয় পায়। এই ধরনের পরিস্থিতিতে সেই কারণে এই ধরনের এক যৌথ আবেগ সৃষ্টি করার জন্য কোন উপকরণের প্রয়োজন থাকে না। ভীত হরিণযূথের মত উপজাতি মূকভাবে সাড়া দেয়।

কিন্তু যখন দৃষ্টিগোচর বা অনুভবনীয় কোন কারণের অস্তিত্ব নেই অথচ সেই কারণটা সুপ্ত অবস্থায় [potential] থাকে তখন সামাজিক দিক থেকে এই ধরনের একটা উপকরণের প্রয়োজন থাকে। এইভাবে উপজাতির অর্থনৈতিক জীবন থেকে কাব্য দেখা দেয় এবং বাস্তব [reality] থেকে বিভ্রমের [illusion] জন্ম হয়।

পশুর জীবনে না হলেও, সরলতম উপজাতির জীবনে এমন একগুচ্ছ প্রচেষ্টার প্রয়োজন যা সহজপ্রবৃত্তিগত নয় বরং সেগুলি অ-জৈবিক অর্থনৈতিক লক্ষ্যে পৌছানর তাগিদে প্রয়োজন—যেমন ফসল তোলা। অতএব একটা সামাজিক-কর্মপ্রণালী যারা সহজপ্রবৃত্তিগুলিকে ফসল তোলার প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত করতেই হয়। এই কর্মপ্রণালীর একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল গোষ্ঠী-উৎসব, কাব্যের ধাত্রী, যা আবেগের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দেয় এবং যৌথ খাতে সেগুলিকে প্রবাহিত করে। বাস্তব বিষয়টি, অনুভবনীয় লক্ষ্যটি—ফসল-তোলা—উৎসবের মধ্যে হয়ে ওঠে এক অলীক কল্পনার বিষয়। বাস্তব বিষয়টি এখানে এখন অনুপস্থিত। অলীক বিষয়টি এখন উপস্থিত—অলীক কল্পনার মধ্যে। যে বর্তমান বাস্তবে আরোপিত ফসলের অস্তিত্ব নেই সেই বর্তমান বাস্তব থেকে মানুষ যখন নৃত্যের উদ্দামতায়, সংগীতের উল্লাসে ও কবিতার সংবেশনমূলক (hypnotic) ছন্দে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন যে অলীক কল্পনার জগতে এই সামগ্রীগুলি অলীকভাবে উপস্থিত, সেই অলীক কল্পনার জগতে সে প্রক্ষেপিত হয়। সেই জগৎটি তখন আরও বেশি বাস্তব হয়ে ওঠে

এবং সংগীতের রেশ মিলিয়ে যাওয়ার পরও তার কাছে সেই অবেখা ফসল আরও বেশি বাস্তব। সেই ফসলকে অর্জন করার জন্ম প্রয়োজনীয় শ্রম করতে তাকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে।

কাব্য এইভাবে নৃত্য, অনুষ্ঠান ও সঙ্গীতের সঙ্গে মিলিত হয়ে উপজাতির সহজপ্রবৃত্তিগত শক্তির বিরাট স্যুইচবোর্ড হয়ে ওঠে এবং তাকে যৌথ কার্যাবলীর পথে চালিত করে যায় আশু কারণ বা পরিপূরণ দৃষ্টিপথে অনুপস্থিত এবং যেগুলি সহজ প্রবৃত্তির দ্বারা আপনা-আপনি নির্ধারিত হয় না।

ফসলের জন্ম জমি তৈরি করা প্রয়োজন। যুদ্ধযাত্রায় যাওয়া প্রয়োজন। শীতের সুদীর্ঘ অনটনের সময় ব্যয়সংকোচ করা ও নিজেদের গুটিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। এই সব যৌথ দায়িত্বগুলির জন্ম মানুষকে তার সহজপ্রবৃত্তিগত শক্তিকে ব্যবহার করতে হয়, অথচ সেগুলি তাকে করতে বলবে এমন কোন সহজপ্রবৃত্তির অস্তিত্ব নেই। পিঁপড়ে ও মৌমাছি সহজপ্রবৃত্তির তাগিদে সঞ্চয় করে, মানুষ তা করে না। বীবর সহজপ্রবৃত্তির তাগিদে বাসা তৈরি করে; মানুষ তা করে না। শ্রমের চাকার সঙ্গে মানুষের সহজপ্রবৃত্তিগুলিকে জুতে দেওয়ার প্রয়োজন হয়, তার আবেগগুলিকে একত্রিত করে উপকারী, অর্থনৈতিক খাতে পরিচালিত করার প্রয়োজন হয়। যেহেতু এটা অর্থনৈতিক, অর্থাৎ সহজপ্রবৃত্তিগত নয়, সেই কারণে এই সহজপ্রবৃত্তিকে পরিচালিত করতেই হয়। যে উপকরণ সেগুলিকে পরিচালিত করে সেটা সেইকারণে মূলতঃ অর্থনৈতিক।

এই আবেগগুলিকে একত্রিত করা যায় কিভাবে? সাধারণ সামাজিক জীবনে শব্দগুলি প্রত্যেক মানুষের কাছে আবেগগত অনুষঙ্গ লাভ করেছে। এই শব্দগুলিকে সযত্নে নির্বাচন করতে হয় আর ছন্দোবদ্ধ বিন্যাস সম্ভব করে তোলে যাতে সেগুলিকে একত্রে সুরসহকারে আবৃত্তি করা যায় এবং যৌথ অস্তিত্বের সমগ্র সুস্পষ্টতা নিয়ে তাদের আবেগগত অনুষঙ্গগুলিকে মুক্তি দেওয়া যায়। সমগ্র সমাজ-যন্ত্রটিকে চালনা করছে যে বাস্তব সেই বাস্তবের থেকে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করতে সংগীত ও নৃত্য সহযোগিতা করে। আবেগ যখন উৎপন্ন হয় আর যখন তা "কাজ" সৃষ্টি করার স্তরে উন্নীত হয়, এই দুই সময়ের মধ্যবর্তী কালে সেটা লোপ পায় না। উপজাতির অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যক্তি যৌথ বিভ্রমে অংশগ্রহণ করে পরিবর্তিত হয়। সে শিক্ষিত হয়ে ওঠে, অর্থাৎ, উপজাতির জীবনে অভিযোজিত হয়। ভোজ বা তাৎপর্যপূর্ণ নৈশনৃত্যগীতাদি হল অভিযোজনের সংকটকাল—কোনটি সাধারণ এবং সারাজীবন স্থায়ী হওয়ার

উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, যেমন স্কুলপ্রবেশক অনুষ্ঠান বা বিবাহসংক্রান্ত অনুষ্ঠানগুলি, অন্যগুলি নিয়মিত নতুন করে বা বিশেষ উদ্দেশ্যে পালন করা হয়—যেমন ফসল তোলা ও যুদ্ধের উৎসব বা শীতের মাঝামাঝি সময়ে অনুষ্ঠিত রোমান কৃষিদেবতার পূজা [Saturnalias]।

কিন্তু উপজাতির উৎসবে শিল্পের সাহায্যে সংগঠিত এই যৌথ আবেগ যেহেতু কাজকে মধুর করে তোলে এবং শ্রমের প্রয়োজন থেকেই সৃষ্ট হয়, সেই কারণে আবার সেগুলি শ্রমের মধ্যেই তাকে লঘু করে তোলার উদ্দেশ্যে প্রবেশ করে। নিড়ান, মাড়াই, লাঙল দেওয়া, বীজ বোনা ও বোঝাইয়ের মত যৌথ কাজগুলি আদিম মানুষ ছন্দোবদ্ধ সুরযুক্ত আবৃত্তির সঙ্গে পরিচালনা করে থাকে। এই ছন্দোবদ্ধ সুরযুক্ত আবৃত্তির একটা শিল্পগত বিষয়বস্তু থাকে যা কাজটির প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং কাজটির পিছনে যে যৌথ আবেগ থাকে তাকে প্রকাশ করে।

ক্রমবর্ধমান শ্রম-বিভাজন, তার ক্রমবর্ধমান সংগঠনও যার অন্তর্ভুক্ত, মূর্ত জীবনযাত্রা থেকে কাব্য দূরে সরে যাচ্ছে এমন এক চলন সৃষ্টি করছে বলে মনে হয়। যার ফলে শিল্পকে কাজের বিরোধী একটা জিনিষ বলে, বিশ্রামের সৃষ্টি বলে মনে হয়। কবি এখন এক বিশেষ ধরনের নিঃসঙ্গ ব্যক্তি হয়ে ওঠেন; গীতিকাব্য হল তার প্রকাশ। শ্রম-বিভাজনের ফলে শ্রেণীবিভক্ত সমাজ দেখা দিয়েছে, যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে চেতনা গিয়ে জমা হয়েছে শাসক শ্রেণীর মেরুতে, যে শাসক শ্রেণীর শাসন কালক্রমে আলস্যের শর্তগুলি সৃষ্টি করে। অতএব শিল্প শেষ পর্যন্ত কাজ থেকে পুরাপুরি পৃথক হয়ে পড়ে, দুটির পক্ষেই যার ফল হয় মারাত্মক; আর সেই রোগ থেকে আরোগ্য একমাত্র শ্রেণীগুলিকে নিশ্চিহ্ন করেই সম্ভব। কিন্তু ইতোমধ্যে এই চলনটি করণ কৌশলের এক সমৃদ্ধ বিকাশ ঘটিয়েছে।

যৌথভাবে উৎপন্ন এই আবেগগুলি মানুষ যখন একলা থাকে তখনও বজায় থাকে, যার ফলে একজন মানুষ যখন একা একা কোন গান করে তখনও যৌথ প্রতিরূপগুলি তার আবেগকে নাড়া দেয়। ইতোমধ্যেই শিল্পের সেই আপাতঃবিরোধী সত্যকে তিনি প্রদর্শন করতে শুরু করেছেন—মানুষ তার সঙ্গীদের থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে যখন শিল্পের জগতে প্রবেশ করে তখন সে আরও ঘনিষ্ঠভাবেই মানুষের সঙ্গে মিলিত হয়। কাব্যধর্মী শিল্পের এই যৌথ আবেগ একবার যখন তরল হয়ে ওঠে তখন একান্ত স্বতন্ত্র ও ব্যক্তিগত আহার গ্রহণকেও তা পরিব্যাপ্ত করতে পারে। হাজার হাজার

পুরুষ ধরে মানুষ সকলের সঙ্গে একযোগে যে আবেগ ও অভিজ্ঞতা ভোগ করেছে তার সমস্ত জটিল ইতিহাস যৌন প্রেম, বসন্তকাল, সূর্যাস্ত, পাপিয়া পাখির গান এবং গোলাপের বহু পরিচিত সজীবতাকে সমৃদ্ধ করে। এই প্রতিক্রিয়াগুলির কোনটিই সহজপ্রবৃত্তিগত নয়, সেই কারণে কোনটিই ব্যক্তিগত নয়। বানরের কাছে বা নেকড়ে মায়ের হাতে লালিত পালিত মৌগ্‌লির মত মানুষের কাছে গোলাপ সম্ভবতঃ একটা খাদ্যবস্তু বা উজ্জল রঙ জাতীয় কিছু। কবির কাছে তা হল-কীট্‌সের, আনাক্রিয়নের, হাফিজের, ওভিদের, ভুল লাফার্গের-গোলাপ। কারণ শিল্পের এই জগৎ হল সামাজিক আবেগের জগৎ—সকলের জীবন-অভিজ্ঞতার ফলে সকলের কাছে সুপরিচিত যে আবেগগত অনুষঙ্গগুলি শব্দ ও চিত্রকল্পগুলিতে সঞ্চিত হয়েছে, এবং তার ক্রমবর্ধমান জটিলতা সমাজজীবনের ক্রমবর্ধমান বিস্তারলাভকে প্রতিফলিত করে সেই শব্দ ও চিত্রকল্পের জগৎ।

সমাজের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সকলের কাছে সুপরিচিত আবেগগুলি পরিবর্তিত হয়। প্রকৃতির মধ্যে নিজের আকাঙ্ক্ষাগুলিকে খুঁজে পাওয়ার জন্য আদিম খাদ্যসংগ্রহকারী বা মৃগয়াজীবী উপজাতি নিজেকে প্রকৃতির মধ্যে প্রক্ষেপ করে। প্রকৃতির সঙ্গে সংগতি ঘটানর জন্য সে নিজেকে সামাজিক দিক থেকে পরিবর্তিত করে। সেই কারণে তার শিল্প হয় প্রকৃতিবাদী [naturalistic] ও প্রত্যক্ষধর্মী। তা হল পুরাতন প্রস্তরযুগের মানুষের সুস্পষ্ট চিত্রগুলি বা অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের পশু-পক্ষীর নকল-করা নৃত্য ও গীত। তার চিহ্ন হল টোটেম—মানুষ প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতি। তার ধর্ম হল অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস মানা [mana]।

শস্য উৎপাদনকারী ও পশুপালনকারী উপজাতি এর থেকে অগ্রসর। প্রকৃতিকে সে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে এবং গৃহপালিত করে ও পোষ মানিয়ে প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটিয়ে নিজের বাসনার সঙ্গে তার সংগতি গড়ে তোলে। তার শিল্প হল প্রথাগত [conventional] ও চেষ্টাশক্তিমূলক [conative]। তা হল নব্য প্রস্তরযুগের বিধিবহির্ভূত অলংকরণ বা আফ্রিকার কি পলিনেশিয়ার উপজাতিদের বিস্তারিত আচার-অনুষ্ঠান। তার চিহ্ন হল শস্যদেবতা বা পশুদেবতা—প্রকৃতি এখানে প্রকৃতপক্ষে মানুষ। তার ধর্ম হল অচেতন পদার্থাদিতে অন্ধভক্তি ও প্রেতাদিতে বিশ্বাসের ধর্ম।

প্রকৃতিকে উপজাতির মধ্যে প্রবেশ করানর ফলে শ্রমবিভাজন দেখা দেয় এবং সেইজন্য যোদ্ধা, পুরোহিত ও শাসক শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। কোরিয়াবান

[choreagus] আচার অনুষ্ঠান থেকে নিজেকে পৃথক করে হয়ে ওঠে অভিনেতা—একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। পিন্ন মহান ব্যক্তি এবং দেবতা দুজনকেই বর্ণনা করে। কোরাস হয়ে ওঠে মহাকাব্য—স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের সম্পর্কে যৌথ কাহিনী—এবং শেষ পর্যন্ত লিরিক হয়ে ওঠে—একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তির উক্তি। প্রথমে প্রকৃতির সঙ্গে নিজের পার্থক্য সম্বন্ধে এবং পরে প্রকৃতির সঙ্গে নিজের ঐক্য সম্বন্ধে মানুষ ইতোমধ্যেই সচেতন হয়ে উঠেছিল। এখন মানুষ নিজের ভিতরের পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল, কারণ এই প্রথম সেগুলিকে বাস্তব রূপ দেওয়ার শর্তগুলি দেখা দিল।

এইভাবে পরিবেশের সংগে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সমাজের ক্রমবর্ধমান জটিলতা থেকে যেমন ফসল তোলার করণকৌশল নিঃসৃত হতে থাকে সেই রকম জাগতিক অস্তিত্বের সঙ্গে তার অ-জৈবিক ও বিশেষভাবে মানবিক অভিযোজনের অংশ হিসাবে কাব্য নিঃসৃত হতে থাকে। উত্তরাধিকার সূত্রে মানুষ হাতের যে আকার লাভ করেছে তাতে পরিবর্তন না ঘটিয়েও যন্ত্রপাতি মানুষের হাতকে নতুন ক্রিয়ার সঙ্গে অভিযোজিত করে তোলে। মানুষের হৃদয়ের শাশ্বত বাসনাগুলিতে পরিবর্তন না ঘটিয়েও কাব্য মানুষের হৃদয়কে নতুন এক উদ্দেশ্যের সঙ্গে অভিযোজিত করে তোলে। এই কাজ সে করে মানুষকে এক অলীক কল্পনার জগতের মধ্যে প্রক্ষেপ ক'রে,যে অলীক কল্পনার জগৎ তার বর্তমান বাস্তবের থেকে শ্রেষ্ঠতর, কারণ সে জগৎটাই হল এক শ্রেষ্ঠতর বাস্তবের জগৎ—আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবের এক জগৎ যাকে এখনও বাস্তব রূপ দেওয়া যায় নি, যাকে বাস্তব রূপ দিতে হল সেই কাব্যকেই প্রয়োজন যা অলীক কল্পনার দিক থেকে তার পূর্বাভাষ দেয়। সব রকমের ভুল করার সম্ভাবনা এখানে থাকে ; কারণ, কাব্য এমন একটা জিনিষ উপস্থাপিত করে যাকে কাব্যের দিক থেকে ব্যবহার করার যুক্তিই হল এই যে আমরা তখনও সেটাকে স্পর্শ করতে পারি না, তার ঘ্রাণ নিতে বা স্বাদ গ্রহণ করতে পারি না। কিন্তু কেবলমাত্র এই বিভ্রমের সাহায্যেই সেই বাস্তবকে রূপ দেওয়া যায় যে বাস্তবের অন্য কোনও ভাবে অস্তিত্ব সম্ভব নয়। শস্যের গোলাগুলি যে শস্যে উপছিয়ে পড়ছে, ফসল তোলার যে সুখ ও আনন্দকে অলীক কল্পনার দিক থেকে চিত্রিত করে যে-অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানটি পালন না করলে সেই ফসল তোলাকে বাস্তব করে তুলতে যে কঠোর শ্রমের প্রয়োজন, মানুষ সেই শ্রম করত না। ফসল তোলার গান দিয়ে সেটা মধুর হয়ে ওঠার ফলে কাজটা ভালোভাবে করা যায়। কাব্য, বা কাব্য হওয়ার

কারণেই, যে বাস্তবের জন্ম দেয় এবং মোটামুটি ভাবে তার চিত্র তুলে ধরে, সেই বাস্তবের অতীত এক বাস্তবকে চোখের সামনে তুলে ধরে। সেই বাস্তব যদিও গৌণ তবু তা আরও বেশি উন্নত ও আরও বেশি জটিল। মূর্ত-ভাবে শস্যকে, ঘটনার দিক থেকে ফসল তোলার সারমর্মকে বাস্তব রূপ দিতে কাব্য সাহায্য করে এবং এগুলি হল কাব্যের নিজেরও অস্তিত্বের শর্ত। কাব্য যতটা এই সারমর্মকে বর্ণনা করে ও প্রকাশ করে তার থেকে বেশি করে বর্ণনা করে ও প্রকাশ করে আবেগগত, সামাজিক ও যৌথ 'সংগ্রহ'। এই সংগ্রহটি [complex] হল ফসল তোলার সঙ্গে সেই উপজাতির সম্পর্ক। কাব্য সত্যের এক সমগ্র নতুন জগৎকে প্রকাশ করে—তার আবেগ, তার বন্ধুত্ব, তার পরিশ্রম, তার দীর্ঘ প্রতীক্ষা ও আনন্দময় পরিণতিকে আর এই রূপ দেওয়া সম্ভব হয়েছে এই কারণেই যে ফসল তোলার সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটি সহজ প্রবৃত্তিগত ও অন্ধ নয়; সে সম্পর্ক হল অর্থনৈতিক ও সচেতন। অতএব, কাব্যের বিমূর্ত উক্তিটা নয়—তার তথ্যের বিষয়বস্তু নয়—সমাজে কাব্যের গতিশীল ভূমিকা—তার যৌথ আবেগের বিষয়বস্তুই [content] হল কাব্যের সত্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পুরাণের মৃত্যু

ধর্মের জন্মকালে আমরা এসে পৌঁছেছি। কাব্যের এই যৌথ অলীক কল্পনা যা প্রত্যেক স্বতন্ত্র ব্যক্তির জীবনে প্রবেশ করে কারণ তা সমাজের বুনানীর (Web) মধ্যেই জন্ম নেয়, আবার বেরিয়ে আসে (যেহেতু সেই বুনানি শ্রমবিভাজনের দ্বারা পৃথকীভূত হয়ে উঠে) এক বিস্তারিত পল্লবিত রূপে, জাগতিক জীবনের বস্তুগত জগৎ থেকে পৃথক ধর্মের এক জগৎ রূপে।

কাব্য হল মানুষের নবজাত আত্ম সচেতনতা, স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসাবে নয়, অন্যের সঙ্গে সাধারণ [common] আবেগের এক সমগ্র জগতের অংশীদার হিসাবে। যেহেতু তা সাধারণ সেই কারণে এই আবেগের একটা বিষয়গত এবং সেই কারণে ছদ্ম-বাহ্যিক অস্তিত্ব থাকে প্রত্যেক স্বতন্ত্র ব্যক্তির কাছে। আদিম মানুষ এই সামাজিক বিষয় ধর্মিতাকে বস্তুগত বিষয় ধর্মিতার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে, যাতে করে অলীক কল্পনার জগৎটি যেহেতু তা বাইরের শক্তির টানাটানির ফলে স্বতন্ত্র ব্যক্তির কাছে "বাইরে থেকে" উপস্থাপিত হয় সেই কারণে যে বস্তুগত জগতের সঙ্গে সে ধাক্কা খায় তার সঙ্গে সেটি গুলিয়ে যায়। অন্ত ব্যক্তিরা তাদের কর্মের দ্বারা বস্তুগত জগতের বিষয়ধর্মিতাকে সপ্রমাণ করে, একইভাবে যে অলীক জগতের অস্তিত্বকে তারা স্বীকৃতি দেয় সেই অলীক জগতের জন্য অনুরূপ এক বাস্তবতাকে তারা সপ্রমাণ করছে বলে মনে হয়।

মানুষের আবেগগুলি তরল এবং বিভ্রান্তিকর; মানুষের সংস্কৃতির আদিম পর্যায়ে সর্বপ্রাণবাদ (animism), ওরোনডিজম [orondism] এবং অলৌকিক-বাদ [mana]'র মধ্যে সেগুলি বহির্জগতে প্রক্ষেপিত হয়। মানুষ যে তার পরিবেশের সঙ্গে এক হয়ে থাকে বলে এটা ঘটে তা নয়, এটা ঘটে এই কারণেই যে শিকার করা বা শস্য সংগ্রহের দ্বারা তার বাসনাকে পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে মানুষ নিজেকে সচেতনভাবে তার পরিবেশের থেকে পৃথক করেছে। যেহেতু পরিবেশ ইতোমধ্যেই মানুষের থেকে সচেতনভাবে সুস্পষ্ট এক পৃথক জিনিষ হয়ে উঠেছে সেই কারণে কোনও "জিনিষকে" নিজের বাইরে, পরিবেশের বা তার নিজের মধ্যে স্থাপন [locate] করতে হয় মানুষকে। এই যৌথ আবেগগুলি, যা কোনও একটা ব্যথা লাগা বা ক্ষতের মত নয়, তা কোনও

পূর্বাভ-বৃষ্ট বা ঝড়াবাত্যার মত, যা সকলেই সুস্পষ্টভাবে অনুভব করে, সেই কারণে সেগুলি বিষয়ধর্মিতার এবং সেই কারণে বস্তুগত বাস্তবতার মর্যাদা লাভ করে এবং "বাইরে" যে বস্তু সেই আবেগকে জাগিয়ে তোলে সেই বস্তুতে স্থাপিত হয়। মানুষ প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করে: প্রকৃতি হয়ে ওঠে "প্রাণযুক্ত"—মানুষের বিষয়ীগত আত্মার গুণ তাতে আরোপিত হয়।

উপজাতির কাব্যের এই আবেগগত সংগ্রহ [complex] জিনিষটা আসলে কি? সেটা কি বস্তুগত বাস্তব, নাকি পুরাপুরি ভাবগত বিভ্রম? না, দুটোর কোনটাই নয়। সেটা একটা সামাজিক বাস্তব। সেটা মানুষের সহজ প্রবৃত্তির সঙ্গে অসংগৃহীত ফলের সামাজিক সম্পর্ককে প্রকাশ করে। এই সহজ প্রবৃত্তিগুলি এই আবেগগুলির জন্ম দিয়েছে এই কারণেই যে সেগুলি জনন-কোষের প্রোটোপ্লাজম'এর [germ plasm] প্রয়োজনগুলিকে অন্ধের মত অনুসরণ করেনি, বরং এক সাধারণ অর্থনৈতিক লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে যৌথ কর্মের বিষয়গত প্রয়োজনের দ্বারা সেগুলি আকারলাভ করেছে। কাব্যের অলীক কল্পনা হল এক সামাজিক প্রতিরূপ।

অতএব কাব্যধর্মী আচার-অনুষ্ঠান, পৌরাণিক কাহিনী বা নাটকের অলীক জগৎ জৈবিক বা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বাইরে একটা সামাজিক সত্যকে প্রকাশ করে, সংঘবদ্ধ ভাবে লাভ করা অভিজ্ঞতার মধ্যে মানুষের সহজপ্রবৃত্তিগুলি যেভাবে কাজ করে সেই সম্পর্কে একটা সত্যকে প্রকাশ করে। সেই সত্যগুলি সেই কারণে স্বভাবতঃই আবেগের ভাষায় প্রকাশিত হয়। বেণুশরে ছিদ্র করা হয়। এই ছিদ্রগুলি বাস্তব মূর্ত সামগ্রী। কিন্তু সেগুলি সঙ্গীত নয়। সেই বেণু বাজালে যে জিনিষটা ঘটে সেইটা হল সঙ্গীত; পাঠ করলে যেটা ঘটে সেইটা হল কবিতা।

অতএব উপজাতির কাব্য এবং ধর্মের যে অংশ থেকে প্রথমে তাকে পৃথক করে চেনা যায় না সেটা হল সমাজের এবং তার সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের বিষয়ে মানুষের অবিন্যস্ত জ্ঞান।

আর যাদু? মানুষ তার ব্যক্তিগত আবেগগুলি সম্পর্কে সচেতন হলে যে বস্তুটি সেই আবেগগুলিকে উদ্দীপিত করে, সেই বস্তুটির মধ্যকার অনিয়মিতত্বকে স্থাপন করে। যেহেতু ভীতি বা বাসনার মত সচেতন আবেগ-উদ্দীপকগুলি [affects] উপজাতির সাধারণ অভিজ্ঞতার কারণেই দেখা দেয় এবং সেগুলি কোন নির্দিষ্ট জিনিষ সম্পর্কে উপজাতির সমস্ত স্বতন্ত্র ব্যক্তির সাধারণ মনোভাব [impressions]। আবেগগুলি তখন এই জিনিষগুলিতে স্থাপিত

বলে মনে হয় এবং তার তাৎক্ষণিক স্পষ্টতার কারণে তাকে এই জিনিষগুলির আত্মা, মূলগত বাস্তব বলে মনে হয়। বেগ, যা হল পেশীর প্রচেষ্টার চেষ্টাবেদন [kin-aesthetic sensation], অনেক দিন পর্যন্ত বিজ্ঞানের চিন্তা ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল এবং এখনও প্রকৃতিকে এই আদিম সর্বপ্রাণবাদের দিক থেকে গণ্য করাকেই প্রকাশ করে।

মানুষের আবেগগুলিও তার মধ্যেই থাকে। এই কারণে সেগুলিকে তার নিজের নিয়ন্ত্রণাধীন বলে মনে হয়। সেইজন্য সেগুলিকে বাস্তবের উপর যা দিয়ে—জিনিষগুলির আবেগগত সারবস্তুর মাধ্যমে প্রাধান্য বিস্তার করার উপায় বলে মনে হয়। সে একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। তার ইচ্ছার সাহায্যে বাস্তবের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে। যাদু মন্ত্র, অনুষ্ঠান ও সহধর্মিতাসূচক যাদুর [charms, ceremonies and sympathetic magic] সাহায্যে আরব্ধ কর্মটির উপযুক্ত আবেগকে জাগিয়ে তুলে সে বিশ্বাস করে কাজটি সম্পন্ন হয়েছে। নিজের মধ্যে ফিরে গিয়ে বহির্বাস্তবকে সে নিয়ন্ত্রণ করতে পাবে বলে তার কাছে মনে হয়। প্রকৃতই সে তা পারে, কিন্তু এই চিন্তাটা যদি বিজ্ঞানসম্মত চিন্তা হয় তবেই সেটা পাবে এবং এই চিন্তা যখন তার কর্মকে পরিচালনা করে তখন সে বাস্তবের সঙ্গে বোঝাবুঝি করার জন্য আবার নিজের বাইরে ফিরে আসে।

যাদু জন্ম দেয় বিজ্ঞানের, কারণ কোন নির্দিষ্ট নিয়মের অনুযায়ী হওয়ার জন্য যাদু বহির্বাস্তবকে আদেশ দেয় আর বহির্বাস্তব তা মানতে রাজি হয় না, যাতে করে যাদুকরের উপর বাস্তবের কঠোর প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান ছাপ ফেলে। মায়ামন্ত্রের সাহায্যে সে জলের উপর দিয়ে হাঁটার চেষ্টা করে না, যদি সে তা করে তাহলে মায়ামন্ত্রটা ব্যর্থ হয়। মরুভূমিতে বৃষ্টি নামানর লোক দেখা যায় না, যে সব জায়গায় মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয় সেখানেই তাদের দেখা যায়। শীতকালে পাকা ফসলের জন্য কোনও যাদুকর মায়ামন্ত্র পড়ে না। এইভাবে বাস্তবের মধ্যে কিছু কিছু কঠোরতা যেগুলির জন্য আরও শক্তিশালী মায়ামন্ত্রের প্রয়োজন হয় সেগুলি ধীরে ধীরে স্বীকৃত হতে থাকে; এবং সেইজন্য কোন কোন নিয়ম যে কেবলমাত্র প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী শক্তির সাহায্যেই মাত্র যেমন দেবতার বা ভাগ্যের সাহায্যেই মাত্র নিয়ন্ত্রণ করা যায় এটা স্বীকৃত হয়। কালক্রমে ভাগ্যও সেই অমোঘ বিধান হয়ে ওঠে যাতে এই শক্তিগুলিকে কেউ ছাড়িয়ে উঠতে না পারে। এমন কি জুপিটার'ও (Jove) ভাগ্যের অধীন। ভাগ্য হল নিয়ম। যাদু হয়ে উঠল নিজেরই বিপরীত, হয়ে উঠল বৈজ্ঞানিক নির্ভরতা।

অর্থনীতির বিকাশের ফলে মানুষ যত বেশি বেশি করে বাস্তবের প্রকৃতিকে আবিষ্কার করতে থাকে যাদুর কাজগুলিও সেই অনুপাতে তত বেশি বেশি সাহসিক ও বিস্তারিত হয়ে পড়ে এবং আরও বেশি বেশি করে অভিজ্ঞতার দ্বারা তার সংশোধন ঘটতে থাকে। অসম্ভব ধরনের সম্ভাবনার কথা মানুষের সামনে সে তখন তুলে ধরে আর মানুষও সে সব আয়ত্ত করতে থাকে। কিন্তু যাদুর সাহায্যে মানুষ সেগুলিকে আয়ত্ত করে না। শামনদের [shaman] উদ্ভট উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং এ্যালকেমিষ্টদের অসম্ভব আশা ছাড়া আধুনিক রসায়ন যে আশাআকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছে তা সম্ভব হত না। "ভাগ্যের" হাতে, বস্তুর অমোঘ নির্বন্ধতার হাতে যাদুকরের সর্বদাই পরাজয় ঘটে এবং যাদুকর যখন সেই নির্বন্ধতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং যাদু তখনই বিজ্ঞানে পরিণত হয় যখন, যাদু যে কাজ সম্পন্ন করার ভাণ করত সেগুলি সে বাস্তবে করতে সক্ষম হয়। বিভ্রম এইভাবে বাস্তবের হাতে পরাস্ত হয়। যে যাদু আবেগ-উদ্দীপকের অন্ধ চাপের সাহায্যে স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেয় সেই যাদুই বাস্তবে রূপ পায় যখন আবেগগত বিষয়বস্তুটা তা থেকে লুপ্ত হয়ে যায়, যখন যাদুকরের চোখ খোলে এবং বাস্তবের আবেগবিহীন কার্যকারণতা সম্পর্কে সে সচেতন হয়ে ওঠে।

শুধু বহির্বাস্তবের একটা অবিন্যস্ত প্রত্যক্ষ হিসাবে যাদুর অস্তিত্ব থাকতে পারে, যেহেতু এর সঙ্গে তার সম্পর্কের বিষয়ে মানুষের নিজের ধারণাটাই অবিন্যস্ত। মানুষ নিজেকে তার পরিবেশ থেকে সুনির্দিষ্টভাবে পৃথক করেনি— বিষয়ীগত আবেগ-উদ্দীপকগুলি বিষয়গত গুণগুলির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়। এই বিভ্রান্তিকে কিভাবে সে দূর করে? নিছক ধ্যানের দ্বারা নয়; মাটি ঘাঁটতে সে চায় না পাছে হাতে কাদা লেগে যায়। অর্থনৈতিক বিকাশের পথে পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে এবং সক্রিয়ভাবে পরস্পরকে ভেদ ক'রে মানুষ নিজেকে সচেতনভাবে পরিবেশ থেকে পৃথক করে। অর্থনৈতিক উৎপাদনের মধ্যে বহির্বাস্তবের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করে মানুষ বহির্বাস্তবের প্রকৃতিকে বুঝতে পারে ও পরিবেশ এবং তার নিজের মধ্যে যে পার্থক্য সেটা তখন তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এইভাবে সে তাদের ঐক্যটা বুঝতে পারে বলে এটাও বুঝতে পারে যে একটা যন্ত্র হিসাবে মানুষও প্রয়োজনের অধীন এবং একটা প্রক্রিয়া হিসাবে বিশ্বজগৎ হল অবাধ বিকাশের রঙ্গভূমি।

(২)

জাতির শৈশবাবস্থায় ধর্মকে কাব্য থেকে আমরা কিভাবে পৃথক করতে

পারি? দুটিরই একটা অর্থনৈতিক ভূমিকা এবং একটা সামাজিক বিবরবস্ত থাকে।

আমরা যে এই দুটির মধ্যে পার্থক্য টানতে পারি তার কারণ এই যে সমস্ত যুগেই কাব্যের মধ্যে আমরা একটা বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই যেটা ধর্ম যতই "প্রকৃত" ধর্ম হিসাবে বেশি বেশি করে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে তখন তার মধ্যে পাই না। কাব্য উৎপাদনধর্মী ও পরিবর্তনশীল। এক যুগের কাব্য পরবর্তী যুগকে তৃপ্তি দেয় না, বরং প্রত্যেক নতুন যুগের মানুষই (পুরাতন কাব্যের স্বাদ গ্রহণ করেও) এমন কবিতার দাবি জানায় যা তার নিজের সমস্যা ও আশাআকাঙ্ক্ষাকে আরও বিশিষ্টভাবে এবং বিশেষভাবে প্রকাশ করবে। এই ভাবে কাব্যগত জীবনের একটা বৈশিষ্ট্য রূপে রাশি রাশি গান, গল্প, পৌরাণিক কাহিনী, মহাকাব্য, উপন্যাস অবিরাম সৃষ্ট হতে দেখি যা শিল্পকে একটা জৈব ও পরিবর্তনশীল জিনিষ বলে প্রকাশিত করে। এক সামাজিক ফুলগাছে সামগ্রিকভাবে গাছটার সঙ্গে সঙ্গেই বিকশিত হচ্ছে ও জন্ম নিচ্ছে এমন একটা ফুলের মত বস্তু যা শিল্প হিসাবে নিজেকে প্রকাশ করে কারণ তা একই রস আহরণ করে এবং সমগ্র গাছটির যাতে উপকার হয় সেইরকম একটা কাজ করে।

কাব্যধর্মী শিল্পের এই অবিরাম পরিবর্তন এই কারণেই মাত্র সম্ভব যে, কাব্যের স্বাদগ্রহণকারী বিভ্রমকে প্রাতিভাসিক (Illusory) বলে মেনে নেয়। যখন সেই অলীক জগতের মধ্যে সে মগ্ন থাকে তখন অলীকটাই বিষয়গত বাস্তবকে প্রকাশ করছে বলে সে মেনে নেয়; কিন্তু অলীক জগৎটার বাইরে সে যখন আসে তখন আর সেটাকে বাস্তব জগতেরই একটা অংশ হিসাবে দেখার জন্য সে দাবি করে না। যাকে সে বাস্তব জীবন বলে, সেখানে যেমন এক অভিজ্ঞতার সঙ্গে আর এক অভিজ্ঞতার সাযুজ্য সে দাবি করে, সেইরকমভাবে সমস্ত কাহিনী এবং সমস্ত কাব্যধর্মী উক্তির পরস্পরের মধ্যে সাযুজ্যের জন্য সে দাবি করে না।

জগৎটা একটি কাহিনীতে পরীর দেশ হতে পারে, আর একটিতে নরক হতে পারে। এক মহাকাব্যে প্যারিস হেলেনকে বন্দী করতে পারে, আর একটা কাব্যে হেলেন প্যারিসকে ছলনা করতে পারে এবং মিশরে এক গৌরবময় মৃত্যু বরণ করতে পারে। এই কারণের জন্য কবিকে এবং তার শ্রোতাকে চিন্তার যুক্তিনিষ্ঠ নিয়মগুলির—যে নিয়ম অনুসারে একথা কখনই বোঝান হয় না যে কোনও রকমের সাঙ্গীকরণ ঘটতে পারে না—ভিত্তিতে দৈনন্দিন অস্তিত্বের বাস্তব জগতের সঙ্গে কাব্যের নকল জগতের সমন্বয় সাধনের

সমস্তায় মুখোমুখি হতে হয় না। কিন্তু কবিতা বা উপন্তাসকে একটা বিভ্রম হিসাবেই মেনে নেওয়া হয়। কাব্যধর্মী শিল্পের উক্তিগুলিতে আমরা কেবলমাত্র একটা শর্তাধীন সম্মতি দিই এবং সেই কারণে সেগুলিতে বাস্তবের কোনও কায়েমী স্বার্থ থাকে না। এই কারণের জন্য অজস্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোন বাধা থাকে না। প্রত্যেক যুগে শিল্পের প্রাণই হল এই অজস্র সৃষ্টি।

এটিও ধর্মের বৈশিষ্ট্য, কিন্তু কেবলমাত্র প্রাথমিক পর্যায়ে; যা তখনও তা কাব্যের সঙ্গে মিশ্রিত। ধর্ম তখন পৌরাণিক কাহিনী এবং পৌরাণিক কাহিনীর যা বৈশিষ্ট্য সেই স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ভাবন ক্ষমতা এবং আত্ম-দ্বন্দ্বের উদ্দামতা সবই তার মধ্যে দেখা যায়।

পুরাণের মধ্যে এই জৈব বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায় কেন? দেখা যায় সেটা জৈব বলেই। কারণ সেটা সমাজের সঙ্গে তখনও জৈবভাবে যুক্ত, সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তা প্রবেশ করে আছে। আদিবাসী জাতির মানুষ যখন প্রথম এরোপ্লেন দেখে সঙ্গে সঙ্গেই তাদের পুরাণে এক বিশালকায় শ্বেত পক্ষীর আবির্ভাব ঘটে। প্রাথমিক পর্যায়ের খ্রীষ্টধর্মতে শিল্পের যা বৈশিষ্ট্য সেই একই রকম পুরাণ কাহিনীর বিস্ফোরণাত্মক সংখ্যাবৃদ্ধি দেখা যায়।

পুরাণ গ'ড়ে তোলার যুগ যখন শেষ হয়ে যায় তখন ধর্মের এক নতুন রূপ সুরু হয়। পুরাণ কাহিনীটা নেওয়া হয় বটে কিন্তু সেটা শুকিয়ে যায়। ধর্ম তখন "প্রকৃত" ধর্ম হয়ে উঠেছে।

এটা খুবই স্পষ্ট যে তার নিজের মধ্যেই দ্বন্দ্ব থাকার কারণে পুরাণ আদিম মানুষের কাছ থেকে একটা বিশেষ ধরনের সম্মতিই মাত্র পেতে পারে। তার কাছ থেকে যুক্তিহীনতার পক্ষে সম্মতি হল এর দাবি। এই অবধি লেভি-ব্রুহ্‌লের কথা সঠিক। কিন্তু এই একই যুক্তিহীনতার পক্ষে সম্মতি বিংশ শতকের মানুষও জানায় কাব্য ও সাহিত্যের সৃষ্টিতে। হ্যামলেট তার কাছে জীবন্ত, প্রতিহিংসার অধিষ্ঠাত্রী গ্রীক দেবীরাও [Furies] তাই। নরক জীবন্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে মৃত্যুর পরে নরকবাস বা প্রতিশোধের ব্যক্তিগত প্রতি-নিধিতে বিশ্বাস করে না।

একথা ঠিক যে বিংশ শতকের মানুষের কাছে এই সম্মতিটা একই রকম জোরাল নয়। আদিম মানুষের কাছে দেবতারা যৌথ উৎসব ও যৌথ আবেগের মধ্যে বেঁচে থাকে। শ্রম বিভাজন তখন এত অল্প মাত্রায় থাকে এবং সমাজ তখন এত অ-পৃথকীভূত থাকে যে, যে-যৌথ আবেগের জগতে দেবতারা বাস করেন তা ব্যক্তি মানুষের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে ভেদ করে।

রূপকথার বা উপন্যাসের জগতের ক্ষেত্রে কিন্তু তা ঘটে না, সেগুলি মানুষের জটিলতর সামাজিক জীবন থেকে নিজেদের পৃথক করে ফেলেছে। বিংশ শতকের শিল্পের জগৎ হল আরও বেশি নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া এক জগৎ—এবং সেটা এত বেশি মাত্রায় যে দার্শনিকরা কেবলই সেটাকে এক সম্পূর্ণ পৃথক জগৎ বলে মনে করেন এবং হাজির করেন "বিশুদ্ধ" নান্দনিক নির্ণায়ক—শিল্পের জন্য শিল্প।

কিন্তু এই সম্মতির শক্তিতে পার্থক্য থাকলেও গুণধর্মের দিক থেকে এক। প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে মানুষ যেহেতু তার থেকে দূরে সরে গেছে এবং প্রকৃতির ও তার নিজের কর্মপ্রণালীকে এক পারস্পরিক সাপেক্ষ ক্রিয়ার সাহায্যে অনাবৃত করে তুলেছে, তাই সাহিত্যের জগৎ হল পরিশীলিত ও জটিল ও সচেতন-হয়ে-ওঠা উপজাতির পুরাণের জগৎ। আচার অনুষ্ঠান সমেত পুরাণ এবং অনুষ্ঠান সহ শিল্পের ভূমিকাগুলি একই ধরনের—সামাজিক সহযোগিতার প্রয়োজনের সঙ্গে মানুষের আবেগগুলির অভিযোজন। দুটিই সমাজ সম্পর্কে এক অবিমূর্ত প্রত্যক্ষ কিন্তু এক সঠিক্ অনুভূতিকে আকার দেয়। একথা সত্য যে পুরাণের অন্যান্য ভূমিকাও থাকে। কিন্তু এখানে আমাদের আলোচ্য হল পুরাণের কাব্যধর্মী বিষয়বস্তু যা পরবর্তীকালে নিজেকে একটা সুস্পষ্টভাবে পৃথক ক্ষেত্র করে তোলে।

পুরাণ যেহেতু আদিম মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে এইভাবে পরস্পরকে ভেদ করে সেই কারণে তার জন্য কোনও প্রকাশ্য,আনুষ্ঠানিক সম্মতির প্রয়োজন হয় না। কোনও হোলি ইনকুইজিশনের সাহায্যে জনসাধারণকে তা জোর করে গলাধঃকরণ করান হয় না, কারণ যৌথ উৎসবের মধ্যে তাদের হৃদয় থেকেই তা সুস্পষ্টভাবে দেখা দেয়। সেই কারণে সেটা নমনীয়। পরিবেশের সঙ্গে উপজাতির সম্পর্ক যখন পরিবর্তিত হয় বা উপজাতিটি নিজেই যখন পরিবর্তিত হয়ে যায় তখন সেটাও মাথা নোয়ায় এবং পরিবর্তিত হয়ে যায়। একটা এরোপ্লেন বা কোন বিজেতার আবির্ভাব ঘটলে সদা তরল পুরাণের পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে সেই অনুযায়ী যৌথ মনের একটা অভিযোজন সৃষ্টি করে। সেইকারণে পুরাণের একটা "আত্মসংশোধনকারী" প্রবণতা থাকে; মোটের উপর তা সত্য থাকে; অর্থনৈতিক উৎপাদনের মধ্যে তার নিজের পরিবেশ সম্পর্কে উপজাতির নিজের ব্যাখ্যা যতখানি সঠিক হওয়া সম্ভব ততখানি পরিমাণেই পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কে সেই উপজাতির যৌথ আবেগগত জীবনকে তা সঠিকভাবে প্রতিফলিত করে।

যদি পুরাণকে এখন সত্য বলেই মেনে নিতে হয় তাহলে একটা প্রকৃত জৈব বিকাশ হিসাবে পুরাণের যুগ কেন অনুশাসন এবং "প্রকৃত" ধর্মের যুগকে পথ ছেড়ে দেয়, কেন সেটা বাস্তবের অবিরাম চলনকে আর প্রতিফলিত করে না এবং প্রাণরস হারিয়ে মরে যায়? পুরাণ এখন আর পুষ্টিলাভ করে না, পরিবর্তিত হয় না এবং স্ববিরোধিতা করে না, এবং এখন তা একটা অনড় ও চূড়ান্ত সত্য হয়ে ওঠে। এটা মেনে নিতে হলে যে ধর্মবিশ্বাসের [Faith] প্রয়োজন দেখা দেয়, আদিম মানুষের কাছে সেটি ছিল অজানা। যৌথ আবেগের জগতে তার সরল সরাসরি অভিজ্ঞতার কারণে আদিম মানুষের কাছে ধর্ম বিশ্বাসের প্রয়োজন ছিল না। শিল্পের জগতে তার তাৎক্ষণিক সরাসরি অভিজ্ঞতার কারণে উপন্যাস পাঠকেরও ধর্মবিশ্বাসের প্রয়োজন হয় না, পুরাণ যখন প্রাণরস হারিয়ে "প্রকৃত" ধর্ম হয়ে ওঠে তখন ধর্ম বিশ্বাসেরও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ধর্মবিশ্বাস ও অনুশাসন হল বিশ্বাসের অভাব এবং বিশ্বাসমূলক উপদেশ সম্পর্কে সন্দেহের চিহ্ন। এগুলি থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে সমাজ থেকে পুরাণ যেভাবেই হোক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

এটা ঘটল কি ভাবে? কারণ এটাই যে সমাজ নিজেকে নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে; কারণ ধর্মের ধারাটা সমাজের একটি অংশ মাত্র হয়ে পড়েছে এবং সমাজের বাকি অংশটির সঙ্গে তার বিরোধিতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এই কারণেই ধর্ম সমাজের বাকি অংশটির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। "প্রকৃত" ধর্ম সমাজের মধ্যে বিভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণীর আবির্ভাবকে সূচিত করে। পুরাণের যখন আর বিকাশ ঘটতে থাকে না তখন অপৃথকীভূত উপজাতির জীবনও শেষ হয়ে যায়।

(৩)

মার্ক্স ব্যাখ্যা করেছেন কি ভাবে শ্রমবিভাজনের ফলে এক শ্রেণীর তত্ত্বাবধায়ক, গ্রাম-মোড়ল, সেচের ব্যবস্থাপক ইত্যাদির প্রয়োজন হয়ে পড়ে। পৃথকীভবন যত বাড়তে থাকে এদের তত্ত্বাবধান তত উৎপাদনের সামাজিক উপায়গুলির প্রশাসনব্যবস্থা থেকে সেগুলির মালিকানা বা বিশেষ সুযোগ সুবিধাতে পরিণত হয়। সমাজের তাগিদে উৎপাদনের উপায়গুলির নির্বাচনভিত্তিক শাসনব্যবস্থা থেকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক এক চরম অধিকার হিসাবে উৎপাদনের উপায়গুলির উপর মালিকানার আবির্ভাব সমাজ বিকাশের এক সুনির্দিষ্ট পর্যায়কে, অর্থাৎ শ্রেণীবিভক্ত সমাজের পর্যায়কে সূচিত করে। এই শ্রেণীবিভাগগুলি সমাজকে দ্বিধাবিভক্ত করে দিলেও সেগুলিই একমাত্র উপায়,

যার সাহায্যে সমাজ উৎপাদনগত বিকাশের উন্নত পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই পর্যায় আসছে যখন এমন এক শ্রেণী সৃষ্ট হবে যে শ্রেণীর অর্থনৈতিক পরিবেশ শ্রেণীগুলির বিলোপসাধনকে সম্ভবপর করে তুলবে।

তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে শাসক শ্রেণীর সদস্যদের বিশেষ ক্রিয়ার কারণে শোষিত শ্রেণীর অস্তিত্ব বজায় রাখাকে সুনিশ্চিত করার জন্য যেটুকু সামগ্রী প্রয়োজন সেটুকু বাদ দিয়ে সমাজের সমস্ত উৎপন্ন সামগ্রীকে নিজেদের ভোগে লাগানর উপায়টা তাদের হাতে আসে। "বৌদ্ধিক" সামর্থ্যের ["intellectual" ability] কারণে প্রথমে তাদের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছিল। যখন সেটা একটা চরম অধিকার হিসাবে দেখা দেয় এবং সেই কারণে মানসিক যোগ্যতার উপর তা আর নির্ভর করে না তখনও তাদের ভূমিকা হল মুখ্যতঃ মানসিক কাজেরই, যেমন উৎপাদনের উপায়গুলিকে সম্পাদন করতে হলে মুখ্যতঃ দৈহিক কাজেরই প্রয়োজন। সেই সঙ্গে সামাজিক উৎপন্নের বেশির ভাগটাই ভোগ করার ফলে যে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ও অবসর তারা পায় তা এই শ্রেণীর মধ্যে চিন্তা ও সংস্কৃতির চর্চাকে উৎসাহিত করে, অপরপক্ষে অন্য শ্রেণীটির কঠোর কষ্টের ও পশুসুলভ জীবনের পরিবেশ এই সংস্কৃতিকে নিরুৎসাহ করে।

এর ফলে একটা ক্রমবর্ধমান অস্থায়িত্বের অবস্থার সৃষ্টি হয়, অনেকটা ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ক্ষেত্রে যেমন "সংকটসূচক" স্পন্দনের ["critical" vibration] সৃষ্টি হয় এবং প্রকৃতির জগতে বা কোন কোন প্রজাতির ক্ষেত্রে প্রতিকূল অভিযোজনের সৃষ্টি করে—বিরাট আকারের মাথার ঝুঁটি, বিরাট বিরাট কঠিন গাত্রচর্ম বিশাল লেজ ও বিরাট শুঁড় ইত্যাদি। দেহধারী জীবটি বরফের গোলার মত নিজের ধ্বংসের কারণকেই বাড়িয়ে তোলে।

এইভাবে, শ্রমবিভাজনের ফলে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী সৃষ্টি যখন একটা পর্যায় পার হয়ে যায় তখন বিচ্ছেদ প্রক্রিয়াটাও দ্রুততর হতে থাকে। শ্রেণীগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য দেখা দিতে থাকার ফলে একদিকে এক শোষকশ্রেণী সৃষ্টি করে যারা আরও বেশি বেশি করে বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, আরও বেশি বেশি করে তারা চিন্তা, সুখ, সংস্কৃতি ইত্যাদি নিয়ে জড়িত হয়ে পড়ে, আর অপর পক্ষে এক শোষিতশ্রেণীর সৃষ্টি হয় যারা চিন্তা থেকে আরও বেশি বেশি করে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তাদের জীবন হয়ে ওঠে আরও বেশি বেশি শ্রমসাপেক্ষ, আরও বেশি বেশি অবস্থার অধীন হয়ে পড়ে তারা।

ক্রিয়ার এই বিশেষীকরণ প্রথমে মঙ্গলজনক হলেও কালক্রমে ব্যাধিগ্রস্ত

হয়ে পড়ে। চিন্তা প্রথমে কর্ম থেকে নিজেকে পৃথক করেছিল কিন্তু বার বার কর্মের মধ্যে ফিরে আসার দ্বারাই কেবল তার বিকাশ ঘটেছিল। কর্মকে পরিচালিত করার জন্য তা কর্ম থেকে পৃথক হয়েছিল। শোষকশ্রেণী একবার যখন তত্ত্বাবধায়ক ও নেতৃত্বের কাজ থেকে কেবলমাত্র ভোগসুখের দিকে ও পরভোজী হওয়ার দিকে মুখ ফেরাল তখন চিন্তাও বস্তুগত বাস্তব থেকে নিজেকে শেষ অবধি পৃথক করে ফেলল এবং প্রাণরস শুকিয়ে হয়ে উঠল বন্ধ্যা আচারবাদ বা অতিসূক্ষ্মবিচারবাদ [scholasticism]। আর শোষিত শ্রেণীও একবার যখন অংশীদার ও উপজাতির সহযাত্রী মানুষ থেকে নিছক দাস হওয়ার দিকে মুখ ফেরাল, কর্মও তখন চিন্তার থেকে নিজেকে শেষ পর্যন্ত পৃথক করে ফেলল এবং হয়ে উঠল অন্ধ যান্ত্রিকতা। সামগ্রিকভাবে সমাজ-জীবনে এর প্রতিফলন হল সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও শিল্পের আচারবাদ ও ষট্পদী পংক্তিসুলভ তুচ্ছতায় [Alexandrine futility] অবনতি এবং অর্থনৈতিক উৎপাদনের অকর্মণ্যতা ও নৈরাজ্যের মধ্যে অবনতি। মিশর, চীন, ভারত এবং পতনকালের রোমান সাম্রাজ্য এই অধঃপতনের উদাহরণ।

অপৃথকীভূত উপজাতি ভেঙে চিন্তাচর্চায় রত তত্ত্বাবধায়কদের একটি শ্রেণী আর কেবল কর্মরত শ্রমিকদের একটি শ্রেণী হয়ে যাওয়াটা প্রতিফলিত হয় ধর্ম ও শিল্পের একই ধরনের দ্বৈতরাজ্যের ক্ষেত্রে। ধর্ম ও শিল্প আর উপজাতির যৌথ সৃষ্টি থাকে না তা হয়ে পড়ে শাসক শ্রেণীর সৃষ্টি, যে শাসক শ্রেণী যেমন আইন চাপিয়ে দেয় সেই রকম একটা ধর্মও চাপিয়ে দেয়।

উপজাতি তার সদস্যদের উপর কাজের জন্য হুকুম করে না; ঐতিহ্য ও ধর্মের চাপে একটা সামগ্রিক গোষ্ঠী হিসাবে যৌথভাবে কাজ চালানর প্রয়োজনে তাদের কাজটা স্বাভাবিকভাবে দেখা দেয়। ঐতিহ্য এবং ধর্ম যে কিভাবে এই চাপের সৃষ্টি করে সে বিষয়টি আমরা ইতোপূর্বেই আলোচনা করেছি। কোনও সমস্যার সমাধান বা কোনও কাজ সম্পন্ন করতে হয় সমগ্র উপজাতিরই স্বার্থ অনুযায়ী, কারণ উপজাতিটি তখনও সমগ্র থাকে। কিন্তু স্বার্থ যখন পৃথক হয়ে যায় তখন শাসক শ্রেণী শাসিত শ্রেণীকে হুকুম দেয়। সম্পর্কটা এখানে দমনমূলক হয়ে ওঠে।

একইভাবে ধর্ম হয়ে ওঠে অনুশাসন। শ্রেণীবিভক্ত সমাজ যখন তৈরি হতে থাকে তখন ধর্ম, যা সমাজ সম্পর্কে একটা অবিকৃত প্রত্যক্ষ হিসাবে কাজ করতে থাকে তা একটা নতুন ও আরও বিস্তারিত অলীক কল্পনার জগৎ গড়ে তোলে; কিন্তু সে জগতের একটা শ্রেণীভিত্তিক গঠন থাকে। রাজতন্ত্রী

সমাজে একজন সর্বপ্রধান দেবতা থাকেন, দৈরতন্ত্রে থাকেন দেবতাদের পরিবারবর্গ বা মিশরের মত যে সব রাষ্ট্রে বিভিন্ন উন্নত-শ্রেণী-এককগুলি ইতোমধ্যেই দেবত্বলাভ করায় সেগুলির বহুমতের সমন্বয়ের [synoresis] দ্বারা রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে সেখানে দেখা যায় একটা দেবতামণ্ডলী [pantheon]। জাগতিক শাসক শ্রেণীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ অনুযায়ী স্বর্গেও থাকে সভাসদবর্গ, লিপিকর, পুরোহিত ও সেনাপতি ইত্যাদি।

ইতোমধ্যে উৎপন্ন সামগ্রীর অসম বিভাগ ও বিরোধী শ্রেণীস্বার্থের ফলে এক পারস্পরিক শত্রুতার সৃষ্টি হয়েছে যা সমাজকে বিভক্ত করে ফেলে; অভ্যুত্থান, রাজদ্রোহ ও বিদ্রোহ দেখা দেয়, আর সেগুলিকে ধ্বংস করতেই হয়। সমগ্র উপজাতির কাছে উপস্থিত এক কর্তব্যের প্রতি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে সৃষ্ট না হওয়ার কারণে উৎপাদনের উপায়গুলির উপর নিরঙ্কুশ মালিকানা হল বিধিবহির্ভূত [arbitrary] এবং সেই কারণে শেষ পর্যন্ত হিংসার উপর তা নির্ভরশীল। দ্রব্যসামগ্রীগুলি একে প্রয়োজনীয় করে তোলেনা এবং সেই কারণে মানুষের দ্বারা এটা বলবৎ হয়। একইভাবে ধর্মকেও, যা এখন সমাজের যৌথ অভিযোজনকে আর প্রকাশ করে না, সমানভাবে বিধিবহির্ভূত হতে হয়। ধর্ম হয়ে ওঠে অনুশাসন। তাকে চ্যালেঞ্জ করার অর্থ রাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ করা। বিধর্মিতা একটা দেওয়ানি অপরাধ।

সমস্ত সামাজিক শ্রমের বন্দোবস্ত এখন শাসক শ্রেণী করছে বলে মনে হয়। অত্যন্ত উন্নত ধরনের কৃষিভিত্তিক সভ্যতায় পিরামিডের চূড়ায় একজন দেবতা-রাজা সৃষ্টি করা হয় এবং সমস্ত সামাজিক ক্ষমতা সেই নিয়ন্ত্রণ করছে বলে মনে হয়। দেবতা-রাজা যে সামাজিক শ্রমের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে তার সঙ্গে তুলনায় দাসের নিজেকেই খুব ক্ষুদ্র বলে মনে হয়। সংঘবদ্ধভাবে দাস প্রচণ্ড ক্ষমতা ধরে, পিরামিড গড়ার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু এই ক্ষমতা দাস নিজের ক্ষমতা বলে মনে করে না, যে দেবতা-রাজা সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করে ক্ষমতাটা যেন সেই দেবতা-রাজার বলেই মনে হয়। সেই কারণে দাস তার নিজের যৌথ ক্ষমতার সামনে নিজেকেই খুব ক্ষীণ বলে মনে করে; দেবতা-রাজাকে সে দেবতা করে তোলে এবং সমগ্র শাসক শ্রেণীকেই সে পবিত্র বলে মনে করে। তার এই আত্ম-বিচ্ছিন্নতা [alienation of self] সম্পত্তির যে বিচ্ছিন্নতা থেকে তার জন্ম দিয়েছে তারি প্রতিফলন মাত্র। দাসের এই হীনতাবোধ কেবল তার দাসত্বেরই অভিজ্ঞান নয়, যেখানে দাসত্বের অস্তিত্ব

রয়েছে এমন এক অতীব শক্তিশালী সামাজিক ক্ষমতাকে তা পদানত করে রাখে এমন এক পর্যায়ে উন্নত এক সমাজের ক্ষমতারই সেটা অভিজ্ঞান। ধ্যানের বিপরীত মেরুতে এই ক্ষমতা প্রকাশিত হয় মিশর, চীন, জাপান, সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয় ও আক্কাদীন নগর-রাষ্ট্রগুলির দেবতা-রাজাদের স্বর্গীয় মহিমায়। রোমান সাম্রাজ্যের মত এক বহুমতের সমন্বয়ধর্মী সাম্রাজ্যে সম্রাটপূজার রাষ্ট্রীয় পূজারীতির [cult] তলায় তলায় অন্যান্য ধর্মের অস্তিত্ব সম্ভব। এই স্থানীয় পূজারীতিগুলি শোষণের যে স্থানীয় রূপগুলির উপর সাম্রাজ্যবাদী শোষণ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে শোষণের সেই স্থানীয় রূপগুলিকেই প্রকাশ করে, এবং শুধুমাত্র দেবতা-সম্রাটকে চ্যালেঞ্জ করাটাই হল সাম্রাজ্যবাদী শোষণকে চ্যালেঞ্জ করা এবং সেই কারণে রোমান আইনে সেটা একটা অপরাধ। ধর্মের প্রতিভাস সম্পর্কে অধ্যয়ন করে মার্ক্স সেই ১৮৪৪ সালেই বুঝতে পেরেছিলেন: "এই রাষ্ট্র, এই সমাজ সৃষ্টি করে ধর্মকে—জগৎ সম্পর্কে এক বিপ্রতিপ [inverted] সচেতনতাকে—কারণ জগৎটাই একটা বিপ্রতীপ জগৎ। ধর্ম হল এই জগতের সাধারণ তত্ত্ব, তার সর্বব্যাপী সারাৎসার তাব যুক্তির জনপ্রিয় রূপ, তার আধ্যাত্মিক মর্যাদার সামগ্রী, তার উৎসাহ উদ্দীপনা তার নৈতিক সমর্থন, তার পবিত্র পরিপূরক, তার সাধারণ সান্ত্বনা ও সমর্থনীয়তা। এটা হল মানুষের অলীক সার্থকায়ন, যেহেতু মানুষের কোনও প্রকৃত সার্থকতা নেই।…ধর্মীয় দুঃখকষ্ট হল একই সঙ্গে বাস্তব দুঃখকষ্টের প্রকাশ এবং সেই বাস্তব দুঃখকষ্টের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ।" (মার্ক্স: On Hegel's Philosophy of Law)।

এই শ্রেণীবিভাজনের ফলে সমাজ আরও বেশি বেশি বিদীর্ণ হয়ে যখন পতনোন্মুখ রোমান সাম্রাজ্যের অর্থনীতির মত এক ব্যর্থ হতে থাকা অর্থনীতির যুগে প্রবেশ করে, উৎপন্ন সামগ্রী তত কমতে থাকে এবং তার ভাগবাঁটোয়ারাও তত বেশি বেশি দমনমূলক হতে থাকে। ধর্মও সেই কারণে আরও বেশি বেশি দমনমূলক, বেশি কঠোর এবং বিধর্মিতার কথায় আরও বেশি বেশি আঁৎকে উঠতে থাকে।

প্রথম দিকে শাসক শ্রেণী তার ধর্মে বিশ্বাস করতে থাকে, কারণ আদিম পুরাণ থেকে পৃথকীভবনটা সবে মাত্র ঘটেছে। এই জন্য সংসারের সমস্ত সামগ্রী যেমন সে আত্মসাৎ করছে সেই রকম ধর্মের সমস্ত সামগ্রীও সে আত্মসাৎ করতে চেষ্টা করে। স্বর্গের সব থেকে ভালো জায়গাটা সে নিয়ে নেয় অথবা—মিশরের প্রথম দিকের শাসকদের মত এবং গ্রীসের অভিজাতদের

মত মন্দনকাননটা তারা নিজেদের একচেটিয়া করে নেয়। কিন্তু এক অস্থির শোষিত শ্রেণী যতই এই শাসক শ্রেণীকে চ্যালেঞ্জ করতে থাকে শোষক শ্রেণী ততই নিজেদের আধ্যাত্মিক সামগ্রীগুলি তাদের সঙ্গে ভাগযোগ করে নিয়ে তাদের খুশি করার চেষ্টা করতে থাকে, কারণ এই সামগ্রীগুলি বস্তুগত সামগ্রীর মত ভাগযোগ করে নিলে ত' কমে যায় না। সেই কারণে মিশরে এমন কি দাসদেরও ক্রমে ক্রমে অমরত্বলাভের অধিকার দেওয়া হয়েছিল; এবং পতনোন্মুখ রোমান সাম্রাজ্যের যুগে রহস্যময় ধর্মগুলিতে এমন কি হীনতম মানুষদেরও দেবতা বানানর অধিকার দেওয়া হয়েছিল, যে অধিকার প্রথম দিকে একমাত্র দেবতা-সম্রাটদেরই বিশেষ অধিকার ছিল। এইভাবে দেখা যায় শোষিত শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান দুঃখকষ্টের সমান তালে পরকালের সৌন্দর্যও ততই বেড়ে উঠতে থাকে, অবশ্য তারা যদি বেশ ভালোভাবে জীবন যাপন করে তাহলেই—অর্থাৎ তারা যদি তাদের মালিকদের বাধ্য হয়ে থাকে তবেই। কল্পনা করা ফসল উপজাতির জীবনে কালক্রমে সর্বদাই ঘরে তোলা হয়। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে অধিকাংশ লোকের জন্য এই কল্পনা করা ফসল এক অলীক-পরলোকে পাওয়া যাবে বলে মুলতুবি রাখা হয়, যেহেতু বাস্তব ফসলও অধিকাংশ লোক ভোগ করতে পায় না।

ধর্মের ক্রিয়া সম্পর্কে এই ক্রমবর্ধমান সচেতনতার পরিণামে শাসক শ্রেণীর মধ্যেই দেখা দেয় সংশয়বাদ। যে ধর্মে এদের এখন আর বিশ্বাস নেই সেই ধর্মটাই জোর করে চাপিয়ে দেয় এবং নিজেরা এক সুরুচিপূর্ণ ভাববাদ অথবা শুদ্ধ দর্শনের মধ্যে আশ্রয় নেয়।

উৎপাদন সম্পর্কের ব্যবস্থাটি যে সরকারী ধর্মের জন্ম দিয়েছে তার মত সেই সরকারী ধর্মকেও আর পরিবর্তিত করা যায় না। এই সরকারী ধর্মের তলায় তলায় এখন "কুসংস্কার"ও"অলৌকিক কাহিনীর" এক গুপ্তাচ্ছাদিত জায়গা যেন দেখা দিতে থাকে। এই "কুসংস্কার" জনসাধারণের পুরাণ ছাড়া আর কিছুই নয়, যা তার সেই সাবেকি যৌথ ভূমিকা পালন করতে থাকে, যেটাকে শাসকশ্রেণী এখন একটা ইতরজনোচিত ও অভদ্রজনোচিত কিছু বলে মনে করে। এই কুসংস্কারের মধ্যেই এই লক্ষণ দেখা যায় যে, যদিও তা যৌথ তবু এই যৌথত্ব এক হীনবল শ্রেণীর হীনবল সমসত্তা। এর ভিতরে একটা ছেলেমানুষী ও দাসস্বভাব থাকে যা অবিভক্ত সমাজের তৈরি কুসংস্কারের মধ্যে যে বর্বরজনোচিত সরলতা থাকে তার থেকে পৃথক। এই কুসংস্কার, যাকে কখনও সহ্য করে যাওয়া হয় আবার কখনও ধিক্কার দেওয়া হয়, তার মধ্যে

পুরাণের অভিযোজনাত্মক ক্ষমতা দেখা যায়, কিন্তু সেটা এখন এক শোষিত শ্রেণীর ভূমিকার সঙ্গে অভিযোজন এবং তাতে শোষণজনিত মূর্ধামির ছাপ লেগে থাকে। পয়, সোনা, বাদুর তৈরি খাত, পয়মন্ত ছেলে—ইত্যাদি যে সব সৌভাগ্যের থেকে এই শ্রেণীটি বিশেষ ভাবে বঞ্চিত সেই সব জিনিষে তা ভর্তি। কিন্তু এটা আসল এবং এগুলিকে বিশ্বাস করতে হলে ধর্মবিশ্বাসের প্রয়োজন নেই, কারণ এটা জোর করে চালান হয় না। এটা হল যৌথ আত্মার এক স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি এবং সেই যৌথ আত্মা যদি অবিভক্ত সমাজের নাও হয় সেটা অন্ততঃ অবিভক্ত শ্রেণীর যৌথ আত্মার সৃষ্টি। এটা সেই সময়কার ধর্মের কাব্য যখন ধর্ম জিনিষটাই আর কাব্যধর্মী নেই। এ হল নিপীড়িত মানুষের শিল্প। কাব্য মানুষের সহজ প্রবৃত্তিগুলিকে সমাজজীবনের সঙ্গে অভিযোজিত করানর যে কাজটা করে এই কাব্য যদিও সেটা পালন করে তবু এটা মহৎ কাব্য হতে পারে না। কারণ একথা মিথ্যা নয় যে একমাত্র স্বাধীন মানুষই পারে মহৎ কাব্য রচনা করতে। ইচ্ছাপূরণের চৌহদ্দির মধ্যে এই কাব্যের ঘোরাফেরা। প্রয়োজন সম্বন্ধে মহানভাবে সচেতন হওয়ার মত স্বতঃস্ফূর্ততা এই কাব্যের স্রষ্টাদের নিজেদের জীবনে খুবই কম। সেই কারণে এই কাব্য কখনই ট্র্যাজিক কাব্য নয়।

উপজাতির পুরাণ ছিল স্বাধীন ও কাব্যধর্মী, কারণ উপজাতির অপৃথকীভূত অর্থনীতি তার সদস্যদের কার্যকলাপকে আপেক্ষিকভাবে স্বাধীন করেছিল। এই স্বাধীনতা ছিল সত্যই স্বাধীনতা—প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতনতা। হাতের কাজটি সম্পন্ন করার জন্য স্পষ্টতঃই এই ধরনের কার্যকলাপের প্রয়োজন ছিল, এবং সেগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই করা হত—সেগুলির প্রয়োজন সম্পর্কে ব্যক্তির সচেতনার সাহায্যে তা করা হত। অবশ্যই এই স্বাধীনতা কেবলমাত্র আপেক্ষিক স্বাধীনতা। এক সীমাবদ্ধ অর্থনীতি দ্বারা সৃষ্ট এক সীমাবদ্ধ সচেতনতাকেই তা প্রতিফলিত করে। গভীরতর সচেতনতা ও উচ্চতর স্বাধীনতার জন্ম জমি তৈরি করতে শ্রেণী-সমাজের বিভাগগুলির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তখনও আদিম স্বাধীনতাটা স্বাধীনতাই—সেই পর্যায়ের মানব সমাজে যে ধরনের স্বাধীনতা মানুষ জেনেছে। সেই পর্যায়ে অর্থনীতিটা যেহেতু অপৃথকীভূত সেই কারণে সীমাবদ্ধ উৎপন্নের মত সীমাবদ্ধ স্বাধীনতাটাও সকলে অন্ততঃ সম পরিমাণে ভোগ করে। তরল ও স্বতঃস্ফূর্ত কাব্য বা কাব্যধর্মী পুরাণ সেই ধরনের জমিতে জন্মায়।

শ্রেণী বিভক্ত সমাজে তত্ত্বাবধায়করা যেভাবে কাজ করতে বলে শ্রমিকরা

অন্ধভাবে সেই অনুসারে তাদের কাজ করে যায়। তারা পিরামিড গড়ে কিন্তু প্রত্যেকে একখানা করে পাথর বয়; একমাত্র শাসকরাই জানে যে একটা পিরামিড গড়া হচ্ছে। যে কাজ হাতে নেওয়া হয় তার মার্জাটা বাস্তব সম্পর্কে অধিকতর সচেতনতাকে সম্ভবপর করে তোলে; কিন্তু এই সচেতনতার সবটা জমা হয় শাসক শ্রেণীর মেরুতে। শাসিতরা অন্ধভাবে হুকুম তামিল করে এবং তারা স্বাধীনতাহীন।

শাসকরা স্বাধীন তাদের সচেতনার মাপকাঠিতে। সেই কারণে শিল্পচর্চা আরও বেশি বেশি করে তাদেরই একান্ত অধিকার হয়ে ওঠে; তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছাকেই সেটা প্রতিফলিত করে। শ্রেণী অধিকার বজায় রাখার প্রয়োজন ধর্মকে প্রাণরসহীন করে তোলে এবং সেই কারণে শিল্প এখন ধর্ম থেকে নিজেকে পৃথক করে তোলে। তাছাড়া, শাসকশ্রেণী ইতোমধ্যেই ধর্মকে তার প্রকাণ্ড শোষণধর্মী চরিত্রের কারণে অবিশ্বাস করে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ধর্মের প্রাণরসহীন হয়ে পড়া এবং সংশয়বাদের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই কারণে সর্বদাই শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে, স্বাধীন শাসক শ্রেণীর শিল্প সেটা এবং আদিম ধর্মের সমস্ত তরল, পরিবর্তনশীল ও অভিযোজনমূলক বৈশিষ্ট্যগুলিকে নিজের মধ্যে টেনে নেয়। ধর্ম এখন মুখ্যতঃ শ্রেণী দমনের একটা প্রকাশ, বাস্তব দুঃখকষ্টের এবং সেই দুঃখকষ্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের একটা প্রকাশ। অপরদিকে শিল্প হল এখন শাসক শ্রেণীর আবেগগত প্রকাশ। শোষক শ্রেণীর পরিশীলিত শিল্প শোষিতের রূপকথার গল্প ও লোকশিল্পের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। কিছুকালের জন্য পাশাপাশি দুটিরই শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে দেখা যায়।

এই পর্যায়টা নেহাৎই ক্ষণস্থায়ী। কারণ শাসক শ্রেণী যত বেশি বেশি পরজীবী হয়ে ওঠে এবং তার তত্ত্বাবধানের ভার অন্যের উপর দিতে থাকে তার নিজের স্বাধীনতাও ততই কমতে থাকে। বিগত দিনের পুরাতন সচেতনতার কথা সে আনুষ্ঠানিকভাবে আউড়িয়ে যায় কিন্তু যে বাস্তবকে তা প্রকাশ করে সেটা ইতোমধ্যে বদলিয়ে গেছে। এই শ্রেণী এখন আর বাস্তব সম্পর্কে প্রকৃতপক্ষে সচেতন নয়, কারণ যে লাগামের চাপ তার হাতকে পরিচালনা করত এখন সে আর সেই লাগাম ধরে নেই। তত্ত্বাবধানের কাজের মত শিল্পের চর্চাও হয়ে ওঠে বেতনভুক কর্মচারী ও ভৃত্যদের দিয়ে অতীতের রূপ, ভূমিকা ও ক্রিয়াকর্মের [forms, functions and operation-এর] এক যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি। বাইজানটির আচার ধর্মিতা বা ধর্মীয় গোঁড়ামির স্বগোত্র এক পণ্ডিতসুলভ প্রথাবদ্ধতার মধ্যে শিল্পের মৃত্যু ঘটে। বিজ্ঞান হয়ে ওঠে নিছক

পরিতৃপ্তি—যাদুর বশোত্র। শাসক শ্রেণী অন্ধ, সেই কারণে স্বাধীনতাহীন হয়ে পড়েছে। এই ধরনের জমিতে কাব্যের ফলন ফলে না।

এই ঘটনা যখন ঘটতে থাকে তখন শোষিত শ্রেণীও হয়ে ওঠে আরও শোষিত এবং দুঃখদুর্দশাগ্রস্ত। শাসক শ্রেণীর অবক্ষয়জনিত অর্থনীতির অবক্ষয় আরও তীব্র ও আরও তিক্ত শোষণের জন্ম দেয়। শাসক ও শাসিতের সচেতনতায় বিচ্ছেদ শাসিতের জীবজনকে করে তোলে আরও বেশি যান্ত্রিক, আরও বেশি দাসসুলভ এবং আরও বেশি স্বাধীনতাহীন। কৃষকের বা ক্ষুদ্র জমির মালিকের অর্থনীতি পরিবর্তিত হয়ে ভূস্বামী ও ভূমিদাসের অর্থনীতি হয়ে ওঠে। এমন কি "লোক" শিল্প এবং "কুসংস্কার" সৃষ্টি করতে হলেও একটা সীমাবদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ততার প্রয়োজন। দাস শ্রেণীর কোন শিল্প থাকে না; যাযাবর, ক্ষুদ্র জমির মালিক বা নগরবাসীদের [burghers] শ্রেণীর ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম ঘটে না। মানুষের মনের জন্ম অভিযোজনের মূলগত কাজটা এখনও পর্যন্ত করা হয় ধর্মের সাহায্যে, যে ধর্মের অনড় গোঁড়ামি এবং কুসংস্কার-পূর্ণ অন্ধবিশ্বাস শাসক শ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ততার অভাব এবং তাদের হ্রাসপ্রাপ্ত সচেতনতাকেই প্রকাশ করে।

এই ধবনেব ভাঙন যে সম্পূর্ণ হবেই এমন কোন কথা নেই, কারণ শাসক শ্রেণীব শোষণের ধাক্কাটা যার উপর সব থেকে বেশি পড়ে সেই শ্রেণীর মধ্যে অন্যান্য শ্রেণী দেখা দিতে পারে যারা আবার বিপ্লবের ফলে শাসক শ্রেণীতে পর্যবসিত হতে পারে। প্রাণরস-শুকিয়ে-যাওয়া ধর্মগুলিকে চ্যালেঞ্জ করে ধর্ম-বিরোধী উক্তিগুলি যে সফল হয় তার কারণ এটাই যে অর্থনীতির বিকাশের ফলে গোপনে যে অন্য এক শ্রেণী জন্ম নিয়েছে এবং শীঘ্রই যে পুরাতন শ্রেণীকে হটিয়ে নিজে তার জায়গা নেবে, এই ধর্মবিরোধী উক্তিগুলি সেই শ্রেণীর স্বার্থকেই প্রকাশ করে। এই ধর্মবিরোধী উক্তিগুলি হল শাসক শ্রেণীর অস্তিত্বেরই বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ—সেইভাবেই সেগুলির সঙ্গে লড়াই করা হয়।

(৪)

তাহলে দেখা যাচ্ছে: যে সমাজের মানুষের বিশিষ্ট কার্যকলাপ থেকেই কাব্যের জন্ম সেই সমাজ থেকে কাব্যকে আলাদা করা যায় না। মানুষের কার্যকলাপের ভিত্তি হল সহজপ্রবৃত্তি। কিন্তু মানুষের কার্যকলাপের যে রূপগুলি সব থেকে বেশি পরিবর্তনশীল এবং সহজপ্রবৃত্তির উপর সব থেকে কম নির্ভরশীল সেগুলিই সব থেকে উন্নত ও সব থেকে মানবিক। প্রকৃত ও বস্তুগত অথচ জীববিদ্যার অর্থে পরিবেশগত নয় এমন উন্নতিশীল রূপ ও গঠনতন্ত্রগুলি [forms

and systems] এক প্রজন্মী থেকে পরের প্রজন্মীতে উত্তরাধিকারের উপর এই কার্যকলাপগুলির ভিত্তি। এই কার্যকলাপগুলি সেই কারণেই প্রত্যেক নতুন প্রজন্মীকে ভিন্ন ভিন্ন ছাঁচে গড়ে তোলে, প্রজন্মী ত আর নিছক কাদা নয়, কারণ তাদের নিজেদের অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ বাহ্যিক ব্যবস্থার চলনকে চালিয়ে নিয়ে যায়। ব্যক্তি বা স্বাভাবিক মানুষের সঙ্গে সংঘবদ্ধ বা সভ্য-মানুষের এই দ্বন্দ্বটিই কাব্যকে প্রয়োজনীয় করে তোলে এবং তাকে তার অর্থ ও সত্তা দান করে। কাব্য হল মানুষের এক উৎপাদনকারী বা অর্থনৈতিক কার্যকলাপ। এই ভিত্তি থেকে তাকে আলাদা করে দেখলে তার বিকাশকে বুঝতে পারা অসম্ভব।

কাব্যের ক্রিয়া সম্পর্কে বিভিন্ন কালের মানুষের নিজেদের মূল্যায়ন আমাদের এই বিশ্লেষণের সঙ্গে কতটা মেলে? মিলটন, কীটস, শেলি বা ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রভৃতি কবিরা সাধারণভাবে উপলব্ধি করেছেন যে "দূরদ্রষ্টা", "ভবিষ্যৎ-বক্তা" বা "শিক্ষক" হিসাবে কবির একটা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ভূমিকা আছে। কথাটা অবশ্য যথাযথভাবে প্রকাশ করা হয়নি। সেটা প্রকাশ পেয়েছে রূপক আকারে বা কাব্যগত আকারে, যার মধ্যে তাদের দাবির প্রচণ্ড মাত্রাটা সামাজিক অন্তর্দৃষ্টির কিছুটা অস্পষ্টতা বা অভাব লুকিয়ে রেখেছিল। প্রকৃতপক্ষে বুর্জোয়া অর্থনীতির শর্তগুলি—যার অধীনে এতদিন পর্যন্ত যা কিছুকে পবিত্র বলে মনে করা হত তারই মত কাব্যেরও পণ্য হয়ে ওঠাব প্রবণতা দেখা যায় এবং কবি, যাকে এতদিন পর্যন্ত প্রেরণাপ্রাপ্ত বলে মনে করা হত সেই কবিরও এক নামহীন অবাধ বাজারের জন্য উৎপাদনকারী হয়ে ওঠার প্রবণতা দেখা যায়। যে সমালোচক বুর্জোয়া চিন্তার বিধেয়গুলির [categories] চৌহদ্দির মধ্যে অবস্থিত তার পক্ষে আধুনিক যুগে কাব্য যে ভাববাদী আবরণে নিজের ব্যবসায়ভিত্তিক হয়ে ওঠার লজ্জাকে ঢেকে রেখেছে এই শর্তগুলি সেই আবরণ উন্মোচনকে প্রায় অসম্ভব করে তোলে।

তা সত্ত্বেও আদিম আত্ম-মূল্যায়নের কাছে আবেদন করা অসম্ভব, কারণ আত্মসচেতনতাহীন আদিম মানুষের মধ্যে সাহিত্য সমালোচনার অস্তিত্ব অসম্ভব—তাদের সমাজের অ-পৃথকীকৃত অবস্থাটাই একে অপ্রয়োজনীয় করে রাখে। সেখানে সমালোচনা হল প্রত্যক্ষ, মূক ও কার্যকর—উপজাতির সমাজে সকলে স্বেচ্ছায় কবিকে যে স্থান দেয় সেটা থেকেই কবির মূল্যায়ন প্রকাশ পায়, কবিতার মূল্য প্রকাশ পায় সেগুলিকে বার বার বলা ও তার টিকে থাকার মধ্য দিয়ে।

খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতকের এথেন্সে এক সমাজের আবির্ভাব ঘটেছিল যা কাব্যের সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পক্ষে তখনও আদিম সমাজের যথেষ্ট কাছাকাছি ছিল। কিন্তু তা সত্বেও সেই সমাজ কাব্যকে সংস্কৃতির একটা সুস্পষ্ট "ক্ষেত্র" হিসাবে পৃথক করার পক্ষে যথেষ্ট পৃথকীভূত অবস্থায় ছিল। উৎপাদনকারী হিসাবে কবির কাজ তখনও একটা বৃত্তি হয়ে ওঠেনি, যেহেতু এথেন্স মুখ্যতঃ পণ্য উৎপাদনে নিযুক্ত একটা পুঁজিবাদী শহর ছিল না, এথেন্স তখনও একটা বন্দর, একটা বিনিময় কেন্দ্র। কবিতার লেনা দেনা সেইকারণে একটা বৃত্তি—পেশাদার গায়ক বা বেতনভুক আবৃত্তিকারের বৃত্তি (Trade)।

সেই সমাজ তখন আলোড়নের মধ্যে, বিপ্লবের মধ্যে রয়েছে। ঈজিয়ান সমুদ্রে ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি ঘটছে। ফলে এক শ্রেণীর বণিক ও দাস-মালিকের সৃষ্টি হচ্ছে যারা পুরাতন অভিজাত জমির মালিকদের হটিয়ে দিচ্ছে। এথেন্সে ইতোমধ্যেই শাসন করার গুণাবলী আর জমির উপর ভিত্তি করে নেই। এখন তার ভিত্তি হল মুদ্রার উপার্জন; আর এর ফলে স্পার্টার সঙ্গে তার তীব্র বিরোধ ঘটল। এথেন্স ছিল একটা বাজার-শহর এবং অভিজাতদের থাকার জায়গা, অতিকায় ভূসম্পত্তিগুলির একটা লেজুড় মাত্র। সেই এথেন্স এখন নিজের অধিকার বলে হয়ে উঠেছে একটা শহর, বণিক ও কারিগরদের একটা কেন্দ্র। হেলেনীয়রা এটাকে একটা "স্বল্প-সংখ্যকের শাসনতন্ত্র" [oligarchy] থেকে একটা "গণতন্ত্রে" [democracy] পরিবর্তন বলে মনে করত। পরবর্তীকালের একই ধরনের উৎক্রান্তিকালে যেমন দেখা দেয় সেই-রকম এটাও ঘটেছিল টিউডর রাজত্বকালের স্বৈরতন্ত্রের [tyranny] মত, উৎক্রান্তিকালের মধ্য দিয়ে, যখন সরকার ছিল দৃঢ় এবং তার ক্ষমতা ছিল কেন্দ্রীভূত। এই "গণতন্ত্র" অবশ্য অত্যন্ত শর্তসাপেক্ষ গণতন্ত্র—এ হল সম্পত্তি-বান মানুষের গণতন্ত্র। সর্বহারা শ্রেণীর সেখানে কোন ভোটাধিকার নেই।

মধ্যযুগের অর্থনীতির পর্যায়টি—সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে উৎক্রান্তির ক্ষেত্রে যেমন ঘটেছিল-সেরকমের নয়। বিপ্লবী শ্রেণীর সুস্পষ্ট জয়লাভের মধ্যে যার পরিসমাপ্তি ঘটে সেরকম শ্রেণীসংগ্রাম এটা নয়। বরং বিবদমান শ্রেণী-গুলির পরস্পরকে ধ্বংস করার মধ্যে এর সমাপ্তি ঘটল। ওলিগ্যার্ক ও ডেমোক্র্যাটদের মধ্যকার সংগ্রাম, এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যকার সংগ্রাম গ্রীসকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলল। এ হল শহর ও গ্রামের মধ্যকার, দাস মালিকশ্রেণীর ও দাস-শহরের মধ্যকার সংগ্রাম। দাস-মালিকানার বিরোধগুলির তীব্রতার

মধ্যে থাকার কারণে কোন চূড়ান্ত সমাধান করতে তা অক্ষম। বন্ধনগ্রস্ত ভূমিকানদের মুক্তি দেওয়ার মত কোনও চূড়ান্ত আঘাত হানা সম্ভব নয়। সে কাজ বুর্জোয়া বিপ্লবের ভিত্তি যোগায়। কোনও শ্রেণীই অপর শ্রেণীর ভিত্তিভূমিকে পুরাপুরি ধ্বংস করতে পারল না, কারণ উভয় শ্রেণীরই ভিত্তি দাসপ্রথার উপর এবং একই চরিত্রের দাসপ্রথার উপর।

সংস্কৃতির সমস্ত ক্ষেত্রটা নিয়ে কোনও একক মানুষ যাতে পর্যালোচনা করতে পারেন তার পক্ষে সংস্কৃতি তখনও যথেষ্ট মাত্রায় অপৃথকীকৃত রয়েছে। আর প্লেটো ও আরিস্ততল সাহিত্য সমেত সংস্কৃতির সমগ্র ক্ষেত্রটির পর্যালোচক দার্শনিক হিসাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছেন। দুজনেরই সৌভাগ্য এই যে গ্রীসে শ্রেণীসংগ্রাম তার চূড়ান্ত বন্ধ্যা পরিণতি নেওয়ার আগেই তাঁরা জন্মেছিলেন। সম্প্রতি শ্রেণীগুলির পরস্পরের মধ্যে সাধারণ শত্রু পারস্যের বিরুদ্ধে মৈত্রী স্থাপিত হয়েছে এবং মৈত্রীটা তখনও গতিশীল ও সৃজনশীল। ওলিগ্যার্ক শ্রেণীর মুখপাত্র প্লেতো আরিস্ততলের উপর সৃজনশীলভাবে প্রতিক্রিয়া করেন। আরিস্ততল অপেক্ষাকৃত নতুন শ্রেণীর লক্ষ্য ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ভাষা দিয়েছেন। তিনি আরও বেশি কঠোরচিত্ত, আরও বেশি ব্যবহারিকবুদ্ধিসম্পন্ন, বাস্তবের সঙ্গে আরও বেশি সংস্পর্শে থাকা মানুষ। স্তাগিরার আরিস্ততল ফিলিপ ও আলেকজান্দারের সঙ্গে যে এত ঘনিষ্ঠভাবে মৈত্রীবদ্ধ ছিলেন, এটা কোন আকস্মিক ঘটনা নয় কারণ শেষ অবধি তাঁর শ্রেণীকে যদি আরও বেশি জোরদার কোনও জয়লাভ করতে হত এবং কোথাও না কোথাও রাজ্যবিজেতা হিসাবে আবির্ভূত হতে হত, তা হলে একমাত্র নগরের গণ্ডী বিদীর্ণ করে এবং হেলেনীয় সাম্রাজ্যে গ্রীসের সীমানা ছাড়িয়ে রাজ্যশাসনকরেই আলেকজান্দারের উত্তরাধিকারীদের তা করতে হত।

একান্ত ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এবং জনসমক্ষে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বলা উক্তির মধ্যকার, অ-ছন্দোবদ্ধ ও ছন্দোবদ্ধ ভাষার মধ্যকার, ব্যক্তিগত প্রত্যয় উৎপাদন ও যৌথ আবেগের মধ্যকার আদিম পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য আরিস্ততল পরিষ্কার লক্ষ্য করেছিলেন। বাস্তবিকই সেই যুগের একজন গ্রীকের কাছে এই পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য স্বতঃই এত স্পষ্ট ছিল ও ব্যবহারিক ছিল যে তার কোনও ব্যাখ্যার প্রয়োজন হত না। একদিকে ছিল অলংকার-শাস্ত্রের বিরাট উপকরণ যার দ্বারা কোন ব্যক্তি তার সহযাত্রী মানুষদের নিজের মতের অনুকূলে আনতে পারতেন; অপরদিকে ছিল কাব্যশাস্ত্রের জগৎ যা দিয়ে মানুষের মধ্যে যৌথভাবে আবেগ জাগান যেত। এক প্রয়োজনীয় ও অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ মানবিক কার্যকলাপ সম্পর্কে পাঠ্যপুস্তক লেখার মত করে আরিস্ততল দুটি বিষয় সম্পর্কেই লিখেছেন।

অলংকারশাস্ত্র সম্পর্কে আরিস্ততলের বক্তব্য হল এই মাত্র যে সেটা প্রত্যয় উৎপাদনের শিল্প। কিন্তু এটা তিনি স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন যে, আদালতে ও রাজনৈতিক সমাবেশের মত যে সব সুস্পষ্ট ও চিত্তাকর্ষক সর্বজনীন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রত্যয় উৎপাদক শিল্পের প্রয়োজন হয় মুখ্যতঃ সেইগুলির কথা ভেবেই তিনি কথা বলেছেন। আনুষ্ঠানিক "সর্বজনীন" উপলক্ষ্যে ব্যবহৃত স্বতন্ত্র উক্তি হিসাবে অলংকারশাস্ত্রের ধারণাটিকে কাব্যের প্রচার থেকে আলাদা করে দেখতে হবে। এটা হল রাষ্ট্রীয় উপলক্ষ্যের প্রচার, যেখানে রাষ্ট্র সমাজ থেকে আলাদা একটা ব্যাপার। আদিম জীবনে দুটোই এক, কিন্তু এথেন্সের শ্রেণীগুলির বিকাশ ইতোমধ্যেই নগরকে মানুষ থেকে পৃথক করে দিয়েছে। যে সব উপলক্ষ্যে মানুষ রাষ্ট্রযন্ত্র এবং রাষ্ট্রীয় উপলক্ষ্যগুলিকে অন্যদের প্রত্যয় উৎপাদন করার জন্য ব্যবহার করে সেগুলিকে আরিস্ততল যে সব উপলক্ষ্যে মানুষ দৈনন্দিন জীবনের সচরাচর ঘটনাগুলির বিষয়ে প্রত্যয় উৎপাদনের জন্য অন্য মানুষের সঙ্গে যখন কথা বলে সেগুলির থেকে পৃথক করে দেখেছেন। শ্রেণীগুলির বিকাশ নগরকে করে তুলেছে একটা "মনুষ্য বশকারী", সমাজের উপর একটা পৃথক এবং আরোপিত এক বিশাল ইমারতের মত ইতোপূর্বেই গড়ে তোলা একটা কিছু। নিরঙ্কুশ রাষ্ট্র সম্পর্কে হেগেলীয় ধারণার মধ্যে এই দৃষ্টিভঙ্গীর চূড়ান্ত রূপ। কিন্তু নগর সক্রাতেসকে যে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দিয়েছিল সক্রাতেসের সেটা এড়াতে অস্বীকার করার মধ্যে এই দৃষ্টিভঙ্গী ইতোপূর্বেই নিহিত থেকেছে। এই অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে সক্রাতেস এই ভবিষ্যদ্বাণীই করে গেছেন, যে শ্রেণীসংগ্রাম গ্রীসকে ধ্বংস করতে বাধ্য, কারণ এই নগর, নগরকে অতিক্রম করে দেখার মত কোন শ্রেণী বা এমন কি কোন ব্যক্তিরও জন্ম দিতে পারেনি।

কাব্যশাস্ত্র সম্পর্কে আরিস্ততলের পর্যালোচনার আরও বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন। তিনি এমন এক আদিম কাব্য নিয়ে আলোচনা করেছেন যা ইতোমধ্যেই স্তত্র, নাটক, মহাকাব্য ও প্রেমের কাব্যে সুনির্দিষ্টভাবে পৃথক হতে সুরু করে দিয়েছে এবং অলংকার শাস্ত্র থেকে ইতোমধ্যেই তা সুনির্দিষ্টভাবে পৃথক হয়ে উঠছে; সেইকারণে কাব্যধর্মী সৃষ্টিগুলির মধ্যে তিনি এমন এক সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সন্ধান করেছেন যা সেগুলিকে অ-কাব্যধর্মী সৃষ্টিগুলির থেকে সুনির্দিষ্টভাবে পৃথক বলে চিহ্নিত

করবে। গ্রীকদের কাছে কাব্যের একটা সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে কোন না কোন ধরনের কাহিনী তাতে থাকত। দেবতা বা মানুষের কার্যকলাপ বা কবির আবেগ সম্পর্কে কাব্য কিছু না কিছু উক্তি করে থাকে যা সত্য না হলেও সত্য বলে মনে হয়। মহাকাব্য একটা অসত্য ইতিহাস, নাটক একটা কৃত্রিম ক্রিয়া [feigned action]। এমন কি প্রেমের কাব্যে Chloeর (সপ্তদশ শতকের প্রেমের কবিতায়, বিশেষতঃ Mathew prior-এর কবিতায় সুপরিচিত প্রেমিক বিশেষ।) অস্তিত্ব না থাকলেও কবি ন্যায়সঙ্গতভাবেই বলতে পারেন "Chloeর ভালোবাসা না পেলে আমি বাঁচব না"। কাব্যের সারমর্ম সেই কারণে গ্রীকদের কাছে একটা বিভ্রম, একটা সচেতন বিভ্রম বলে মনে হত।

প্লেতোর কাছে কবির শিল্পের এই বৈশিষ্ট্য এতই নিন্দনীয় ছিল যে তাঁর রিপাবলিকে কবিদের তিনি স্থান দিতে রাজি ছিলেন না, অথবা, তাদের সৃষ্টি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত [censored] হলে তবেই কেবল তাদের স্থান দিতে রাজি ছিলেন। প্লেতোর দর্শনের মত প্রতিক্রিয়াশীল বা ফ্যাসীবাদী দর্শনের সঙ্গে সর্বদাই সংস্কৃতির অধিকার না-দেওয়াটা সংশ্লিষ্ট থাকে, বিশেষ করে সমকালীন সংস্কৃতির, আর প্লেতোর সমকালীন সংস্কৃতি ছিল মুখ্যতঃ কাব্যধর্মী। সেই কারণে দার্শনিক হিসাবে তিনি কবিতাকে ঘৃণা করতেন যদিও মানুষ হিসাবে তার দ্বারা তিনি মুগ্ধ হতেন। বিপ্লবী যুগে সংস্কৃতি বিপ্লবের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বা বঞ্চিতদের সন্দেহকে প্রকাশ করে। দার্শনিকরা এই আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সন্দেহ দুটিকেই "বিপজ্জনক" বা "দুর্নীতিপরায়ণ" বলে মনে করেন এবং যে সংস্কৃতি তাদের গলাপচা অবস্থাকে ঠেক্‌নো দিয়ে রাখে সেই রকম সংস্কৃতি দাবি করে থাকেন। এই ধরনের সংস্কৃতি, যে অতীতে তারা ক্ষমতাশালী ছিল সেই অতীতকে সুন্দর করে দেখায়। প্রকৃত অতীতের সঙ্গে এই আদর্শায়িত অতীতের খুব একটা সাদৃশ্য থাকে না, কারণ এটা এমন সযত্নে সাজানো যে প্রকৃত অতীত যেমন বর্তমানের জন্ম দিয়েছিল এটা সেইরকম করে আবার বর্তমানের জন্ম দেবে না। প্লেতোর কাছে এই অতীতই তাঁর রিপাবলিকে আদর্শায়িত হয়েছে যে রিপাবলিকে অভিজাতরা শাসন করে এবং এক আদিম সাম্যবাদ অনুসরণ করে থাকে; প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেণী যে বৃত্তির সাহায্যে ক্ষমতায় এসেছে প্লেতো সেটাকে এইভাবে লঘু করে দেখাতে পারবেন বলে আশা করেন।

গ্রীকরা যুক্তি দিতেন যে একটা বিভ্রম সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই কাব্যের সৃষ্টি হয়েছিল। স্বভাবতই তাহলে কবি এমন একটা কিছু করেন যেটা আজগুবি

হলেও বিভ্রম সৃষ্টি করে। কবি এমন এক কাহিনী রচনা করতেন যেটা মঞ্চের উপর প্রকৃতই দেখা যাবে, অথবা হোমারীয় ইতিবৃত্তে যেমন হয়েছে, ইতিহাস রচনা করতেন যা হাট বাজারের লেনাদেনার থেকে আরও বেশি বাস্তব, হেলেনীয়দের যৌথ জীবনের সব থেকে বাস্তব জিনিষ। এই সৃষ্টি করাকে গ্রীকরা কবির বিশেষ নির্দেশক চিহ্ন বলে মনে করতেন। কবি এই নামটাও ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে "করা" শব্দ থেকেই উৎপন্ন, যেমন এ্যাংলো স্যাক্সন ভাষায় কবিকে বলা হত Makar :

To build from matter is sublimely great,

But only gods and poets can create

যাই হোক, শব্দ, যা বাস্তবের কেবল প্রতীক মাত্র, তা দিয়ে কবি শূন্য থেকে কিছু একটা সৃষ্টি কবতে পাবেন একথা গ্রীকরা মনে করতেন না। তারা মনে করতেন কবি সৃষ্টি করেন বাস্তবের এক কৃত্রিম অনুকরণ, একটা mimesis। প্লেতোর কাছে কবি মূলতঃ এক ব্যক্তি যিনি তাঁর শ্রোতাদের একটা ছায়া-জগৎ দিয়ে ভুলানর উদ্দেশ্যে জীবনের সৃষ্টিগুলিকে অনুকরণ করেন। এই কাজে কবি হলেন বিশ্বকর্মার [Demiurge] মত, যে ভেমি-আর্জ বাস্তবেব ছায়া দেখিয়ে জীবনগুহায় বসবাসকারী মানুষদের বিদ্রূপ করে।

এই মিমেসিসতত্ত্ব অলংকারের শ্রেণী আর কাব্যের শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য টানতে আরিস্ততলকে বিশিষ্ট নির্দেশক চিহ্ন দিয়েছে। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত সাহিত্যে যে পৃথকীভবন ঘটেছে তার ফলে আমাদের আধুনিক মনের কাছে পার্থক্য হিসাবে যদিও এটা ত্রুটিপূর্ণ, তাহলেও আরিস্ততলের কালে এই পার্থক্যটা যথেষ্ট ছিল।

উপন্যাস ও নাটক থেকে আমরা কাব্যকে পৃথক করেছি ; আরিস্ততল তা করেন নি। কিন্তু প্রণালীবদ্ধ জীববিদ্যার[systematic biology] বর্গীকরণগুলি যেমন শাশ্বত নয় সেইরকম সাহিত্যের বর্গগুলিও শাশ্বত নয় ; প্রণালীবদ্ধকরণের সামগ্রীগুলি যেমন যেমন উদ্ভূত হতে থাকে এবং তাদের প্রজাতির সংখ্যার দিক থেকে ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে পরিবর্তিত হতে থাকে সেই অনুযায়ী দুটিই পরিবর্তিত হতে বাধ্য। সংস্কৃতি প্রজাতির থেকে দ্রুতবেগে পরিবর্তিত হয় এবং সাংস্কৃতিক সমালোচনা সেই অনুযায়ী নমনীয় হতে বাধ্য। আমাদের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাবে যে আরিস্ততলের মিমেসিসতত্ত্ব আলাদা হলেও হয়ে থাক, তা শিল্পের ক্রিয়া ও পদ্ধতিকে [function and method] বোঝার পক্ষে একটা মৌলিক সামগ্রী।

অ্যারিস্ততলের মন ছিল বহির্মুখী [extraverted] এবং বস্তুর উপর ছিল সেই মনের দৃঢ় লক্ষ্য। যে মানুষ নাটকের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে বা যে নাটকটা সৃষ্টি করছে তার থেকে সৃষ্ট সামগ্রী, অর্থাৎ নাটকের উপর অ্যারিস্ততলের বেশি আগ্রহ ছিল। এইভাবে যে দিক থেকে তিনি আক্রমণ করেছিলেন সেটা নান্দনিক দিক থেকে সঠিক; মনোবিদের বা মনঃসমীক্ষকের চোখ দিয়ে তিনি সাহিত্যকে দেখেন নি।

প্লেতোর মন ছিল আরও বেশি স্বজ্ঞাধর্মী [intuitive]। সৃষ্ট সামগ্রীটির তুলনায় তাঁর বেশি আগ্রহ ছিল কবির সম্পর্কে এবং কবির শ্রোতাদের সম্পর্কে। কাব্যধর্মী মনের সৃজনশীল ও গ্রহণশীল অবস্থা সম্পর্কে তাঁর ধারণা হল আদিম স্তরের; প্লেতোর চিন্তার অধিকতর প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র অনুযায়ী সেটা হয়েছে, কিন্তু এই বর্বরতার পিছনে রয়েছে এক সংস্কৃতিবানের ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি যা লক্ষণীয়ভাবে প্লেতোনিক। লিপির আবিষ্কারের ফলে কাব্য যখন যৌথ স্তর থেকে ব্যক্তিগত স্তরে গিয়ে পৌছাচ্ছে সেইরকম এক সময়ে সংস্কৃতির থেকে বর্বরতাই বরং প্লেতোকে কবির ভূমিকা সম্পর্কে কিছুটা পরিমানে আদিম মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর মুখপাত্র করে তুলেছে।

প্লেতো ছিলেন এথেন্সের প্রাচীনতর জগতের অন্তর্ভুক্ত মানুষ, এই পরিবর্তন সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন না। হেলেনীয় অর্থনীতির বিকাশ যে কবিতাকে নগর ও জনসাধারণের মধ্যে এথেনীয় পানপাত্রের মত একটা বিনিময়ের সামগ্রী করে তুলেছে সেটা তিনি দেখতে পাননি। যে যৌথ উৎসবের মধ্যে অভিনেতা ও দর্শক একই সঙ্গে শিল্পের এক সংশ্লিষ্ট জগতে মগ্ন হয়ে থাকে তার মধ্যে কবিতার মূল এখন আর পুরাতন এথেনীয় ট্র্যাজেডির মত প্রোথিত নয়। এথেন্স আদিম স্তর থেকে পরিশীলিত অর্থাৎ পৃথকীকৃত স্তরে প্রবেশ করার ফলে শিল্পের ক্ষেত্রে নীটশের ডায়োনিসিয় থেকে এ্যাপোলোনিয় স্তরে প্রবেশ ইতোমধ্যেই ঘটেছে। কবিতা এখন সমাজ—দেহ থেকে পৃথক হয়ে গেছে, এখন তা সমাজ থেকে পৃথক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উপভোগের সামগ্রী। অর্থনীতির বিকাশ এমন এক স্তরে পৌছেছে যেখানে নথি ও বার্তা অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠায় লিপির আবিষ্কার প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে কারণ নথি এখন আর উপজাতির যৌথ স্মৃতি নয় এবং মানুষ এখন আর একত্রিত হয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে না, ফলে লিখিত কবিতার আবির্ভাব ঘটল। লিপির আবিষ্কার হয়েছে বলেই যে এটা ঘটল তা নয়, ঘটল তার কারণ এই যে, যে প্রয়োজনের তাগিদে লিপির জন্ম

হন সেই তাগিদই চাইল যে কবিতা যৌথ উৎসব থেকে বিচ্ছিন্ন হোক এবং মানুষ একা একা তার রস উপভোগ করুক। ইউরিপিদিসের হাতে এমন কি নাটকও ঘরে-বসে উপভোগ করার শিল্প [closet art] হয়ে উঠল। প্লেতো অবশ্য কেবল মাত্র সাধারণভাবে এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন ; বইপুস্তকের এবং রচনা শিল্পের তিনি যেভাবে নিন্দা করেছেন তা থেকে এটা প্রকাশ পায়। ডি. এচ. লরেন্সের সমালোচনার মত প্লেতোর সমালোচনা অতীতকালে, এক অপৃথকীভূত সমাজ ও যৌথ আবেগের যুগে গিয়ে পৌছায়। সেগুলি সঠিক কিন্তু কোনও কাজে লাগে না, কারণ সমালোচক এই বিষয়ে ওয়াকিবহাল নয় যে তিনি যেটার নিন্দা করছেন সেটা অর্থনীতির মধ্যে নিহিত-মূল এক শ্রেণী-বিভেদের সৃষ্টি। সেইজন্য বর্তমান অসুবিধাগুলির সমাধানের দিকে তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন না, সেই সব অসুবিধাগুলি যখনও দেখা দেয়নি তিনি সেই কালের দিকে পিছিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু ইতিহাসের চাকাকে ত কেউ পিছনের দিক ঘুরিয়ে দিতে পারে না।

প্লেতো সেইরকম এক যুগের ক্যাসিবাসী দার্শনিকদের মধ্যে সব থেকে বেশি মনোমুগ্ধকর, সব থেকে বেশি মানবতা গুণসম্পন্ন ও সব থেকে বেশি সভ্য যখনও পর্যন্ত পিলোপনেসিয় যুদ্ধের হলাহল প্রতিক্রিয়াকে নৃশংসভাবে তিক্ত করে তোলে নি। এই দিক থেকে তিনি এক এথেনীয় হেগেল। আজকের দিনের কোনও প্রতিক্রিয়াশীল দার্শনিকই প্লেতোর নাগরিকতা বা আকর্ষণীয়তা অর্জন করতে পারেন নি। কবি সম্পর্কে প্লেতোর ধারণা :

"আয়ন নামে এক পেশাদার গায়কের সঙ্গে সক্রাতেস কথা বলছেন :

ইউরিপিদিস যাকে ম্যাগনেট বলেছেন এবং লোকে যাকে হেরাক্লিয়া [Heraclea] বলে সেই পাথরের মধ্যে যেমন এক দৈব প্রভাব থাকে সেইরকম এক দৈব প্রভাব তোমায় নাড়া দেয়। কারণ এই পাথরের যে লৌহবলয়কে কেবল আকর্ষণ করার ক্ষমতা আছে তাই নয়, সেই বলয়গুলিতে অন্য বলয়কে আকর্ষণ করার ক্ষমতাও সঞ্চারিত করে, যার ফলে কখন কখন দেখা যায় যে এই প্রভাবের ফলে এক দীর্ঘ বলয় মালা এবং অন্যান্য লৌহ দ্রব্যাদি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ঝুলে আছে। এবং এই পাথরের শক্তি যেমন মালার প্রতিটি খণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং প্রত্যেকটিকে অপরের সঙ্গে যুক্ত করে রাখে-সেই রকম কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী গ্রীক দেবীও (Muse) যাদের প্রথম অনুপ্রাণিত করেছে তাদের মধ্য দিয়ে অন্যান্য যারা সেই প্রথম উৎসের উপযুক্ত তাদের মধ্যে এই শক্তি সঞ্চারিত করে একটা মালা এবং একটা

পরম্পরা সৃষ্টি করে। কারণ, যে সব মহান কবিতাকে আমরা মর্যাদা দিই সেই সব কবিতার রচয়িতারা কোনও শিল্পের নিয়মের মধ্য দিয়ে এই চমৎকারিত্ব আয়ত্ব করেননি, বরং অনুপ্রাণিত অবস্থায় এঁরা তাঁদের কবিতার সুন্দর সুন্দর সুর উচ্চারণ করেন, এবং মনে হয় তাঁদের উপরে যেন কোন এক আত্মা ভর করেছে। এইভাবে পবিত্র নৃত্যের উৎসাহে কোরিবান্তেসরা [corybantes] যেমন যুক্তির উপর নিজেদের সমস্ত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে সেইরকম গীতিকবিতার রচয়িতারাও এক দৈব উন্মাদনাগ্রস্ত অবস্থায় তাঁদের সেইসব প্রশংসনীয় গীত সৃষ্টি করেন ; এবং এই অতিপ্রাকৃত শক্তি ভর করার সময় তাঁরা ছন্দ ও সুরসংগতির পর্যায়ে উত্তেজিত হন এবং সেটাই তাঁরা মানুষের কাছে প্রকাশ করেন। দেবতা ভর করলে বাকান্তেসরা [Bacchantes] নদী থেকে মধু ও দুধ পান করে অথচ যখন তাদের বোধ ফিরে আসে তখন দেখে নদীতে শুধু জল ছাড়া আর কিছু নেই। কারণ, কবিরাই আমাদের বলেছেন, কবিদের আত্মার পৃথিবীতে এটি বিশেষ কাজ। তাঁরা বলেছেন যে এই আত্মারা মৌমাছির মত ফুলে ফুলে ঘুরে এবং মিউজদের উদ্যান শ্যামলক্ষেত্র ও মধুস্রাবী নির্ঝরিণীর উপর উড়ে বেড়িয়ে আমাদের কাছে সুরের মাধুর্যে ভরপুর হয়ে ফিরে আসে ; এবং দ্রুত কল্পনার পাখায় সজ্জিত হওয়ার কারণে তারা সত্য বলে। কারণ বাস্তবিকই কবি হলেন ইথারের মত লঘু, পক্ষবান ও পবিত্র এবং কবিতাপদবাচ্য কোনও কিছু রচনা করতে পারেন না যতক্ষণ না তিনি অনুপ্রাণিত হচ্ছেন এবং পাগলের মত হয়ে যাচ্ছেন বা যতক্ষণ আদৌ কোনও যুক্তি তাঁর মধ্যে থাকে। কারণ যুক্তি বলে কোন জিনিষের এতটুকু অংশও যতক্ষণ মানুষের মধ্যে থাকে ততক্ষণ কাব্য সৃষ্টি করার বা ভবিষ্যদবাণী করার পক্ষে তিনি অনুপযুক্ত। Dithyrambic, enconiastic, choral, epic বা iambic যে কোন ধরনের পেশাদার গায়ক বা কবি প্রত্যেকেই দৈব প্রভাবের সঙ্গে যে পরিমাণে সংযুক্ত এবং মিউজ নিজে তাঁর উপর যতটা মাত্রায় ভর করেন সেই পরিমাণেই তিনি চমৎকার। অন্যান্য দিক থেকে কবিরা যথেষ্ট অজ্ঞ ও অনুপযুক্ত হতে পারেন। কারণ তাঁরা আয়ত্ব করা কোন শিল্পের সাহায্যে রচনা করেন না, তাঁরা দৈবশক্তির প্রভাবে রচনা করে থাকেন, কারণ সমালোচনার এমন কোনও নিয়ম তাঁরা যদি জানতেন যে অনুযায়ী তাঁরা কোন একটা বিষয়ের উপর সুন্দর কবিতা রচনা করতে পারেন তাহলে অন্যান্য সমস্ত বা অন্য কোনও বিষয়ের ক্ষেত্রেও তাঁরা এই একই রচনাক্ষমতাকে প্রয়োগ করতে পারতেন। দেবতা

সমস্ত কবি, ভবিষ্যদ্‌বক্তা বা সত্যদ্রষ্টাদের উদ্দেশ্যপূর্ণ ভাবে কথামাত্র যুক্তি বা বোধশক্তি থেকে বঞ্চিত করেছেন বলে মনে হয় যাতে আরও ভালোভাবে নিজের যাজক এবং ব্যাখ্যাকার হিসাবে তাঁদের কাজে নিযুক্ত করা যায়; এবং আমরা যাঁরা শ্রোতা, স্বীকার করি যে যাঁরা এমন সুন্দর রচনা করতে পারেন তাঁদের উপর ভর করে আছেন দেবতারা এবং দেবতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই তাঁরা আমাদের শোনাচ্ছেন।"[১]

এখানে প্লেতো কাব্যকে সচেতন শব্দালংকার থেকে ভিন্ন কিছু বলে দেখাচ্ছেন। গ্রীকদের মতে সচেতন শব্দালংকার অর্থাৎ প্রত্যয় উৎপাদনের শিল্পকে নিয়মে বাঁধা যায় এবং সেগুলি শিক্ষা করা যায়। কিন্তু কাব্য কখনই শিক্ষা করা যায় না, কারণ প্লেতোর মত অনুসারে এটা সমালোচনার নিয়মসমেত একটা সচেতন ক্রিয়া নয়, এটা দেবতার দান এবং প্লেতো কবিকে ভবিষ্যদ্‌বক্তা ও সত্য দ্রষ্টার পাশাপাশি স্থান দেওয়ার পক্ষে আদিম সংস্কৃতির যথেষ্ট কাছাকাছি। তাছাড়া, প্লেতোর মতে এই অনুপ্রেরণা কেবলমাত্র কবির জন্যই অত্যাবশ্যক নয়, পাঠকের জন্যও তা অত্যাবশ্যক। যে পেশাদার গায়ক তাঁর রচনা গেয়ে শোনান বা যে শ্রোতা তাব দ্বারা প্রভাবিত হন তাঁদেরও দেবতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হতেই হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে, কেবলমাত্র কাব্য রচনাই নয় কাব্যের রস গ্রহণ করাও একটা অচেতন (অ-যুক্তিধর্মী) ক্রিয়া। প্লেতোর মতে সমস্ত ছলনাই এক ধরনের মোহ। কবিরা হল আধা-ধর্মীয়-ক্ষমতা সম্পন্ন যাদুকর। প্লেতোর চৌম্বকধর্মপ্রাপ্ত বলয়ের প্রতীকটি আদিম কাব্যের যৌথ চরিত্রটিকে ভালোভাবেই প্রকাশ করে। আরিস্ততলের বিপরীতে, ভাববাদী প্লেতো কাব্যের ক্রিয়ার থেকে তার উপভোগের ব্যাপারে বেশি আগ্রহী।

কবির মনের ব্যাপারে আরিস্ততলের অবশ্য কোনও আগ্রহ নেই। এবং কাব্যের সৃষ্টি ও রসগ্রহণ একটা সচেতন ক্রিয়া, নাকি সচেতন ক্রিয়া নয়, সে বিষয়েও তিনি চিন্তিত নন। কাব্যকে তিনি বিচার করেন তার ফল থেকে, কবিতা থেকে। কবিতাকে তিনি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন, বিশ্লেষণ করেন, এবং তা থেকে একটা নিয়ম দাঁড় করান। তিনি দেখলেন যে কাব্য—শাস্ত্রের বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ হল মিমেসিস, এবং এক বিশ্বাসযোগ্য ও সফল মিমেসিস সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মগুলি নিয়ে তিনি অনুসন্ধান করেছেন।

প্লেতোর মত না করে তিনি আরও এগিয়ে গিয়েছেন। বর্তমান রাষ্ট্রগুলির

১। আয়ন: শেলির অনুবাদ।

সংবিধান নিয়ে আলোচনাকারী এক দার্শনিকের পক্ষে যেভাবে উপযুক্ত সেই ভাবেই তিনি প্রশ্ন তুলেছেন : ট্র্যাজেডির সামাজিক ক্রিয়া [social function] কি ?

তাঁর উত্তরটি সকলেরই জানা। তার পরিণতি হল Catharsis—বিরেচন। উত্তরটির আড়ালে কি আছে ভালো করে জানতে গেলে অবশ্য দেখা যাবে যে উত্তরটি কিছুটা প্রহেলিকাময়। কথাটার আধুনিক ব্যাখ্যা দেওয়ার লোভ হয়। উদাহরণস্বরূপ, বলা হয়েছে যে এটা হল গ্রীক পোষাকে ফ্রয়েডের মূলগত আরোগ্যপদ্ধতি [therapy]—অভিস্ফোটের সাহায্যে আরোগ্যপদ্ধতি [therapy by abreaction] ছাড়া আর কিছু নয়। একদিকে এটা হল আরিস্ততলকে বেশি সূক্ষ্ম করে তোলা, অপরদিকে অভিস্ফোটের সাহায্যে আরোগ্যপদ্ধতি বলতে প্রকৃতপক্ষে যা বোঝায় তাকে ভুল বোঝা। অন্যান্য অলীক-কল্পনার মত কাব্যধর্মী সৃষ্টিগুলি স্নায়বিক সংঘাত [neurotic conflicts] বা এষণার [complex] বাহন হতে পারে। কিন্তু অলীক-কল্পনা হল একটা আবরণ যার দ্বারা "মনের প্রহরী" ["censor"] অচেতন এষণাকে গোপন করে রাখে। এই পদ্ধতি বিরেচক হওয়া দূরে থাক, ফ্রয়েডের নিজের মূল সূত্র অনুসারে এটা তার বিপরীত। মূলগত এষণাকে অভিস্ফোটের দ্বারা আরোগ্য করতে হলে অলীক কল্পনা থেকে তার ছদ্মবেশটাকে অবশ্যই দূর করতে হবে এবং শিশুসুলভ ও অপ্রচলিত সারবস্তুটাকে অনাবৃত করতে হবে।

অর্থাৎ, ফ্রয়েডের নিজের আবিষ্কার অনুযায়ী কাব্যগত নির্মিতি [poetic construct] এমন কি কবির জন্যও একটা অভিস্ফোটমূলক আরোগ্য পদ্ধতি নয়। কিন্তু আরিস্ততল ট্র্যাজেডিকে দর্শকের পক্ষে একটা বিরেচক বলে দেখেছেন। কবির উপর কাব্যগত অলীক-কল্পনায় যদি কোন অভিস্ফোটাত্মক প্রভাব (abreactive effect) থাকেও, তাহলেও প্রত্যেক দর্শকের যে একই এষণা এবং একই অনুষঙ্গও থাকবেই এটা অসম্ভব। বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে অনুষঙ্গগুলি (associations) সাধারণতঃ অত্যন্ত ব্যক্তিগত হয়।

অতএব যেসব ফ্রয়েডপন্থীরা বলতে চান যে আরিস্ততলের বিরেচন ফ্রয়েডীয় অভিস্ফোটের সাহায্যে আরোগ্য পদ্ধতির সমতুল, তাঁরা আরিস্ততলকেই যে ভুল বোঝেন তাই নয়, যে সব অভিজ্ঞতামূলক আবিষ্কারের উপর ভিত্তি করে মনঃসমীক্ষণ (psychoanalysis) গড়ে উঠেছে সেগুলির সঙ্গে তাদের পরিচয়ও ত্রুটিপূর্ণ।

প্রকৃতপক্ষে যতক্ষণ না কাব্যের ক্রিয়া সম্পর্কে আমরা নিজেরা সুস্পষ্ট ধারণা করতে পারছি এবং আরিস্ততলের ধারণার সঙ্গে নিজেদের ধারণার তুলনা করতে পারছি ততক্ষণ আরিস্ততলের সরল ধারণাটির ভিতর প্রবেশ না করাই সব থেকে ভালো। আরিস্ততল কিভাবে এই সংজ্ঞায় পৌছেছেন তা মোটামুটি স্পষ্ট। একদিকে তিনি দেখলেন ট্র্যাজেডি দর্শকদের মনে অপ্রিয় আবেগ জাগিয়ে তুলছে—যেমন ভীতি, উদ্বেগ ও দুঃখ। অপরদিকে সেই একই দর্শক যখন এইসব দেখে চলে গেলেন তখন তাঁরা বেশ ভালো মন নিয়েই গেলেন এবং এত ভালো লাগল যে আরো দেখার জন্ত তাঁরা আবার আসলেন। আবেগগুলি অপ্রিয় হলেও তাদের উপকার করেছে। একইভাবে অপ্রিয় ঔষধও মানুষের ভালো করে এবং সম্ভবতঃ আরিস্ততল আরও একটু এগিয়ে গিয়ে দেখেছিলেন যে ট্র্যাজেডি অপ্রিয় আবেগগুলিকে ঘনীভূত করে এবং মন থেকে দূর করে দেয়, জোলাপ যেমন দেহ থেকে অপ্রিয় শারীরিক রসগুলিকে (humours) ঘনীভূত করে এবং শরীর থেকে সেগুলিকে দূর করে দেয়। ট্র্যাজেডির প্রতি এই অত্যন্ত ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গী আমার মনে হয় কেবল যে সুস্থ ও ভালো সাহিত্য-সমালোচনা তাই নয়, এটা মূলতঃ গ্রীসীয়। কোনও ট্র্যাজেডিজাতীয় নাটক তার ট্র্যাজেডি সত্ত্বেও কোনও এথেন্সবাসীকে যদি নিজেকে আরও ভালো বোধ করাতে না পারত তাহলে সেটাকে নাটক হিসাবে মন্দ ট্র্যাজেডি বলে গণ্য করা হত। পারস্যে সহচর হেলেনীয়দের ভাগ্য দেখিয়ে কোনও ট্র্যাজিক কবি যদি তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে হেলেনীয়দের নিদারুণভাবে কাঁদাত তাহলে সেই কবির জরিমানা হত। আমাদের নিজেদের কালের পুরাপুরি ভাবালু যুদ্ধবিষয়ক সাহিত্য সম্পর্কে এই ধরনের বিধি প্রয়োগ করলে কেমন হত?

আমাদের নিজেদের সংস্কৃতিতে এতদিন পর্যন্ত যে পৃথকীভবন ঘটেছে তা যখন সবেমাত্র সুরু হয়েছিল সেই সময়কার সাহিত্য সম্পর্কে এটাই তাহলে ছিল বুদ্ধিমান গ্রীক দৃষ্টিভঙ্গী। একদিকে অলংকার-শাস্ত্র, প্রত্যয় উৎপাদনের শিল্প, সচেতনভাবে যা চর্চা করা হত এবং সচেতনভাবে যার রস গ্রহণ করা হত, যা এমন একটা শিল্প মাত্র যার মধ্যে নগর-রাষ্ট্রের স্বতন্ত্রসত্তা কল্পনা করার [hypostatisation] দ্বারা সাধারণ কথোপকথন স্বতন্ত্রসত্তাবিশিষ্ট হয়েছে [hypostatised]। অপরদিকে হল কাব্যশাস্ত্র [poetics], একটা মিমেসিস বাস্তবকে অনুকরণ করায় যার সাফল্য সঞ্চারিত আবেগের তীব্রতার দ্বারা বিচার করা যায়, শ্রোতারা যেন প্রকৃতই সেই ব্যাপারে জড়িত। প্লেতো ও আরিস্ততল

দুজনেই একক্ষেত্রে একমত। কিন্তু প্লেতোর মতে এই তীব্রতায় পৌছানর জন্ত কোনও নিয়ম বেঁধে দেওয়া যায় না, কারণ সৃষ্টি ও রসগ্রহণ দুই-ই আসে সচেতন মনের বাইরে থেকে। তাছাড়া, প্লেতো কাব্যের কোনও সামাজিক সার্থকতা দেখতে পাননি। আরিস্ততলের পরিষ্কার জবাব হল, "সঞ্চারিত আবেগ একটা সামাজিক উদ্দেশ্য সাধিত করে, বিরেচনের উদ্দেশ্য।"

কাব্যের এই ধরনের সংজ্ঞা আজকের দিনে সাহিত্যে যথেষ্ট নয়। তার কারণ এই নয় যে গ্রীকরা সঠিক ছিলেন না; কারণ এই যে সমাজের মতো সাহিত্যও পরিবর্তিত হয়েছে। আরিস্ততল যদি আজকের সাহিত্যকে প্রণালী-বদ্ধ [systematise] করতেন তাহলে তিনি দেখতে পেতেন যে সাহিত্যের বর্তমান প্রজাতিগুলির মধ্যে পার্থক্য সূচিত করতে হলে মিমেসিসের নির্ণায়কটি যথেষ্ট হত না; সেটা মূল সংজ্ঞায় কোনও দুর্বলতা থাকার জন্ত নয়, তার কারণ শুধু এই যে সামাজিক বিবর্তনের গতিপথে সাহিত্যের নতুন নতুন রূপ [forms] দেখা দিয়েছে। মিমেসিস আধুনিক উপন্যাস এবং গদ্য-নাটকেরও বৈশিষ্ট্য। আজকের দিনে যাকে আমরা কাব্য বলতে সম্মত হয়েছি সেটা নাটক ও উপন্যাস দুটি থেকেই আলাদা একটা কিছু, যার জন্ত নতুন বিশিষ্ট পার্থক্যের সন্ধান করতেই হবে। আমাদের পরবর্তী কাজ হল সেগুলি খুঁজে বার করা।

কিন্তু আরিস্ততলের সংজ্ঞা আমাদের সতর্ক করে দেয় যে, কাব্যের উৎস সম্পর্কে আলোচনায় সাহিত্যের অন্যান্য রূপগুলিকে আমরা অবহেলা করতে পারি না, কারণ একটা সময় থাকে যখন সমস্ত সাহিত্যই হল কাব্য। সংস্কৃতির প্রতি বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী এই ধরনের কোনও ভুল করার ফাঁদে পড়ে না। আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি যে একটা সময় থাকে যখন সমস্ত ধর্ম এবং সমস্ত সাহিত্যই হল কাব্য। তা সত্ত্বেও আধুনিক মানুষ হিসাবে, পুঁজিবাদী যুগের অধিবাসী হিসাবে বুর্জোয়া কাব্যই আমাদের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। আমাদের পরবর্তী অধ্যায়টি সেই কারণে ইতিহাসের দিক থেকে আধুনিক কাব্যের বিকাশ সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচনার জন্ত ব্যয়িত হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আধুনিক কাব্যের বিকাশ

"আধুনিক" শব্দটিকে যখন সাধারণ অর্থে আমরা ব্যবহার করি তখন ইউরোপে সংস্কৃতির যে সমগ্র ধারাটি বিকশিত হয়েছিল এবং পঞ্চদশ শতক থেকে আজ পর্যন্ত যা ইউরোপ পার হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সেটাকে বর্ণনা করার জন্ম আমরা ব্যবহার করি। শেকসপীয়র, গ্যালিলিও, মিকেলআঞ্জেলো, পোপ, গোটে ও ভলতেয়রের মধ্যে একটা "আধুনিক" কিছু আছে যেটা আমরা হোমার, থালেস, চসার ও বিবুলফের থেকে আলাদা করে চিনতে পারি এবং সেটাকে ভালেরি, সেজান, জেম্‌স জয়েস, বের্গসঁ ও আইনস্টাইনের সঙ্গে তুলনা করি। এই ধারাটি দাঁড়িয়ে আছে একটা অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর। ধারাটা নিজেও পরিবর্তনশীল—এলিজাবেথীয় কাল থেকে আমাদের কাল পর্যন্ত যুগের মত মানব ইতিহাসের অন্য কোনও যুগ এত বিচিত্র ও গতিশীল হয়নি। কিন্তু অর্থনৈতিক বনিয়াদও আবার পরিবর্তিত হয়েছে, সামন্ততান্ত্রিক থেকে "যন্ত্র-শিল্পভিত্তিক" [industrial] বনিয়াদে। এই সাংস্কৃতিক ধারাটা হল উৎপাদনের ক্ষেত্রে বুর্জোয়া বিপ্লবের উপরিতল [superstructure]—যে বিপ্লবের প্রকৃতি মার্ক্স তাঁর দাস ক্যাপিট্যাল পুস্তকে প্রথম সম্পূর্ণভাবে বিশ্লেষণ করেন। আধুনিক কাব্য হল **পুঁজিবাদী** কাব্য।

ইতিহাসের দিক থেকে অর্থাৎ—গতির মধ্য দিয়ে না দেখলে আধুনিক কাব্যকে বুঝতে পারা অসম্ভব। কাব্যকে একটা স্থিতিশীল "শিল্পকর্ম" হিসাবে, একটা জমাট হয়ে যাওয়া, শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া সামগ্রী হিসাবে আলোচনা করলে আমরা কেবল কিছু বিগতপ্রাণ ফরমূলাকেই আবার এনে হাজির করব। যেক্ষেত্রে কাব্য হল প্রচণ্ডভাবে গতিশীল এক সমাজের জৈব-উৎপন্ন সেক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে সত্য।

কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই কালের বুর্জোয়া সংস্কৃতির কাব্যকে সামগ্রিকভাবে আলোচনা করা এক দুরূহ কাজ। বহু জাতি ও বহু ভাষা বুর্জোয়া চলনের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে এবং তা সত্ত্বেও কাব্যের বৈশিষ্ট্যই হল এই যে তার রস গ্রহণের জন্ম সাহিত্যের অন্যান্য রূপের ক্ষেত্রে ভাষা সম্পর্কে যতটা জ্ঞানের প্রয়োজন তার থেকে যে ভাষায় কাব্য রচিত সেই ভাষা সম্পর্কে ঘনিষ্ঠতর জ্ঞানের প্রয়োজন।

কিন্তু ঘটনা এই যে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে বুর্জোয়া বিপ্লবের পথিকৃৎ হল ইংলণ্ড। ইতালিতে তার আগে দেখা দিয়েছিল বটে কিন্তু সেখানে তার বিকাশ অল্প দিনের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায়। আমেরিকা তাকে ছাড়িয়ে যায় বটে কিন্তু সে অনেক পরবর্তীকালে। একমাত্র ইংলণ্ডেই বুর্জোয়া বিপ্লবের বেশির ভাগ অংশটা উদ্ঘাটিত হয় এবং সেখান থেকে বাকি দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে।

ফ্রান্সে ১৭৮৯—১৮৭১ মধ্যে বুর্জোয়া বিপ্লব নানা স্তরের মধ্য দিয়ে এখানকার থেকে আরও বেশি দ্রুতবেগে, আরও বেশি সুস্পষ্টভাবে, আরও অমোঘ যুক্তিসঙ্গতভাবে এগিয়েছিল বটে, কিন্তু তার সেই দ্রুত বেগই মতাদর্শগত উপরিতলকে আরও ঘোরাটে করে তুলেছিল। সাধারণভাবে বুর্জোয়া সাহিত্য-শিল্পের আলোচনার জন্য এই স্বল্পকালস্থায়ী যুগের ফ্রান্সই বেশি গুরুত্বপূর্ণ (valuable), কিন্তু বিশেষভাবে কাব্যের আলোচনার জন্য ইংলণ্ড অপেক্ষাকৃত ভালো ক্ষেত্র—ইংলণ্ডে এই বিপ্লব অনেক বেশি সুসমভাবে, অনেক বেশি বিশদভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছিল।

অন্যান্য দেশের তুলনায় ইংলণ্ডে অনেক পরে বুর্জোয়া অর্থনীতির ক্ষয় দেখা দিয়েছিল। কারণ ইংলণ্ডে তা অপেক্ষাকৃত আগে দেখা দিয়েছিল এবং তুলনামূলকভাবে বেশি বিকাশ তার ঘটেছিল। সেইজন্য সাম্রাজ্যবাদের অধ্যায়ে তার কাব্যগত লক্ষণগুলি ইংলণ্ডের থেকে অন্যান্য দেশে বরং প্রথমে দেখা দেয়—ফ্রান্সে, জার্মানীতে ও রাশিয়ায়। সেইকারণে এই শেষের অধ্যায়টি বাদ দিলে, ইতিহাসের দিক থেকে আধুনিক কাব্যের যে আলোচনা আমরা করব তা একটি দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে—সে দেশ হল ইংলণ্ড।

এই দেশটি অর্থাৎ ইংলণ্ড যে আধুনিক কাব্যে তার অবদানের পরিমাণ ও বৈচিত্র্যের জন্য লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে সেটা কিছু আকস্মিক ঘটনা নয়। ইংলণ্ড যে তিন শতাব্দী ধরে পুঁজিবাদের বিকাশে পৃথিবীকে নেতৃত্ব দিয়েছে এই ঘটনা সম্পর্কবিহীন একটা যোগাযোগমাত্র নয়, তা হল ইতিহাসের একই চলনের (গতির) অংশ।

"ইতিহাসের দিক থেকে বুর্জোয়া শ্রেণী একটা অত্যন্ত বিপ্লবী ভূমিকা পালন করেছে।

বুর্জোয়া শ্রেণী যেখানেই প্রাধান্য পেয়েছে সেখানেই সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক পিতৃতান্ত্রিক ও প্রকৃতিশোভন [idyllic] সম্পর্কগুলিকে শেষ করে দিয়েছে। যেসব বহুবিচিত্র সামন্ততান্ত্রিক বন্ধনসূত্রে মানুষ তার "স্বভাবসিদ্ধ ঊর্ধ্বতনদের" সঙ্গে

বাঁধা ছিল সেগুলিকে এরা নির্মমভাবে ছিন্ন করেছে এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের অনাবৃত স্বার্থের বন্ধন ছাড়া, নির্বিকার "নগদ বিদায়ের" (cash payment) বাঁধন ছাড়া আর কিছুই এরা বাকি রাখেনি।

উৎপাদনের উপায়গুলিতে অবিরাম বিপ্লবী পরিবর্তন না ঘটিয়ে এবং তার দ্বারা উৎপাদন-সম্পর্ক ও সেই সঙ্গে সমগ্র সমাজ সম্পর্কে বিপ্লবী পরিবর্তন না ঘটিয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী বাঁচতে পারে না। অপরদিকে সমস্ত পূর্বতন শিল্পজীবী শ্রেণীর বেঁচে থাকার প্রথম শর্তই ছিল সাবেকি উৎপাদন পদ্ধতিগুলিকে অপরিবর্তিত রূপে বজায় রাখা। আগেকার সমস্ত যুগ থেকে বুর্জোয়া যুগের পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্য হল উৎপাদনে অবিরাম বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন, সমস্ত সামাজিক শর্তগুলিতে অনবরত ব্যাঘাত, চিরস্থায়ী অনিশ্চয়তা এবং উত্তেজনা। সমস্ত স্থিরীকৃত দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কগুলিকে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়, নবগঠিত সম্পর্কগুলি দৃঢ় হয়ে ওঠার আগেই অচল হয়ে পড়ে। যা কিছু ছিল দৃঢ় তা বাতাসে মিলিয়ে যায়, পবিত্র যা কিছু ছিল হয়ে পড়ে কলুষিত এবং শেষ পর্যন্ত মানুষ তার জীবনের বাস্তব অবস্থাকে এবং অন্যান্য মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্কগুলিকে ঠাণ্ডা মাথায় দেখতে বাধ্য হয়।" মার্ক্স ও এঙ্গেলস। দি কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো (১৮৪৮) মস্কো ১৯৫৫, পৃঃ ৫৬—৫৮।

পুঁজিবাদী কাব্য এই শর্তগুলিকে প্রতিফলিত করে। এই কাব্য হল এই শর্তগুলিরই পরিণতি। উপজাতির অ-পৃথকীভূত ধাত্র থেকে কাব্যের জন্ম ঘটেছিল, যা তাকে একটা পুরাণভিত্তিক চরিত্র দিয়েছিল। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শাসক শ্রেণীর শিল্প হিসাবে এ নিজেকে ধর্ম থেকে পৃথক করে নিয়েছিল। কিন্তু খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের গ্রীসের মত কোনও বিপ্লবী উৎক্রান্তির সময় ছাড়া অন্য সময়ে এই শিল্প শান্ত পর্যায়ের মধ্য দিয়ে গিয়েছে এবং যে শ্রেণীর "অস্তিত্বের প্রথম শর্তই হল তার উৎপাদনের পদ্ধতিকে অপরিবর্তিত রূপে সংরক্ষণ করা" সেই শ্রেণীর মন্থরগতি উন্নতি ও পতনকে প্রতিফলিত করে; তারপর সামন্ততন্ত্রের শান্ত, আড়ষ্ট শিল্পের তলায় তলায় এক শ্রেণী বিকশিত হতে থাকে যার উত্তম প্রথম ঘোষিত হয় গথিক ক্যাথিড্রালগুলির মধ্য দিয়ে। এই শ্রেণী আবার একদিন শাসক শ্রেণী হয়ে উঠল, কিন্তু তার অস্তিত্বের শর্ত হল উৎপাদনের উপায়গুলিতে অবিরাম বিপ্লব ঘটান; এবং তার দ্বারা উৎপাদন-সম্পর্কগুলিতে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সমস্ত সম্পর্কগুলিতে অবিরাম বিপ্লব ঘটান।

এই শ্রেণীর শিল্প সেই কারণে মূলতঃ বিদ্রোহী, অ-প্রথাগত ও প্রকৃতিবাদী

[insurgent, non-formal, naturalistic] শিল্প। একমাত্র বিপ্লবী গ্রীসের শিল্প বুর্জোয়া শিল্পের প্রকৃতিবাদের যা হোক কিছুটা ভবিষ্যদ্বাণী করে। এ এমন এক শিল্প যা নিজের প্রথাগুলিতেই অবিরাম বিপ্লব ঘটায়, ঠিক যেমন বুর্জোয়া অর্থনীতি তার উৎপাদনের উপায়গুলিতে অবিরাম বিপ্লব ঘটায়। এই অবিরাম বিপ্লব, "প্রাচীন এবং শ্রদ্ধেয় সংস্কার ও মতামতগুলিকে" এই অবিরাম দূর করে দেওয়া, এই "চিরস্থায়ী অনিশ্চয়তা ও উত্তেজনা" বুর্জোয়া শিল্পকে পূর্ববর্তী সমস্ত শিল্প থেকে পৃথক করে চিহ্নিত করে। যে কোনও বুর্জোয়া শিল্পী, যিনিই তাঁর কালের প্রথাগুলিতে এক পুরুষব্যাপী সময়ের জন্যও আবদ্ধ থাকেন তিনিই হয়ে ওঠেন "প্রতিষ্ঠানধর্মী" ["academic"] এবং তাঁর শিল্প হয়ে পড়ে নিষ্প্রাণ। এই একই চলন ইংরেজি কাব্যেরও বৈশিষ্ট্য।

পুঁজিবাদী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য এই যে তা মানুষে মানুষে সমস্ত সরাসরি দমনমূলক সম্পর্কগুলিকে আপাতঃ দৃষ্টিতে ঝেঁটিয়ে দূর করে—এবং তার জায়গায় কোন জিনিসের সঙ্গে মানুষের দমনমূলক সম্পর্ককে, রাষ্ট্রকর্তৃক সুরক্ষিত সম্পত্তির অধিকারকে-প্রতিষ্ঠা করে বলে মনে হয়। সামন্ত সমাজে ভূস্বামীর কাছে ভূমিদাস যেমন আবার ভূস্বামী যেমন সামন্ত প্রভুর কাছে বাঁধা থাকে মানুষ আর সেইভাবে দমনমূলক বন্ধনে বাঁধা থাকেনা। অবাধ বাজারের জন্য তারা অন্যের উপর নির্ভর না ক'রে উৎপাদন করতে থাকে এবং এই একই অবাধ বাজার থেকে অন্যের উপর নির্ভর না ক'রে ক্রয় করতে থাকে। তাদের উৎপন্ন দ্রব্যকেই তারা যে কেবল বাজারে নিয়ে আসে তাই নয়, তাদের কর্মক্ষমতাকেও তারা বাজারে নিয়ে আসে এবং সর্বোচ্চ দাম যে দেবে তার কাছে তাদের শ্রম শক্তিকে বিনা বাধায় বিনা বিঘ্নে বিক্রয় করার অধিকার তাদের থাকে। বাধানিষেধরহিত বাজারে এই নিঃশর্ত প্রবেশাধিকারই হল পুঁজিবাদী সমাজের "স্বাধীনতা"।

এইভাবে মনে হয় যে মানুষে মানুষে কোনও দমনমূলক সম্পর্ক বুঝি নেই। আছে কেবল মানুষের এবং একটা জিনিসের (সম্পত্তির) মধ্যে বল দ্বারা সুরক্ষিত সম্পর্ক যার পরিণতি হল ব্যক্তির সঙ্গে বাজারের সম্পর্ক। বাজারকে মনে হয় প্রকৃতির একটা অংশ, পরিবেশের একটা অংশ, যা যোগান ও চাহিদার স্বাভাবিক "নিয়মের" অধীন। এর দমনকে মানুষের দমন বলে মনে হয় না, মনে হয় যেন বন্যা বা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মত কোন অন্ধ প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা দমন।

প্রকৃতপক্ষে বাজার মানুষে মানুষে প্রকৃত সম্পর্কের অন্ধ প্রকাশ ছাড়া অন্য

কিছুই নয়। এই সম্পর্কগুলি হল দমনের সম্পর্ক, উৎপাদনের উপায়গুলির উপর মালিকানা স্বত্ব এবং নিজের দুটি হাত ছাড়া যার অন্য কোনও সম্পত্তি নেই সেই স্বাধীন শ্রমিকের শ্রমশক্তি ক্রয় করার দ্বারা সংঘটিত পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শোষণ। কিন্তু যেহেতু এটা কেবলমাত্র অন্ধ প্রকাশ, সেইকারণেই তা দমনমূলক এবং নৈরাশ্যজনক, এবং প্রাকৃতিক শক্তির প্রচণ্ডতা ও বল্গাহীন বেপরোয়াভাব নিয়ে তা কাজ করে। পুঁজিপতি ও মজুরি-শ্রমিকের মধ্যকার দমনমূলক সম্পর্কগুলিতে একটা আড়াল থাকে বলেই সেগুলো এত বেশি পাশবিক ও নির্লজ্জ।

অতএব পুঁজিবাদী অর্থনীতি হল এক ভুয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং সংখ্যা গরিষ্ঠের পক্ষে এক অন্তঃসারশূন্য স্বাধীনতার অর্থনীতি; শাসকশ্রেণী হিসাবে বুর্জোয়া শ্রেণীর অস্তিত্বের শর্ত এবং সেই কারণে সমাজে তার স্বাধীনতার শর্ত হল মানুষে মানুষে সরাসরি দমনমূলক সম্পর্কের অস্তিত্বহীনতা। যে সামন্ত-তান্ত্রিক বাধানিষেধগুলি ভূমিদাসকে ভূস্বামীর সঙ্গে আবদ্ধ রাখে এই ধরনের দমনমূলক সম্পর্কগুলি হল সেই রকমের বাধানিষেধ। কিন্তু সামাজিক সম্পর্কহীন স্বাধীনতা আদৌ কোনও স্বাধীনতাই নয়, তা হল এক অন্ধ নৈরাজ্যের অবস্থা যাতে সমাজ লোপ পেতে বাধ্য। সেই কারণে মানুষে মানুষে সরাসরি সম্পর্কের অস্তিত্বহীনতা ছাড়াও বুর্জোয়া সমাজে আরও একটি জিনিস অন্তর্ভুক্ত হওয়া দরকার সেটি হল উৎপাদনের উপায়গুলির উপর নিরঙ্কুশ অধিকারের অস্তিত্ব—"ব্যক্তিগত সম্পত্তির" অধিকারের অস্তিত্ব। এই নিরঙ্কুশ অধিকার বজায় রাখা হয় আইনকানুন, পুলিশ ও সৈন্যসহ এক দমনমূলক রাষ্ট্রশক্তির কৌশলের দ্বারা। এই রাষ্ট্রশক্তি যেহেতু সম্পত্তির অধিকারকে বলবৎ করে এবং মানুষে মানুষে সম্পর্কের উপর কোনও সরাসরি মালিকানা বলবৎ করে না সেইজন্য সেটাকে সমাজের উপর মধ্যস্থতাকারী ও অন্যের অধীন নয় এমন এক কর্তৃত্ব বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এই সম্পত্তির অধিকার উৎপাদনের উপায়গুলির উপর মালিকানার মাধ্যমে বুর্জোয়াকে "স্বাধীন" শ্রমিকদের উপর দমনমূলক ক্ষমতা দান করে। সেই কারণে রাষ্ট্র এবং তা যে বুর্জোয়া অর্থনীতি বলবৎ করে এই দুই-ই সেটা যে একটা সংখ্যা গরিষ্ঠের পক্ষে দমনমূলক সমাজ এই কথাটাকে আড়াল করে রাখে। এবং যে একমাত্র স্বাধীনতা এই সমাজে থাকে তা হল প্রকৃতির হাত থেকে বুর্জোয়ার স্বাধীনতা—কারণ সামাজিক উৎপন্নসামগ্রীর উপর তারই একচেটিয়া অধিকার এবং মানুষের দমনপীড়নের হাত থেকে বুর্জোয়ারই

স্বাধীনতা—কারণ, সামন্ততান্ত্রিক চরিত্রের সমস্ত সরাসরি দমনমূলক সম্পর্কগুলি এখন সমাজ থেকে বিতাড়িত। বুর্জোয়ার চোখ দিয়ে দেখলে বুর্জোয়া সমাজ হল এমন এক স্বাধীন সমাজ যার স্বাধীনতার হেতু তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, তার পুরাপুরি অবাধ বাজার এবং তার সরাসরি সামাজিক সম্পর্কের অনুপস্থিতি; যার আবার কারণ ও প্রকাশ হল অবাধ বাজার। কিন্তু সমাজের বাকি অংশের কাছে বুর্জোয়া সমাজ হল এক দমনমূলক সমাজ যার দমনের পদ্ধতিই হল বুর্জোয়া সমাজের মৌলিক দ্বন্দ্ব। যে সামগ্রিক চলন পুঁজিবাদী সংস্কৃতির বিকাশ সুনিশ্চিত করে সেই সামগ্রিক চলনকে বুঝতে হলে এই দ্বন্দ্বটিকে বুঝতেই হবে।

কাব্যের জন্ম সম্পর্কে আমাদের বিশ্লেষণে আমরা দেখেছি যে প্রথমদিকের কাব্য মূলতঃ যৌথ-আবেগ এবং গোষ্ঠী-উৎসবে তার জন্ম। শত্রুকে দেখে মৃগযূথের মধ্যে ভীতি জাগার মত এটা একটা অনপেক্ষ [unconditioned], সহজপ্রবৃত্তিগত ধরনের যৌথ আবেগ নয়, এ হল অর্থনৈতিক সংঘবদ্ধতার প্রয়োজনের দ্বারা সাপেক্ষীকৃত কোন উদ্দীপকের যৌথ আবেগ।

এদিকে বুর্জোয়া সংস্কৃতি হল সেই শ্রেণীর সংস্কৃতি যার কাছে স্বাধীনতা—মানুষের সমস্ত সহজপ্রবৃত্তিগত শক্তির সার্থকায়ন—"ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের" দ্বারা সুনিশ্চিত হয়েছে। অতএব এটা মনে হতে পারে যে বুর্জোয়া সভ্যতা বুঝি কাব্য বিরোধী হবে, কেননা কাব্য হল যৌথ আর বুর্জোয়া হল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী।

কিন্তু সেটা হবে বুর্জোয়াকে তার নিজের মূল্যায়নের চোখে দেখা। তাকে পুঁজিপতি হিসাবেই বুঝতে চাই আর কবি হিসাবেই বুঝতে চাই, সবপ্রথমে আমাদের অবশ্য সেটাই করতে হবে। বুর্জোয়া নিজেকে এমনভাবে দেখে যেন স্বাধীনতার জন্য একাকী এক বীরত্বপূর্ণ লড়াই সে চালিয়ে যাচ্ছে—যে স্বাভাবিক মানুষ স্বাধীন হয়েই জন্মেছে এবং কোন এক অদ্ভুত কারণে সর্বত্র সে শৃঙ্খলিত সেই স্বাভাবিক মানুষকে যে সব সামাজিক সম্পর্কগুলি শৃঙ্খলিত করেছে সে সবের বিরুদ্ধে সে যেন লড়াই করছে এমন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী সে।

আর প্রকৃতপক্ষে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ফলে অবিরাম করণকৌশলগত অগ্রগতি ঘটে এবং সেই কারণেই ক্রমবর্ধমান স্বাধীনতারও সৃষ্টি হয়। সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্কগুলির বিরুদ্ধে তার লড়াই-এর ফলে সমাজের উৎপাদিকা শক্তিগুলির বড় রকমের মুক্তি ঘটে। বুর্জোয়া অর্থনীতি যে বনিয়াদের উপর দাঁড়িয়ে থাকে সেই বনিয়াদই বিপ্লব ঘটাতে থাকে যতক্ষণ

না সেই বনিয়াদ আর উপরিতলকে ধরে রাখতে পারে না এবং বুর্জোয়া অর্থনীতিতে বিস্ফোরণ ঘটে আর সৃষ্টি হয় তার বিপরীত অর্থনীতি। যে বিশেষ পদ্ধতিতে বুর্জোয়া অর্থনীতি এই বিপ্লব ঘটাতে থাকে সেই বিশেষ পদ্ধতিই বুর্জোয়ার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মধ্যে দিয়ে অভিব্যক্তি লাভ করে।

আর ঠিক একইভাবে বুর্জোয়া কবি নিজেকে এমনভাবে ভাবেন যেন তিনি একজন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী যিনি তাঁর মূলতঃ নিজস্ব সত্তাতেই প্রকাশ করার চেষ্টা করছেন তাঁর অন্তরের অন্তর্নিহিত শক্তির এক সম্প্রসারণশীল বহির্মুখী বিকাশের মাধ্যমে ; বাহ্যিক রূপগুলি তার অন্তর্নিহিত যে শক্তিগুলিকে পঙ্গু করে রেখেছে সেগুলির মুক্তি ঘটিয়ে। এই হল বুর্জোয়া স্বপ্ন, একজন মানুষ একাই জগতের সমস্ত প্রক্রিয়াকে সৃষ্টি করছে এই স্বপ্ন। সে ফাউস্ট, হ্যামলেট, রবিসন ক্রুসো, স্যাটান এবং প্রফক, একাই সব কিছু।

বুর্জোয়ার এই "ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ" সামন্ত সমাজের বাধানিষেধগুলি বিলোপ কর র আয়োজন থেকে সৃষ্ট এবং তা উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক প্রচণ্ড ও অবিরাম করণকৌশলগত অগ্রগতি গড়ে তোলে। একইভাবে কাব্যের ক্ষেত্রেও তা এক প্রচণ্ড ও অবিরাম করণকৌশলগত অগ্রগতি গড়ে তোলে।

কিন্তু পুঁজিপতি ও কবি দুজনের মূর্তিই আরও অন্ধকারময় হয়ে ওঠে —প্রথমে ট্র্যাজিক, তারপর করুণার পাত্র এবং শেষ পর্যন্ত জঘন্য। পুঁজিপতি দেখতে পায় যে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদই, তার স্বাধীনতাই যুদ্ধের অন্ধবলপ্রয়োগ নৈরাজ্য, মন্দা ও বিপ্লব সব কিছু গড়ে তুলছে। উৎপাদন ক্ষমতায় যন্ত্র শেষ পর্যন্ত তাকেই ভয় দেখাচ্ছে। বাজারের অন্ধ আচরণ প্রকৃতির এক ভয়ঙ্কর শক্তি হয়ে ওঠে।

বাজারের মাধ্যমে পুঁজিপতি তার সঙ্গী পুঁজিপতিদের অবিরাম মজুরে পরিণত করছে অথবা তাকে ক্ষণস্থায়ী বিশেষ সুযোগসুবিধাভোগী "বেতনভুক কর্মচারীর" দলে ঠেলে দিচ্ছে। গতকালের কারিগর আজকের-কারখানা-শ্রমিক হয়ে যাচ্ছে, গত সপ্তাহে যে ছিল এক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের মালিক—আজ সে হয়ে উঠেছে কোনও বৃহৎ ট্রাস্টের বেতনভুক প্রশাসক : এই হল সেই নাটকীয় প্রক্রিয়া যার দ্বারা পুঁজিবাদ নিজের মধ্যে বিপ্লব ঘটায়। স্বাধীনতার জন্য বুর্জোয়া যে অবাধ বাজারের উপর নির্ভর করে সেই অবাধ বাজারের মাধ্যমেই সে এটা ঘটায়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও পরনির্ভরহীনতার এই গ্যারান্টি গড়ে তুলছে তার বিপরীত জিনিসটাই—ট্রাস্ট গঠন ও ফিনান্সপুঁজির উপর নির্ভর-শীলতা। ন্যায্য প্রতিযোগিতার এই স্বর্গোদ্যানে ন্যায্যতার বিপরীত

জিনিসটারই জন্ম দিচ্ছে : মূল্যহ্রাসের প্রতিযোগিতা, বুহ, কার্টেল, একচেটিয়া কারবার, "কর্ণারস" ও ভার্টিক্যাল ট্রাস্ট্‌স। এই সমস্ত অমঙ্গল বুর্জোয়াকে তার স্বাধীনতা থেকে দূরে নিক্ষেপ করছে কিন্তু সেই বুর্জোয়ার কাছেই মনে হয় সেগুলি প্রত্যক্ষ ও দমনমূলক সামাজিক সম্পর্ক—এবং সেগুলি প্রকৃতই তাই। সব সমস্যার জন্ত তার আদর্শ দাওয়াই হল অবাধ বাজার। অবাধ বাজারের বিপরীত এই কাণ্ডকারখানার বিরুদ্ধে সে তাই বিদ্রোহ করে। সেগুলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে সে তাই দাবি করে এক অবাধতর বাজার এবং তীব্রতর প্রতিযোগিতা; এটা সে বোঝে না যে এই কুফলগুলি যেহেতু অবাধ বাজারেরই সৃষ্টি সেইজন্ত তার স্বাধীনতার তীব্রতাবৃদ্ধির জন্ত দাবি করার অর্থই হল যে দাসত্বকে সে ঘৃণা করে সেই দাসত্বেরই তীব্রতাবৃদ্ধির জন্ত দাবি করা। ফলে যে চলনকে সে পছন্দ করে না সেই চলনকেই সে এগিয়ে নিয়ে যায়। এবং বুর্জোয়া হওয়াকে এড়াতে পারলে তবেই এই চলনকে সে এড়াতে পারে। বুর্জোয়া সর্বদাই স্বাধীনতার কথা বলে, কারণ সেই স্বাধীনতা কেবলই তার হাতের মুঠোর বাইরে চলে যাচ্ছে।

বুর্জোয়া কাজেও একই ধরনের বৃত্ত পরিক্রমণ করে। যে নিঃসঙ্গতা তার স্বাধীনতার শর্ত সেই নিঃসঙ্গতাকেই সে অসহ্য ও দমনমূলক বলে দেখতে পায়। পৃথিবী ও বিশ্বকে সে তার অভিজ্ঞতায় আরও বেশি বেশি করে বৈরীভাবাপন্ন এবং তার স্বাধীনতার পথে বাধা বলে দেখতে পায়। সামাজিক সব কিছুকে সে তার আত্মা থেকে দূর করে দেয় আর তার ফলে দেখে যে তার আত্মা গিয়েছে শীর্ণ হয়ে আর সে নিজে হয়ে পড়েছে নীচ, অন্তঃসারশূন্য এবং নিরাপত্তাহীন।

এটা ঘটল কি ভাবে? কেন সেটা ঘটল আমরা তখনই দেখতে পাব যদি বুর্জোয়া তার নিজের যে মূল্যায়ন করে সেইভাবে তাকে না দেখে আমরা যদি তার নিজের সম্পর্কে মূল্যায়ন যে অর্থনৈতিক চলনের প্রতিফলন, সেই অর্থনৈতিক চলনটিকে অনাবৃত করে দেখি। প্রত্যেক পর্যায়েই বুর্জোয়া দেখতে পায় যে, যে সামাজিক "বাধানিষেধগুলি"র সে বিলোপ ঘটিয়ে ছিল সেগুলি তার ফলে কেবল তীব্রতর হয়েই উঠেছে। অবাধ বাজারের জন্ত সে যে চেষ্টা করে তাতে উৎপাদনকারী এমন এক প্রতিযোগিতার ঝড়ের মধ্যে পড়ে যার একমাত্র পরিণতি হল সংযুক্তিকরণ [amalgamation]। সম্পত্তির উপর বুর্জোয়ার সরল অধিকারের অনুকূলে সে যে সামন্ততান্ত্রিক "জটিলতাগুলিকে" দমন করেছিল তার ফলেই দেখা দিয়েছে বুর্জোয়া চুক্তি আইনের যতকিছু

দুর্বোধ্য জটিলতা। সামন্তশাসন ও সামাজিক দমনের বিরুদ্ধে তার ঘৃণার ফলে দেখা দিয়েছে দৃঢ়-কেন্দ্রীভূত বুর্জোয়া রাষ্ট্র আর ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর যত রাজ্যের ছোটখাটো হস্তক্ষেপ—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবিরোধিতা সৃষ্টি করেছে। সমস্ত সামাজিক সম্পর্ককে ঝেঁটিয়ে বিদায় করাকে যে অর্থনীতির উদ্দেশ্য বলে মনে হয়েছিল সেই অর্থনীতি এমন এক অতীব জটিল সমাজ সৃষ্টি করেছে যা আগে কখনও দেখা যায়নি। তার স্বাধীনতার দাবি হল স্বাধীনতাকে নাকচ করে দেওয়া। সে এক "দর্পণ-বিপ্লবী" এবং যা আকাঙ্ক্ষা করে তার বিপরীতটাই সৃষ্ট হওয়ার ফলে ক্রমাগত সে সমাজে বিপ্লব ঘটায়।

এই স্ব-বিরোধী চলনটি পুঁজিবাদী উৎপাদনের মৌলিক নিয়মগুলির মধ্যে নিহিত আছে। এ হল সেই একই নিয়মের পরিণতি যে নিয়ম ডেকে আনে এক মূল্যহ্রাসের লড়াই, যাতে প্রত্যেক পুঁজিপতি অন্যকে ধ্বংস করতে বাধ্য এবং অন্য কিছু সে করতেও পারে না, কারণ সকলের চূড়ান্ত ধ্বংসকে বিলম্বিত করার অর্থ হল নিজের দ্রুত ধ্বংসকে সুনিশ্চিত করা। এই চলন প্রত্যেক শিল্পে স্থিরপুঁজির [constant capital] অবিরাম বৃদ্ধি ঘটায় যার ফলে সুদের হার কমতে থাকে এবং সেই পরিচিত পুঁজিবাদী সংকট সৃষ্টি করে যাকে কাটিয়ে ওঠার একটাই মাত্র উপায় আছে, আর তা হল দেশের সম্পদের একটা বড় অংশকে ধ্বংস করা। এই একই দ্বন্দ্ব পুঁজিবাদের সম্প্রসারণমূলক বিকাশ, তার নিজের বনিয়াদে অবিরাম বিপ্লব এবং দুনিয়ার সর্বত্র তার ব্যাকুল চাপও ঘটায়। এ সৃষ্টি করে চলে অবিরাম সংযুক্তিকরণ ও ট্রাস্টগঠন, যা স্থির পুঁজির অনুপাতকে বাড়িয়ে তুলে মুনাফার হারের পতনকেই কেবল দ্রুততর করে তোলে।

পুঁজিবাদী উৎপাদনের এই দ্বন্দ্ব, যা তার বিপ্লবী সম্প্রসারণ ঘটায়, তা তার বিপ্লবী পতনও ডেকে আনে। পুঁজিবাদের সম্প্রসারণমূলক ক্ষমতা যখন গোটা পৃথিবীকে নিজের করদরাজ্য করে তোলে তখন প্রতিদ্বন্দ্বী অগ্রসরমান কেন্দ্রগুলি পরস্পরের সঙ্গে গোপন বা প্রকাশ্য যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং তার ফলে যে কারণ-গুলির জন্য সম্প্রসারণ প্রয়োজন হয় পরস্পরের মধ্যে সেই কারণগুলিকেই কেবল তীব্রতর করে তোলে। উৎপাদিকা শক্তিগুলি উৎপাদন সম্পর্কের উপর চাপসৃষ্টি করতে থাকে। "অতি উৎপাদনের" চরম সংকট দেখা দেয়। মুনাফার হারের পতন, যা পুঁজিবাদের অভ্যন্তরীণ স্ব-বিরোধের অপরিহার্য পরিণতি, ব্যাপক বেকারি, দুনিয়াজোড়া সংকট, পুঁজিবাদী সম্প্রসারণের সাধারণ হ্রাসপ্রাপ্তি, যুদ্ধ এবং বিপ্লবের মধ্যে তা স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে।

আর এই শেষ চলনটি, যার মধ্যে বুর্জোয়া তার নিজের স্বাধীনতার সমস্তটাকেই প্রয়োজনের কাছে তার দাসত্বের শীলমোহর দ্বারা একটা বন্ধন হিসাবে দেখতে পায়, সেই শেষ চলনটি তার কাব্যেও প্রতিফলিত হয়, সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের কাব্যে তা প্রতিফলিত হয়।

সমস্ত প্রত্যক্ষ সামাজিক দমন পীড়ন—যা ছিল বুর্জোয়াদের প্রাধান্যের এবং সেই কারণে তার স্বাধীনতার শর্ত—তাকে ধ্বংস করাটাই হল শোষিত ও হৃতসম্পদ মানুষের দাসত্বের শর্ত; কারণ তা হল পুঁজির পরোক্ষ দমন পীড়নকে বজায় রাখার উপায় এবং সেই উদ্দেশ্যে দমনমূলক রাষ্ট্রযন্ত্রটিকে ব্যবহার করে। সেই কারণে পুঁজিবাদী বিকাশের পরবর্তী অংশে বুর্জোয়া শ্রেণী নিজের মুখোমুখি একটি শ্রেণীকে দাঁড়াতে দেখে যে-শ্রেণীর স্বাধীনতালাভের উপায় হল ট্রেডইউনিয়নের মধ্যে সংগঠিত হওয়া। ট্রেড ইউনিয়নগুলি অবাধ বাজারের কঠোরতাকে খর্ব করে। বুর্জোয়ার উপর দমনমূলক বাধানিষেধ আরোপ ক'রে তবেই এরা নিজেদের জন্য স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে। এই শ্রেণীটি হল মজুরি-শ্রমিক বা সর্বহারা শ্রেণী। প্রথমে চার্টিস্ট হিসাবে, পরে ট্রেড ইউনিয়নে নিজেদের সংগঠিত করে এবং শেষে এক সচেতন রাজনৈতিক পার্টির দ্বারা পরিচালিত হয়ে তারা পুঁজিপতিদের উপর দমনমূলক বাধানিষেধ আরোপ করে, যেমন ফ্যাক্টরি আইন, সামাজিক বীমা ইত্যাদি; এইগুলি হল সেই ধরনের স্বাধীনতার শর্ত যা বুর্জোয়া অর্থনীতির গণ্ডীর মধ্যে তারা পেতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক শ্রেণীর স্বাধীনতা অপর শ্রেণীর স্বাধীনতাহীনতা ঘটায়—এই দ্বন্দ্বটিই এখন অনাবৃত হয়ে চোখের সামনে হাজির হয়।

বুর্জোয়া উৎপাদন ব্যবস্থাই এই শ্রেণীর উপর সংগঠন গড়ে তোলার উপায়টি চাপিয়ে দেয়। বুর্জোয়া অর্থনীতি শ্রমিক শ্রেণীর মানুষকে শহরে এবং ফ্যাক্টরিতে এনে জড়ো করে দেয় এবং সহযোগিতার মধ্যে [co-operation] তাদের কাজ করতে বাধ্য করে। সামন্ততান্ত্রিক বাধানিষেধগুলি দূর করার প্রয়োজনে যখনই মানুষের সঙ্গে মৈত্রীস্থাপনের দরকার হয়েছে বুর্জোয়া শ্রেণী তখনই মানুষে মানুষে প্রতিযোগিতাকে সাময়িকভাবে মুলতুবি রেখেছে এবং মানুষে মানুষে সৌভ্রাতৃত্বের কাছে আবেদন জানিয়েছে; এবং এটা মজুরি-শ্রমিকদের একটা রাজনৈতিক শিক্ষা দিয়েছে এবং তাদের রাজনৈতিক পার্টি গড়ার দিকে নিয়ে গিয়েছে।

এই নতুন শ্রেণী নিজেকে একটা শাসক শ্রেণী হিসাবে পুরাপুরি কার্য-

নির্বাহী শ্রমিকদের সোভিয়েৎগুলির শক্তি সংগঠিত করায় যারা শেষ অবধি তার স্বাধীনতা আরম্ভ করে, এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর উপর ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা থেকে দায়মুক্ত করার শেষ "স্বাধীনতা" আরোপ করে, এবং বুর্জোয়া স্বাধীনতার ধারণা যে মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল সেই মিথ্যাকে এইভাবে উদ্ঘাটিত করে। কিন্তু বুর্জোয়াশ্রেণী লোপ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তাগুলির মধ্যে নিহিত দমনমূলক সম্পর্কের শেষটুকুও লোপ পায় এবং মানুষ এখন যথার্থ স্বাধীন হয়ে ওঠার পথে যাত্রা সুরু করতে পারে।

এই সর্বহারা বিপ্লব যে পরিস্থিতিতে সম্পন্ন হয় তাতে স্বাভাবিকভাবেই অনেক বুর্জোয়াকেই নির্মূল করা হয় এবং তাদের সর্বহারায় পরিণত করা হয়।

"সুতরাং পূর্ববর্তী এক যুগে যেমন অভিজাতদের একটি অংশ বুর্জোয়া শ্রেণীর দিকে চলে গিয়েছিল, ঠিক তেমনই বুর্জোয়াদের একটি অংশ, বিশেষতঃ বুর্জোয়া মতাদর্শীদের একটি অংশ এই ঐতিহাসিক গতিকে সামগ্রিক ও তত্ত্বগতভাবে উপলব্ধি করার স্তরে নিজেদের যারা উন্নীত করেছে তারা এখন যোগ দেয় শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে……এইভাবে তারা তাদের বর্তমান স্বার্থ নয়, তাদের ভবিষ্যৎ স্বার্থকে রক্ষা করে ; তাদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গিটাকে পরিত্যাগ করে সর্বহারা শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী তারা গ্রহণ করে।" দি কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো, (১৮৪৮), মস্কো সংস্করণ ১৯৫৫, পৃঃ ৭১-৭৩।

ভবিষ্যৎ স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য পুঁজিবাদের শেষ চলন কালে বুর্জোয়া মতাদর্শীদের এই দলত্যাগ ইংরেজি কাব্যেও প্রতিফলিত।

সেই কারণে পুঁজিবাদী কাব্যের মৌলিক চলনটিকে আমরা বুঝতে পারি না যতক্ষণ না আমরা এই কথাটা বুঝতে পারি যে, যে স্ব-বিরোধিতা বুর্জোয়া কাব্যের বিকাশকে এত দ্রুতবেগে এবং এত অস্থিরভাবে এগিয়ে নিয়ে যায় সেটা হল সেই স্ব-বিরোধিতারই মতাদর্শগত পরিপূরক অংশ যা পুঁজিবাদী অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান চলনকে সৃষ্টি করে এবং যা হল স্থিরপুঁজি বৃদ্ধির, মুনাফা-হারের হ্রাস ও পৌনঃপুনিক পুঁজিবাদী সংকটের কারণ। বাস্তব জীবনে বুর্জোয়া যে জিনিসের মুখোমুখি হয় স্বভাবতঃই তার আদর্শগত অভিজ্ঞতা সেই ছাঁচেই গড়ে ওঠে। বাস্তব সমাজের বোধ জগৎই শিল্পের বোধ জগৎকে পুষ্টি যোগায়, কারণ সেটা সেই সব উপাদান দিয়ে গড়া যা তার গঠন ও আবেগগত অনুষঙ্গগুলিকে সামাজিক ব্যবহার থেকেই পেয়েছে।

২

স্বাধীনতা বুর্জোয়ার কাছে প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতনতা নয়, তা হল প্রয়োজন সম্পর্কে অজ্ঞতা। সমাজকে সে হেঁটমুণ্ড করে ধরে। তার কাছে সহজ প্রবৃত্তিগুলি হল স্বাধীন আর সমাজ সর্বত্র সেগুলিকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছে। এটা কেবল যে সামন্ততান্ত্রিক বাধানিষেধগুলির বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহেরই প্রতিফলন তাই নয়, তা হল নিজের শর্তগুলির বিরুদ্ধেই পুঁজিবাদের অবিরাম বিরোধের প্রতিফলন; যা প্রতি পদক্ষেপে তাকে তার নিজের বনিয়াদে বিপ্লব ঘটানর দিকেই এগিয়ে নিয়ে যায় সেই শক্তিগুলির বিরুদ্ধেই পুঁজিবাদের অবিরাম বিরোধের প্রতিফলন।

বুর্জোয়া সেই লোক যে এমন এক সহজাত স্বতঃস্ফূর্ততায় বিশ্বাস করে যা মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাকে নিশ্চিত করে। সুড়সুড়ির মত প্রতিবর্তমূলক অনৈচ্ছিক ক্রিয়া বা ঘাড় ধরে ঝাঁকুনি দেওয়ার মত কোন দমনমূলক চরিত্রের আরোপিত-কর্মের বিপরীতে মানুষ যে পরিমাণে তার কর্মের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন সেই পরিমাণেই যে সে স্বাধীন, এটা সে দেখতে পায় না। উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়াটাই হল কারণ সম্পর্কে, অর্থাৎ প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন হওয়া। কিন্তু বুর্জোয়া এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, কারণ নির্বন্ধতা [determinism] তার কাছে স্বাধীন ইচ্ছার নঙর্থক ধারণা বলে [antithesis] মনে হয়।

নিজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়াই হল স্বাধীনভাবে ইচ্ছা করা—নিজের কর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হওয়া। সচেতন না হওয়ার অর্থ হল পশুর মত সহজ প্রবৃত্তির তাগিদে বা পিছন থেকে ধাক্কা খাওয়া মানুষের মত অন্ধভাবে কর্ম করা। এই সচেতনতা অন্তর্দর্শনের [introspection] সাহায্যে আয়ত্ব করা যায় না, তা আয়ত্ত করা যায় বাস্তবের সঙ্গে সংগ্রামের দ্বারা যা তার নিয়মগুলিকে অনাবৃত করে, এবং সেগুলিকে সচেতনভাবে ব্যবহার করার উপায়গুলিকে মানুষের সামনে এনে হাজির করে।

একে স্বীকার করে নিতে বুর্জোয়ার যে আপত্তি তা সমাজের প্রতি তার মনোভাবেও দেখা যায়, সমাজের মধ্যে সে নিজেকে স্বাধীন বলে তখনই মনে করে যদি প্রকাণ্ড সামাজিক কর্তব্যগুলি পালন করা থেকে—সামন্ততন্ত্রের বাধানিষেধগুলি থেকে সে মুক্ত থাকে, কিন্তু সেই সঙ্গে পুঁজিবাদী উৎপাদনের শর্তগুলিও চায় যে সে তার সঙ্গী মানুষদের সঙ্গে এক ক্রমবর্ধমান জটিল সম্পর্কাবলীর মধ্যে প্রবেশ করুক। এগুলি অবশ্য যোগান ও চাহিদার নিয়মাবলী

দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এক বিষয়গত বাজারের সঙ্গে সম্পর্ক হিসাবে দেখা দেয়। সেই কারণে এগুলির প্রকৃত চরিত্র সম্পর্কে যে অচেতন থাকে এবং সমাজের যে প্রকৃত নির্বন্ধতার কবলে সে থাকে, সমাজের সেই প্রকৃত নির্বন্ধতা সম্পর্কে সে অবহিত থাকে না। এই কারণেই সে স্বাধীনতাহীন। অন্ধশক্তির হাতে সে ধ্বংস হয়; সংকট, যুদ্ধ, মন্দা এবং "অন্যায্য" প্রতিযোগিতার সে অধীন। যদিও এগুলি সৃষ্টি করতে সে চায় না তবু তার কর্মই এই সব জিনিস সৃষ্টি করে।

বহির্বাস্তবের নিয়মগুলিকে—বিজ্ঞান যে নির্বন্ধতা বা প্রাণহীন প্রকৃতির যে প্রয়োজনীয়তাকে প্রকাশ করে তাকে মানুষ যতখানি বুঝতে পারে ততখানিই সে প্রকৃতির অধীনতামুক্ত; এর প্রমাণ যন্ত্র। এক্ষেত্রেও স্বাধীনতা হল প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতনতা। এই স্বাধীনতা, যা পূর্ববর্তী শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ছিল না, তা বুর্জোয়া লাভ করতে সক্ষম। কিন্তু এই স্বাধীনতা ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল নয়, তা নির্ভর করে সংঘবদ্ধ মানুষের উপর। যন্ত্র যত বিশদ হয়, তাকে চালানর জন্য প্রয়োজনীয় সংঘবদ্ধতাও তত বিশদ হয়। সুতরাং সমাজের মধ্যে সংঘবদ্ধ হওয়ার নিয়মগুলি সম্পর্কে সচেতন না হয়ে প্রকৃতির সম্পর্কে মানুষ প্রকৃত স্বাধীন হতে পারে না। আর যন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত স্বাধীন হওয়ার সম্ভাবনা যত বেশি বিকশিত হয়, ততই অজ্ঞানতার দাসত্ব সম্পর্কে তাকে আরও বেশি রূঢ়ভাবে মনে করিয়ে দেয়।

সমাজের প্রকৃতিকে—অর্থাৎ যে নির্বন্ধতা মানুষের সচেতনতা ও মানুষে মানুষে উৎপাদন সম্পর্কগুলির যোগসাধন করায়, তাকে—মানুষ যত বেশি বুঝতে পারে ততই ব্যক্তি হিসাবে নিজের উপর এবং প্রবৃত্তির উপর সমাজের প্রভাবকে একটা সামাজিক শক্তি হিসাবে সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কিন্তু বুর্জোয়া অর্থনীতির দাবিই হল এই যে সামাজিক সম্পর্কগুলি অবাধ বাজারের দ্বারা এবং পণ্য উৎপাদনের রূপগুলির দ্বারা আড়াল করা থাকুক, যাতে মানুষে মানুষে সম্পর্কগুলি দ্রব্য সামগ্রীর সঙ্গে সম্পর্কের ছদ্মবেশে থাকে। মানুষ অর্থ-নৈতিক উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করুক এবং নির্বন্ধতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠুক এর জন্য কোন দাবি হলেই বুর্জোয়া সেটাকে "স্বাধীনতার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ" বলে মনে করে। আর সেটা এই অর্থেই স্বাধীনতার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ যে সেটা সমাজে বুর্জোয়া হিসাবে তার পদমর্যাদার এবং তার বিশেষ সুবিধাভোগী অবস্থানের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে,—সমাজের উৎপন্ন সামগ্রীকে এবং সুতরাং সমাজের স্বাধীনতাকে একচেটিয়া দখলে রাখার বিশেষ সুযোগসুবিধার ব্যাপারে—হস্তক্ষেপ করে।

এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে স্বাধীনতা সম্পর্কে এবং সহজ প্রবৃত্তির প্রতি সমাজের ভূমিকা সম্পর্কে বুর্জোয়া বিভ্রমের মূল উৎস হল বুর্জোয়া অর্থনীতির মৌলিক দ্বন্দ্ব—উৎপাদনের সামাজিক উপায়গুলির বেসরকারী (অর্থাৎ, ব্যক্তিগত) মালিকানা। বুর্জোয়া যে মুহূর্তে তার সামাজিক সম্পর্কগুলির নির্বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে সেই মুহূর্তেই সে আর বুর্জোয়া থাকে না, কারণ চেতনা কোন নিছক ধ্যানচিন্তা নয়, তা হল এক সক্রিয় প্রক্রিয়ার সৃষ্টি। সামাজিক সম্পর্কগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তার পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলি থেকে তার সৃষ্টি, ঠিক যেমন প্রকৃতির নির্বদ্ধতা সম্পর্কে তার চেতনা হল প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সে যে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সেগুলিরই সৃষ্টি। কিন্তু মানুষ তার সামাজিক সম্পর্কগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার আগে সেই কাজ করার মত ক্ষমতা তাকে অর্জন করতে হয়—অর্থাৎ, সামাজিক সম্পর্কগুলি উৎপাদনের যে উপায়গুলির উপর নির্ভর করে তাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা। কিন্তু উৎপাদনের এই উপায়গুলি যদি কোন এক বিশেষ সুযোগ-সুবিধাভোগী শ্রেণীর ক্ষমতার অধীন হয় তাহলে একাজ সে করবে কি করে?

সামন্ত সমাজে বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বাধীনতার শর্ত হল সামন্ত শাসনের অস্তিত্বহীনতা। পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিকদের স্বাধীনতার শর্ত হল পুঁজিবাদী শাসনের অস্তিত্বহীনতা। একটা পুরাপুরি স্বাধীন সমাজের স্বাধীনতার শর্তও হল তাই—অর্থাৎ, শ্রেণীহীন সমাজ। একমাত্র সেই রকম এক সমাজেই সমস্ত মানুষ তাদের সংশ্লিষ্ট ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করে সামাজিক নির্বদ্ধতা সম্পর্কে তাদের চেতনাকে সক্রিয়ভাবে বিকশিত করতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আর নিজে বুর্জোয়া না থাকছে এবং ঐতিহাসিক চলনকে সামগ্রিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারছে ততক্ষণ পর্যন্ত সকলের জন্য স্বাধীনতার এই সংজ্ঞাকে বুর্জোয়ারা কখনই মেনে নিতে পারে না।

বুর্জোয়া সমাজ যত ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বাধীনতা যত বেশি বেশি করে সামগ্রিকভাবে সমাজের স্বাধীনতার বিরোধী হয়ে ওঠে মাত্র তখনই স্বাধীনতা সম্পর্কে বুর্জোয়া ধারণার মধ্যকার এই দ্বন্দ্বের প্রকৃতি তত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সামগ্রিকভাবে সমাজের স্বাধীনতা সেই সমাজের অর্থনৈতিক উৎপন্ন দিয়ে গঠিত। প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে মানুষ যে স্বাধীনতা অর্জন করেছে এই উৎপন্নগুলি তাকেই সূচিত করে। এই উৎপন্নগুলি যত সম্প্রসারিত হয় বুর্জোয়াই যে কেবল বুর্জোয়া অর্থনীতির কল্যাণে নিজেকে সেই অনুপাতে

স্বাধীন মনে করে তাই নয়, সমাজের বাকি অংশটিতে—সেও এই উৎপন্নগুলিই ভোগ করে—এই শর্তগুলিকে বিপ্লবী দিক থেকে চ্যালেঞ্জ করতে প্রস্তুত থাকে না। সেই অংশটা এগুলিকে—নিষ্ক্রিয়ভাবে—মেনেও নেয়। সুতরাং এই সব কিছু থেকে এটাই মনে হয় যে স্বাধীনতা সম্পর্কে বুর্জোয়া তত্ত্বটা বুঝি সঠিক। এই বিশেষ পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা সম্পর্কে বুর্জোয়া তত্ত্বটা সঠিক। এটা একটা বিভ্রম, একটা উদ্ভট বিভ্রম, যা এই পর্যায়ে প্রয়োগের মধ্য দিয়ে নিজেকে বাস্তব রূপ দেয়। সমাজের সম্পর্কগুলিকে অস্বীকার করে মানুষ স্বাধীনতা লাভ করছে, কারণ এগুলি ত সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক, যার মধ্যে বুর্জোয়া অর্থনীতির বিকাশ ঘটায় ফলে ইতোমধ্যেই সেগুলি অচল হয়ে পড়েছে।

"কিন্তু কোন শ্রেণীকে পীড়ন করতে হলে, তার জন্য এমন কিছু শর্তকে সুনিশ্চিত করতে হয় যাতে সে তার দাসসুলভ অস্তিত্বটুকু অন্ততঃ বজায় রাখতে পারে। ভূমিদাসত্বের যুগে ভূমিদাস নিজেকে কমিউনের সভ্যের পর্যায়ে উন্নীত করেছিল, ঠিক যেমন সামন্ততান্ত্রিক সর্বাত্মকবাদের [feudal absolutism] অধীনে পেটিবুর্জোয়ারা বুর্জোয়া স্তরে উন্নীত হতে সক্ষম হয়েছিল। পক্ষান্তরে, যন্ত্রশিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উপরের স্তরে উন্নীত হওয়ার পরিবর্তে আধুনিক কালের শ্রমিক নিজ শ্রেণীর অস্তিত্বের জন্য যে শর্তগুলি বর্তমান তারও নীচে আরও বেশি বেশি করে নেমে যায়। সে হয়ে পড়ে দুঃস্থ, আর দুঃস্থতা বেড়ে চলে জনসংখ্যা ও সম্পদবৃদ্ধির থেকে দ্রুততর গতিতে। আর এখানেই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ হয়ে যায় যে সমাজকে আর শাসন করার পক্ষে এবং নিজেদের অস্তিত্বের শর্তগুলিকে চূড়ান্ত আইন হিসাবে সমাজের উপর চাপিয়ে দিতে বুর্জোয়া শ্রেণী এখন অযোগ্য। এই শ্রেণী শাসন চালানর অনুপযুক্ত, কারণ দাসত্বের অবস্থার মধ্যে দাসের অস্তিত্ব সুনিশ্চিত করতে সে অক্ষম, কারণ দাসকে সে সেই অবস্থায় না নামিয়ে পারে না যেখানে দাসের দৌলতে নিজের পেট ভরানর বদলে এখন তাকেই দাসকে খাওয়াতে হয়। এই বুর্জোয়ার অধীনে সমাজ আর বেঁচে থাকতে পারেনা, অর্থাৎ অন্যভাবে বলতে গেলে, বুর্জোয়া শ্রেণীর অস্তিত্ব আর সমাজের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না।" দি কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো (১৮৪৮), মস্কো সংস্করণ, ১৯৫৫, পৃ ৭৫-৭৬।

অতএব, এই রকম সময়ে, স্বাধীনতার বুর্জোয়া সংজ্ঞাটির পরস্পর বিরোধী প্রকৃতিটি নিজেকে উদ্‌ঘাটিত করে, যেহেতু সমাজের অগ্রগতি বিষয়গতভাবে তাকে নিরর্থক করে দিয়েছে। সেই কারণে এটা এখন স্বাধীনতার সেই

সংজ্ঞাকে পথ ছেড়ে দেয় যে সংজ্ঞা অনুসারে স্বাধীনতা হল নির্বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতনতা, এবং যে সচেতনতা এবং সামাজিক সম্পর্কগুলির নির্ধারক কারণগুলিকে—উৎপাদিকা শক্তিগুলিকে—নিয়ন্ত্রণ করা মানুষের স্বাধীনতার শর্ত তা এখন দেখা যায়। কিন্তু এ দাবি ত বিপ্লবী দাবি—সমাজতন্ত্র ও সর্বহারার ক্ষমতার জন্ত দাবি, আর বুর্জোয়ারা স্বাধীনতাকে নঞর্থক করে দেওয়া বলে—এবং বুর্জোয়া হিসাবে প্রকৃতই সেটা তাই—সেটার বিরোধিতা করে। এখন সে গোটা সমাজের হয়ে কথা বলার চেষ্টা করে, কিন্তু সমাজের বেশির ভাগ অংশটির বিপ্লবী চলন তাকে এই অধিকার দিতে অস্বীকার করে।

এইভাবে স্বাধীনতা সম্পর্কে বুর্জোয়া বিভ্রম—যা স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে নির্বদ্ধতা ও সমাজের বিপরীতে স্থাপিত করে,—এই ঘটনাটা এড়িয়ে যায় যে সমাজ হল একটা যন্ত্র যার দ্বারা মানুষ, স্বাধীনতাহীন স্বতন্ত্র ব্যক্তি, সংঘবদ্ধ হয়ে তার স্বাধীনতাকে আয়ত্ত করে এবং এই ধরনের সংঘবদ্ধতার শর্তগুলিই হল স্বাধীনতার শর্ত। এই বিভ্রমটাই একটা বিশেষ শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সৃষ্টি এবং বুর্জোয়া শাসন যে বিশেষ সুযোগসুবিধার উপর নির্ভর করে এবং যতদিন সেই শাসন চলে ততদিন সমাজকে যা ভেঙে দুভাগ করে সেই বিশেষ সুযোগসুবিধারই সেটা একটা প্রতিফলন।

অন্যান্য শ্রেণীবিভক্ত সমাজেরও নিজ নিজ বিভ্রম থাকে। এইভাবে দাসমালিক সমাজ স্বাধীনতাকে দমনমূলক সম্পর্কগুলির অস্তিত্বহীনতার মধ্যে দেখে না, তাকে দেখে এক বিশেষ দমনমূলক সম্পর্কের মধ্যে; তাকে দেখে ইচ্ছার [will] দমনমূলক সম্পর্কের মধ্যে যেখানে প্রভু নির্দেশ দেন আর দাস সেটাকে অধিকার হিসাবে অন্ধের মত মেনে চলে। এই ধরনের সমাজে স্বাধীন হওয়ার অর্থ হল ইচ্ছা করা। কিন্তু শ্রেণীগুলির বিকাশ, যে চেতনা ইচ্ছাকে নির্দেশ দেয় সেই চেতনাকে বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন করে, যে বাস্তবের সঙ্গে দাসকে—যে অন্ধভাবে ইচ্ছাকে মেনে চলে—সক্রিয়ভাবে সংগ্রাম করতেই হয়। এই থেকে যে অর্থনৈতিক অবনতি ঘটে সেটা প্রয়োজন সম্পর্কে মানুষের ক্রমবর্ধমান অচেতনতার কারণে স্বাধীনতাহীনতার এক প্রতিফলন। সেই সঙ্গে চেতনার এবং সেই কারণে যে শ্রেণীর স্বাধীনতার বাহক হওয়ার কথা সেই শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান নিষ্ক্রিয়তার কারণে স্বাধীনতাহীনতারই এক প্রতিফলন। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সক্রিয় সংগ্রামের দ্বারা চেতনার সৃষ্টি হয় এবং একবার যদি সেই সংগ্রাম বন্ধ হয়ে যায় তাহলে অন্ধ আচারবাদের মধ্যে তা লোপ পেয়ে যায়।

স্বাধীনতার প্রকৃত রূপ হল এই যে তা পরিবেশের—মানুষের এবং সমাজের,

বা তাদের পারস্পরিক সংগ্রামের প্রকাশ তার—নির্বন্ধতা সম্পর্কে সচেতনতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। স্বাধীনতার এই প্রকৃত রূপ সম্পর্কে সজাগ হওয়াটা ধ্যানের ফল হিসাবে হয় না; ধ্যান চেতনার জন্ম দিতে পারে না, চেতনার জন্ম হয় সক্রিয় সংগ্রামের মধ্যে। স্বাধীনতার প্রকৃত রূপ সম্পর্কে এই সজাগ হওয়ার অর্থ হল, যে অন্ধ দমনমূলক সম্পর্কগুলি বা সমাজের মধ্যকার শোষণ চেতনার এই বিকাশকে বাধা দেয় সেই অন্ধ দমনমূলক সম্পর্কগুলিকে বিলোপ করার জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া। সেগুলিকে বিলুপ্ত করার অর্থ হল শ্রেণীগুলিকে বিলোপ করা এবং প্রকৃত স্বাধীন হওয়ার উপায়গুলি মানুষের হাতে দেওয়া: কিন্তু সেটা এই কারণেই মাত্র ঘটে যে পুঁজিবাদ তার নিজের কবর খননকারীর জন্ম দিয়েছে—অর্থাৎ সেই শ্রেণীর জন্ম দিয়েছে যে শ্রেণীর অস্তিত্বের শর্তগুলি তাকে কেবল যে বিদ্রোহ করার দিকে ঠেলে নিয়ে যায় এবং এক সফলকাম শাসন সম্ভবপর করে তোলে তাই নয়, সেই শ্রেণীর শাসন যে কেবল মাত্র যে অধিকারগুলি বিভিন্ন শ্রেণীর সৃষ্টি করতে পারে সেই অধিকারগুলির সবগুলিকেই নিশ্চিহ্ন করার উপরই মাত্র ভিত্তি করে গড়ে উঠতে পারে, এটাকে সুনিশ্চিত করে।

৩

এই বিভ্রম ধীরে ধীরে নিজের যে স্বরূপটিকে উদ্ঘাটিত করে সেটাই হল বুর্জোয়া স্বাধীনতার ইতিহাস। আমরা সেটাকে ম্যাকবেথের মত ট্র্যাজিক, ফলস্টাফের মত কমিক, পঞ্চম হেনরির মত প্রেরণাদায়ক বা টিমন অব এথেন্সের জগতের মত বিরক্তিকর হিসাবে দেখতে পেতে পারি—বুর্জোয়া বিভ্রমের এই সমস্ত দিকগুলিই তার বিকাশের মধ্যে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে অনুরূপ বিকাশ অনুযায়ী প্রতিফলিত হয়।

আমরা কি বলিনি যে ট্র্যাজেডি সর্বদাই প্রয়োজনের একটা সমস্যা? ঈদিপাসের কাছে ট্র্যাজেডি সেই ছদ্মবেশেই দেখা দেয় যার দ্বারা দাসমালিকের সমাজে স্বাধীনতা সুনিশ্চিত বলে মনে হয়—দৈব ইচ্ছার [Will] ছদ্মবেশে সমস্ত মানুষের ইচ্ছার উপর প্রভুত্ব বিস্তারকারী এক দৈব, ঊর্ধতন ইচ্ছার রূপ ধরে দেখা দেওয়া ভাগ্য দেবীর [Fate] ছদ্মবেশে দেখা দেয়।[১] ম্যাকবেথের কাছে ট্র্যাজেডি দেখা দেয় বুর্জোয়া স্বাধীনতার আবরণ গায়ে দিয়ে; অসংযত-

১। "যে দেবতার কাছে মানুষ প্রার্থনা করে তা বাধ্যবাধকতাই হোক বা অন্ধ ভাগ্যদেবীই হোক বা সকলের পিতা জিউসই হোক" (ইউরিপিডিস)

ভাবে উদ্ভূত মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাগুলি পরিস্থিতির দ্বারা প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে তারই উপর এবং এখন সেগুলি আগে যা ছিল তার বিপরীত হয়ে দেখা দেয়—ডাকিনীদের মজুরি পাওয়া ম্যাকবেথের ইচ্ছাগুলি এখন তাদের মূলধর্মেরই বিপরীত হিসাবে বিপ্রতীপ ইচ্ছা হয়ে আবার দেখা দেয়। বার্ণামের বন ডানসিনেনে এগিয়ে আসে আর স্ত্রীলোকের দ্বারা ভূমিষ্ঠ হয়নি এমন এক মানুষের হাতে ম্যাকবেথের মৃত্যু হয়।

সমস্ত বুর্জোয়া কাব্য হল পুঁজিবাদের বিকাশের পথে বুর্জোয়া অর্থনীতির মধ্যে প্রোথিত দ্বন্দ্ব যেমন যেমন দেখা দিতে থাকে সেই অনুযায়ী বুর্জোয়া বিভ্রমের চলনের প্রকাশ। অর্থনীতি অন্ধভাবে মানুষকে ছাঁচে ঢালাই করে না; অর্থনীতি হল তাদের কর্মের পরিণতি এবং তার চলনটি মানুষের প্রকৃতিকেই প্রতিফলিত করে। তাহলে কাব্য হল সংঘবদ্ধ মানুষের প্রকৃত মূলধর্মের একটা প্রকাশ এবং তার সত্যও সেখান থেকেই উদ্ভূত।

বুর্জোয়া বিভ্রমকে তাহলে একটা অলীক-কল্পনা বলে দেখা যাচ্ছে এবং সত্যের সঙ্গে তার সম্পর্কটা আদিম পুরাণের যেমন ছিল সেইরকম। যৌথ উৎসবে,—যেখানে কাব্যের জন্ম, কাব্যের অলীক জগৎ ফসলের পূর্বাভাষ দেয় এবং তার দ্বারা সে প্রকৃত ফসলকে সম্ভবপর করে তোলে। কিন্তু এই যৌথ অলীক-কল্পনার বিভ্রমটা ভাবী ফসলের নিছক একটা স্থূল অনুকরণ নয়: মানুষকে মানুষের সঙ্গে এবং ফসলের সঙ্গে একটা নির্দিষ্ট সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে, ফসলকে সম্ভবপর করে তুলতে হলে প্রকৃতির সঙ্গে এবং অন্যান্য মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ প্রবৃত্তিগুলিকে একটি নির্দিষ্টভাবে অভিযোজিত করতে হবে—এই ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আবেগগত ধাত্রের একটা প্রতিফলন হল এই বিভ্রম। যৌথ কাব্য বা উৎসব যদিও তা বাস্তব ভাবী ফসলের একটা অবিন্যস্ত প্রত্যক্ষ তবু, তা ফসল তোলার প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংঘবদ্ধ মানুষের সম্পর্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সহজ প্রবৃত্তিগত অভিযোজনগুলির এক সঠিক চিত্র। তা হল মানুষের হৃদয়ের এক প্রকৃত চিত্র।

একইভাবে বুর্জোয়া কাব্য তার সমস্ত বৈচিত্র্য ও জটিলতার মধ্যদিয়ে যে সামাজিক সম্পর্কগুলি স্বাধীনতার জন্ম দেয়—কারণ; আমরা আগেই দেখেছি যে, স্বাধীনতা হল সমাজের যে অর্থনৈতিক উৎপন্ন মানুষের আত্ম-সার্থকায়নকে [self-realisation] সুনিশ্চিত করে তারই এক নিছক অলীককল্পনামূলক ও কাব্যগত প্রকাশ—সেই সম্পর্কগুলির জন্য মানুষের পরস্পরের সঙ্গে এবং প্রকৃতির সঙ্গে যে সব সহজপ্রবৃত্তিগত অভিযোজনের প্রয়োজন সেগুলিকে তা প্রতিফলিত

করে। এই অর্থনৈতিক উৎপন্নের মধ্যে আমরা অবশ্যই কেবলমাত্র সমাজের বাণিজ্যিক বা বিক্রয়যোগ্য উৎপন্নগুলিকেই অন্তর্ভুক্ত করি না, মানুষের চেতনাগুলি সমেত সাংস্কৃতিক ও আবেগগত উৎপন্নগুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করি। অতএব বুর্জোয়া কাব্যে প্রকাশিত স্বাধীনতা সম্পর্কে এই বুর্জোয়া বিভ্রমের একটা যেহেতু বাস্তবতা থাকে, তার অস্তিত্বের দ্বারা সে স্বাধীনতার জন্ম দেয়—এটা কোনও প্রথাগত অর্থে আমি বলছি না। আমি বলতে চাই যে আদিম কাব্য যেমন যে বস্তুগত ফসল উৎপন্ন করে এবং যা হল আদিম মানুষের স্বাধীনতার উপায়, তার মধ্যেই তার যুক্তির ন্যায্যতা, তেমনি সমাজের যে বস্তুগত উৎপন্ন তার চলনের মধ্যে বুর্জোয়া কাব্যকে সৃষ্টি করে, সেখানেই তার যুক্তির ন্যায্যতা। কিন্তু এই স্বাধীনতা সমস্ত সমাজের স্বাধীনতা নয়, এ স্বাধীনতা হল যে বুর্জোয়া শ্রেণী সমাজের উৎপন্নের বেশির ভাগ অংশটাই আত্মসাৎ করে সেই বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বাধীনতা।

কারণ স্বাধীনতা একটা অবস্থা নয়, তা হল প্রকৃতির সঙ্গে এক বিশিষ্ট সংগ্রাম। স্বাধীনতা সর্বদাই আপেক্ষিক, সংগ্রামের সাফল্যের সঙ্গে আপেক্ষিক। স্বাধীনতার প্রকৃতি সম্পর্কে চেতনা একটা তত্ত্ববিদ্যামূলক সমস্যার নিছক ধ্যান নয়, তা হল সমাজের একটা বিশেষ অবস্থায় মানুষের মত বেঁচে থাকার এবং ব্যবহার করাটাই। চেতনার প্রতিটি পর্যায়কে সুনির্দিষ্টভাবে জয় করতে হয়; সামাজিক চলন—যে চলনকে আমরা বলি শ্রম, কেবল এটাকে একটা সজীব ব্যাপার হিসাবে টিকিয়ে রাখে মাত্র। প্রথমে এক বিজয়সূচক সত্য হিসাবে (পুঁজিবাদের বিকাশ ও ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধি), তার পরে ধীরে ধীরে প্রকাশিত এক মিথ্যা হিসাবে (পুঁজিবাদের অবনতি ও চূড়ান্ত সংকট) এবং শেষ পর্যন্ত নিজের বিপরীত জিনিস হয়ে ওঠায় সামাজিক প্রয়োজন সম্পর্কে জীবন দিয়ে লাভ করা চেতনা হিসাবে (সর্বহারা বিপ্লব) স্বাধীনতা সম্পর্কে বুর্জোয়া বিভ্রমের প্রকাশ হতে থাকাটা মানুষ, সামগ্রী, আবেগ ও মতাদর্শের এক অতিকায় চলন। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শ্রম করা, শিক্ষালাভ করতে থাকা এক যন্ত্রণাভোগকারী এবং আশাবাদী মানুষের সমগ্র ইতিহাস এটা। বুর্জোয়া কাব্য যে এত উজ্জ্বল, সূক্ষ্ম, জটিল ও বহুমুখী সেটা হতে পেরেছে এই চলনের বিস্তার, প্রাণশক্তি ও বস্তুগত জটিলতার কারণে। বুর্জোয়া বিভ্রম, যা বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে স্বাধীনতারও শর্ত, তা তাদের নিজেদের কাব্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। যেহেতু বুর্জোয়া কবিরা বুর্জোয়া শ্রেণীর বাকি অংশেরই মত তার সমস্ত বিজয়সূচক আবেগ, তার ট্র্যাজেডি, তার বিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং

তার আত্মিক বীজগানসহ নিজেদের জীবনেই সেটা আয়ত্ত করে। এবং সামাজিক প্রয়োজন সম্পর্কে চেতনা, যা হল শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজে সামগ্রিকভাবে সমস্ত মানুষের স্বাধীনতার শর্ত, তা সাম্যবাদী কাব্যে আয়ত্ত হবে। কারণ একটা তত্ত্ববিজ্ঞামূলক কর্মূলা হিসাবে নয়, তার মূলধর্মের দিক থেকে তাকে আয়ত্ত করা যাবে এমন এক বিকাশমান সাম্যবাদী সমাজে, কবি এবং কাব্যের পাঠক হিসাবে বাঁচাও যে সমাজের অন্তর্ভুক্ত—সেই সাম্যবাদী সমাজে মানুষ হিসাবে বেঁচে থেকে।

৪

বুর্জোয়া মানুষের সহজপ্রবৃত্তিকে --তার বাসনা ও লক্ষ্যের উৎস "হৃদয়কে" স্বাধীনতার উৎস হিসাবে দেখে। এটা মিথ্যা, যেহেতু সহজপ্রবৃত্তিগুলি যখন অনভিযোজিত তখন সেগুলি অন্ধ ও স্বাধীনতাহীন। কিন্তু সমাজের সম্পর্কগুলি দ্বারা যখন সেগুলি অভিযোজিত হয় তখন সেগুলি আবেগের জন্ম দেয় এবং এই অভিযোজনগুলি,—আবেগগুলি যার প্রকাশ ও যার দর্পণ,—হল সেই উপায় যার সাহায্যে মানুষের সহজপ্রবৃত্তিগত শক্তিকে (energy) সমাজের যন্ত্রটিকে চালনা করার জন্য ভিন্ন পথে চালিত করে দেওয়া হয়: সমাজের যন্ত্রটি চলছেই এবং মানুষকে, স্বতন্ত্র সহজপ্রবৃত্তিধর্মী মানুষ হিসাবে নয়, সংঘবদ্ধ অভিযোজিত মানুষ হিসাবে মানুষকে, প্রকৃতির মুখোমুখি দাঁড়াতে এবং তার সঙ্গে সংগ্রাম করতে সক্ষম করে। এইভাবে যে চলনটি মানুষের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে, সহজপ্রবৃত্তির সঙ্গে স্বাধীনতা ও সমাজের সম্পর্ক সংক্রান্ত এই বিভ্রম এবং এই সত্য বুর্জোয়া কাব্যের মধ্যে আপন স্বরূপকে প্রকাশিত করে এবং বুর্জোয়া কাব্যের গোপন শক্তি ও নিগূঢ় জীবন এইগুলি দিয়েই গঠিত। অর্থাৎ, এই বুর্জোয়া বিভ্রমের মূলধর্ম "ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ" বা "স্বাভাবিক মানুষ" সংক্রান্ত এক বিশেষ বিশ্বাস, যা আবার বুর্জোয়া অর্থনৈতিক শর্তগুলি থেকেই উদ্ভূত—একথা জানার পর বুর্জোয়া কবি হয়ে ওঠেন এক নিঃসঙ্গ মানুষ যিনি আপাতঃ দৃষ্টিতে সমাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজের মধ্যে মগ্ন হয়েছেন এবং সেই কাজ করার ফলে সমকালীন সমাজের মূলগত সম্পর্কগুলিকে আরও দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করে থাকেন। এই ব্যাপার দেখে আমরা আর বিস্মিত হতে পারি না। বুর্জোয়া কাব্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, কারণ তা সেই যুগের যৌথ আবেগকে প্রকাশ করে থাকে।

আমরা দেখেছি যে সমস্ত সাহিত্যধর্মী শিল্পই পুরাণ থেকে রূপান্তরিত হওয়ার মধ্য দিয়ে প্রথমে দেখা দিয়েছিল, যাতে কাব্য নিজেকে পুরাণ থেকে পৃথক

করে তুলেছিল—এবং সমস্ত সাহিত্যেরই মূল স্বাধীনতার মধ্যে নিহিত এবং তা সমাজের স্বতঃস্ফূর্ততার প্রকাশ, এর ভিত্তি আবার সমাজের বস্তুগত উৎপন্নের উপর স্থাপিত এবং সংঘবদ্ধ মানুষের কাছ থেকে এই বস্তুগত উৎপন্নগুলি যে আবেগগত সম্পর্ক দাবি করে তারই এক ধরনের ছাঁচ। শিল্প যেহেতু স্বাধীনতার প্রকাশ, সেই কারণে উন্নত ধরনের শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শিল্প হল শাসক শ্রেণীর বিভ্রমের প্রকাশ; গোটা সমাজের বিভ্রমের নয়, কেবলমাত্র শাসকশ্রেণীর বিভ্রমের প্রকাশ। বুর্জোয়া বিভ্রমের বিকাশের পথে সাহিত্য আবার কাব্য থেকে কাহিনীকে পৃথক করে দেয়। কাব্য—যা হল তরুণতর, আরও বেশি আদিম, আবেগগতভাবে আরও বেশি সরাসরি—সেই কারণে পুঁজিবাদী সংস্কৃতিতে সহজপ্রবৃত্তি থেকে আঘাত দিয়ে সমাজের সম্পর্কগুলি যারা আবেগগত প্রতিক্রিয়ার শর্তগুলির আকারে বেরিয়ে আসা আবেগগুলির সঙ্গে—চকমকি ঠুকে যেমন স্ফুলিংগ বেরোয় সেইরকমভাবে সংশ্লিষ্ট। এটা বুর্জোয়া বিভ্রমের সেই অংশটিকে প্রকাশ করে যে অংশটি ব্যক্তি মানুষের হৃদয় এবং অনুভূতিকে স্বাধীনতার, জীবনের ও বাস্তবের উৎস হিসাবে দেখে, যেহেতু সমাজের স্বাধীনতা সামগ্রিকভাবে শেষ অবধি সেই সব সহজপ্রবৃত্তিগুলির চালিকাশক্তির উপর নির্ভর করে যেগুলির প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামের ফলে সমাজের সৃষ্টি হয়। যেহেতু একে ভাষার যৌথ জগৎকে ব্যবহার করতে হয় সেই কারণে সমাজের গোটা আবেগগত জীবনটাকে সমস্ত লোকের কাছে সাধারণ এক অতিকায় "অহং"কে "I" একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করতে হয় এবং সমস্ত মানুষকে এক নিরতিশয় আগ্রহযুক্ত অভিজ্ঞতা দান করে।

কাহিনী নেয় নক্সী পর্দার [tapestry] বিপরীত দিকটাকে এবং সহজ-প্রবৃত্তিগুলি যেভাবে সমাজে একজন অভিযোজিত স্বতন্ত্র ব্যক্তির মধ্যে আবির্ভূত হতে থাকে সেইভাবে তাকে প্রকাশ করে। এই ক্ষেত্রে বুর্জোয়া সমাজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ মানুষ যেখানে একটি সাধারণ অভিজ্ঞতার মধ্যে বিমূর্ত হয়ে ওঠে এমনভাবে মানুষ সম্পর্কে আগ্রহ হিসাবে নয়, বরং চরিত্র হিসাবে, এক বাস্তব জগতে বসবাসকারী সামাজিক জাতিরূপ বা টাইপ হিসাবে মানুষ সম্পর্কে আগ্রহ আকারে প্রকাশ পায়। বুর্জোয়া বিভ্রম কিভাবে এই স্ব-বিরোধ কবিতার মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে তা: নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করতে পারলে আমরা বুঝতে পারব।

(ক) বিভিন্ন প্রতিনিধিস্থানীয় কবির মধ্যে, বিভিন্ন কবিগোষ্ঠী ও কাব্য প্রবণতার মধ্যে ইংরেজি কাব্যের বিকাশ

(খ) কাব্যের করণকৌশল

(গ) সামগ্রিকভাবে তাহার সঙ্গে কাব্যের সম্পর্ক

(ঘ) পরিবেশের উপর কবির নিজের জীবনের প্রভাবের প্রকৃতি এবং

(ঙ) যে বিশেষভাবে এই প্রকার কবিতার জন্ম দেয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইংরেজ কবিকুল

১। প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয়ের যুগ

১

পুঁজিবাদের অস্তিত্বের জন্য দুটি শর্ত থাকা প্রয়োজন—প্রচুর পরিমাণ পুঁজি এবং "স্বাধীন" -অর্থাৎ বিত্তহীন—মজুরি শ্রমিক। একবার যখন তার চলন শুরু হয় তখন পুঁজিবাদ তার আরও বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তগুলি সৃষ্টি করে নেয়। সঞ্চয়ের সাহায্যে স্থির-পুঁজির পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং সংযুক্তিকরণের সাহায্যে সেগুলির যোগ হতে থাকে এবং এই সংযুক্তিকরণ কারিগর ও অন্যান্য পেটিবুর্জোয়াকে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিত্তহীন করে তোলার দ্বারা মজুরি শ্রমিকের প্রয়োজনীয় যোগান সৃষ্টি করে।

এই শর্তগুলি অর্জন করার আগে সেইকারণে প্রাথমিক সঞ্চয়ের একটা যুগের প্রয়োজন। এই প্রাথমিক সঞ্চয় স্বাভাবিকভাবেই হিংসাত্মক ও বল-প্রয়োগের মধ্য দিয়ে হতে বাধ্য, কারণ, বুর্জোয়া শ্রেণী তখনও শাসক শ্রেণী হয়ে ওঠে নি, তার নিজের সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তগুলি তখনও গড়ে তুলতে পারেনি: রাষ্ট্র তখনও বুর্জোয়া রাষ্ট্র হয়ে ওঠে নি।

এই আমলে ইংলণ্ডে বুর্জোয়া শ্রেণী এবং অভিজাতদের যে অংশটি বুর্জোয়াদের পক্ষে চলে গিয়েছিল তারা গির্জার জমি ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছিল এবং সাধারণের ব্যবহারের জমিকে [common land] ঘিরে নিয়ে দখল করে, মঠগুলিকে বন্ধ করে দিয়ে, মেষপালনের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে এবং সামন্ত প্রভুদের ও তাদের অধীন ব্যক্তিদের শেষ পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে বিত্তহীন ভবঘুরের এক বিরাট বাহিনী গড়ে তুলেছিল। সদ্য আবিষ্কৃত আমেরিকা থেকে লুঠ করা সোনা ও রূপা পুঁজিবাদের ভিত্তি গড়ে তুলতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। পুঁজিবাদের এই গতি যে সম্ভবপর হয়েছিল তার কারণ সামন্ত অভিজাতদের সঙ্গে লড়াইয়ে রাজতন্ত্র বুর্জোয়া শ্রেণীর উপর নির্ভর করেছিল এবং তাদের সমর্থনের বিনিময়ে তাদের পুরস্কৃতও করেছিল। টিউডর রাজারা ছিলেন স্বৈরতন্ত্রী; বুর্জোয়া শ্রেণী এবং বুর্জোয়া-হয়ে-ওঠা অভিজাতদের সঙ্গে তাঁরা মৈত্রী স্থাপন করেছিলেন।

প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয়ের এই আমলে বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশের জন্য

প্রয়োজনীয় শর্তগুলি বেআইনীভাবে গড়ে তোলা হয়। প্রত্যেক বুর্জোয়ারই মনে হয় যে তার সহজ প্রবৃত্তিগুলি—তার "স্বাধীনতা"—যেন আইন, অধিকার, ও তার বাধানিষেধগুলি দ্বারা, অসহনীয়ভাবে সংকুচিত হচ্ছে এবং কেবলমাত্র তার বাসনাগুলির প্রচণ্ড সম্প্রসারণের দ্বারাই সৌন্দর্য ও জীবনকে আয়ত্ত করা যাবে।

এই প্রাথমিক পুঁজিসঞ্চয়ের যুগের মনোভাব হল রীতিনীতি বা মাত্রাহীন "রক্তপিপাসু, বেপরোয়া ও দৃঢ়চিত্ত" এক অসংযত ইচ্ছা। সেই কারণে এলিজাবেথীয় যুগে জীবনের নীতিই হল অন্য সকলের ইচ্ছার উপরে নিরঙ্কুশ ব্যক্তিইচ্ছার একাধিপত্য। মার্লোর ফাউস্ট এবং টেম্বারলেন এই নীতির সরলতম রূপটিকে প্রকাশ করে।

এই জীবন-নীতি রেনেসাঁস যুগের "যুবরাজের" মধ্যে তার সর্বোচ্চ রূপ পেয়েছে। ইতালি ও ইংলণ্ডে—এই কালে তারাই ছিল প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয়—জীবন তার সব থেকে তীব্র প্রান্তের পর্যায়ে পৌঁছেছে যুবরাজের অনপেক্ষ ইচ্ছার মধ্যে। এই যুবরাজের মূর্তি বুর্জোয়া বিপ্লবকে সব থেকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে; ঠিক যেমন বাস্তব সমাজে যুবরাজ হলেন বুর্জোয়া সম্প্রসারণের জন্য উপযোগী শর্তগুলিকে অর্জন করার অবশ্য প্রয়োজনীয় উপায়। সামন্ততন্ত্রের ছাঁচগুলিকে ভেঙে ফেলার এবং সেগুলি থেকে পুঁজি নিংড়ে বার করার জন্য নিরঙ্কুশ রাজার [absolute monarch] শক্তি ও নির্মমতার প্রয়োজন। তার ইচ্ছার স্বর্গীয় জ্যোতি প্রকাশের জন্য কোন সুপ্রতিষ্ঠিত বিধিনিষেধের আশ্রয় নেওয়া ভুল হবে। কারণ, এইধরনের বিধিনিষেধ সুপ্রতিষ্ঠিত এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত হওয়ার কারণে তা একমাত্র সামন্ততান্ত্রিকই হতে পারে এবং সেই কারণে তা বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশকে অগ্রসর হতে দিত না।

এলিজাবেথীয় কাব্য তার সমস্ত ঐশ্বর্য ও বিদ্রোহ সহ এই যুবরাজের ইচ্ছার, অনপেক্ষ বুর্জোয়া ইচ্ছার বাণীরূপ; যে বুর্জোয়ার ইচ্ছার ধর্মই হল সমস্ত প্রচলিত প্রথাকে ভেঙে ফেলা এবং নিজের অভীষ্ট সিদ্ধ করা। সেই কারণেই সেক্সপীয়রের সমস্ত নায়কই হলেন যুবরাজোচিত; সে কারণে এই কালে মানুষের আচরণের আদর্শ হল রাজকীয়তা।

বুর্জোয়া পরিবারের সন্তান মার্লো, চ্যাপম্যান, গ্রীণ এবং সর্বোপরি সেক্সপীয়র এই যুগের যুবরাজোচিত বুর্জোয়া ইচ্ছার কাঠিন্য বেগকে তার সমস্ত তেজ ও বেপরোয়াভাব সমেত যথাযথভাবে প্রকাশ করেছেন। নীরব,

হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, অ্যান্টনি, ট্রয়লাস, ওথেলো, রোমিও ও কোরিয়োলেনাস প্রত্যেকের তাদের ভিন্ন ভিন্ন নিজস্ব পথে সে নিজে যা তাই হয়ে উঠতে, নিজেকে শেষ বিন্দু পর্যন্ত সার্থক করতে, আত্মার গৌরবকে বিস্তৃততম ও সুন্দরতম রূপে প্রকাশ করতে পারা ছাড়া আর অন্য কোন দায় নেই। শিভালরির যুগ নিজেকে যেভাবে দেখত এখন আর তাকে সেভাবে দেখা গেল না। এখন তাকে দেখা গেল মর্যাদালুপ্ত ও অপমানিত রূপে, বুর্জোয়া শ্রেণী তাকে যেভাবে দেখতে চায় সেইভাবে—হটস্পার, ফলস্টাফ এবং আর্মাডোর মধ্যে—ডন কুইকজোটের ইংরেজ সংস্করণ হিসাবে।

এমনকি ঘৃণ্যতম চরিত্র, অন্তঃসারশূন্য, মর্যাদাচ্যুত, আত্মশ্লাঘাপূর্ণ প্যারোলেস পর্যন্ত এই সীমাহীন আত্ম-সার্থকায়নকে তার হৃদয়ের উপর অস্তিত্বের নিয়ম বলে এবং তার চরিত্রের এক ধরনের যৌক্তিকতা বলে উপলব্ধি করে :

Simply to be the thing I am
Shall make me live

এই অসংযত আত্ম-সার্থকায়ন [self-realisation] যার সাহায্যে তারা তাদের অভ্যন্তরীণ কল্পিত-চিত্রধারা [phantasmagoria] দিয়ে সমগ্র জগৎকে সম্প্রসারিত ও পূর্ণ করে তোলে তার মধ্যেই শেকসপীয়রের নায়কদের তাৎপর্য নিহিত। মৃত্যুও তাদের আত্ম-সার্থকায়নের পরিসমাপ্তি ঘটায় না, মৃত্যুতেই তারা সব থেকে বেশি মূলগতভাবে স্বকীয় হয়ে ওঠে—লীয়র, হ্যামলেট, ক্লিওপ্যাট্রা ও ম্যাকবেথ-এর ক্ষেত্রেও তাদের মৃত্যুর রহস্য এবং ট্র্যাজেডির সমাধান দুই-ই রয়েছে।

যে গভীরতা নিয়ে শেকসপীয়র বুর্জোয়া বিপ্লবের মধ্যে চলাফেরা করেছেন, মানব সমাজ সম্পর্কে তার উপলব্ধির যে মহত্ব তা প্রকাশ পায় এই ঘটনার মধ্যেই যে তিনি শেষ পর্যন্ত একজন ট্র্যাজেডিয়ান। মানুষের ব্যক্তিসত্তার এই অবাধ বাস্তব রূপায়ন তাঁর কাছে অপরিহার্যতার [Necessity সমপরিমাণ অবাধ লীলার সঙ্গে জড়িত। পুঁজিবাদের পরিচালিকাশক্তির যে দ্বন্দ্ব তা শেকসপীয়রের ট্র্যাজেডিগুলিতে বারে বারে প্রকাশ পেয়েছে। ম্যাকবেথ নাটকে নায়কের অভিলাষ পূর্ণ হয়েছে—কিন্তু পূর্ণ হয়েছে বিপ্রতীপভাবে। কিং-লীয়র নাটকে নায়ক নিজেকে ধ্বংস করে তার মেয়েদের ইচ্ছার সমষ্টিগত অসংযত প্রকাশের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এবং প্রকৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, যার অপরিহার্যতা এক ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। ঝঞ্ঝার প্রতীকটির

ক্ষমতা এই কারণে যে, বিদ্যুৎঝঞ্ঝার সময় প্রকৃতি কোন অবোধ যন্ত্রের মত আচরণ করে না, বিচারণের অতীত এক প্রচণ্ড আবেগের বশবর্তী হলে মানুষ যেভাবে আচরণ করে প্রকৃতি তখন সেইরকম আচরণ করে। ওথেলো নাটকে মানুষের প্রেম তার নিজের মধ্যে সর্বোত্তম যে অংশটি আছে তাকে অর্জন করে, কিন্তু সেই অর্জন করার অবাধ লীলায় "যে জিনিসকে সে ভালোবাসে সেটাকেই সে হত্যা করে বসে।" ম্যাকবেথ নাটকে অপরিমিত ইচ্ছার দ্বন্দ্বের সম্ভাবনাকে অন্য এক রূপে তুলে ধরা হয়েছে—একজন মানুষের ইচ্ছা এখানে নিজের বিরুদ্ধে বিভক্ত এবং সেই কারণে যদিও "বাহ্যিক" কোনও কিছু তার বিরোধিতা করতে পারে না বা তাকে প্রতিফলিত করতে পারে না, তা সত্ত্বেও নিজের সঙ্গে সে সংগ্রাম করতে পারে এবং ধ্বংস হতে পারে। একটিমাত্র ইচ্ছার এই "দ্বি"ভাব যথোপযুক্ত ভাবে প্রতীকায়িত হয়েছে 'বিষ মাখানো তরবারি ও পানপাত্রের সাহায্যে, যার মধ্যে একটি উদ্দেশ্যকেই দেখান হয়েছে যেন সেটা দু-মুখো এইভাবে এবং তারা বিপরীত উদ্দেশ্য সাধিত করে। এ্যান্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপ্যাট্রা এবং রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট নাটকে সবলতম ও প্রচণ্ডতম সহজ প্রবৃত্তির তৃপ্তিসাধন করতে হলে সীমাহীনভাবে এবং নিঃশঙ্ক-ভাবে ভালোবাসতে হবে, আর এই ভালোবাসা প্রেমিকদের ধ্বংসকেই সুনিশ্চিত করে। এই প্রেমিকরা দেশপ্রেম, পারিবারিক আনুগত্য, যুক্তি ও স্বার্থ সব কিছুকে নিদারুণ অবজ্ঞা করে কিন্তু তারা সমর্থনযোগ্য শুধু এই কারণেই যে তাদের ভালোবাসার কোনও সীমা-পরিসীমা নেই। এই ধরনের মৃত্যু হল ট্র্যাজিক, কারণ এই যুগে অসংযত আত্মসার্থকায়ন বীরত্বব্যঞ্জক, এটা হল ইতিহাসের জীবন-ধর্ম। আমরা অনুভব করি যে মৃত্যুটা প্রয়োজনীয় এবং যা হওয়া উচিত তাই হয়েছে : 'এখানে কান্নার যোগ্য কিছু নেই' ["Nothing is here for tears"]।

এই পর্যায়ে বুর্জোয়ার শক্তি ও তেজ নির্ভর করে রাজতন্ত্রের নেতৃত্বাধীন একটি শ্রেণী হিসাবে তার সংসক্তির [cohesion] উপর। অনেকাংশে একটি স্বয়ং-অস্ত্রসজ্জিত, স্বয়ং-সক্রিয় কমিউন রূপে ইংলণ্ডে বুর্জোয়া শ্রেণী ইতোমধ্যেই রাজসভাকে তার মুখপাত্র হিসাবে পেয়েছে। রাজসভা হল অগ্রগতির পীঠস্থান, এবং তার যৌথ জনজীবন আপাততঃ বুর্জোয়া অগ্রগতির উৎস এবং প্রাথমিক পুঁজিসঞ্চয়ের উৎসধারা। রাজসভা নিজে বুর্জোয়া নয় : সামন্ত-তান্ত্রিক স্বৈরাচারীর মত সে নিজের ইচ্ছাকে বলপ্রয়োগের সাহায্যে চাপিয়ে দিতে চায়, কিন্তু সেটা সে পারে একমাত্র নিজেকে বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে

মৈত্রীবদ্ধ করে। বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে রাজার 'নিরঙ্কুশ ক্ষমতা" যদিও তা মূলতঃ সামন্ততান্ত্রিক তাহলেও পরিণামে বুর্জোয়াধর্মী, কারন সেটা বুর্জোয়াদের বিকাশের শর্তগুলিকে গড়ে তুলেছে।

সেইকারণে শেকসপীয়র যদিও বুর্জোয়া বিভ্রমকেই প্রকাশ করেছেন তবু তাঁকে আমরা রাজসভার বা বুর্জোয়া অভিজাতদের মুখপাত্র হিসাবে দেখতে পাই। অভিনেতারা ছিলেন "রাণীর ভৃত্য"। শেকসপীয়র বুর্জোয়া বাজার বা "জনসাধারণের" জন্য উৎপাদনকারী নন। তাঁর একটা সামন্ত মর্যাদা আছে। সেইকারণে তাঁর শিল্প রূপের দিক থেকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী নয়: ত তখনও যৌথ। রাজসভার যৌথজীবনের প্রতিফলন তার মধ্যে রয়েছে। অভিনেতা ও নাট্যকার হিসাবে তিনি তাঁর দর্শকদের সঙ্গে জনজীবনের একই আবেগের জগতে বাস করতেন। সেইকারণেই এলিজাবেথীয় যুগের কাব্যের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ হল—নাটক—প্রকৃত অভিনীত নাটক। রাজতন্ত্রের সঙ্গে বুর্জোয়া শ্রেণীর মৈত্রীর কারণে সেই নাটক তখনও সামাজিক এবং জনজীবনভিত্তিক। তবু তা বুর্জোয়া শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতে পারে।

এলিজাবেথীয় কাব্যে একটা কাহিনী থাকে অর্থনৈতিক কাজকর্মের মধ্য দিয়ে মানুষের ব্যক্তিসত্তা যেভাবে নিজেকে সার্থক করে কাহিনীর উপজীব্য সর্বদা সেইটাই। কাহিনী মানুষকে বাইরে থেকে "চরিত্র" হিসাবে বা "জাতিরূপ" ["type"] হিসাবে দেখে। কাহিনী বাইরে থেকে দেখা এক বাস্তব সামাজিক জীবনে মানুষকে স্থাপিত করে কিন্তু প্রাথমিক পুঁজিসঞ্চয়ের যুগে বুর্জোয়া অর্থনীতি তখনও সেই পরিমাণে বিশিষ্টতাসূচক হয়ে ওঠেনি যখন সামাজিক 'টাইপ" বা 'রীতনীতি" ['norm"] সুনিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বুর্জোয়া মানুষ মনে করে যে ধ্যানধারণা পায়ের মত, কেবল নিজের চরিত্রকে সার্থক করে সে নিজেই বুঝি একটা অর্থনৈতিক ভূমিকাকেই প্রতিষ্ঠা করছে। সহজপ্রবৃত্তিগত ভূমিকা এবং অর্থনৈতিক ভূমিকা তার কাছে স্বাভাবিকভাবেই একটি ভূমিকা বলেই মনে হয়: একমাত্র সামন্ততান্ত্রিক ভূমিকাগুলিই তার কাছে জোর করে করা এবং "কৃত্রিম" বলে মনে হয়। সেই কারণে কাহিনী ও কাব্য তখনও পর্যন্ত পরস্পর বিরোধী হয় না: তারা তখনও পৃথক হয়ে যায় নি।

এই প্রাথমিক পুঁজিসঞ্চয়ের যুগে সব কিছুই তরল ও সমসত্ত্ব থাকে। বুর্জোয়া সমাজ তখনও তার বিস্তারিত শ্রম বিভাজন, এবং সেই শ্রম-বিভাগেরই অনুরূপ সংস্কৃতির বিস্তারিত জটিলতা সৃষ্টি করেনি। আজকের দিনে মনোবিদ্যা,

জীববিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, দর্শন, আইন, কাব্য, ইতিহাস, অর্থনীতি, উপন্যাস-রচনা, প্রবন্ধ, সব কিছু চিন্তার ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র, নিজ নিজ ক্ষেত্রে অনুসন্ধান চালানর জন্য প্রত্যেকটিরই বিশেষীকরণের প্রয়োজন এবং প্রত্যেকটিই এক বিশেষীকৃত শব্দসম্ভার ব্যবহার করে। কিন্তু বেকন, গ্যালিলিও এবং দাভিঞ্চি বিশেষজ্ঞ ছিলেন না এবং তাঁদের ভাষায় বিশেষজ্ঞোচিত জ্ঞানের ঘাটতি প্রতিফলিত। এলিজাবেথীয় যুগের ট্র্যাজেডি যে ভাষায় কথা বলে তার প্রসার ও পরিধি অনেক বড়। সে ভাষা কথ্য থেকে শুরু করে মহৎ পর্যন্ত করণকৌশলগত ভাষা থেকে শুরু করে আখ্যানমূলক পর্যন্ত বিস্তৃত কারণ তখনও পর্যন্ত পৃথক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য পৃথক ভাষার সৃষ্টি হয় নি।

সমস্ত মহান ভাষার মতই এই ভাষাও দাম দিয়ে কিনতে হয়েছে। টিনড্যাল তার দাম দিয়েছেন নিজের জীবন দিয়ে; সরল ও স্পষ্ট বাক্যের মত, কবিতার উপযুক্ত ইংরেজি গদ্যের স্টাইল সৃষ্ট হয়েছিল প্রাণভয়ে, বিধর্মী'দের হাতে, যাদের কাছে এটা ছিল এক ধর্মীয় কিন্তু সেই সঙ্গে বিপ্লবী কার্যকলাপও বটে। এই কাব্যের জন্য অত্যাবশ্যক এক নিরাবরণতা ও সরলতা, যা সমস্ত তুচ্ছ অলংকার ও প্রথাকে অস্বীকার করবে। সত্য ছাড়া অন্য কিছুই তার কাছ থেকে চাওয়া হয় নি।

এই সব কারণের সমাবেশের ফলেই এলিজাবেথীয় কাব্য একই সঙ্গে বোধ ও পার্থক্যসূচকবাহী নাটক ও কাহিনী হতে পেরেছিল; কিন্তু তা হওয়া সত্ত্বেও প্রাথমিক পুঁজিসঞ্চয়ের যুগে বুর্জোয়া বিভ্রমের তেজকে অসাধারণ শক্তির সাহায্যে প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছিল তার পক্ষে।

শেকসপীয়র যে বিরাটত্ব অর্জন করেছেন তা পারতেন না যদি না তিনি বুর্জোয়া বিকাশের উষাকালেই পুঁজিবাদী দ্বন্দ্বের সমগ্র গতিটিকে, তার বিপুল সাফল্য থেকে তার হীন পরাভব পর্যন্ত সমগ্র চলনটিকে প্রকাশ করতেন। পরবর্তী যুগে যে সব প্রবণতা পৃথক হয়ে পড়বে এবং একই ধরনে ব্যবহার করার পরিধির বাইরে চলে যাবে সেই সব প্রবণতার সবগুলিকেই একটি মাত্র যুগের মধ্যে জড়বদ্ধ করতে শেকসপীয়রকে সক্ষম করেছিল তাঁর অবস্থান, তাঁর সামন্ততান্ত্রিক "পরিপ্রেক্ষিত"।[১] রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট নাটকে বুর্জোয়া

১। একইভাবে মূর [Moore] সামন্ততান্ত্রিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে পুঁজিবাদ যে বিকশিত হয়ে একদিন সাম্যবাদে পৌঁছাবে সে কথার পূর্বাভাষ দিয়ে গেছেন তাঁর ইউটোপিয়া পুস্তকে।

প্রেমের শিশিরভেজা স্নিগ্ধতা, এন্টনি এ্যাণ্ড ক্লিওপ্যাট্রা নাটকে তার মারাত্মক সাম্রাজ্যবিধ্বংসী তন্দ্রালুতা, বা ম্যাকবেথ, হ্যামলেট, লীয়র ও ওথেলো নাটকে ব্যক্তিমানুষের ইচ্ছার দ্বন্দ্বের বিচিত্র লীলা উদ্ঘাটন করাটাই যথেষ্ট ছিল না। পাত্রের শেষ তলানিটুকু পর্যন্ত পানগ্রহণের প্রয়োজন ছিল, প্রয়োজন ছিল স্বয় রিয়ালিজমের যুগকে এবং জেমস জয়েসের পূর্বাভাষ দেওয়ার এবং পুঁজি-বাদের সমগ্র চলনের ফলে যে অধঃপতনের সৃষ্টি হয় তাকে প্রকাশ করার, যে

পুঁজিবাদ মানব আত্মাকে সার্থক করার উদ্দেশ্যে সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কগুলিকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে, আর এই কাজ করতে গিয়ে কেবল দেখে যে এই আত্মা হয়ে পড়েছে নগদ দামের বন্ধন সূত্রের হতভাগা ক্রীতদাস — এটাকে প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশ করার নয়, জলন্ত যথার্থতায় তাকে প্রকাশ করার প্রয়োজন :

Gold ! yellow, glittering, precious gold ! No, gods,
I am no idle votarist. Roots, you clear heavens !
Thus much of this will make black white, foul fair,
Wrong right, base noble, old young, coward valiant.
Ha ! you gods, why this ? What this, you gods ? why this
Will lug your priests and servants from your sides,
Pluck stout men's pillows from below their heads :
This yellow slave
Will knit and break religions ; bless the accurs'd ;
Make the hoar leprosy ador'd ; place thieves,
And give them title, knee and approbation,
With senators on the bench, this is it
That makes the wappen'd widow wed again ,
She whom the spital-house and ulcerous sores
Would cast the gorge at, this embalms and spices
To the April day again. Come, damned earth,
Thou common whore of mankind, that putt'st odds
Among the rout of nations, I will make thee
Do thy right nature.

জেমস জয়েসের চরিত্রগুলিও টিমনের অভিজ্ঞতারই পুনরাবৃত্তি করে :

all is oblique,

There's nothing level in our cursed natures

But direct villainy. Therefore, be abhorred

All feasts, societies, and throngs of men!

His semblable yea, himself, Timon disdains.

Destruction, fang mankind!

এলিজাবেথীয় কাব্যের জীবন-চিন্তা থেকে সাম্রাজ্যবাদী যুগের মৃত্যু-চিন্তা পর্যন্ত বিকাশের একটা প্রচণ্ড অধ্যায়। কিন্তু শেকসপীয়রের নাটকগুলির মধ্যে এর সমস্ত কিছুকে হৃদয়ঙ্গম করা হয়েছে এবং মেঘমেদুরভাবে তার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

মৃত্যুর আগে শেকসপীয়র মেঘমেদুরভাবে এবং অলীক-কল্পনার দিক থেকে চেষ্টা করেছিলেন একটা অ-ট্র্যাজিক সমাধান দিতে একটা মৃত্যুরহিত সমাধান দিতে। বুর্জোয়া সভ্যতার পঙ্কিল পরিবেশ থেকে দূরে টেমপেস্ট নাটকের দ্বীপে মানুষ চেষ্টা করে শান্ত পরিবেশে মহানভাবে বাঁচতে আপনার চিন্তায় আপনি মগ্ন হয়ে। এই ধরনের অস্তিত্বে এলিজাবেথীয় বাস্তবের রেশ তখনও বজায় থাকে, শোষিত শ্রেণী একটা আছে—পশুপ্রকৃতি স্থূলদেহ ক্যালিবান—আর আছে একটি মুক্ত 'আত্মা' কিছুকালের জন্য যে দাসত্বে বাঁধা—আরিয়েল, স্বাধীন মজুরের দেবরূপ। এই স্বর্গ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। অভিনেতারা বাস্তব জগতে ফিরে আসে। যাদুদণ্ডটি ভেঙে ফেলা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, তার পবিত্রতায় ও জ্ঞানের শিশুসুলভ সরলতায় টেমপেস্ট নাটক ও তার যাদু-জগৎকে ঘিরে, যে যাদু জগতে প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে সামাবাদের এক অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে মানুষের কাজে লাগান হয়েছে, সেই যাদু-জগৎকে ঘিরে এক মন্ত্রমুগ্ধকর গুণের বিরাজমানতা।

২

যেহেতু প্রাথমিক পুঁজিসঞ্চয় ধীরে ধীরে পৃথকীকৃত এক বুর্জোয়া উৎপাদনকারী শ্রেণী গড়ে তোলে সেই কারণে রাজার ইচ্ছা, যা তার নিরঙ্কুশতার কারণে এক সৃজনশীল শক্তি ছিল, তা এখন বুর্জোয়াবিরোধী ও সামন্ততান্ত্রিক হয়ে ওঠে। প্রাথমিক পুঁজিসঞ্চয় যখন একটা নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছায় তখন যেটার জরুরী প্রয়োজন সেটা পুঁজি নয়, সেটা হল এক শুদ্ধ শর্ত যার মধ্যে বুর্জোয়া পুঁজির বিকাশ ঘটাতে পারে। এই যুগ হল "হস্তশিল্পের" [manufacture] যুগ—এ যুগ ফ্যাক্টরি বিকাশের বিরোধী।

একচেটিয়া কারবার ও বিশেষ সুযোগসুবিধা অবাধে মজুর করার নিরঙ্কুশ

রাজতন্ত্র সামন্ত আনুগত্যের পুরাতন চক্রের মত বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র ত' নিজে আসলে সামন্ততান্ত্রিক। রাজতন্ত্র এবং কারিগর, বণিক, জোতদার ও দোকানদার শ্রেণীর মধ্যে একটা কাটল দেখা দেয়।

বড় জমিদার বা অভিজাতব্যক্তি ইতোপূর্বেই পরভোজী হয়ে গেছে। রাজসভা এখন তাদের সমর্থন করে। বুর্জোয়া শ্রেণীকে শোষণ করার উদ্দেশ্যে সে রাজসভার সঙ্গে মৈত্রীস্থাপন করে আর রাজসভায় তাকে পুরস্কৃত করে একচেটিয়া অধিকার, বিশেষ সুযোগসুবিধা বা বিশেষ কর ইত্যাদির সাহায্যে যেগুলি উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের বিকাশকে বাধা দেয়। প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয়ের যুগ এখন পার হয়ে যাওয়ায় এইভাবে যুবরাজের নিরঙ্কুশ "ইচ্ছা" বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রাণধর্মকে এই পর্যায়ে আর প্রকাশ করে না।

অপরদিকে, রাজসভা হয়ে ওঠে যাবতীয় মন্দের উৎস। তার চাকচিক্যময় দুর্নীতিপরায়ণ জীবনে পচনের পূতিগন্ধ, জঘন্যতা ও কুকার্য রেশমী বস্ত্রে আবৃত। বুর্জোয়া কাব্য পরিণত হয় তার বিপরীত সামগ্রীতে এবং এক ঐক্যমত চলনের সাহায্যে রাজসভার কলুষ স্পর্শ থেকে বাঁচার জন্য পিউরিট্যানদের মত তার পোষাকের প্রান্তদেশ গুটিয়ে নেয়। যে চলন প্রথমে ছিল ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে বিকর্মড চার্চের এক প্রতিক্রিয়া, তা এখন হয়ে ওঠে বিফর্মড চার্চের বিরুদ্ধে পিউরিট্যানদের প্রতিক্রিয়া।

রাজার নিরঙ্কুশ ইচ্ছার এবং অভিজাতদের বিশেষ সুযোগসুবিধার ধারক চার্চকে এখন মুখোমুখি হতে হয় পিউরিট্যানের ব্যক্তিগত "বিবেকের", যে বিবেক আত্মা ছাড়া—তার নিজের ইচ্ছার আদর্শায়িত রূপ ছাড়া—অন্য কোনও আইন মানে না। প্রাথমিক পুঁজিসঞ্চয় এখন শেষ হয়ে যাওয়ায় তার মিতব্যয়িতা পুঁজি স্তূপীকৃত করার প্রয়োজনকে প্রতিফলিত করে যার মধ্যে জাঁকজমকপূর্ণ ও অমিতব্যয়ী ডাকাতি করে নয় "সঞ্চয়" করার মধ্যেই স্বাধীনতা ও গুণের অস্তিত্ব নিহিত।

ডন এই উৎক্রান্তিকে প্রকাশ করেছেন, কারণ তিনি এর দ্বারা ক্ষতবিক্ষত। রাজসভার ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও চাকচিক্যময় দীপ্তি দেখে প্রথমে তিনি মুগ্ধ হন কিন্তু যে অপমানকর ব্যবহার তিনি পান তার ফলে রাজসভা-বিমুখতা ও অনুতাপের দিকে এক চলন দেখা দেয়। এই চলনটি সম্পূর্ণ হয় নি। ডনের জীবনের শেষদিনগুলি মৃত্যুচিন্তায় এবং জীবনের প্রতি এক তেজস্বিনী ঘৃণায় পূর্ণ হলেও ঐহিক জীবনের অহংকার তাঁর হৃদয়কে তখনও ক্ষতবিক্ষত করে।

রাজসভার যৌথ জীবন থেকে দূরে সরে গিয়ে কাব্য এখন আশ্রয় নিতে পারে কেবল আলবাবের বাহুল্যবর্জিত, অল্প কয়েকজন নির্বাচিত বন্ধু পরিবৃত বুর্জোয়া পাঠকের নিভৃত জগতে। রাজসভার জীবনের নিরন্তর প্রচার থেকে এই জগৎ এত ভিন্ন ধরনের যে তা কাব্যের করণকৌশলকে দ্রুত বিপর্যস্ত করে। ক্র্যাশ্ অ, হেরিক, হার্বার্ট, ডন—এ যুগে রচিত সমস্ত কাব্যই মনে হয় যেন কোনও লাজুক, গর্বিত মানুষ আপন পাঠককে একা মনে রচনা করেছেন—রাজসভার জীবন থেকে গ্রামীন জীবন বা স্বর্গের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তারা এই পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে। গীতিকবিতা এখন আর সেই জিনিস নয় যা ভদ্রলোকেরা তাঁদের মহিলাকে উদ্দেশ্য করে গাইতে পারেন, জটিল চিত্রকল্পগুলি [conceits] আর সেই জিনিস নয় যা দরবারী আলাপের মধ্যে জুড়ে দেওয়া যায়। কাব্য আর সেই বিশেষ জিনিস নয় যা এক বিজ্ঞ শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে চেঁচিয়ে পড়া যায়। যে পাঠককে তার জন্য সেই পাঠকের পক্ষে তার গায়ে। এ কাব্য শিক্ষিত লোকের কাব্য: ছাত্রের অধ্যয়নের উপযুক্ত কাব্য। কাব্য এখন পাঠ করা হয়, আবৃত্তি করা হয় না: সেই অনুযায়ী তা সূক্ষ্ম ও জটিল।

কিন্তু সাকলিং ও লাভলেস রাজসভায় কাব্য রচনা করেছেন। তা সরল, নিজেদের শ্রেণীর প্রকাশ্য কাব্য। তাঁদের কাব্য পিউরিটান কালের বিরোধী এবং এলিজাবেথীয় রাজসভার গীতিকাব্যের ঐতিহ্য তাঁরা রক্ষা করছেন।

রাজসভার যৌথ মনোভাব থেকে যে যৌথ নাটকের জন্ম হয়েছিল স্বভাবতঃই তার মৃত্যু ঘটে। ওয়েবস্টার ও ও ডুর্নর বুর্জোয়া বিভ্রমের প্রথম পর্যায়ের শেষ দিকের দুর্নীতিকে, ঈর্ষাপরায়ণ কুকর্মকে এবং ইতালীয় দুর্জনোচিত মৃত্যুকে প্রকাশ করেছেন।

৩

উৎক্রান্তির যুগ এগিয়ে চলে বিপ্লবের দিকে। রাজতন্ত্র ও বিশেষ সুবিধাভোগী অভিজাতদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়ারা বিদ্রোহ করে পার্লামেন্টের নামে, স্বাধীনতার নামে এবং "আত্মার" নামে, যে আত্মা রাজতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ জানানো বুর্জোয়ার ইচ্ছা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই যুগ হল সশস্ত্র বিপ্লবের যুগ, গৃহযুদ্ধের যুগ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভূত হলেন ইংলণ্ডের প্রথম প্রকাশ্য বিপ্লবী কবি—মিলটন।

স্টাইলে বিপ্লবী, বিষয়বস্তুতেও বিপ্লবী। বুর্জোয়ারা এখন এক বিভ্রমের পর্যায়ে

প্রবেশ করে যেখানে নিজেকে সে পর্যুদস্ত ও নিঃসঙ্গ হিসাবে, প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতার এক চ্যালেঞ্জকারী হিসাবে দেখে। সেই কারণে এর মধ্যে দেখা দেয় এক কৃত্রিম এবং সচেতনভাবে মহান স্টাইল, এক বিচ্ছিন্ন স্টাইল। ইংরেজি কাব্যে এ ধরনের জিনিস এই প্রথম।

বুর্জোয়া বিপ্লব, যা সমগ্র জনগণের সাহায্যেই মাত্র সম্পন্ন করা যায় তা সর্বদাই একটা পর্যায়ে গিয়ে পৌছায় যখন মনে হয় যে তারা "বড় বেশি দূর এগিয়ে গিয়েছে"। সীমাহীন স্বাধীনতার জন্য বুর্জোয়াদের দাবি ততক্ষণই খুব ভালো জিনিস যতক্ষণ "যাদের কিছু নেই" তারাও সীমাহীন স্বাধীনতার জন্য দাবি না করছে; "যাদের সব কিছু আছে" তাদের স্বাধীনতার বিনিময়ে মাত্র "যাদের কিছু নেই" তাদের স্বাধীনতালাভ সম্ভব। বিপ্লবের অগ্রগতিকে বলপূর্বক পিছু টেনে রাখতে হলে একজন ক্রমওয়েল বা একজন রবেস-পিয়ের'এর তখন আবির্ভাব ঘটে।

বুর্জোয়াদের এই ধরনের ধমকে দাড়ানর ফলে সর্বদাই একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, কারণ এই কাজ করার দ্বারা বুর্জোয়া শ্রেণী তার নিজের গণভিত্তিকে ধ্বংস করে ফেলে। রবেসপিয়ের'এর জায়গায় আসে ডিরেক্টরি [Directory] এবং তার পর নেপোলিয়ন; আরও আগেকার এক পর্যায়ে ক্রমওয়েলের জায়গায় এসেছিল মঙ্ক এবং তারপর দ্বিতীয় চার্লস। কিন্তু চাকাটা পুরা পাক পিছনে ফিরে আসে না: একটা আপোষ হয়।

পেটিবুর্জোয়াদের স্বার্থকে যারা সবাসরি প্রকাশ করেছিল তাদের কাছে, পিউরিট্যানদের কাছে, প্রতিক্রিয়ার এই শেষ পর্যায়টা বিপ্লবের প্রতি এক বিশ্বাসঘাতকতা। সেই কারণে প্যারাডাইস লস্ট কাব্যে মিল্টন নিজেকে দেখেন স্যাটান হিসাবে পরাভূত কিন্তু তা সত্ত্বেও তখনও সাহসী অভিশপ্ত, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিপ্লবী। প্যারাডাইস রিগেনড কাব্যে তিনি পরবর্তী জগতে ক্ষমতার বিনিময়ে এই জগতে ক্ষমতালাভকে ইতোমধ্যেই বাতিল করে দিয়েছেন। এই জগতের মন্দির ও প্রাসাদকে তিনি ধিক্কার দেন, তাঁর পুরস্কার পাওয়া যাবে পরবর্তী জগতে কারণ তিনি আপোষ করতে রাজি নন। সেই কারণে এই কবিতা পরাজয়বাদী, এবং প্যারাডাইস লস্ট'এর মহান স্পর্ধা এতে অনুপস্থিত। স্যামসন এগনিস্টেস এ মিল্টন তাঁর সাহস ফিরে পেয়েছেন। তিনি সেই দিনের আশা রাখেন যেদিন তিনি তাঁর স্বেচ্ছাপরায়ণ অত্যাচারী-দের বিলাস বৈভবের উপর গড়ে তোলা মন্দিরকে চুরমার করে টেনে নামাতে পারবেন এবং ফিলিস্তিন রাজসভাকে নিশ্চিহ্ন করতে পারবেন।

মিল্টন কি সচেতনভাবে নিজকে স্যাটান, যীশু এবং স্যামসন হিসাবে এঁকেছিলেন ? সচেতনভাবে এঁকেছিলেন সম্ভবতঃ একমাত্র স্যামসনকে, কিন্তু মানুষ, যে স্বভাবতঃই ভালো সে সর্বত্রই খারাপ অবস্থায় পড়ছে কেন এবং যার সুপরিচিত উত্তর হল—লোভের বশবর্তী হয়ে স্বাভাবিক সদগুণ থেকে আদমের পতনের কারণেই তা হল—এই বুর্জোয়া উপজীব্য বিষয়কে যখন তিনি ব্যবহার করতে গেলেন তখন তাঁকে প্রলুব্ধক স্যাটান এবং তার পতনকে আলোচনা করতে তিনি বাধ্য হলেন। আর স্যাটানের সংগ্রাম স্পষ্টতঃই একটা বিপ্লব হওয়ায় মিলটন সেটাকে তাঁর নিজের বিপ্লবী অভিজ্ঞতা দিয়ে ভরিয়ে তুললেন এবং পরাজিত বিপ্লবীকে করে তুললেন পিউরিট্যান আর প্রতিক্রিয়াশীল ঈশ্বরকে করলেন স্টুয়ার্ট রাজা। এইভাবে উদ্ভূত হল স্যাটানের বিরাট চরিত্র যার অপ্রত্যাশিত বিষমানুপাত এইটাই প্রমাণ করে যে মিলটনের উপজীব্য "তাঁর নাগালের বাইরে চলে গিয়েছিল।"

প্যারাডাইস রিগেনড কাব্যে মিলটন এই বিশ্বাস করতে চেয়েছিলেন যে পার্থিব জীবনের দিক থেকে পরাজিত হওয়ার অর্থ হল আত্মার দিক থেকে জয়লাভ করা, "পরিশেষে" জয়লাভ করা। কিন্তু মিলটন ছিলেন এক প্রকৃত সক্রিয় বিপ্লবী এবং অন্তর দিয়ে তিনি বুঝেছিলেন যে এই আত্মিক তৃপ্তি প্রকৃত পরাজয়ের তুলনায় ফাঁপা—এই কবিতার পরিতৃপ্তিহীনতাতেই তার প্রমাণ। স্যামসন এগনিস্টেস'এ তিনি জয়পরাজয়কে একত্রিত করতে চেষ্টা করছেন।

এই নির্বাচন অবশ্য ইতোপূর্বেই করা হয়েছে কোমাস কাব্যে যেখানে সেই সম্রান্ত মহিলা রাজসভার বিলাসিতা পরিত্যাগ করে জনসাধারণের সহজ সরল গুণের সঙ্গে নিজেকে মৈত্রীবদ্ধ করেছে।

বুর্জোয়া বিভ্রম যে ইতোমধ্যেই কিছুটা আত্ম সচেতন হয়ে উঠেছে তা লক্ষ্য করার মত, মিল্টন সচেতনভাবে মহৎ—শেকসপীয়র কখনও তা নয়। এলিজাবেথীয়রা বীর; পিউরিট্যানরা তা নয় এবং সেই কারনেই তারা নিজেদের বীর হিসাবে, একটা অপ্রচলিত পোষাকে দেখতে বাধ্য। অস্থায়ী সরকারের লাতিন সেক্রেটারীর কাব্য ও শব্দসজ্জার বিভ্রমের এই দ্বিতীয় চলনটিকে ভালোভাবেই প্রকাশ করে। এই সব কবিতার বিষয়বস্তু একই সঙ্গে মহান এবং কোনও অর্থেই সমকালীন হতে পারে না। কাব্য ইতোমধ্যেই বোধ দৈনন্দিন জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে, যার ফলে বিপরীত মেরু হিসাবে গদ্য "কাহিনীর" আবির্ভাবের সূত্রপাত এখন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

বুর্জোয়া বিপ্লবের অত্যাক্ত চলনের মত রাজসভার পর্দায় থেকে উৎক্রান্তির ও ছায়াপাত অবশ্য শেকসপীয়রের নাটকে পূর্বাহ্নেই ঘটেছে। টেম্পেস্ট নাটকে হার্বার্ট বা মিলটনের মত প্রসপেরো'ও দুর্নীতিপরায়ণ রাজসভা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন পাঠকক্ষের শান্তিপূর্ণ দ্বীপে। শেকসপীয়র যখন স্ট্র্যাটফোর্ড অন অ্যাভনে চলে গেলেন তখন তাঁর নিজের জীবনেও ঠিক এইটাই ঘটেছিল।

কিন্তু সেখানে তিনি লিখতে পারলেন না। তাঁর যাদুদণ্ড ছিল একটা যৌথ যাদুদণ্ড। রাজসভার সঙ্গে তার বন্ধন ছিন্ন করে সেই যাদুদণ্ডটিই তিনি ভেঙে ফেলেন এবং তাঁর কল্পনার অভ্রংলিহ প্রাসাদ শূন্যে বাতাসে মিলিয়ে গেল।

৪

পিউরিট্যান বিপ্লবের পর যে প্রতিক্রিয়ার যুগ দেখা দিল তার আবহাওয়া ছিল খোশমেজাজী মানববেষিতার [good-humoured cynicism]। যে চরম "আদর্শগুলির" জন্ত লড়াই করা হয়েছিল সেগুলির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করাটাই এখন বেশির ভাগ লোকের কাছে বিজ্ঞ-জনোচিত বলে বলে মনে হতে থাকল। বাধাবন্ধহীন স্বাধীনতা এবং আত্মার নির্দেশ অবাধে অনুসরণ করাটা তত্ত্ব হিসাবে বেশ সুন্দর, কিন্তু যে শ্রেণীর সেটা রণধ্বনি ছিল সেই শ্রেণীকেই তা যে রীতিমত অস্বস্তির মধ্যে ফেলেছিল এটা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। বুর্জোয়া বিভ্রম এক নতুন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে, রেস্টোরেশন্' এর মধ্য দিয়ে পার হল।

এই ধরনের চলন মানববেষী, কারণ তা আগতিক কারণের পক্ষে "আদর্শগুলির" প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার ফল। এই চলন বিলাসপূর্ণ, কারণ যে শ্রেণীর সঙ্গে বুর্জোয়া শ্রেণী এখন আবার মৈত্রী স্থাপন করছে এবং ইতোমধ্যেই তাকে একটা রীতিমত শিক্ষা দিয়েছে সেই অভিজাত ভূস্বামীদের কাছে পুঁজি সংগ্রহের জন্ত মিতব্যয়িতার প্রয়োজন কিছু নেই। এই চলন একটা যৌথ চলন, কারণ সর্বসাধারণের কাছে উন্মুক্ত রাজসভার জীবনে এবং নাটকে প্রত্যাবর্তন ঘটল। কোনও প্রকৃত অর্থে তাকে অবক্ষয়ী বলা যায় না; একথা ঠিক যে বুর্জোয়া শ্রেণী নিজেকে পুরাতন অভিশপ্ত শ্রেণীর সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ করেছে—কিন্তু সেই শ্রেণীর মধ্যে তা নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটিয়েছে। রাজসভার অবক্ষয়ের প্রকাশক ওয়েবস্টার পথ ছেড়ে দিলেন রাজসভার উদ্দয়ের প্রকাশক ড্রাইডেনকে। আর ড্রাইডেন যাঁর বহুরূপী জীবন মিলটনের জায়-

পরায়ণতা থেকে ভিন্ন ধরনের, তিনি যথাযথভাবে প্রকাশ করলেন সেই যুগের, ক্রমওয়েল থেকে দ্বিতীয় চার্লস এবং দ্বিতীয় জেমস থেকে তৃতীয় উইলিয়মের কালের বুর্জোয়া শ্রেণীর বিভ্রান্ত ও দ্রুত চলনকে। এটা এক প্রকৃত মৈত্রী— সামন্ত যুগ ফিরে আসার কোন প্রশ্নই এখানে নেই। "গৌরবজনক বিপ্লবে" দ্বিতীয় জেমসের ভাগ্যে যা ঘটল তা থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয়ে গেল যে বুর্জোয়া শ্রেণী এখন শাসক হয়ে উঠেছে।

কবিকে ফিরতেই হয় তাঁর পাঠকক্ষ থেকে রাজসভায়, কিন্তু এই রাজসভা এখন আরও শহরে প্রকৃতির, বিবেচনাসম্পন্ন, কম রোমান্টিক এবং ছবির মত সাজান গোছান রাজসভা। রাজসভাই এখন প্রায় নগর হয়ে উঠেছে। এই পাঠকক্ষ থেকে লণ্ডনের রাজপথে গিয়ে দাঁড়ান, সচেতন বীরত্ব থেকে ব্যবসায়ী-সুলভ কাণ্ডজ্ঞানে গিয়ে পৌছান ভাষার ক্ষেত্রেও দেখা যায়। ধর্মনিরপেক্ষ বুর্জোয়া বিপ্লবী, ভান করার দিকে যার কিঞ্চিৎ প্রবণতা, হয়ে উঠল বিবেচনা-সম্পন্ন সংসারী মানুষ। এই হল মিলটন থেকে ড্রাইডেনে উৎক্রান্তি। গৌরবজনক বিপ্লব একবার যখন প্রমাণ করে দিল যে এই মৈত্রীতে বুর্জোয়া শ্রেণীরই প্রাধান্য তখন প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেণীগুলির মধ্যকার দ্বন্দ্বকে "শৃঙ্খলা" ও "ব্যবস্থার" ["order" and "measure"] হিসাবে আদর্শায়িত করার— প্রতিক্রিয়ার যা পরিচিত বৈশিষ্ট্য—ফলে অগাস্তান যুগের ধারণা গড়ে উঠল, যা এক অপরিহার্য উৎক্রান্তির মধ্য দিয়ে অষ্টাদশ শতকের জাতীয়তাবাদে গিয়ে পৌছাল।

এই যুগ যে নিজেকে অগাস্তান যুগ আখ্যা দিয়েছে তা প্রকৃতই দারুণ যথাযথ হয়েছে। রোমে একই ধরনের এক চলনের ক্ষেত্রে সিজার পালন করেছিলেন ক্রমওয়েলের ভূমিকা আর অগাস্তাস পালন করেছিলেন দ্বিতীয় চার্লসের ভূমিকা। সেখানে যোদ্ধা শ্রেণী প্রথমে ব্যবস্থাপক [senatorial] শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং বেশি দূর অগ্রসর হওয়াটা যখন বিপজ্জনক হয়ে পড়ল তখন সেই বিদ্রোহ আপোষ ও প্রতিক্রিয়ার পথ ধরল।

এলিজাবেথীয় বিদ্রোহ অর্থাৎ প্রাথমিক পুঁজিসঞ্চয়ের কণ্ঠস্বর, এইভাবে হয়ে উঠল তার বিপরীত, অগাস্তান ঔচিত্য অর্থাৎ হস্তশিল্পের কণ্ঠস্বর। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বাদ পথ ছেড়ে দিল সুরুচিকে। প্রথম দিকের পর্যায়ে বুর্জোয়াতন্ত্রের পক্ষে সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক রূপগুলিকে ধ্বংস করে ফেলার প্রয়োজন হয় এবং সেই কারণে তার বিজয়টা হল স্বাধীনতার মধ্যে সহজপ্রবৃত্তিগুলির সার্থকতালাভ। এই চলনের অন্তিপর্বে, প্রথমে পুঁজিসঞ্চয়ের জন্য এবং পরে পুঁজিকে অবাধ সুযোগ দেওয়ার

জন্ত বুর্জোয়াতন্ত্র প্রথমে নির্ভর করে রাজতন্ত্রের উপর—শেক্সপীয়র—এবং পরে সাধারণ মানুষের উপর—মিলটন। কিন্তু যেহেতু এটা একটা শ্রেণীর স্বার্থ, সেই কারণে তার দাবিগুলি নিয়ে বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে না, কারণ সমস্ত সমাজের স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে তার নিজের স্বার্থকে বলি দিতে হয়। যে সব পুরাতন রূপগুলি সামন্ত শ্রেণীর শাসন বজায় রাখত সেগুলিকেই যে কেবল চূর্ণ করতে হবে তাই নয়, শাসক শ্রেণী হিসাবে তার নিজের বিকাশকেও সুনিশ্চিত করবে এমন সব নতুন রূপ তাকে সৃষ্টি করতেই হবে। এ হল হস্তশিল্প এবং কৃষিভিত্তিক পুঁজিবাদের যুগ। ক্যাক্টরি নয়, ভূমিই হল এখনও কেন্দ্রবিন্দু।

এই যুগ যে কেবল প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয়ের যুগেরই বিরোধী তাই নয়, অবাধ বাণিজ্যের যুগেরও তা বিরোধী। পুঁজি আছে, কিন্তু প্রলেতারিয়েতের অস্তিত্ব এখনও নামমাত্র। পুঁজির চলনের ফলে অসংখ্য কারিগর, ও কৃষক এখনও সর্বহারা শ্রেণীতে পরিণত হয়নি: অতএব এই প্রক্রিয়াকে সাহায্য করার জন্ত রাষ্ট্রকে আবাহন করতেই হবে। পুঁজিবাদের সম্প্রসারণের যুগ—যে যুগে কারিগরদের দ্রুত বিত্তহীন করার ফলে হাজার হাজার স্বাধীন শ্রমিক বাজারে নিক্ষিপ্ত হতে থাকে—তখনও উপস্থিত হয়নি। এলিজাবেথীয় যুগের মজুরদের ইতোমধ্যেই কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। বুর্জোয়ারা দেখতে পায় যে মজুরি শ্রমের ঘাটতি রয়েছে, যা তার শ্রমশক্তির দামকে তার মূল্যের (অর্থাৎ খাদ্য ও খাজনার মধ্যে তার বংশবৃদ্ধির জন্য খরচা) থেকে বাড়িয়ে দিতে পারে।

অতএব বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশের প্রয়োজনীয় শক্তিগুলিকে সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্তে মজুরির হার এবং দ্রব্যমূল্য নিম্ন রাখার এবং শ্রমের যোগানকে নিয়ন্ত্রিত রাখার জন্ত আইনকানুনের বেড়াজালের প্রয়োজন। বুর্জোয়া শ্রেণী এখন স্বাধীনতার জন্ত তার বিপ্লবী দাবিগুলির "আয়ত্বাতীত আদর্শবাদটা" দেখতে পায়। শৃঙ্খলা, ব্যবস্থা, আইন, সুরুচি এবং অন্তান্ত আরোপিত রূপগুলি প্রয়োজনীয়। ঐতিহ্য এবং প্রথা মূল্যবান। এখন যখন সামন্ত রাষ্ট্র লোপ পেয়েছে তখন এই বাধানিষেধগুলি বুর্জোয়া অর্থনীতির বিকাশকে সুনিশ্চিত করবে। এই যুগের অর্থনীতিবিদদের কাছে অবাধ বাণিজ্য হল কাঙ্ক্ষিত সামগ্রীর ঠিক বিপরীত। বুর্জোয়া বিভ্রম নিজের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করল।

৫

অতএব অষ্টাদশ শতকে বুর্জোয়া কাব্য বৃহৎ জমিদার পুঁজিপতিদের হস্ত-

দ্বারায় শিল্প-পুঁজিবাদের কর্মদানকারী হস্তশিল্পের মনোভাবকে, ক্ষুদ্র হস্তশিল্প-জীবী বুর্জোয়াদের মনোভাবকে প্রকাশ করে। পুঁজিবাদের বিশ্বব্যাপী সম্প্রসারণ এখনও শুরু হয়নি। পুঁজিবাদ এখনও সেইসব অর্থনীতির কাছাকাছি এক মতবাদ যেখানে "অস্তিত্বের প্রথম শর্ত হল সংরক্ষণ" ["conservation is the first condition of existence"], এবং এখনও তা সেই স্তরে পুরাপুরি প্রবেশ করেনি যেখানে তা "উৎপাদনের উপায়গুলিতে অবিরাম বিপ্লব না ঘটিয়ে তার অস্তিত্ব সম্ভব নয়" ["cannot exist without constantly revolutionising the means of production"]। পুঁজিবাদ নিজের মধ্যে বিপ্লব ঘটাচ্ছে, কিন্তু তা সেই বিস্ফোরণের মত নয় যেখানে একটি অংশে অগ্নিসংযোগ ঘটলেই বাকি অংশটা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়; তার বদলে তা হল ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠা এক চারাগাছের মত, সযত্নে যাকে রক্ষা করা প্রয়োজন। গৌরবময় বিপ্লবের আপোষের ফলে হুইগ অভিজাত ভূস্বামী সেই নিরাপত্তা দিতে প্রস্তুত ছিল, কারণ তারা নিজেরাই বুর্জোয়া হয়ে উঠেছিল।

কারিগরির উত্থানের ফলে কৃষিভিত্তিক ও শিল্প-পুঁজিবাদের মধ্যে যখন বিচ্ছেদ ঘটল মাত্র তখনই অভিজাত ও বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যকার ব্যবধান বুর্জোয়া বিপ্লবের উপর একটা নিয়ামক প্রভাব ফেলতে শুরু করল। পশম-কলগুলি যখন হস্তচালিত তাঁতের থেকে বেশি কিছু ছিল না এবং কৃষিভিত্তিক পুঁজিপতিদের মেষ-খাটালের মেষভূ ছাড়া সেগুলি আর কিছু ছিল না তখন শ্রেণীগুলির মধ্যে সরাসরি কোন বিরোধ ছিল না: পশমকলগুলি যখন কাঁচামালের জন্য বিদেশী উৎসের উপর নির্ভরশীল সুতাকল হয়ে উঠল এবং অস্ট্রেলিয়ায় মেষ-পালনের বিকাশ ঘটল এবং ইংলণ্ডের কলগুলির জন্য পশম সরবরাহ করতে থাকল একমাত্র তখনই কৃষিভিত্তিক পুঁজিবাদ এবং শিল্প-পুঁজিবাদের মধ্যে সরাসরি বিরোধ দেখা দিল যা শেষ অবধি অবাধ বাণিজ্যের জন্য ও শস্য-আইন বাতিল করার জন্য শিল্পপতিদের দাবি হিসাবে প্রকাশ পেল।

পোপের কাব্য এবং তার "যুক্তি"—হল বিশেষভাবে সরল ও অগভীর বিষয়গুলির চৌহদ্দির মধ্যে চলাফেরা করা কিন্তু সঠিক ভাবে চলাফেরা করার এক যুক্তি। মার্জিত ভাষা ও ছন্দমাত্রা এবং রসকসহীন বিরোধালংকার-সহ পোপের কাব্যের "যুক্তি" বুর্জোয়া বিপ্লবের সেই পর্যায়েরই এক প্রতিফলন যে পর্যায়ে বুর্জোয়ার কাছে স্বাধীনতা একমাত্র "সীমাবদ্ধই" হতে পারে—দাবির ব্যাপারে মানুষকে বিবেচনাসম্পন্ন হতেই হবে আর তা সত্ত্বেও হতাশ হওয়ার

কোনও কারণ নেই, সব বেশ ঠিকঠাক চলছে। জীবন উন্নতির পথে চলেছে, কিন্তু তাড়াহুড়া করা চলবে না। অন্তরের উপর বাহ্যিক রূপগুলি আরোপ করার প্রয়োজন এবং তা স্বীকার করেও নেওয়া হয়। অষ্টাদশ শতকের হিরোয়িক কাপলেট'-এর সুচারু ছাটকাট অন্তর্বাস এবং এলিজাবেথীয় অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্বাভাবিক বিলাসবাহুল্য, যার ফাঁপানো বিস্তার তার ভিতরকার আয়ম্বিক ছন্দের শক্তসমর্থ গঠনকে ঢেকে রাখে, এই দুইয়ের মধ্যকার পার্থক্য সেই কারণেই।

হস্তশিল্পের যুগে বুর্জোয়া-হয়ে-ওঠা অভিজাতদের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ বুর্জোয়া শ্রেণীর মতাদর্শকে পোপ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করেছেন।

এটা লক্ষ্য করা দরকার যে কবি নিজে উৎপাদনকারী হিসাবে কিন্তু এখনও নিজে বুর্জোয়া হয়ে ওঠেন নি। এখনও তিনি অবাধ বাজারের জন্য উৎপাদন করছেন না। শেকসপীয়র'-এর কালে কবি ছিলেন প্রায়ই রাজসভার বা অভিজাত ব্যক্তির কর্মচারী, পরবর্তী কালে কবির জীবিকা ছিল যাজক বা পণ্ডিতের, আরও পরবর্তীকালে এমন কি পোপের সময়ও কবি পৃষ্ঠ-পোষকতার উপর নির্ভরশীল—অর্থাৎ পোপের কালে যে শ্রেণীর তিনি মুখপাত্র সেই শ্রেণীর সঙ্গে কবির এক "পিতৃতান্ত্রিক" বা "প্রকৃতি-শোভন" সম্পর্ক রয়েছে।

এই ধরনের "প্রকৃতি-শোভন" সম্পর্কের অর্থ হল এই যে কবি "প্রকৃতি-শোভন নয়" এমন কাব্য রচনা করছেন। কবি এখনও নিজেকে সামাজিক ভূমিকা পালন করছেন এমন এক ব্যক্তি হিসাবেই দেখেন। আদিম সমাজের কবির অবস্থাও ছিল এইরকম, পোপের ক্ষেত্রে একথা সত্য। এই অবস্থা তাঁর বেতনদাতার বা সহ-কবিদের ভাষায় কথা বলার বাধ্যবাধকতা তাঁর উপর আরোপ করে। আদিম উপজাতির মধ্যে এদের দিয়েই সমস্ত উপজাতিটা গঠিত ছিল। অগাস্তান সমাজে এই লোকদের দিয়েই কবির পৃষ্ঠ-পোষকের অনুচরবৃন্দ, অর্থাৎ শাসক শ্রেণী গঠিত। চাঁদাদাতার উপর নির্ভরশীল ছিলেন জন্‌সন। পদমর্যাদার অধিকারে কবি এবং উৎপাদনকারী হিসাবে কবি-এই দুইয়ের মধ্যকার ব্যবধানকে তিনি যুক্ত করেন। অর্থাৎ, কাব্য এই অর্থে যৌথ রয়েছে। এই কাব্য মোটামুটি সমকালীন ভাষায় কথা বলে এবং কবি যে শ্রোতৃমণ্ডলীর জন্য লিখছেন তাদের কথা তাঁর সরাসরি মনে আছে, তাদের কাছে অনতিবিলম্বেই কবি তাঁর কবিতা পড়ে শোনাবেন এবং তাদের উপর তার কি প্রভাব হয় তা লক্ষ্য করতে পারবেন। কাব্য তাঁর

কাছে এখনও ততটা পরিমাণে একটা কবিতা নয়—একটা স্বতন্ত্র শিল্পকর্ম নয় যে পরিমাণে তা লেখক থেকে পাঠকের প্রতি একটা চয়ন। এ যেন জনসাধারণের সামনে অভিনীত কোন নাটকে আবেগের এক চয়ন, বা মানুষের মনে কোনও মিউজ'এর এক চয়ন। সুতরাং একটা সামাজিক ভূমিকা, মানবজাতির অনুপ্রেরণাদাতার ভূমিকা বা মানবজাতির প্রতি-অপসারকের ভূমিকা পালন ক'রে কবি নিজেকে সার্থক করে তোলেন। কবি এখনও পর্যন্ত এক আত্ম-সচেতন শিল্পী হয়ে ওঠেননি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইংরেজ কবিকুল

২। শিল্প-বিপ্লব

১

বুর্জোয়া বিপ্লব এখন আর এক স্তরে গিয়ে পৌছায়; তা হল শিল্প-বিপ্লবের স্তর, পুঁজিবাদের "বিস্ফোরণাত্মক" স্তর। পুঁজিবাদের বিকাশ এখন, কবি যে শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ভাষা দেন সেই শ্রেণীর সঙ্গে কবির সম্পর্কসহ সমস্ত সরল, অনাড়ম্বর পিতৃতান্ত্রিক সম্পর্ককে "নির্বিকার" নগদমুদ্রার সম্পর্কে পরিণত করে।

অবশ্য এর ফলে কবি যে নিজেকে দোকানদার বলে বা তাঁর কবিতাকে পনীরের টুকরা বলে মনে করেন তা নয়। সেটা মনে করার অর্থ হল বিভ্রম ও বাস্তবের মধ্যকার যোগসূত্রটির যে ক্ষয়ক্ষতিপূরক ও গতিশীল প্রকৃতি রয়েছে তা দেখতে না পাওয়া। প্রকৃতপক্ষে ফলটা হয় এর বিপরীত। এর ফল হয় এই যে কবি আরও বেশি বেশি করে এটাই মনে করেন যে তিনি নিজে যেন সমাজ থেকে দূরে সরে যাওয়া এক মানুষ, যেন এক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-পরায়ণ মানুষ যিনি কেবলমাত্র তাঁর নিজের হৃদয়ের সহজপ্রবৃত্তিগুলিকেই পূরণ করেন এবং সমাজের দাবিগুলির প্রতি তাঁর কোনও দায়িত্ব নেই—সমাজের সেই দাবিগুলি নাগরিকের কর্তব্য, ঈশ্বর সম্পর্কে ভীতি বা কুবের'এর বিশস্ত সেবক যেরূপেই প্রকাশ পাক না কেন। একই কালে তাঁর কবিতাগুলি আরও বেশি বেশি করে আপনাতে আপনি সার্থক বলে মনে হতে থাকে।

বুর্জোয়া দ্বন্দ্বের এটা হল বিস্ফোরণাত্মক অন্তিম গতি। বুর্জোয়া বিভ্রম ইতোমধ্যেই এক নঞর্থক ধারণা থেকে আর এক নঞর্থক ধারণার দিকে [antithesis to antithesis] দিক পরিবর্তন করেছে, কিন্তু এই শেষ অন্তিম-গতির কারণে ফ্লাইহুইল কেটে গিয়ে ধাতুর ঘুরন্ত টুকরা যেমন ছিটকে বেরিয়ে যায় সেই রকমভাবে চিন্তাজগতের বুর্জোয়া বিবেরগুলির কক্ষপথের বাইরে পুরাপুরি বেরিয়ে যাওয়াই সেই বিভ্রমের পক্ষে শুধুমাত্র সম্ভব।

যা ছিল হস্তশিল্পের যুগের বৈশিষ্ট্য সেই স্বার্থরক্ষামূলক ব্যবস্থা ও আমদানির উপর শুল্কের জালবুনানির নীচে আঠারশ শতকের আপোষের ফলে

বুর্জোয়া অর্থনীতির বিকাশ সেই পর্যায়ে পৌঁছেছিল যখন যন্ত্র ব্যবহারের, ষ্টিম এঞ্জিন ও পাওয়ার লুম ব্যবহারের সাহায্যে সেই অর্থনীতি এক বিপুল আত্মপ্রসারণের ক্ষমতা লাভ করেছিল। হস্তশিল্প ছিল খামারেরই একটা অংশ; ফ্যাক্টরির রূপ গ্রহণ করার পর একই সঙ্গে তা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল খামার থেকে এবং প্রবলতর ও বিরোধী শক্তি হিসাবে তাকে চ্যালেঞ্জ করল।

একদিকে ফ্যাক্টরির অভ্যন্তরে সংগঠিত শ্রমিক আরও বেশি হারে সংখ্যায় বেড়ে চলল, অপরদিকে বহির্বাজারের নিজস্ব নৈরাজ্যও বেড়ে উঠল। একদিকে উৎপাদনের ক্রমবর্ধমান সর্বজনভিত্তিক রূপ, অপরদিকে ভোগের ক্রমবর্ধমান ব্যক্তিগত রূপ। এক মেরুতে ক্রমবর্ধমান ভূমিহীন ও যন্ত্রপাতিহীন সর্বহারা, অপর মেরুতে আরও বেশি ধনী-হয়ে-ওঠা বুর্জোয়া। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে এই স্ব-বিরোধ শিল্পবিপ্লবকে এক প্রচণ্ড গতি-বেগ [momentum] দিল।

যে বুর্জোয়ারা স্বাধীনতা সম্পর্কে নিজেদের বিপ্লবী-পিউরিট্যান আদর্শকে "চরমপন্থী" বলে আগেই বুঝেছিল এবং শাশ্বত যুক্তিবাদী পথ বলে ব্যবসায়ী-সুলভ সুরুচির আপোষপন্থায় ফিরে গিয়েছিল তারাই এখন দেখল যে তাদের আদর্শটা ঠিক কাজই করেছিল, তাদের যুক্তিটাই ছিল ভুল।

এটা সর্বপ্রথম প্রকাশ পেল ভূতপূর্ব অভিজাত-ভূস্বামী ও শিল্প-বুর্জোয়ার মধ্যকার একটা বিচ্ছেদ হিসাবে, যার প্রকাশ ঘটল খামারগুলির ওপর ফ্যাক্টরির আধিপত্য বেড়ে ওঠার মধ্যে। অভিজাত-ভূস্বামী এবং তার বেড়ে ওঠার অনুকূলে যে বিধিনিষেধগুলির জন্য সে দাবি করেছিল, এখন সেগুলি শিল্প-পুঁজি এবং তার দাবিগুলির দ্বারা মুখোমুখি বাধা পেতে থাকল। পুঁজি শিল্পে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির মধ্যে এবং কাঁচা মালের বহির্দেশীয় উৎসের মধ্যে এক অফুরন্ত আত্মপ্রসারণাত্মক ক্ষমতা লাভ করেছিল। এর কাছে পূর্ববর্তী অন্য কোন রূপ মূল্যবান হওয়া দূরে থাক সেগুলি হয়ে উঠল বাধা-নিষেধ। শ্রমশক্তির জন্য খরচা এখন নিশ্চিন্তে তার প্রকৃত মূল্যতে নামিয়ে দেওয়া যেতে পারে, কারণ যন্ত্র এখন প্রতিযোগিতা দ্বারা তার সেবা করার জন্য যে সর্বহারার প্রয়োজন সেই সর্বহারার জন্ম দিল। এদিকে শ্রমশক্তির প্রকৃত মূল্য আবার পণ্যের প্রকৃত মূল্যের উপর নির্ভর করে। ইংলণ্ডের তুলনায় উপনিবেশগুলিতে ও আমেরিকায় পণ্যের প্রকৃত মূল্য কম, কারণ সেখানে তা অপেক্ষাকৃত কম সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় শ্রমের দ্বারা গঠিত। অতএব শস্য-আইন, যা কৃষিভিত্তিক পুঁজিপতির স্বার্থরক্ষা করে তা শিল্পপতিকে বাধা দেয়। এদের স্বার্থ, মজুরি-শ্রমের ঘাটতির মূলে যার সমযোজনা হয়েছিল—

এখন তা হয়ে উঠল পরস্পর বিরোধী। শিল্প-বুর্জোয়ার এই অবাধ সম্প্রসারণকে এখন যে সমস্ত রূপ ও বাধানিষেধ তার বিরোধিতা করে তার সবগুলিকে চূর্ণ করতেই হবে। এই চূর্ণ করার কাজটি সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে বুর্জোয়ারা তার নিজের পতাকার তলায় অন্যান্য সব শ্রেণীকে সমবেত হতে ডাক দেয়, ঠিক সেই পিউরিট্যান বিপ্লবের সময়কার মত। পীড়নকারীর বিরুদ্ধে এবং জনগণের পক্ষে কথা বলার দাবি সে করে। শাসন-সংস্কার ও শস্য আইন রদ করার দাবি সে করল। চার্চকে সে আক্রমণ করে, হয় পিউরিট্যান (মেথডিস্ট) হিসাবে, না হয় প্রকাশ্য সংশয়বাদী হিসাবে। সমস্ত আইন-কানুনই সাম্যের [equality] পক্ষে বাধানিষেধ আরোপ করে—এই বলে সে আক্রমণ করল। মানুষ স্বাভাবিকভাবে ভালো, স্বাধীন হয়ে সে জন্মেছে কিন্তু সর্বত্র সে শৃঙ্খলবদ্ধ—এই ধারণাকে সে তুলে ধরল। আইন, শাস্ত্রীয় বিধি, প্রচলিত বিধি ও ঐতিহ্যের বর্তমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এই ধরনের বিদ্রোহ হল যুক্তির বিরুদ্ধে হৃদয়ের বিদ্রোহ, বন্ধ্যা আচারবাদ ও অতীতের স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে অনুভূতি ও ভাবাবেগের বিদ্রোহ বলেই সর্বদা আবির্ভূত হয়। মার্লো, শেলি, লরেন্স ও দালির মধ্যে একটা মিল রয়েছে এখানে; প্রত্যেকেই এই বিদ্রোহকে সেই সেই যুগের পক্ষে যথোপযুক্ত ঢঙে প্রকাশ করে।

বুর্জোয়া প্রতি পদক্ষেপেই বিপ্লবী কারণ প্রতি পদক্ষেপেই সে তার নিজের ভিত্তিকে বিপ্লবায়িত করছে—এই কথাটি হৃদয়ঙ্গম না করলে কাব্যের এই অস্থির চলনটি আমরা বুঝতে পারব না। কিন্তু এই কাজের দ্বারা বুর্জোয়া সেই ভিত্তিকেই কেবল ক্রমাগত আরও বেশি বুর্জোয়া করে তোলে। একইভাবে প্রত্যেক বুর্জোয়া কবিই বিপ্লবী, কিন্তু যে বন্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে তার এই বিপ্লবী কাব্য সেই বন্ধকে যে চলনটি আরও বেশি প্রবলভাবে প্রকাশ্যে নিয়ে আসে, সেই চলনটাকেই সে প্রকাশ করে। তারা হল "দর্পণবিপ্লবী"। দর্পণের মধ্যে এক লক্ষ্যবস্তুতে তারা পৌঁছানর চেষ্টা করে, ফলে প্রকৃত বস্তু থেকে তারা আরও দূরে সরে যায়। আর সেই উৎপাদনকারী ও কবি হিসাবে মানুষের যা সাধারণ লক্ষ্যবস্তু—অর্থাৎ স্বাধীনতা—সেটি ছাড়া এই লক্ষ্যবস্তুটি আর কি হতে পারে? আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যবস্তুকে আয়ত্ত করার জন্য যতই তারা অগ্রসর হয় ততই তারা সেটা থেকে অবিরাম দূরে সরে যায়, এই ঘটনা থেকেই তাদের ট্র্যাজেডি ও হতাশার তীব্রতার উদ্ভব। সেই "নিঠুরা রূপসী কামিনী" [La Belle Dame Sans Merci] তাদের সকলকে বন্দী করে রেখেছে। ঘুম ভাঙলে দেখতে পায় যে তারা হিমশীতল পর্বতপ্রান্তে পড়ে রয়েছে।

২

ব্লেক, বায়রন, কীটস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও শেলি নিজ নিজ ভিন্ন পথে এই মধ্যবর্গগত বিপ্লবকে একটা রোমান্টিক বিপ্লব বলে প্রকাশ করেছেন।

বায়রন একজন অভিজাত কিন্তু একটি শক্তি হিসাবে তাঁর শ্রেণী যে ভেঙে গিয়েছে এবং বুর্জোয়ার পক্ষে চলে যাওয়া যে তাঁর পক্ষে প্রয়োজনীয় সে বিষয় তিনি সচেতন। সেই কারণেই তাঁর মধ্যে মানব-দ্বেষ ও রোমান্টিসিজমের বিকাশ।

বিপ্লবের মুহূর্তে এই দলত্যাগীরা সর্বদাই কাজে লাগে এবং সর্বদাই তারা বিপজ্জনক মিত্র। প্রায়ই দেখা যায় যে তাদের নিজেদের শ্রেণী পরিত্যাগ করা এবং অন্য শ্রেণীর প্রতি তাদের অনুরাগ "ঐতিহাসিক চলনটিকে সামগ্রিক-ভাবে বুঝতে পারা" ততটা নয়, যতটা তা তাদের নিজেদের শ্রেণীর তাদের উপর যে শ্বাসরোধকারী অবস্থা জোর করে চাপিয়ে দেয় তার বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ। এবং এক আত্মসর্বস্ব নৈরাজ্যের মানসিক অবস্থায় তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত লড়াইয়ে অন্য শ্রেণীর আশা আকাঙ্ক্ষাকে তা একটা হাতিয়ার হিসাবে আঁকড়িয়ে ধরে। তারা সর্বদাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী রোমান্টিক চরিত্র যার মধ্যে অনেকখানি মাত্রায় নাটকীয় ভঙ্গী মিশে থাকে। তারা নিজেদের শ্রেণীর ধ্বংস কামনা করে কিন্তু অন্য শ্রেণীর উত্থান কামনা করে না। আর এই উত্থান যখন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং মুমূর্ষু শ্রেণীর প্রতি তাদের নিছক ধ্বংসাত্মক শত্রুতাকে নতুন শ্রেণীর গঠনমূলক মনোভাবে পরিবর্তিত করুক এই দাবি করে, তখন কথায় না হলেও কাজে শত্রুর হাতে তাদের ঠেলে দিতে পারে। তারা তখন প্রতিবিপ্লবী হয়ে ওঠে। দাঁতঁ (Danton] এবং ট্রট্স্কি এই টাইপের উদাহরণ। এই ধরনের কোন সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটার আগেই মিসোলংঘিতে বায়রনের মৃত্যু ঘটে, কিন্তু এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে তিনি স্বাধীনতার পক্ষে ইংলণ্ডের থেকে বরং গ্রীসের পক্ষে লড়াই করার জন্য বেশি প্রস্তুত ছিলেন। যুক্তির বিরুদ্ধে হৃদয়ের বিদ্রোহ তাঁর মধ্যে পরিবেশের বিরুদ্ধে, নীতির বিরুদ্ধে, সমস্ত "ভদ্রতা" ও প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে নায়কের বিদ্রোহ হিসাবে দেখা যায়। এই বায়রনবাদ খুবই লক্ষণসূচক (S; mptomatic) এবং এটাও খুব লক্ষণসূচক যে বায়রনের মধ্যে এর সঙ্গে পুরাপুরি স্বার্থপরতা ও অন্যের ইন্দ্রিয়ানুভূতির প্রতি ঔদাসিন্য জড়িত দেখা যায়। মিলটনের শয়তান এক নতুন ছদ্মবেশ ধারণ করেছে, অবশ্য তা শয়তানের থেকে অনেক কম মাত্রায় মহান, এমন কি বদমেজাজী।

বায়রণ সব থেকে বেশি সার্থক ব্যবহারকারী হিসাবে—ডন জুয়ান হিসাবে। একদিকে মানবদ্বেষী হওয়া, মানব অস্তিত্বের প্রহসনকে ব্যক্ত করা, অপরদিকে ভাবালু হওয়া এবং বর্তমান সমাজ যেভাবে একজন মানুষের চমৎকার যোগ্যতাবলীকে পীড়ন করছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা—এই হল বায়রণবাদের সারমর্ম। অভিজাত মহলের মধ্যে নীতিহীনতার, আবার সেই সঙ্গে অভিজাতদের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহেরই তা প্রতিনিধিত্ব করে। এই লোকগুলি সেইজন্য মৃত্যু-চিন্তায় সর্বদাই মগ্ন। এই মৃত্যুচিন্তা হলো ক্যাসিবাদ যখন তার শেষ লড়াই চালায় তার তখনকার মৃত্যুচিন্তা, জ্যাকোবাইটদের মৃত্যুচিন্তার সমতুল, আরও বেশি অনিশ্চয়তাপূর্ণ এক জীবনকে সমর্থন ক'রে বীরের মত মৃত্যু বরণের জয়গান। এই অভিজাতরা যদি বিপ্লবী হয়ে যায় তাহলে তাদের মধ্যে একই গোপন মৃত্যু-আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়; তাঁরা তখন অসাধারণ ব্যক্তিগত বীরত্বের কাজ করে থাকেন—যা কখনও অপ্রয়োজনীয়, কখনও বা প্রয়োজনীয়, কিন্তু সর্বদাই রোমান্টিক ও নিঃসঙ্গ। বিপ্লবের নায়ক যেন এক মহীয়া ব্যক্তি—এই ধারণার ঊর্ধ্বে তাঁরা কিছুতেই উঠতে পারেন না।

শেলি অবশ্য আরও অনেক সাচ্চা গতিশীল শক্তিকে প্রকাশ করেন। তিনি বুর্জোয়ার পক্ষে বলেছেন যে বুর্জোয়ারা ইতিহাসের এই পর্যায়ে নিজেদের সমাজের গতিশীল শক্তি বলে অনুভব করেছে এবং সেই কারণে কেবল মাত্র নিজেদের জন্যই দাবি তোলে নি, দুঃখদুর্দশাগ্রস্ত সমস্ত মানুষের জন্যই দাবি তুলেছে। এটা তাদের মনে হয়েছে যে তারা যদি নিজেদের আকাঙ্ক্ষা একবার পূর্ণ করতে পারতেন, অর্থাৎ তাদের নিজেদের স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তগুলি বাস্তবায়িত করতে পারতেন, তাহলে সেটাই আপনা থেকে সকলের জন্য স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করত। শেলি বিশ্বাস করেন যে তিনি সমস্ত মানুষের হয়ে, সমস্ত দুঃখদুর্দশাগ্রস্ত মানুষের হয়ে কথা বলছেন, এবং তাদের সকলকেই এক উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য ডাক দিচ্ছেন। বাণিজ্যভিত্তিক [mercantilism] যুগের বাধানিষেধের নিগড়ে বন্দী বুর্জোয়া হল প্রমিথিউস, মানুষের জন্য যিনি অগ্নি নিয়ে এসেছিলেন, যন্ত্র-ব্যবহারকারী পুঁজিপতির যোগ্য প্রতীক। তাকে মুক্ত করতে পারলেই জগৎ মুক্ত হবে। গডউইনপন্থী শেলি বিশ্বাস করতেন যে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই ভালো [good]—প্রতিষ্ঠানগুলি তাকে মন্দ করে তুলেছে। এই যুগের বুর্জোয়া কবিদের মধ্যে শেলি হলেন সব থেকে বেশি বিপ্লবী, কারণ প্রমিথিউস আনবাউণ্ড একটা অতীতের মধ্যে যাত্রা নয়, তা হল বর্তমানের

স্বর্গ এক বিপ্লবী কর্মসূচী। তাঁর নিজের কালের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবী আন্দোলনে শেলির নিজের ঘনিষ্ঠ যোগদানের সঙ্গে তা খাপ খায়।

শেলি নিরীশ্বরবাদী হলেও বস্তুবাদী নন। তিনি ভাববাদী। তাঁর শব্দতাত্ত্বিক সর্বপ্রথম সচেতনভাবে ভাববাদী বলে দেখা গেল—অর্থাৎ, "উজ্জ্বলতা", "সত্য", "সুন্দর", "আত্মা"; "ঈশ্বর", "পদ্ম", "মূর্ছা যাওয়া" "ঘন ঘন শ্বাস ফেলা"র মত শব্দে পূর্ণ, যে সব শব্দ অস্পষ্ট আবেগের একটা গোটা জগতকে নাড়া দেয়। এই ধরনের এষণাগুলি তাদের অসংখ্য আবেগগত অনুষঙ্গের কারণে শব্দগুলি আপাতঃদৃষ্টিতে একটি সুস্পষ্ট মূর্ত সামগ্রী সূচিত করছে বলে মনে হয়, যদিও প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের কোনও সামগ্রীর অস্তিত্ব নেই, আসলে প্রতিটি শব্দই নানা ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ধারণাকে সূচিত করে।

এই ভাববাদ হল এক বিপ্লবী বুর্জোয়া বিশ্বাসেরই প্রতিফলন। সে বিশ্বাস হল এই যে, যে বর্তমান সামাজিক সম্পর্কগুলি মানুষকে বাধা দিচ্ছে সেগুলি চূর্ণ করতে পারলেই "স্বাভাবিক মানুষ বাস্তব রূপ লাভ করবে" [the "natural man will be realised"]—তার অনুভূতি, তার আবেগ, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, সবকিছু তৎক্ষণাৎ বস্তুগত বাস্তব হিসাবে দেহ ধারণ করবে। শেলি এটা দেখতে পান না যে এই চূর্ণ সামাজিক সম্পর্কগুলি যে শ্রেণীর সেগুলিকে চূর্ণ করার মত যথেষ্ট শক্তি আছে সেই শ্রেণীর সামাজিক সম্পর্কগুলিকেই কেবলমাত্র জায়গা ছেড়ে দিতে পারে এবং যে কোন ক্ষেত্রেই এই অনুভূতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আবেগগুলি যে সামাজিক সম্পর্কগুলির মধ্যে তাঁর নিজেরও অস্তিত্ব সেই সামাজিক সম্পর্কগুলিরই ফল এবং সেগুলি অর্জন করতে হলে একটা সামাজিক ক্রিয়ার প্রয়োজন, এই ক্রিয়াটি আবার মানুষের অনুভূতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আবেগগুলির উপর প্রভাব ফেলে।

কাব্যের ক্ষেত্রে বুর্জোয়া বিভ্রম হল একটা বিদ্রোহ। ওয়ার্ডসওয়ার্থের মধ্যে এই বিদ্রোহ স্বাভাবিক মানুষে প্রত্যাবর্তনের রূপ নেয়, শেলির ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায় ঠিক সেই রকম। শেলির মতই ফরাসী রুশোবাদ যাঁরা গভীরভাবে প্রভাবিত ওয়ার্ডসওয়ার্থও স্বাধীনতা, সৌন্দর্য—মানুষের মধ্যে তাঁর সামাজিক সম্পর্কগুলির কারণে এখন যা আর নেই—সেই সবের সন্ধান করেছেন "প্রকৃতির" মধ্যে। ফরাসী বিপ্লব এখন এসে বাঁকপথে দাঁড়িয়েছে। বুর্জোয়ার স্বাধীনতার দাবিতে এখন একটা পশ্চাদপসৃতির আভাস দেখতে পাওয়া যায়। এখন আর সে বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতালাভের আশা করে না, স্বাভাবিক মানুষে প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতালাভের আশা করে।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের "প্রকৃতি" অবশ্যই সেই প্রকৃতি নয় যা যুগ যুগ ধরে মানুষের কাজের ফলে বন্য পশুও বিপদ থেকে মুক্ত হয়েছে। তাঁর প্রকৃতি হল সেই প্রকৃতি যার মধ্যে কবি যখন শিল্পযুগের দ্বারা "কলুষিত নয়" এমন এক প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করছেন তখন তারই সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিন্ত উপার্জন ভোগ করেছেন, শিল্পযুগের ফলগুলির উপর নির্ভর করে বেঁচে আছেন। কৃষিভিত্তিক পুঁজিবাদের থেকে শিল্পভিত্তিক পুঁজিবাদের বিচ্ছেদটাই এখন গ্রামকে শহর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। শিল্পযুগের সঙ্গে জড়িত শ্রম-বিভাজন যথেষ্ট উদ্বৃত্ত উৎপন্ন দ্রব্যের অস্তিত্ব সম্ভবপর করে তুলেছে যাতে করে কাম্বারল্যাণ্ডে বিলাসিতাবর্জিত আলস্যে দিনযাপনরত কবির ভরণপোষণ সম্ভব। কিন্তু এই দুটির মধ্যকার সম্পর্কটিকে দেখতে পাওয়ার যে সংস্কৃতি, ভাষার অধিকার ও অবসর একজন প্রকৃতির কবি ভোগ করে থাকেন এবং যা তাঁকে মূক মনুষ্যেতর প্রাণীর থেকে আলাদা করেছে তা যে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ফল এটা দেখতে পাওয়ার অর্থ হল বুর্জোয়া বিভ্রমটাকে ছিন্ন করে ফেলা এবং "প্রকৃতির" কবিতার কৃত্রিমতাকে উদঘাটিত করে দেওয়া। এই ধরনের কাব্যের উদ্ভব মাত্র তখনই সম্ভব যখন মানুষ শিল্পায়নের সাহায্যে প্রকৃতিকে জয় করেছে বটে কিন্তু নিজেকে জয় করেনি।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ সেই কারণে নিরাশাবাদী। শেলির বিপরীতভাবে, তিনি পশ্চাৎগতিমুখী বিদ্রোহ করেন—কিন্তু সেটাও তিনি করেন বুর্জোয়াদেরই মত। সামাজিক সম্পর্কগুলি থেকে স্বাধীনতার জন্য দাবি করে তিনি শিল্পভিত্তিক সমাজের বিশিষ্ট সামাজিক সম্পর্কগুলি থেকে স্বাধীনতার দাবি করেন, অথচ একমাত্র এই সম্পর্কগুলি থেকে যে ফলগুলি পাওয়া সম্ভব সেই ফলগুলিকে অর্থাৎ স্বাধীনতাকেও তিনি ভোগ করবেন।

এর সঙ্গে এই তত্ত্বও তিনি হাজির করেন যে "স্বাভাবিক' অর্থাৎ কথোপকথনের ভাষা বেশি ভালো, অতএব তা "কৃত্রিম' অর্থাৎ সাহিত্যিক ভাষার থেকে বেশি কাব্যগুণসম্পন্ন। এটা তিনি দেখতে পান না যে দুটোই সমান কৃত্রিম—অর্থাৎ সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরিচালিত—এবং সমান স্বাভাবিক, অর্থাৎ তা প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রামের ফল। সেগুলি সেই সংগ্রামেরই বিভিন্ন ক্ষেত্র ও স্তরকেই মাত্র সূচিত করে এবং সেগুলি নিজেরা ভালো বা মন্দ নয়, এই সংগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কে সেগুলি ভালো বা মন্দ। এই তত্ত্বের দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ার কারণে ওয়ার্ডসওয়ার্থের রচিত কোনও কোনও কাব্য নিকৃষ্ট হয়ে পড়েছে।

বুর্জোয়া বিপ্লবের যে রূপ ওয়ার্ডসওয়ার্থ দেখেছেন তার সঙ্গে মিলটনের দেখা রূপের কিছুটা মিল আছে। দুজনেই স্বাভাবিক মানুষের জয়গান করেছেন। একজন করেছেন পিউরিট্যান "আত্মার" রূপে, অপর জন করেছেন আরও বিশুদ্ধ সর্বেশ্বরবাদী "প্রকৃতির" রূপে। একজন মানুষের স্বাভাবিক নিষ্পাপতার প্রমাণ হিসাবে আদি মানুষ আদমের উল্লেখ করেন, অপর জন করেন আদি শিশুর। একটি ক্ষেত্রে আদি পাপ, অপরটিতে সামাজিক সম্পর্ক স্বর্গরাজ্য থেকে পতনের কারণ। সেইজন্য দুজনেই যখন সচেতনভাবে মহান ও উচ্চস্তরে উন্নীত তখনই তাঁদের সর্বোৎকৃষ্ট রূপে দেখতে পাওয়া যায়। প্রাথমিক পুঁজিসঞ্চয় এবং তা যে সরল যুবরাজসুলভ বাসনা ও সংকল্পের উপর দেবত্ব আরোপ করেছিল মিল্টন অবশ্য তার বিরোধিতা করে মানুষের মধ্যকার বস্তু উপাদানকে, স্বাভাবিক মানুষকে গৌরবময় করে দেখাননি—সে কাজ করেছেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ। সেইজন্য মিল্টন সেই করণকৌশলগত অভ্যের হাত থেকে রেহাই পেয়েছেন যে তত্ত্ব কাব্যে "নিমগ্ন হওয়ার" ["sinking"] প্রশ্রয় দেয়।

কীটস হলেন প্রথম বড় কবি যিনি বুর্জোয়া বিপ্লবের এই পর্যায়ে অবাধ বাজারের জন্য উৎপাদনকারী হিসাবে কবির অবস্থানের চাপটি অনুভব করেছিলেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থের আয় অল্প; সর্বদা অভাবপীড়িত হলেও শেলি ছিলেন ধনী পরিবারের সন্তান এবং তাঁর অভাব হল শুধু অসাবধানতা, দানপরায়ণতা ও সাধ্যহীনতা [impracticability] যা প্রায়ই ধনী গৃহের প্রতি এক বিশেষ মেজাজসম্পন্ন মানুষের প্রতিক্রিয়া। কিন্তু কীটস আসছেন এক ক্ষুদ্র বুর্জোয়া পরিবার থেকে এবং আর্থিক সমস্যায় সর্বদাই পীড়িত। তাঁর কবিতাগুলি বিক্রি হওয়াটা তাঁর কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়।

কীটসের পক্ষে স্বাধীনতা সেই কারণে ওয়ার্ডসওয়ার্থের মত প্রকৃতিতে ফিরে যাওয়ার মধ্যে নয়। তাঁর কাছে প্রকৃতিতে ফিরে যাওয়ার সঙ্গে সর্বদাই জড়িত সেই অস্বস্তিকর দুশ্চিন্তা, টাকা আসবে কোথা থেকে? তাঁর স্বাধীনতা শেলির মত এই জগতের সামাজিক সম্পর্কগুলি থেকে মুক্তির মধ্যে হতে পারেনা, কারণ নিছক আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতালাভ করলেও জীবনযাত্রানির্বাহের জন্য উপার্জনের সমস্যাটা ব্যক্তির থেকেই যাচ্ছে। সেইজন্য বুর্জোয়া বাস্তব সম্পর্কে কীটসের অধিকতর জ্ঞান তাঁকে সেই অবস্থানে নিয়ে গিয়েছিল যা ভবিষ্যৎ বুর্জোয়া কাব্যের মূল সুরটি বেঁধে দিল। সেই সুরটি হল: বাস্তব থেকে পলায়ন হিসাবে "বিভ্রম"। কীটস হলেন

রোমান্টিকতার পুনর্জাগরণের পতাকাবাহক। "কাব্যের অদৃশ্য পাখায় ভর দিয়ে" কবি পলায়ন করেন রোমান্স, সৌন্দর্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এক জগতে যা প্রাত্যহিক জীবনের দরিদ্র, কঠোর বাস্তব জগৎ থেকে ভিন্ন, বাস্তব জগৎকে তা মধুর করে তোলে কিন্তু তার নিজের মাধুর্যের দ্বারাই সেই বাস্তব জগৎকে নীরবে ধিক্কার দেয়।

এ হল সেই ছায়াচ্ছন্ন মায়াময় জগৎ যা লামিয়া গড়েছিল তার প্রণয়ীর জন্ম বা চন্দ্রমা গড়েছিল এন্ডিমিয়নের জন্য। এ হল স্বর্ণতোরণশোভিত হাইপারিয়ন'-এর ঊর্ধ্বলোক, শব্দ দ্বারা চিত্রিত বুলবুলি পাখির জগৎ, গ্রীসিয়ান আর্ণের জগৎ, সেইন্ট অ্যাগনেস-এর জগৎ। এই অন্ত জগৎ স্পর্ধার সঙ্গে বাস্তব জগতের বিপরীতে উপস্থাপিত।

"Beauty is truth, truth beauty"—that is all

Ye know on earth, and all ye need to know.

আর সন্ন্যাসীর বেশে, প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির বেশে বা প্রত্যাহের বিরস শক্তির বেশে কঠিন বাস্তব সর্বদাই তার দিকে ভ্রূকুটি করে। ইজাবেলার প্রেমের জগৎ চুরমার হয়ে যায় দুই অর্থগৃধ্নু ভাইয়ের হাতে। এমন কি দি ইভ অব সেন্ট এ্যাগনেস-এর বক্ত মাধুর্য দুই ঝঞ্ঝার অন্তর্বর্তী সামান্য বিরতি মাত্র, শৈত্য ও অন্ধকারের বুক থেকে ছিনিয়ে নেওয়া একটুকরো রঙীন স্বপ্ন মাত্র—শেষের স্তবকগুলি অবক্ষয়ের জয়গানে মুখর। ঘুম ভাঙার আগে মুগ্ধ প্রণয়ী তার "নিঠুরা মোহিনীর" কাছ থেকে পায় শুধু স্বল্পক্ষণস্থায়ী আনন্দ। ইজাবেলার প্রেমিকের গলিত মুণ্ড থেকে প্রস্ফুটিত বাজিলের উদ্গম, প্রণয়িনীর অশ্রুতে তা সিক্ত।

The fancy cannot cheat so well

As she is famed to do, deceiving elf!

Was it a vision or a waking dream?

Fled is that music—do I wake or sleep?

কর্টেজ'এর মত মুগ্ধ চোখে কীট্স্ চেয়ে থাকেন কাব্যের নতুন জগতের দিকে, চ্যাপম্যানের স্বর্ণরাজ্যের দিকে, পুরাতনের তুলাদণ্ডের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য যাকে গড়ে তোলা হয়েছে, কিন্তু যতই সেই জগতে পাড়ি দেওয়া যাক না কেন সে শুধু এক কল্পরাজ্যই থেকে যায়।

কীটসের রচনা থেকে এক নতুন শব্দভার উদ্ভূত হতে থাকে, ভাবী কাব্যের প্রভাববিস্তারী শব্দভার। ওয়ার্ডসওয়ার্থের শব্দভাণ্ডার নয়, কারণ তার আবেদন গ্রামের অকলুষিত সরলতার কাছে নয়। শেলিরও নয়—কারণ

এই আবেদন প্রকৃত বস্তুগত জগতের উপরের স্তরে ভেসে ওঠা "ধ্যানধারণার" ফাছে নয় যে ফেনার মত তা তুলে ফেলে দেওয়া যাবে। এরা হল প্রকৃত বস্তু-জগতের একটা অংশ, আর এই তত্ত্ববিভামূলক জগতগুলির ফেনা বড় বেশি বস্তুভারহীন এবং সেই কারণে যে বাস্তব জগৎ থেকে তার সৃষ্টি সেই বাস্তব জগতের কথা সর্বদাই সে মনে পড়িয়ে দেয়। এমন একটা জগৎ গড়ে তুলতে হবে যেটা আরও বেশি বাস্তব। বাস্তব এই কারণে যে সেটা আরও বেশি অবাস্তব এবং সার্থক ভোজবাজি দেখতে পারার যোগ্য আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বাস্তব জগতের মোকাবিলা করার উপযুক্তভাবে যথেষ্ট মাত্রায় অভ্যন্তরীণ কাঠিন্য তার থাকে।

বাস্তব জগতের সব থেকে বেশি স্বাভাবিক, আত্মিক ও সুন্দর অংশ বলে যাকে গণ্য করা যায়, ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও শেলির মত সেই অংশটিকে গ্রহণ করার পরিবর্তে, শব্দ দিয়ে এক নতুন জগৎ গড়ে তোলা হল। মোজাইক শিল্পীর মত করে এবং সেই কারণে এই শব্দগুলির ঘনত্ব ও বাস্তবত্ব থাকতেই হবে। কীটসের শব্দসজ্জার সেই রকম শব্দে পূর্ণ যার একটা কঠিন বস্তুগত বুনন আছে তেসিরার [tesserae] মত, কিন্তু এ এক "কৃত্রিম" বুনন—সব কিছু অলঙ্কারযুক্ত, সুগন্ধ, অপ্রচলিত, দৃঢ়, রত্নখচিত ও সমকালীনতা-বিরোধী। মিসাল চিত্রণের মত তা উজ্জ্বল। এই জগৎ আরও বেশি বেশি মাত্রায় সামন্ততান্ত্রিক জগতের মধ্যে স্থাপিত, কিন্তু সেটা সামন্ততান্ত্রিক জগৎ নয়। এ একটা বুর্জোয়া জগৎ—গথিক ক্যাথিড্রালের জগৎ এবং পরবর্তী যুগের সামন্ততন্ত্রের অধীনে বুর্জোয়া শ্রেণীর সমস্ত ক্রমবর্ধমান সজীবতা ও সতেজতা দিয়ে গড়া জগৎ। এখানেও কাব্যগত বিপ্লবের একটা জোরাল পশ্চাৎমুখী চরিত্র থাকে, ঠিক যেমন ওয়ার্ডসওয়ার্থের মধ্যে তা ছিল, কিন্তু সব থেকে বেশি যথার্থ বিপ্লবী কবি, শেলির মধ্যে তা ছিলনা।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, অবাধ প্রতিযোগিতা, সামাজিক সম্পর্কগুলির অনস্তিত্ব, এবং আরও বেশি সাম্যের জন্য বুর্জোয়া যতই নতুন নতুন দাবি করতে থাকে ততই সে আরও বড় সংগঠন, আরও জটিল সামাজিক সম্পর্ক, আরও বেশি মাত্রায় ট্রাস্ট ও সংযুক্ত শিল্প গঠন, আরও বেশি অসাম্যের জন্ম দেয়। কিন্তু তা হলেও এই সব পরস্পর-বিরোধী চলনগুলি তার ভিত্তিকে বিস্তারিত করে এবং নতুন নতুন উৎপাদিকা শক্তির জন্ম দেয়। একইভাবে শেলি, ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কীটসের কাব্যে প্রকাশিত বুর্জোয়া বিপ্লব, তার চলন পরস্পরবিরোধী হলেও কাব্যের নতুন নতুন করণকৌশলের বিপুল সম্ভার

গড়ে তুলেছে এবং এই শিল্পের সমগ্র সরঞ্জামটাকে [apparatus] বিস্তারিত করেছে।

মূলগত চলনটি অনেক ব্যাপারে যে প্রাথমিক পুঁজিসঞ্চয় এলিজাবেথীয় কাব্যের উত্থান ঘটিয়েছিল তার চলনের সঙ্গে সমান্তরাল। সেই কারণে এই যুগে কবিদের মধ্যে শেকসপীয়র ও এলিজাবেথীয় কবিদের সম্পর্কে আগ্রহে একটা পুনর্জাগরণ দেখা যায়। এলিজাবেথীয় যুগের কাব্যে প্রকাশিত অনিগত ব্যক্তিসত্তার বিদ্রোহাত্মক ক্ষোভের একটা যৌথ চেহারা দেখা যায়; কারণ তা ছিল সেই যৌথমূর্তির উপর, যুবরাজের উপর কেন্দ্রীভূত। স্বতন্ত্র ব্যক্তির, "স্বাধীন" বুর্জোয়ার ভাবালুতা ও আবেগের প্রকাশ হিসাবে রোম্যান্টিক কাব্যে তার একটা আরও বেশি কৃত্রিম চালচলন আছে। কাব্য নিজেকে কাহিনী থেকে পৃথক করে ফেলেছে, হৃদয়কে বুদ্ধি থেকে, ব্যক্তিকে সমাজ থেকে, সবই আরও বেশি কৃত্রিম, পৃথকীভূত ও জটিল হয়ে উঠেছে।

কবি এখন পণ্য উৎপাদনের লক্ষণ দেখাতে সুরু করেছেন। পরবর্তীকালে এটা যখন কাব্যের সমগ্র সুরটি বেঁধে দেবে তখন তার আরও বিশ্লেষণ করা যাবে। বর্তমানে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হল কীটসের সেই উক্তিটি যে তিনি সারাজীবন লিখে যেতে এবং পরে তা পুড়িয়ে ফেলতে পারেন। কবিতা ইতোমধ্যেই লেখার জন্য লেখার ব্যাপার হয়ে উঠেছে।

কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যেটা লক্ষ্য করা যায় তা হল এখন থেকে "বড়" এই বিশেষণ দেওয়ার যোগ্য সমস্ত বুর্জোয়া কাব্যেই একটা ট্র্যাজেডির ছায়া ফেলেছে। কাব্য হয়ে উঠেছে নিরাশাবাদী বা আত্মবিরোধী। বায়রণ, কীটস ও শেলি অল্প বয়সে মারা গেলেন। কিন্তু তাঁদের শ্রেষ্ঠ রচনা লিখিত হওয়ার পূর্বেই তাঁদের মৃত্যু ঘটেছিল বলে দুঃখ করাটাই যদিও সহজ, তবু সুইনবার্ণ ও টেনিসনের উদাহরণ থেকে বেশ স্পষ্ট হয়েই ওঠে যে ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। ব্যাপারটা হল এই যে তাদের মৃত্যুর ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডিটা, অন্ততঃ শেলি ও বায়রণের ক্ষেত্রে, মৃত্যু যেন তাঁরা নিজেরাই সন্ধান করেছিলেন বলেই মনে হয়, তাঁদের কাব্যে বুর্জোয়া বিভ্রমের ট্র্যাজেডি নৈর্ব্যক্তিকভাবে যা ঘটাতে চলছিল তাঁদের মৃত্যুর ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি সেটাকে ঘটতে দেয় নি। কারণ যে দ্বন্দ্ব পুঁজিবাদের চলনকে সুনিশ্চিত করে তা এখন এত দ্রুত প্রকাশিত হচ্ছিল যে একজন কবির জীবনে এবং সর্বদা একইভাবে তা নিজেকে উদ্ঘাটিত করছিল। কবির যৌবনের ব্যগ্র আশা, আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্বাসগুলি মিলিয়ে যাচ্ছিল, আর না হয়ত পরিবর্তিত বাস্তবের মুখে দাঁড়িয়ে এমন এক

ভাটিয়া ও বন্যায় নিয়ে তার পুনরাবির্ভাব ঘটছিল যাতে প্রত্যয়ের অভাব প্রকাশ পাচ্ছিল এবং সেগুলিকে তাদের যৌবনোজ্জ্বল মিঠার এক ব্যঙ্গাত্মক প্রহসন করে তুলছিল। এ কথা সত্য যে সব মানুষই বুড়ো হয়ে যায় এবং তাদের যৌবনোজ্জ্বল আশা হারিয়ে ফেলে—কিন্তু সেটা এই ভাবে নয়। মধ্য-বয়সী সফোক্লিস সন্ধানী পরিপক্বতা দিয়ে তাঁর জীবনের ট্র্যাজেডির কথা বলতে পারেন, এবং আশি বছর বয়সে এমন এক নাটক রচনা করলেন যা প্রজ্ঞার সন্ধান এখন বয়োবৃদ্ধ হয়ে যে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ধৈর্য লাভ করছেন তাকেই প্রতিফলিত করে। কিন্তু পরিপক্ব বুর্জোয়া কবিরা ট্র্যাজেডিও রচনা করতে পারেন না, পদত্যাগ করতেও পারেন না, পারেন শুধু যৌবনের বিশ্বাসগুলির নিষ্প্রাণ পুনরাবৃত্তি করতে অথবা চুপ করে যেতে। কোন্ কারণে যে বন্ধ ঘটছে ইতিহাসের চলন তা প্রকাশ করে দেয় কিন্তু তা সত্ত্বেও তা বুর্জোয়াকে সেটা আঁকড়িয়ে থাকতেও বাধ্য করে। সেই মুহূর্ত থেকেই তার আত্মায় মিথ্যা প্রবেশ করে এবং প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন হওয়ার দিকে অন্ধ থেকে দাসত্বের পায়ে তার আত্মাকে সে সমর্পণ করে।

ফরাসী বিপ্লবে বুর্জোয়ারা স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের নামে অচল হয়ে পড়া সামাজিক সম্পর্কগুলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। শেলির মত তারা দাবি করেছিল সমস্ত মানবজাতির হয়ে কথা বলতে, কিন্তু তার পরে দেখা গেল—প্রথমে অস্পষ্টভাবে, পরে ক্রমেই আরও বেশি বেশি স্পষ্টতার সঙ্গে—সর্বহারাও স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের দাবি তুলছে। কিন্তু সর্বহারাকেও এই অধিকারগুলি মঞ্জুর করার অর্থ হল, যে শর্তগুলি বুর্জোয়া শ্রেণীর অস্তিত্ব ও সর্বহারা শ্রেণীকে শোষণ করাটা সুনিশ্চিত করে সেই শর্তগুলিকেই বিলুপ্ত করা। সেই কারণে স্বাধীনতার অনুকূলে চলনটি, যা প্রথমে প্রধানতঃ মানব-জাতির ভাষায় কথা বলে, এমন একটা পর্যায়ে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে যখন বুর্জোয়ারা কাব্যে তাদের যে মতাদর্শকে প্রকাশ করেছে সেটার প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করতেই হয়; তাকে ভুলে যেতেই হয় যে মানবজাতির হয়ে সে কথা বলার দাবি করেছিল, এবং তার নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে যে শ্রেণীর সেই ধরনের দাবিগুলি খাপ খাচ্ছে না সেই শ্রেণীকে ধ্বংস করতেই হয়। বিদ্রোহী বুর্জোয়া একবার যদি তার জনসমর্থন হারায় প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলি তখন তাকে সর্বদাই একধাপ পিছু হটিয়ে দিতে পারে। একথা সত্য যে এই শক্তিগুলি "একটা রীতি-মত শিক্ষা" এখন লাভ করেছে এবং যে বুর্জোয়া একবার তার ক্ষমতা দেখিয়েছে তার বিরুদ্ধে সেগুলি বেশি দূর অগ্রসর হয় না। উত্তরেই তখন সর্বহারা রা

বিরুদ্ধে পরস্পরের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধে। একটা ভারলায়্যের অবস্থা দেখা যায়—যখন বুর্জোয়ারা যেসব স্বাধীনতার কথা বলত তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং তাদের আদর্শগত নির্দিষ্টটাকে খাটো করে, কেবল নিজেরাই তাদের সংগ্রামের আদর্শগত ফলের কিছুটা অংশ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির কাছে] হারায়। সংগ্রামটা যদি সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে হয় তাহলে সামন্ততান্ত্রিক শক্তি-গুলির কাছে, আর সংগ্রামটা যদি কৃষিভিত্তিক পুঁজিবাদের এবং শিল্প-পুঁজির মধ্যে হয় তাহলে তা জমির মালিক ও বৃহৎ লগ্নীকারী [big financial] শক্তিগুলির কাছে হারায়।

এই ধরনের চলন ছিল রবেসপিয়ের থেকে ডিরেক্টরির যুগের চলন এবং এ্যান্টি-জ্যাকোবিন চলন যা ফরাসী বিপ্লবের ফল হিসাবে সর্বত্র ইউরোপকে প্লাবিত করেছিল। সমগ্র উনবিংশ শতকটি এই বিশ্বাসঘাতকতারই ইতিহাস, যে বিশ্বাসঘাতকতা এই যুগের কবিদের জীবনে তারুণ্যময় ভাববাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হিসাবে প্রকাশ পায়। ১৮৩০, ১৮৪৮, এবং শেষ অবধি ১৮৭১ হল সেই সব তারিখ যা এখন সমস্ত বুর্জোয়া কবিদের ওয়ার্ডসওয়ার্থের পথ অনুসরণ করতে বাধ্য করে, যে ওয়ার্ডসওয়ার্থের বিপ্লবী আগুন ফরাসী বিপ্লবের শেষ পর্যায়ের সর্বহারাসুলভ বিষয়বস্তুর ফলে হঠাৎ নিভে গেল এবং কাণ্ডজ্ঞান, মানমর্যাদা ও ধর্মানুরাগে পর্যবসিত হল।

কীটস-ই লিখেছিলেন :

"None can usurp this height", the shade returned,

"Save those to whom the misery of the world,

Is misery and will not let them rest."

এ যুগে বুর্জোয়া কবিদের অভিশাপ হল এটাই যে জগতের দুঃখকষ্ট, তাদের নিজেদের বিশেষ দুঃখকষ্ট সমেত, তাদের শান্তিতে থাকতে দেয় না, অথচ সেই কালের মেজাজ যে শ্রেণী তা সৃষ্টি করেছে সেই শ্রেণীকেই সমর্থন করতে তাদের বাধ্য করে। সর্বহারা বিপ্লব এখনও সেই পর্যায়ে গিয়ে পৌছায়নি যখন "ঐতিহাসিক চলনকে সামগ্রিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করে কোনও কোনও বুর্জোয়া "মতাদর্শবাদী" তার সঙ্গে নিজেদের মৈত্রী স্থাপন করতে পারে এবং দুঃখভোগী মানবজাতির পক্ষে এবং যে শ্রেণী বর্তমানে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং আগামী দিনে হয়ে উঠবে সমগ্র মানব গোষ্ঠী সেই শ্রেণীর পক্ষে প্রকৃতই কথা বলতে পারে। এখন তারা কেবলমাত্র সেই শ্রেণীর পক্ষেই কথা বলে যে শ্রেণীটি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আগামী দিনের জগৎটাকে গড়ে তুলছে এবং প্রতি পদক্ষেপে পিছু

ছুটে আসছে এবং যে আগামী দিনের জগৎকে সে গড়ে তুলছে নিজেকে তার অন্তর্ভুক্ত করতে পারে না—এই সচেতন জ্ঞানের কারণে তার নিজের সহজপ্রবৃত্তিগত আশাআকাঙ্ক্ষাগুলির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ইংরেজ কবিকুল

৩। পুঁজিবাদের অবনতি

১

আর্নল্ড সুইনবার্ণ টেনিসন ও ব্রাউনিং প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাবে বুর্জোয়া বিপ্লবের ইতিহাসের এই "ট্র্যাজিক" পর্যায়ে বুর্জোয়া বিপ্লবের চলনকে ব্যাখ্যা করেন।

টেনিসন যখনই সৌন্দর্যের জগৎ আর দুঃখকষ্টময় যে বাস্তব জগৎ তাঁকে শান্তিতে থাকতে দেয় না সেই দুঃখকষ্টময় বাস্তব জগতের মধ্যে আপোষ করার চেষ্টা করেন তখনই টেনিসনের কীর্তনীয় জগৎ চুরমার হয়ে যায়। একমাত্র শোক গাথামূলক ইন মেমোরিয়াম, তার গভীর নিরাশাবাদসহ, যা এই কাল পর্যন্ত ইংরেজী ভাষায় রচিত নিরাশাবাদী কবিতার মধ্যে সব থেকে বেশি যথার্থ নিরাশাবাদী কবিতা, কোনও না কোন দিক থেকে সমকালীন সমস্যাগুলিকে সমকালীন পরিভাষায় সাফল্যের সঙ্গে প্রতিফলিত করে।

ডারউইনের মত এবং আরও বেশি করে ডারউইনের অনুসারীদের মত, তিনি পুঁজিবাদী উৎপাদনের শর্তগুলিকে প্রকৃতির মধ্যে প্রক্ষেপ করেছেন (অস্তিত্বের জন্য ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রাম)। এবং তারপর এই সংগ্রামকে, সহজ-প্রবৃত্তিগত এবং সেই কারণে অপরিবর্তনীয় অন্তদ্বন্দ্বের কারণে যা তীব্র হয়ে উঠেছে, সেই সংগ্রামকে আবার সমাজের মধ্যে প্রতিফলিত করেন, যাতে ঈশ্বরকে—যিনি হলেন সমাজের অভ্যন্তরীণ শক্তিগুলির প্রতীক—প্রকৃতির—যা হল সমাজের বহিঃস্থ পরিবেশের প্রতীক—হাতে বন্দী মনে হয়:

Are God and Nature then at strife,
That Nature lends such evil dreams ?
So careful of the type she seems,
So careless of the single life ;

That I, considering everywhere
Her secret meaning in her deeds,
And finding that of fifty seeds

She often brings out but one to bear,

I falter where I firmly trod……

টেনিসনের "প্রকৃতির" অচেতন নির্মমতা প্রকৃতপক্ষে সেই সমাজের নির্মমতাকেই প্রতিফলিত করে যে সমাজে পুঁজিপতি সহযাত্রী-পুঁজিপতিকে সর্বহারার পাতালে অবিরাম নিক্ষেপ করছে :

"So careful of the type ?" but no,

From scarped cliff and quarried stone

She cries : "A thousand types are gone :

I care for nothing, all shall go".

...No more ! A monster then, a dream,

A discord. Dragons of the prime

Which tear each other in the slime

Were mellow music matched with him.

O life as futile then, as frail !

O for thy voice to soothe and bless !

What hope of answer, or redress

Behind the veil, behind the veil ?

বিবর্ণ বর্তমান থেকে ব্রাউনিঙ বিদ্রোহ করে ভবিষ্যতের দিকে তাকান না, বুর্জোয়াদের পূর্বযোচিত ইতালীয় বসন্তকালের গৌরবোজ্জল যুগের দিকে তাকান। ইংরেজী কাব্যে এর আগে কখনও সেই তেজকে এত গাঢ় রঙে আঁকা হয়নি। কিন্তু তাঁর অকপটতারে একটা কুয়াশাচ্ছন্ন অস্পষ্টতা আছে যা প্রকৃত সমকালীন সমস্যাগুলি সম্পর্কে তাঁর বৌদ্ধিক অসাধুতার [intellectual dishonesty] এক প্রতিফলন। টেনিসনের কাছে কীটসীয় রোমান্সের জগৎ, ব্রাউনিঙের কাছে ইতালীয় বসন্তকাল ; দুজনের কাছেই পশ্চাৎমুখী বিদ্রোহ, যে শ্রেণীর পক্ষে তাঁরা কথা বলছেন সেই শ্রেণীর বন্ধ থেকে পলায়নের চেষ্টা। সমকালীন সমস্যাগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে ব্রাউনিঙ মিঃ স্লাজ্ বা বিশপ ব্লোগ্রাম' এর থেকে উচ্চতর কোনও কাব্য সৃষ্টি করতে পারেন না। অথচ তিনিও তাঁর আকুল যৌবনে প্রতিক্রিয়ার পরিচিত পথ অনুসরণ করার জন্য এক অধিক বয়স্ক কবিকে ভর্ৎসনা করতে পেরেছেন :

Shake:peare was of us, Milton was for us,

Burns, Shelley was with us—They watch from their graves !

He alone breaks from the van and the freemen,

He alone sinks to the rear and the slaves !

সুইনবার্ণের কাব্য হল শেলির অন্তর্নিহিত আলোক ও সৌন্দর্যের জগৎকে কীটসের জগতের বস্তুধর্মিতা ও সংবেদনাত্মক বিষণ্ণতার সঙ্গে কিছুটা মিশিয়ে কঠিন করে তুলে আরও বেশি মাত্রায় পৃথক করে তোলা এক জগৎ। ভাগ্যদেবী হার্থা হিসাবেই হোক বা আটলান্টা ইন কালিডনের নেমেসিস হিসাবেই হোক, এখন আর ট্র্যাজিক নয়; সে এখন বিষণ্ণ, বদলেয়রের মৃত্যুর মত বিষণ্ণ। ১৮৪৮—১৮৭১ মধ্যে ইউরোপের সর্বত্র সমকালীন যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবগুলি ঘটছিল তার আবেদনে সুইনবার্ণ গভীরভাবে বিচলিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যে সাড়া দিয়েছিলেন তার পুরাপুরি শাব্দিক ও অগভীর চরিত্র এই পরবর্তী যুগের এই ধরনের সমস্ত চলনের মূলগত অগভীরতাকেই প্রতিফলিত করে। এই পরবর্তী যুগে সর্বহারার বিকাশের কারণে এই চলনগুলি উদ্ভূত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিজেদের প্রতিরোধ করে।

আর্ণল্ডের কবিতাগুলির মূল সুর বুর্জোয়া বিভ্রমের এখনকার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ "নিরাশাবাদ," যা তার অন্তিম ও (নিজেরই প্রতি) ট্র্যাজিক পর্যায়গুলিকে এখন গড়ে তুলছে। ফিলিস্তিনদের বিরুদ্ধে আর্ণল্ড লড়াই করেন, কিন্তু তাঁর নিজেরই এক অস্বস্তিকর সন্দেহ রয়েছে যে তাঁর পরাজয় অবধারিত। এবং প্রকৃতপক্ষেই তিনি পরাজিত, কারণ দর্পণের মধ্যে নিজের প্রতিবিম্বের সঙ্গে তিনি লড়াই করছেন। বুর্জোয়া সমাজের বিধেয়গুলির মধ্যে যতক্ষণ তিনি চলাফেরা করেন ততক্ষণ তাঁর নিজের চলনই ফিলিস্তিন সৃষ্টি করছে, সমাজ থেকে কবিকে বিচ্ছিন্ন করার দ্বারা যে চলন ফিলিস্তিন ও কবির জন্ম দেয় তিনি সেই চলনকেই এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

২

বুর্জোয়া কাব্যের পরবর্তী অধ্যায় সেই কারণে "পণ্যের উপর অন্ধভক্তির" ["commodity-fetishism"] অধ্যায়—বা "শিল্পের জন্য শিল্প"র অধ্যায়—এবং সেটা দেখা যায় বাজারের জন্য উৎপাদনকারী হিসাবে বুর্জোয়া কবির মিথ্যা অবস্থানের মধ্যে—বুর্জোয়া অর্থনীতির বিকার্শ তার উপর জোর করে এই অবস্থান চাপিয়ে দিয়েছে। সমকালীন বিষয় সম্পর্কে আর্ণল্ডের ও তরুণ টেনিসনের নিরাশাবাদ এবং ব্রাউনিং, সুইনবার্ণ ও প্রৌঢ় টেনিসনের আরও বেশি মাত্রায় বিষণ্ণ আশাবাদ কবিদের সমকালীন বিষয়কে পরিত্যাগ করা যখনই অপরিহার্য করে তুলল, কবিরও পণ্যের উপর অন্ধভক্তির শিকার হয়ে

পড়াটা তখনই অপরিহার্য হয়ে পড়ল। এর অর্থ হল এমন এক চলনের উদ্ভব যা বাস্তবের জগৎ থেকে শিল্পের জগৎকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে, এবং এই বিচ্ছিন্ন করার দ্বারা শিল্পের উৎস থেকেই তাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে যার ফলে সেই শিল্পকর্মটি যখন সব থেকে বেশি ধনুত্তর বলে মনে হচ্ছে তখনই তা বুদ্বুদের মত ফেটে যাবে।

এ্যান্টি-ডুরিঙ পুস্তকে একেলস পণ্য উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে যে সব সমাজ গড়ে উঠেছে সেই রকম প্রতিটি সমাজের বৈশিষ্ট্য খুব সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন :

(এর) এই বৈশিষ্ট্য থাকে : উৎপাদনকারীরা তাদের নিজেদের সামাজিক আন্তঃসম্পর্কগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। যার যেমন উৎপাদনের উপায় থাকে তার সাহায্যে প্রত্যেক লোকই নিজের জন্য উৎপাদন করে, এবং তার বাকি অভাবগুলি পূরণ করার জন্য সেইটুকু মাত্রায় বিনিময়ের জন্য উৎপাদন করে। কেউ জানে না তার তৈরী সেই বিশেষ সামগ্রী বাজারে কতটা পরিমাণে আসছে এবং তার কতটা পরিমাণের জন্য যে চাহিদা থাকবে তাও জানে না। তার নিজের এই সব উৎপন্ন সামগ্রী কোনও প্রকৃত চাহিদা মেটাবে কিনা কেউ জানে না, তার উৎপাদনের খরচাটাও সে তুলতে পারবে কিনা বা তার উৎপন্ন সামগ্রীটা আদৌ বিক্রয় করতে পারবে কিনা তাও কেউ জানে না। সামাজিকীকৃত উৎপাদনের ক্ষেত্রে নৈরাজ্য বিরাজ করে।

কিন্তু উৎপাদনের অন্যান্য প্রতিটি রূপের মত পণ্য উৎপাদনেরও নিজস্ব বিশিষ্ট, অন্তর্নিহিত নিয়ম থাকে যেগুলি এই উৎপাদনের বিশেষ রূপটি থেকে অবিচ্ছেদ্য ; আর এই নিয়মগুলি নৈরাজ্য সত্ত্বেও, নৈরাজ্যের মধ্যে এবং নৈরাজ্যের মধ্য দিয়েই কাজ করে...অতএব, এইগুলি উৎপাদনকারীর উপর নির্ভর করে না এবং তাদের বিরোধিতা করেই তাদের উৎপাদনের এই বিশেষ রূপটির অমোঘ স্বাভাবিক নিয়ম হিসাবেই এইগুলি কাজ করে চলে। উৎপন্ন সামগ্রী উৎপাদনকারীকে শাসন করে। (পৃ ৩৭৬, মস্কো সংস্করণ, ১৯৫৪)

বিনিময়ের পরিবর্তে ব্যবহারের জন্য অপেক্ষাকৃত পুরাতন এবং আরও সর্বজনীন উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে এর পার্থক্য এঙ্গেলস দেখিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে উৎপাদনের উৎপত্তি ও পরিণতি সুস্পষ্টভাবে চোখে দেখা যায়। সব কিছুই একটি মাত্র সামাজিক ক্রিয়ার অংশ, এবং যে সমাজ সেই উৎপন্ন সামগ্রী উৎপাদন করে সেই সমাজের কতটা তা কাজে লাগে তার দ্বারাই, মাত্র সেই উৎপন্ন সামগ্রীর মূল্য দেওয়া হয়। এই ধরনের সমাজে কবিতা হিসাবে কোন কবিতা

তার মূল্য লাভ করে তার যৌথ আবির্ভাব থেকে, তার শ্রোতাদের হৃদয়ে সেটার জন্ম থেকে এবং গোষ্ঠীর জীবনে যে প্রত্যক্ষ ও স্পষ্টতঃ প্রভাব ফেলে, তা থেকে।

পুঁজিবাদী উৎপাদন হল চরম মাত্রায় [in excelsis] পণ্য উৎপাদন। পুঁজিবাদী উৎপাদনে এ সবকিছু বদলে যায়। প্রত্যেকেই অন্ধভাবে উৎপাদন করে চলেছে এমন এক বাজারের জন্ম যার নিয়মগুলি দুর্বোধ্য, যদিও সেগুলি লৌহকঠিন দৃঢ়তার সঙ্গে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে। সমাজজীবনের উপর পণ্যের প্রভাব মাপা যায় না বা চোখে দেখা যায় না। "মানুষ নিজের সামাজিক আন্তঃ-সম্পর্কগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে।" পুঁজিবাদের সমগ্র বিস্তারিত বুননটি, নৈরাজ্যের মধ্যে বোনা এই জটিল জাল এই অসহায়তাকে অপরিহার্য করে তুলেছে।

বুর্জোয়া বাজারটা কবির কাছে "পাঠক সমাজ" বলে মনে হয়। মুদ্রণ ও প্রকাশন ব্যবস্থার উদ্ভাবন ও বিকাশ সর্বজনীন বুর্জোয়া অবাধ বাজারের বিকাশের একটা অংশ। এই বাজারের বিকাশ (ঔপনিবেশিকতা, যানবাহন ও বিনিময়ের সুযোগের প্রসারণের ফলে) যে সব জায়গার নামই শোনেনি কানে, সে সব জায়গা যে কোথায় অবস্থিত তাও জানে না এমন সব জায়গার প্রয়োজনের জন্ম উৎপাদন করা যেমন একজনের পক্ষে সম্ভব করে তুলেছিল, সেইরকম কবি এখন সেই সব মানুষের জন্য লেখেন যাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না, যাদের সামাজিক জীবন, যাদের সমগ্র জীবনযাত্রা পদ্ধতিটাই তাঁর কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। বাজারটাই তাঁর কাছে "পাঠক সমাজ"—অন্ধ, অপরিচিত, নিষ্ক্রিয়।

এর ফলে দেখা দিল সেই জিনিস যাকে মার্ক্স বলেছিলেন "পণ্যের উপর অন্ধভক্তি।" শিল্পপ্রক্রিয়ার সামাজিক চরিত্র, যা ছিল যৌথ উৎসবের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত, এখন তা লোপ পেয়ে গেল। "সুতরাং পণ্য হল এক রহস্যময় সামগ্রী, তার সহজ কারণ এই যে এর মধ্যে মানুষের শ্রমের সামাজিক চরিত্রটি সেই শ্রমজাত সামগ্রীর উপর দেওয়া একটা বিষয়গত চরিত্রের ছাপ বলে মানুষের কাছে মনে হয়···একইভাবে কোন বস্তু থেকে আসা আলোককে আমরা আমাদের চক্ষুস্নায়ুর বিষয়ীগত উত্তেজনা হিসাবে প্রত্যক্ষ করি না, বরং আমরা তাকে আমাদের চোখের বাইরেরই কোনও একটা জিনিসের বিষয়গত রূপ হিসাবে প্রত্যক্ষ করি।" একইভাবে শিল্পকর্ম একবার যদি সমাজের হৃদয়ে তার সামাজিক বাস্তবায়ন "বাজার" বা "পাঠক সমাজ" দ্বারা

ভাবা পড়ে যায় তখন সেটা একটা বিষয়গত সামগ্রী বলে কবির কাছে মনে হয়। শিল্প এখন নৃত্য, গীত, সংগীত, স্বতঃস্ফূর্ত নাটক ও কমেডিয়া দেলার্তে এর [commedia dell'arte] মত সংবদ্ধ মানুষের উপর মূলতঃ নির্ভরশীল রূপগুলি থেকে লিখিত কবিতা, সঙ্গীতের স্বরলিপি, লিখিত নাটক, চিত্র বা ভাস্কর্যের মত শিল্প-প্রক্রিয়ার কেন্দ্রাপিত বিষয়ণী অর্থাৎ সমাজের উপর মূলতঃ নির্ভরশীল নয় এই রকম পরিবর্তিত রূপলাভ করার এটা সাহায্য পায়। শিল্পের উদ্দীপকটি হয়ে ওঠে বিষয়গত—একটা পণ্য।

পুঁজিবাদী উৎপাদনের চলনের জন্য প্রয়োজন পুঁজি। স্থির-পুঁজি হল পুঁজির সমষ্টির এক অবিরাম বর্ধনশীল অংশ। এই স্থির-পুঁজি বিস্তারিত ফ্যাক্টরি প্ল্যান্টের দৃশ্যমান রূপ নেয় এবং পরোক্ষভাবে এই প্ল্যান্টকে ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় আরও বেশি মাত্রায় উন্নতমানের করণকৌশল ও সংগঠনের রূপ নেয়। একদিকে স্থিরপুঁজির এই বৃদ্ধি এবং সেই কারণে শ্রমের ক্রমবর্ধমান উৎপাদন শক্তিজনিত সামাজিক সংগঠনের বৃদ্ধি ঘটে; অপরদিকে মালিকানায় ব্যক্তিগত অধিকারের বৃদ্ধির ফলে এবং বেসরকারী পুঁজিপতিদের বাড়তে থাকা সম্পদের ফলে ভোগের বৃদ্ধি ঘটে। একইভাবে বুর্জোয়া কাব্যে অবিরাম বর্ধমান ঐতিহ্য ও করণকৌশলের সমষ্টির বিশিষ্ট ছাপ পড়ে যার চাপ কবি অনুভব করেন; এর ফলে যে প্রচণ্ড সামাজিক অভিজ্ঞতা কবিতাটির মধ্যে রূপ লাভ করেছে তার সঙ্গে কবির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক ও সমাজবিরোধী মনোভাবের অবিরাম দ্বন্দ্ব দেখা যায়। কবির সামনে "ঐতিহ্য" একটা ভীষণ কঠিন ও অজানা সামগ্রী হিসাবে পর্বতপ্রমাণ হয়ে ওঠে যার সঙ্গে একটা অহং হিসাবে কবিকে বোঝাপড়া করতেই হবে।

কিন্তু কবি ত আর পুঁজিপতি নন। তিনি শ্রমকে শোষণ করেন না। পুঁজিপতির কাছে পণ্যের উপর অন্ততঃ সমস্ত পণ্যের সাধারণ বাজার—বিনির্ণায়ক [market-denominator] অর্থাৎ অর্থের পবিত্রকরণের রূপ নেয়। অর্থ তার কাছে এক উচ্চ, রহস্যময়, আত্মিক মূল্য লাভ করে। কিন্তু লেখক ত নিজেই শোষিত হন। যখন তিনি 'অর্থের জন্য লেখেন" তখন অবশ্যই একটা পুরাপুরি পুঁজিপতিসুলভ মনোভাব তাঁর গড়ে ওঠে। এমন কি তিনি নিজেও সেক্রেটারি এবং ভাড়াটিয়া লেখক যারা তাঁর হয়ে "খাটুনির কাজটা" ["donkey-work"] করে দেন তাদের নিয়োগ ক'রে—শ্রমকে শোষণ করতে পারেন। কিন্তু যে লেখক অর্থের জন্য লেখেন তিনি শিল্পী নন, কারণ শিল্পীর বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁর উৎপন্ন সামগ্রীগুলি অভিযোজনমূলক; মনুষ্য-

প্রবৃত্তি ও চেতনার মধ্যকার, উৎপাদিকা শক্তিগুলি ও উৎপাদন সম্পর্কগুলির মধ্যকার চাপ [Tension] থেকে—যে চাপ সমস্ত সমাজকে ভবিষ্যতের বাস্তবের দিকে চালনা করে সেই চাপ থেকে—শিল্পগত বিভ্রমটি জন্মলাভ করেছে। বুর্জোয়া সমাজে এই চাপটা হল উৎপাদিকা শক্তিগুলির (ফ্যাক্টরিগুলিতে পুঁজিবাদী করণকৌশলের সামাজিকভাবে সংগঠিত ক্ষমতা) এবং সামাজিক সম্পর্কগুলির (ব্যক্তিগত মুনাফার জন্য উৎপাদন এবং যার ফলে সামগ্রিকভাবে বাজারে যে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়। অর্থের বা প্রত্যক্ষ বা "ব্যবহার" সম্পর্কের পরিবর্তে "বিনিময়" সম্পর্কের সর্বজনীনতার দ্বারা এই নৈরাজ্য সূচিত হয়।) মধ্যকার চাপ। যেহেতু এটি হল মৌলিক দ্বন্দ্ব সেই কারণে মুনাফা করার জন্য বা বিনিময় মূল্যের জন্য উৎপাদন ব্যবস্থা শিল্পের অর্থ ও তাৎপর্যকে পঙ্গু করে তোলে বলে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কবি "বিদ্রোহ" করেন। কিন্তু যতক্ষণ তিনি বুর্জোয়া চিন্তার বিধেয়গুলির চৌহদ্দির মধ্যে থেকে বিদ্রোহ করেন—অর্থাৎ, যতক্ষণ না তিনি মূলগত বুর্জোয়া বিভ্রমকে পরিত্যাগ করতে পারেন—ততক্ষণ তাঁর বিদ্রোহ সেইরূপই নেয় পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থার জন্যই যার প্রয়োজন।

৩

এইভাবে কবি নিজেই শোষিত মানুষের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় শোষিত মানুষ দু'ধরনের : এই দু'ধরনের শোষিত মানুষ-হল শ্রমিক ও কারিগর। এদের মধ্যযুগের ভূমিদাস ও কারিগরদের উত্তরাধি-কারী বলে গণ্য করা যায়। এই উত্তরাধিকারটা অবশ্য সরাসরি নয়। পুঁজিবাদী বিপ্লবের কালে ভূমিদাসরা হয়ে উঠল পুঁজিপতি আর কারিগররা নিক্ষিপ্ত হল সর্বহারা শ্রেণীতে। শোষিতদের এক শ্রেণীর কারিগরদের বংশধর বলে গণ্য করা যায়। শ্রমিক পুরোপুরি সর্বহারা হয়ে গিয়েছে ; কারিগর বিশেষ কারণে, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় কিছুটা পরিমাণে বিশেষ সুযোগ সুবিধা বজায় রাখতে পেরেছে। সে অর্থাৎ কারিগর যেন সামগ্রিকভাবে শ্রেণীসংগ্রামের প্রভাবমুক্ত ও তার উর্ধ্বে এক শ্রেণীর, "মধ্যবিত্ত শ্রেণীর" অন্তর্ভুক্ত—পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা তার মনে এই মিথ্যা ধারণা গড়ে তোলে। তা সত্বেও, তার পায়ের নীচে সর্বহারাদের অতল গহ্বর হাঁ করে আছে। তার বিশেষ সুযোগসুবিধাটা পুঁজিবাদী উৎপাদনের এক বিশেষ পর্যায়ের একটা আকস্মিক ঘটনা এবং সর্বদাই সেটা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে। যাই হোক, পুঁজিবাদী উৎপাদনের ঐতিহাসিক পরিবর্তন এই শ্রেণীর, নতুন নতুন সমস্ত স্তর

করছে, যে কারণে সর্বদাই তার একটা স্থায়িত্ব ও পৃথক অস্তিত্ব আছে বলে মনে হয়, যদিও তার প্রকৃত গঠন এক বিশৃঙ্খল বিভিন্নমুখী গতিসম্পন্ন অবস্থায় থাকে [is in a state of wild flux]। পুঁজিবাদের শেষ পর্যায়গুলি এমন কি এই স্তূপকে বিচ্ছেদেরও প্রাক্‌যুক্তিকে উদ্ঘাটিত করে থাকে এবং সেটি বুর্জোয়ারা দেখতে পায় যে তাদের বিশেষ সুযোগসুবিধাগুলি তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

ইংলণ্ডে এই দুটি বিভাগের প্রধান ইতিহাসটা পরীক্ষা করে দেখা যাক।

(১) **শ্রমিক :—**শ্রমিক হল সেই মানুষ যে নীরস, একঘেয়ে এবং সব থেকে শ্রমসাপেক্ষ কাজ মজুরির বিনিময়ে করে; বিরাট যন্ত্রের সে এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। সে হল যথার্থ সর্বহারা, পুঁজিবাদের অনুপম সৃষ্টি। পুঁজিপতির বিরুদ্ধে তার লড়াই সব থেকে বেশি তিক্ত এবং আপোষহীন, কারণ তার কাজের প্রকৃতির কারণেই তার কাজটা এমনই যে সেটাকে পছন্দ করা অসম্ভব, এবং সেইজন্য তার বিদ্রোহটা প্রকাশ পায় বিশ্রামের জন্য তার লড়াই হিসাবে, ফ্যাক্টরির বাইরে অল্প, মানবোচিত জীবনের প্রতিটি বাড়তি ঘণ্টা তার মালিকের অনিচ্ছুক হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা হিসাবে প্রকাশ পায়। সেই অল্প অবসরটুকু যতদূর সম্ভব পরিপূর্ণ ও স্বাধীন করার জন্য এই লড়াইয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকে উন্নততর মজুরির জন্য সংগ্রাম।

পুঁজিবাদী উৎপাদনের বিধেয়গুলির মধ্যে তার স্বাধীনতার সংগ্রাম যে একমাত্র রূপ নিতে পারে তা এইটাই, কারণ তার এই নীরস কাজে স্বাধীনতা সামাজিক কার্যকলাপ বা "কাজের" বিপরীত হিসাবেই নিজেকে প্রকাশ করে। যেহেতু সে হল সেই সংখ্যাগরিষ্ঠদের একজন যাদের শ্রমশক্তির উদ্‌বৃত্ত মূল্য থেকে পুঁজিপতি তার মুনাফা সংগ্রহ করে, সেই কারণে এই দুই শ্রেণীর মধ্যকার বিরোধিতাও নগ্ন ও সরাসরি। এই বিরোধিতা হল পুঁজিবাদী সমাজে শ্রেণী সংগ্রামের প্রকৃত কেন্দ্রবিন্দু। শ্রমিকের প্রতিটি মিনিট অবসর বা মজুরির প্রতিটি পয়সার অর্থ হল পুঁজিপতির মুনাফা থেকে সেই পরিমাণে কমে যাওয়া। তার স্বাধীনতা হল পুঁজিপতির স্বাধীনতাহীনতা এবং এর বিপরীতটাও সত্য।

(২) **কারিগর :—**পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় এই শ্রেণীটি তার ব্যক্তিগত দক্ষতা, করণকৌশল বা "সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ" কাজটির কারণে ফোরম্যান, ওভারসিয়ার বা মেকানিক বা পেশাগত দিক থেকে ব্যারিস্টার, ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার বা স্থপতি হিসাবে একটা বিশেষ অবস্থান অধিকার করে থাকে। তার সুবিধাভোগী অবস্থান, নিজের দক্ষতায় তার আনন্দ এবং তার উচ্চতর মজুরির

কারণে কারিগর নিজেকে যথার্থ সর্বহারার বিরুদ্ধে প্রায়ই দাঁড়াতে দেখে। শ্রমিকদের ক্ষেত্রে কাজের সঙ্গে অবসরের যেমন তীব্র বিরোধ বা তার স্বাধীনতার সঙ্গে পুঁজিপতির স্বাধীনতার তীব্র বিরোধ দেখা যায় এর ক্ষেত্রে সেরকম ঘটে না। কখনও কখনও সে নিজেই "একটা ছোটখাটো" ব্যবসায় করে, পুঁজিপতি হিসাবে নয়, কিন্তু দু-তিন জন শিক্ষানবীশ—সহকারী নিয়োগ করে এবং বড় পুঁজিপতিদের কাছে মাল বিক্রয় করে। স্বার্থের এই আপাতঃ বিচ্ছেদ এদের শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে প্রকাশ পায়। পুরাতন A. S. E-র মত "সংযুক্ত" কারিগরদের ইউনিয়নগুলিকে শ্রমজীবীদের বড় বড় সাধারণ ইউনিয়নগুলি—T & G.W, N.U.G. & M.W. এবং এই ধরনের ইউনিয়নগুলির—তাদের গোড়ার দিকে Ben Tillet, Tom Mann, John Burns এর নেতৃত্বাধীনে, বিরোধিতা করতে এবং বিবাদ করতে দেখা গেছে। পুরাতন A.S.E "Junta"র উদারপন্থী ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী ছিল, "জুন্টা" আবার আরও আগেকার কালে জঙ্গী কিন্তু অগোছালভাবে সংগঠিত আদি কুঠিগুলিকে [original lodges] হটিয়ে দিয়েছিল।

যাই হোক না কেন, পুঁজিবাদীউৎপাদনের বিকাশ কারিগরকে অমোঘভাবে শ্রমিকে পরিণত করে। তার দক্ষ হাতের সৃষ্টির সঙ্গে সমস্ত বিভাগে যন্ত্র প্রতিযোগিতা করে এবং হটিয়ে দেয় এবং তাকে বেকারদের "শিল্পশ্রমিকের রিজার্ভ বাহিনীর" মধ্যে জোর করে ঠেলে দেয়।

প্রথমে এর ফল হয় এই যে কারিগর তার দক্ষতাকেই সামাজিক ব্যবহার থেকে বিচ্ছিন্ন একটা মাল হিসাবে তুলে ধরে নিছক লেনাদেনাভিত্তিক বাজারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বাধ্য করে। এই ধরনের কারিগরকে শুনবেন দক্ষ কারিগরের অপূর্ব সৃষ্টি হিসাবে, যেমন ধরুন, নেপিয়ার মোটর গাড়ির প্রশংসা করতে এবং আধুনিক ব্যাপক উৎপাদন পদ্ধতির সৃষ্টি ফোর্ড গাড়ির সঙ্গে তুলনা করতে। এই আধুনিক পদ্ধতিতে উৎপন্ন ফোর্ড গাড়ির সামাজিক ভূমিকা একই এবং তার দামও অপেক্ষাকৃত কম। সাবেক দক্ষতায় যদিও অনেক বেশি মাত্রায় মানব শ্রমের অপচয় হত তবুও তা কারিগরের কাছে একটা বিশেষ মূল্য অর্জন করেছে, কারণ সর্বহারার থেকে সুস্পষ্টভাবে ভিন্ন একটা শ্রেণী হিসাবে নিজের অস্তিত্বের শর্তই হল এই দক্ষতা। এই দক্ষতা বাজারের উপরে এবং তার বিরুদ্ধে স্থাপিত হয়। এই বাজারের নির্ণায়ক হল মুনাফা বা তার দক্ষতা সেকেলে হয়ে যাওয়ার হেতু। ফ্যাক্টরির শ্রমিক হিসাবে চাকুরি পেয়ে ঘটনাক্রমে তার সেই সেকেলে হয়ে যাওয়া দক্ষতাকে জ্ঞানের

করে—যন্তের তৈরী ক'রে, কোটখাটো ব্যক্তিগত "শখ" নিয়ে ব্যস্ত থেকে এবং যেসব কাজে তার কারিগরিবিদ্যা প্রয়োগ করা যায় এমন সব অত্যন্ত সামাজিক দিক থেকে অর্থহীন কার্যকলাপে ব্যস্ত থেকে।

এই ব্যাপারে তার মনোভাব লেখকের মনোভাবের সঙ্গে মূলতঃ এক গোত্রীয়। পুঁজিবাদের সঙ্গে লেখকের সম্পর্কটিও বিশেষ সুযোগসুবিধামূলক এবং কারিগরিবিদ্যাভিত্তিক, যদিও যে যুগে শ্রেণীবিভাজন চিন্তা থেকে কর্মকে পৃথক করেছে সেই যুগে তার "আদর্শ" বিষয়বস্তু তাকে হাতের কারিগরিবিদ্যা থেকে আরও বেশি সুযোগসুবিধা দিয়ে থাকে। লেখকও ডাক্তার, ব্যারিস্টার, স্থপতি, শিক্ষক অথবা বৈজ্ঞানিকদের মতই বুর্জোয়া সমাজের উপর তলার একটা অংশ, তাঁদের কাজের মত তাঁর কাজেরও একটা তত্ত্বগত বিষয়বস্তু থাকে। হাতের কারিগরি কাজ যে করে সে কখনই "নিম্ন মধ্যবিত্তের", থেকে বড় কিছু নয়। তবু দেখা যায় দুজনেই পেটি বুর্জোয়ার বিশেষ আশাআকাঙ্ক্ষা ও বিভ্রান্তিকেই প্রকাশ করছে।

পুঁজিবাদের বিকাশ যেমন আরও বেশি বেশি করে সমস্ত শ্রমশিল্পের উৎপাদনকে ব্যাপকহারে উৎপাদনের (mass production-এর) দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে থাকে, কারিগরদের হাজারে হাজারে বিত্তহীন করতে থাকে এবং কারিগরকে শ্রমিক বা যন্ত্রচালকের স্তরে নিয়ে এসে সর্বহারার দিকে ঠেলে দিতে থাকে শিল্পের ক্ষেত্রেও তার প্রভাব একই রকমের। পাইকারী হারে শিল্প সৃষ্টির ফলে শিল্প এক প্রাণহীন অতিসাধারণ স্তরে নেমে আসতে বাধ্য হয়। ভালো শিল্পের বিক্রয়যোগ্যতা কমে যায়। যেহেতু শিল্পের ভূমিকা এখন লক্ষ লক্ষ মানুষকে পুঁজিবাদী উৎপাদনের মৃত যান্ত্রিক অস্তিত্বের সঙ্গে অভিযোজিত করা, যে উৎপাদন ব্যবস্থায় কাজ তাদের সহজপ্রবৃত্তিকে জাগিয়ে না তুলে তাদের জীবনীশক্তিকে শুষে নেয় মাত্র, যে ব্যবস্থায় অবসর হয়ে ওঠে আজগুবি চলচ্চিত্র, সরল ইচ্ছাপূরণমূলক রচনা বা এমন সংগীত যা নিছক আবেগের সুড়সুড়ি, তাই দিয়ে মনকে মেরে ফেলার সময় মাত্র—এই কারণের জন্যই লেখকের বেতনভুক কারিগরিজ্ঞান যন্ত্রচালকের বেতনভুক কারিগরিজ্ঞানের মতই বিরক্তিকর ও ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে। সাংবাদিকতা হয়ে ওঠে এ যুগের বিশিষ্ট শৈলী। চলচ্চিত্র, উপন্যাস, চিত্রকলা সব কিছুতেই এই অধঃপতন ঘটে। পুঁজিবাদের এই পর্যায়ে ফ্যাক্টরিভিত্তিক উৎপাদন আর ফ্যাক্টরিভিত্তিক শিল্প দুইয়েরই বৈশিষ্ট্য হল বিপুল করণকৌশলগত সম্পদ এবং মানব মানসের অধঃপতন ও এক ছাঁচের হয়ে ওঠা। যে শিল্পীকেই সাংবাদিকতা করে বা

"রোমাঞ্চকর উপন্যাস" লিখে জীবিকা উপার্জন করতে হয়েছে তিনিই সাক্ষ্য দেবেন কি ভাবে তাঁর শিল্প অনিবার্যভাবে সর্বহারার পর্যায়ে পরিণত হচ্ছে। আধুনিক রোমাঞ্চকর উপন্যাস, প্রেমের গল্প, কাউবয় রোমান্স, সস্তা চলচ্চিত্র, জ্যাজ সংগীত বা রোমহর্ষক রবিবাসরীয় পত্রিকা আজকের দিনের প্রকৃত সর্বহারার সাহিত্য গড়ে তুলছে—অর্থাৎ সেই সাহিত্য বা আধুনিক পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মধ্যে যে দুঃখকষ্ট ও সহজ-প্রবৃত্তিগত দৈন্যের সৃষ্টি হয়েছে তারই বিশিষ্ট সহচর। এ হল সেই সাহিত্য বা লেখককে সর্বহারার স্তরে টেনে নামিয়েছে। এই সাহিত্য একই সঙ্গে প্রকৃত দুঃখকষ্টের একটা প্রকাশ এবং সেই প্রকৃত দুঃখকষ্টের বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদও। এ হল বিশ্বব্যাপী, অনড়, উদ্ভট, আধুনিক পুঁজিবাদের কারণে উপবাসী সহজপ্রবৃত্তিগুলির সহজ তৃপ্তিসাধনে লিপ্ত এক শিল্প, এর মধ্যে আছে অতিরাগসম্পন্ন প্রেমিক, বীর কাউবয়, এবং আশ্চর্য ক্ষমতাসম্পন্ন গোয়েন্দা। এই শিল্পই হল আজকের দিনের ধর্ম। ক্যাথলিক ধর্ম যেমন সামন্ততান্ত্রিক শোষণের একটা বিশিষ্ট প্রকাশ সেই রকম এটাও হল সর্বহারা শ্রেণীকে শোষণের একটা বিশিষ্ট প্রকাশ। এটা হল জনগণের জন্ত আফিম; একটা বিপ্রতীপ জগতের চিত্র আঁকে এই শিল্প, কারণ সমাজের জগৎটাই বিপ্রতীপ হয়ে গিয়েছে। এই শিল্পই হল বুর্জোয়া সভ্যতার প্রকৃত বিশিষ্ট শিল্প, যা বুর্জোয়া বিভ্রমের তার নিজের দ্বারা মূল্যায়িত বিষয়বস্তুকে নয়, তার প্রকৃত বিষয়বস্তুকেই প্রকাশ করে। বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বাধীনতা থেকে "নাক-উঁচু" বুর্জোয়া শিল্প পুষ্টিলাভ করে। সর্বহারা শ্রেণীর স্বাধীনতাহীনতা থেকে "সাদামাটা" সর্বহারা শিল্প পুষ্টিলাভ করে এবং তার উপবাসী বিদ্রোহাত্মক সহজপ্রবৃত্তিগুলিকে সুড়সুড়ি দিয়ে তার অস্তিত্বের স্বাধীনতাহীনতাকে টিঁকিয়ে রাখতে সেটা সাহায্য করে। যেহেতু তা নিছক সুড়সুড়ি, যেহেতু তা মানুষকে স্বাধীনতাহীনতার মধ্যেই টিঁকিয়ে রাখতে সাহায্য করে এবং তার স্বতঃস্ফূর্ত শক্তিকে প্রকাশ করতে সাহায্য করে না, সেই কারণেই সেটা খারাপ শিল্প। তা সত্ত্বেও এটা এমন এক শিল্প যা, যেমন ধরুন জেমস জয়েসের শিল্পের থেকে অনেক বেশি যথার্থভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, যা বুর্জোয়া সমাজে এক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বব্যাপী ভূমিকা পালন করে।

লেখকদের মধ্যে সব থেকে বেশি কারিগরিজ্ঞানের অধিকারী হলেন কবি। তাঁর শিল্পের জন্ত প্রয়োজন যে কোনও শিল্পীর করণকৌশলগত দক্ষতার সর্বাধিক মাত্রায় দক্ষতা; আর উন্নততরদের পুঁজিবাদী সমাজের বিপুল সংখ্যা-

পরিষ্ঠ মানুষের কাছে এই করণকৌশলগত দক্ষতারই কোনও চাহিদা নেই। মাটারের হাত চালাইয়ের যুগে মধ্যযুগীয় পাথরখোদাইকারীর মতই তিনি সেকেলে হয়ে গিয়েছেন। সমাজ যতই কার্যতঃ আরও বেশি বেশি করে সর্বহারা করে পরিণত হতে থাকে, মানুষের কাজের শর্তগুলি, স্বতঃস্ফূর্ততার দিক থেকে যা রিক্ত সেই শর্তগুলি, ব্যাপকহারে উৎপন্ন "সাদামাটা" শিল্পের জন্য আরও বেশি বেশি করে দাবি জানাতে তাদের বাধ্য করে; এই সাদামাটা শিল্পের বৈচিত্র্যহীনতা ও অগভীরতা তাদের স্বাধীনতাহীনতার সঙ্গে তাদের অভিযোজিত করার কাজে লাগে। কবি হয়ে ওঠেন "উন্নাসিক" একজন ব্যক্তি যাঁর দক্ষতা কেউ চায় না। গড়পড়তা মানুষের কাছে কবিতা পাঠ খুবই কষ্টকর ব্যাপার হয়ে ওঠে।

জীবনের শর্তগুলির কারণেই কবির প্রতিক্রিয়া কারিগরের প্রতিক্রিয়ারই মত হয়। কারিগরি দক্ষতাকে সামাজিক ক্রিয়ার বিপরীতে, "শিল্পকে" "জীবনের" বিপরীতে স্থাপন করতে সে সুরু করে। কারিগরের ক্ষেত্রে পণ্যের উপর অন্ধভক্তির বিশেষ ভাষ্য হল দক্ষতার উপর অন্ধভক্তি। দক্ষতা এখন সামাজিক মূল্যের বিরোধী এক বিষয়গত সামগ্রী বলে মনে হয়। শিল্পকর্মটি সেই কারণে নিজেই এবং নিজের জন্যই মূল্যবান হয়ে ওঠে [valued in and for itself]।

কিন্তু শিল্পকর্মটি একটা সমাজের জগতে বাস করে। শিল্পকর্মগুলি সর্বদাই সেই সব বিষয় দিয়েই গঠিত হয় যেগুলির একটা সামাজিক পরিচয় আছে। শিল্পের যা উপাদান সেগুলি নিছক কোলাহল নয়, সেগুলি একটা শব্দভাণ্ডার থেকে নেওয়া শব্দ; নিছক আকস্মিক ধ্বনি মাত্র নয়, সেগুলি সামাজিকভাবে স্বীকৃত স্বরগ্রাম থেকে নেওয়া স্বর; নিছক খানিক রঙের পোঁচ নয়, সেগুলি হল নির্দিষ্ট রূপ যার একটা অর্থ আছে। এই সব জিনিসের আবেগগত অনুষঙ্গ থাকে যেগুলি সামাজিক।

তা সত্ত্বেও যে সমাজের কাছে বর্তমানে দক্ষতার কোনও ব্যবহার নেই সেই সমাজের বিরুদ্ধে স্পর্ধিত ও বিদ্রোহাত্মক বিরোধিতা ক'রে কোনও শিল্পকর্মকে যদি তার নিজের জন্যই মূল্য দেওয়া হয় তাহলে তার প্রকৃত অর্থ হল শিল্পীর জন্য সেটাকে মূল্য দেওয়া। উদ্দেশ্যহীন স্বয়ম্ভূ কবিতা কেউ লিখতে পারে না। তার অনুষঙ্গগুলি যদি সামাজিক না হয় তাহলে তা হবে ব্যক্তিগত, এবং শিল্পকর্ম যত সমাজের বিরোধী হবে তত বেশি করে সেগুলি হবে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, কিম্ভূতকিমাকার, অদ্ভুত ও উদ্ভট। ব্যক্তিগত অনুষঙ্গগুলির

বেপরোয়া নির্বাচন চলবে ; বুর্জোয়া বিভ্রমের এই পর্যায়ে সেইজন্ত কাব্যের মধ্যে শিল্পের সামাজিক জগৎ থেকে ব্যক্তিগত উদ্ভট কল্পনার ব্যক্তিগত জগতের দিকে একটা দ্রুত চলন দেখা যায়। এ থেকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ দেখা দেয়। কবি যেহেতু বুর্জোয়া বিধেয়গুলির চৌহদ্দির মধ্যেই থাকেন সেই কারণে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়ে কবি গিয়ে উপস্থিত হন এক চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মধ্যে, পুরোপুরি "তাঁর সামাজিক সম্পর্কগুলির উপর নিয়ন্ত্রণক্ষমতা হারিয়ে ফেলার" মধ্যে এবং বিমূর্ত পণ্য-উৎপাদনের মধ্যে—প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদের যে সারবস্তুর বিরুদ্ধে তিনি ধিক্কার দেন সেইগুলির মধ্যেই গিয়ে তিনি উপস্থিত হন। তিনি হয়ে ওঠেন পুরোপুরি দর্পণ-বিপ্লবী।

এবং তাঁর চড়াগলার স্বাধীনতা ঘোষণা শেষ অবধি যে মুহূর্তে পূর্ণভাবে আয়ত্তে আসে সেই মুহূর্ত থেকেই স্বাধীনতা তাঁর হাত থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে যায়।

৪

এই "শিল্পের জন্ম শিল্প"র অর্থাৎ "আমার জন্ম শিল্প"র জগতের দিকে চলন অবশ্য ইংলণ্ডে রসেটির, সমাজতান্ত্রিক হওয়ার আগে মরিসের, ওয়াইল্ডের এবং কিছুটা পরিমাণে হপকিন্সের মধ্যে স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু পুঁজিবাদের এই শেষ পর্যায়ের যুগে অন্যান্য দেশে এই চলন সর্বাধিক দ্রুত হয়েছে। যে ইংলণ্ড সব থেকে তাড়াতাড়ি পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশ ঘটিয়েছিল তার অবনতির গতি হল সব থেকে মন্থর। বুর্জোয়া শিল্পের অন্তিম চলন অন্যান্য দেশে সর্বাধিক সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

ফ্রান্সে এই চলনটি সব থেকে বিশুদ্ধভাবে দেখা যায়। বদলেয়র তা শুরু করেন : "কেবলমাত্র ব্যক্তিরই মধ্যে অথবা স্বয়ং ব্যক্তির দ্বারাই অগ্রগতি (প্রকৃত, অর্থাৎ নৈতিক) সম্ভব।" "Il ne peut être du progrès (vrai, c'est à dire moral) que dans l'individu et par l'individu lui-même"। ভার্লেন ও র‍্যাঁবো এটাকে চালিয়ে নিয়ে যান, যদিও র‍্যাঁবো নিজেকে প্যারি কমিউনের সঙ্গে যুক্ত করেন, প্রথম সর্বহারার একনায়কতন্ত্রের পতনের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু কাব্য থেকে সরে যান।

তখন থেকে এই চলনটির বিকাশ পারনাসিয়ান হয়ে, প্রতীকবাদীদের মধ্য দিয়ে, সুররিয়্যালিস্টদের মধ্যে গিয়ে তার চরমে ওঠে। পারনাসিয়ানদের কাছে শব্দের মূল্য হল তার মর্মর প্রস্তরের উপযোগী কারিগরী গুণগুলির জন্ত ;

প্রতীকবাদীদের কাছে শব্দের মূল্য হল তার মধ্যে শব্দের অতীত আবেগগত অনুষঙ্গের যে অস্পষ্ট উপচ্ছায়া থাকে অর্থাৎ, তার যে সম্যক-অতিরিক্ত অনুষঙ্গগুলি থাকে তার জন্য, সুররিয়্যালিস্টদের কাছে শব্দের মূল্য হল তার মধ্যে যে ব্যক্তিগত অচেতনলোকের তাৎপর্য থাকে সরাসরি তার জন্য। হেরেদিয়া থেকে লাফর্গ হয়ে আপলিনেয়ার পর্যন্ত এই উৎক্রান্তি বিস্ময়করভাবে দ্রুত ও স্পষ্ট।

ইংলণ্ডে কাব্য প্রথমে মনে করেছিল বুঝি নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে। বুর্জোয়া অর্থনীতির বিশ্বব্যাপী যে চলন সমস্ত শিল্পকে অধঃপতিত করছে বা তাকে সুররিয়্যালিজমের দিকে চলতে বাধ্য করছে, ইংলণ্ডের দীর্ঘকালস্থায়ী বুর্জোয়া স্বসময়ে সংরক্ষিতএলাকাসূচক ছোট ছোট "পকেট" বা আশ্রয়প্রাপ্ত বৃত্তি [sheltered occupations] ইংলণ্ডে সেই চলনের গতিরোধ করল। গ্রাম এলাকা হল সেই ধরনের পকেট। ধনী শিল্প-পুঁজিপতিরা গ্রাম এলাকাকে সংরক্ষিত ও সুরক্ষিত রাখল, তারা যেখন কাঁচামালের জন্ম উপনিবেশের "গ্রাম এলাকাকে" নির্মমভাবে শোষণ করে নিজের চারদিকে প্রকৃতিশোভন সম্পর্কের কিছুটা বেশ বজায় রাখা অপেক্ষাকৃত ভালো। এর ফলে আমরা পেলাম হার্ডি এবং টমাস ও ডেভিস'এর মত এক ঝাঁক অপেক্ষাকৃত কম প্রখ্যাত গ্রাম্য কবি। অকসফোর্ড ও কেম্ব্রিজ হল এই ধরনের অন্যান্য পকেট, সেখান থেকে আমরা পেলাম হাউসম্যান ব্রেকার,ব্রুক ও অন্যান্য বহু "জর্জিয়ান" কবি। প্রথম মহাযুদ্ধ এই যুগের সমাপ্তি ঘটাল। ১৯২৯ সালে পুঁজিবাদের শেষ অর্থনৈতিক সংকট এমন কি ইংলণ্ডকেও আঘাত করল এবং ইংরেজি কাব্যও প্রতীকবাদের দিকে এবং সুররিয়্যালিজমের দিকে, যা কাব্যগত কারিগরিজ্ঞানের বিদ্রোহের যুক্তির দিক থেকে সব থেকে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রকাশ, সেই সুররিয়্যালিজমের দিকে দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকল।

সুররিয়্যালিস্ট অনেকটা সেই কারিগরের মত যে কারিগর অবসর সময়ে নিজের দক্ষতার অনুশীলনের জন্য তুচ্ছ মডেল ও খেলনা তৈরি করে। তার বিদ্রোহকে সে এইভাবে প্রকাশ করে এবং নিজের দক্ষতার প্রকৃতির কিছুটাকে ইচ্ছাপূর্বক অপ্রয়োজনীয় করে এবং সেই কারণে ব্যাপকহারে উৎপাদনের হীন দক্ষতাহীনতার বিরোধিতা করে নিজের দক্ষতার কিছুটা অবাধ প্রকাশের পথ খোলা রাখে। ভবিষ্যতে যখন শিল্পে সহজপ্রবৃত্তির এবং মনের অচেতন অংশের প্রকৃত ভূমিকা নিয়ে আলোচনার অবকাশ পাওয়া যাবে তখন আমরা সুররিয়্যালিজমের নন্দনতত্ত্ব নিয়ে এবং মনের অচেতন অংশকে সেই নন্দনতত্ত্ব

যে গুরুত্ব দেয় তা নিয়ে আলোচনা করব। বর্তমানে এইটুকু শুধু আমাদের পক্ষে দেখিয়ে রাখা প্রয়োজন যে, অবাধ অনুষঙ্গ, যা হল সুররিয়্যালিস্টপন্থী করণকৌশলের ভিত্তি, তা প্রকৃত স্বাধীন হওয়া দূরে থাক, তা সাধারণ যুক্তিভিত্তিক অনুষঙ্গের থেকেও অনেক বেশি মাত্রায় বাধ্যবাধকতামূলক [compulsive] ; ফ্রয়েড, ইয়ুং এবং ম্যাককার্ডি এটা সুস্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন। যুক্তিভিত্তিক অনুষঙ্গের ক্ষেত্রে চিত্রকল্পগুলি বাস্তব সম্পর্কে এক সামাজিক অভিজ্ঞতার দ্বারা—প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতনতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অবাধ অনুষঙ্গের ক্ষেত্রে চিত্রকল্পগুলি অচেতন সহজপ্রবৃত্তির লৌহকঠিন শাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত— এবং সেই কারণে তা পিঁপড়ের "চিন্তা করা" যেমন স্বাধীন তার থেকে বেশি স্বাধীন নয়। সমাজের বিরোধিতা করে নিজেকে সার্থক করার দ্বারা মানুষ স্বাধীন হয়ে ওঠে না। সমাজের মধ্য দিয়ে নিজেকে সার্থক করার দ্বারাই মানুষ স্বাধীন হয়ে ওঠে এবং সেই অনুষঙ্গের চরিত্রটাই কিছু কিছু সাধারণ রূপ ও প্রথা আরোপ করে যেগুলি মানুষের স্বাধীনতার অভিজ্ঞান। কিন্তু সুররিয়্যালিস্ট যেহেতু একজন বুর্জোয়া এবং তার সামাজিক সম্পর্কগুলির উপর সে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে সেই কারণে সে বিশ্বাস করে এই রূপগুলি, যেগুলির সাহায্যে অতীতে স্বাধীনতা অর্জন করা গিয়েছিল, সেই রূপগুলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাটাই হল স্বাধীনতা। যেহেতু ব্যক্তি মানুষের কার্যকলাপ যত সামাজিক হয়ে ওঠে তত বেশি সে পূর্ণাপূর্ণভাবে তার ফলগুলি ভোগ করে সেই কারণে সামাজিক কার্যকলাপ হল স্বাধীনতা অর্জনের উপায়। স্বিরসঙ্কল্পিত অ-সামাজিক কার্যকলাপ এই সামাজিক কার্যকলাপের বিরোধিতা করে আর স্থিরসঙ্কল্পিত অ-সামাজিক কার্যকলাপ দিয়েই স্বাধীনতা গঠিত বলে মনে করা হয়, যেহেতু সমাজের কাছে এই কার্যকলাপের ফলগুলির কোনও উপকারিতা নেই এবং সেইকারণে ব্যক্তি তা ভোগ করতে পারে না। অবশ্যই এটা হল প্রক্রিয়াটির বাইরে থেকে দেখা রূপ। বিষয়ীগত দিক থেকে শিল্পী বিশ্বাস করেন যে শিল্পকর্মগুলির "যাদুধর্মী" গুণগুলি থেকে এবং শিল্পীর মনের অনুপম বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে উদ্ভূত যেন এক আদর্শ স্বাধীনতা সে অর্জন করছে।

প্রত্যেক পর্যায়ে বুর্জোয়া দ্বন্দ্ব নিজেকে উদ্ঘাটিত ক'রে তার নিজের ভিত্তিরই বিপ্লব ঘটায় এবং করণকৌশলগত সম্পদের নতুন বিকাশ সাধন করে। সেই কারণে "শিল্পের জন্য শিল্প" থেকে সুররিয়্যালিজমের দিকে চলন কাব্যের করণকৌশলের বিকাশ সাধন করে, ইতোপূর্বে উল্লেখিত স্বপ্নগতির কারণে ইংলণ্ডে এলিয়ট হলেন তার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ। কিন্তু এই অবস্থা

অনির্দিষ্টকাল ধরে চলতে পারে না। করণকৌশলগত সম্পদ ও বিষয়বস্তুর মধ্যকার দ্বন্দ্ব একটা চরম অবস্থায় পৌঁছায় এবং তখন তার বিস্ফোরণ ঘটে এবং তা নিজের বিপরীত হয়ে উঠতে সুরু করে। করণকৌশলের এক নিছক চলনের বিপরীতে বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে একটা বিপ্লব এখন সুরু হয়। সামাজিক ক্ষেত্রে এর সমান্তরাল হল উৎপাদিকা শক্তিগুলির নিছক উন্নতির বিপরীতে উৎপাদন-সম্পর্কগুলিতে পরিবর্তন ঘটা। ফলে শব্দের সামাজিক অনুষঙ্গগুলি সব ভেঙে যাবে এবং কাব্যের সমগ্র বিষয়বস্তুটা হয়ে উঠবে ভিন্ন। কারণ তাহা নিজেই এক ভিন্ন সমাজে এখন সৃষ্ট হতে থাকবে। বুর্জোয়া কাব্যের বিধেয়গুলি থেকে কমিউনিস্ট কাব্যের বিধেয়গুলির দিকে একটা প্রকৃত বিপ্লবী চলন ঘটবে।

অতএব সুররিয়ালিস্ট হল শেষ বুর্জোয়া বিপ্লবী। তাকে অতিক্রম করে যাওয়ার অর্থ—মিলটনকে অতিক্রম করা, গডউইনকে অতিক্রম করা, শেটায়কে অতিক্রম করা, শেষ অবধি দাদা ও দালিকে অতিক্রম করা এবং তার অর্থ হল বুর্জোয়া চিন্তার বিধেয়গুলিকে অতিক্রম করা। এই শেষ বুর্জোয়া বিপ্লবী রাজনীতিগতভাবে কি? তিনি এক নৈরাজ্যবাদী।

নৈরাজ্যবাদী হলেন এক বুর্জোয়া যিনি বুর্জোয়া সমাজের বিকাশ দেখে এতই বিরক্ত হয়ে পড়েছেন যে বুর্জোয়া মতবাদকেই তিনি সর্বাধিক মূলগত-ভাবে তুলে ধরেন: পূর্ণ "ব্যক্তিগত" স্বাধীনতা, সমস্ত সামাজিক সম্পর্কের পূর্ণ বিনাশ। নৈরাজ্যবাদী তা সত্ত্বেও বিপ্লবী, কারণ সমস্ত বুর্জোয়া সমাজের ধ্বংসাত্মক উপাদানের এবং সমস্ত বুর্জোয়া সমাজের পূর্ণ প্রতিষেধের তিনি প্রতিনিধিত্ব করেন। কিন্তু বুর্জোয়া সমাজকে তিনি প্রকৃতপক্ষে অতিক্রম করতে পারেন না, কারণ তার যন্ত্রণার মধ্যেই তিনি আবদ্ধ। বুর্জোয়া অর্থনীতির নৈরাজ্যমূলক সংগঠনের মধ্যে কিছু কিছু সংগঠনের নিয়ম তখনও নিজেদের অস্তিত্ব তুলে ধরে এবং সেই কারণে কেবলমাত্র এক উন্নততর সংগঠনের দ্বারাই সেগুলিকে চূর্ণ করা যায়, এক নতুন শাসক শ্রেণীর সংগঠনের দ্বারাই মাত্র সেগুলিকে চূর্ণ করা যায়।

শিল্প-পুঁজিবাদের বিকাশ যে দেশে দেরিতে "গাছ-ঘরের" ["hot-house"] আবহাওয়ায় ঘটেছে এবং বিপুল সংখ্যায় কারিগর বা পেটি বুর্জোয়া কারু-শিল্পীরা যেখানে দ্রুত সর্বহারা স্তরে পরিণত হচ্ছে, নৈরাজ্যবাদী হল সেই দেশের জাতিগতভাবে বিপ্লবী সৃষ্টি। এ একটা পেটি-বুর্জোয়া মতবাদ। সেই কারণেই ইতালি, স্পেন, রাশিয়া ও ফ্রান্সের মত যে সব দেশে পুঁজিবাদ

"বেরিয়ে" বিকশিত হয়েছে সেই সব দেশে এই মতবাদের প্রাধান্য দেখা যায়—শিল্পে সুররিয়ালিস্ট প্রবণতাও আবার ঠিক এই দেশগুলিতেই সব থেকে বেশি।

রাজনৈতিক তত্ত্ব হিসাবে নৈরাজ্যবাদের মত সুররিয়ালিজমের চরিত্রও হল এই যে তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিজেকেই প্রতিষেধ করে [negates]। রাজনৈতিক তত্ত্ব হিসাবে সাম্যবাদ ও নৈরাজ্যবাদের মধ্যে পার্থক্য হল এই যে সাম্যবাদ মনে করে যে বুর্জোয়া শাসনকে সংগঠিত চলনের মধ্য দিয়েই এক-মাত্র সাফল্যের সঙ্গে উচ্ছেদ করা যায়। বুর্জোয়া অর্থনীতির সাধারণ শর্তগুলি সর্বহারার উপর যে সংগঠন চাপিয়ে দেয় সোভিয়েৎ ও ট্রেড ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত এই সংগঠন হল তার সরাসরি ফল। নৈরাজ্যবাদী অবশ্য সম্প্রতি পেটিবুর্জোয়া বা কৃষক বা কারিগর হয়েছেন। পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে সে যন্ত্রশিল্পের দিক থেকে এবং রাজনৈতিক সংগ্রামে দীর্ঘকাল যাবৎ সংঘবদ্ধ হয় নি। বিপ্লবকে সেই কারণে সে ব্যক্তিগতভাবে একজন শাসকের ধ্বংসসাধন হিসাবে দেখে। আর এটা হলেই যে শর্তগুলির মাধ্যমে সে তার নিজের ক্ষুদ্র মাত্রার শ্রমের ফল ভোগ করত সেই শর্তগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার পক্ষে তা যথেষ্ট হবে বলে মনে করে।

কিন্তু কর্মক্ষেত্রে নৈরাজ্যবাদী দেখতে পায় যে নতুন সমাজ গড়ার কথা দূরে থাক পুরাতন জীর্ণ সমাজকে ধ্বংস করাটার জন্যই সংগঠনের প্রয়োজন। এই কর্তব্যসাধনের জন্য নিছক প্রয়োজনীয় কাজটুকুই প্রথমে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার দিকে পরে সোভিয়েৎ গড়ার দিকে তাকে ঠেলে দেয়। রুশ বিপ্লবে এটা দেখা গিয়েছিল, যখন ঘটনার যুক্তি অনুযায়ী নিষ্ঠাবান সোশ্যাল রেভোলিউশ-নারিদের বেশির ভাগটাই বলশেভিকদের অবস্থানের দিকে সরে যেতে বাধ্য হয়েছিল, আবার স্পেনেও তাই ঘটেছিল, সেখানে বার্সিলোনায় এক শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারকে নৈরাজ্যবাদীদের সমর্থন করতে হয়েছিল, রক্ষীবাহিনী, প্রতিরক্ষা ও সরবরাহ ব্যবস্থা সংগঠিত করতে সাহায্য করতে হয়েছিল, এবং সমস্ত রকমে নিজেদের মতবাদকেই প্রতিষেধ করতে হয়েছিল। সেইজন্যই নৈরাজ্যবাদীদের যুক্তিধারা নিয়ে সেই পুরাতন রসিকতার মূল সত্যটা হল :

অনুচ্ছেদ ১। কোনও রকম শৃঙ্খলা আদৌ থাকবে না।

অনুচ্ছেদ ২। পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদটি মানতে কেউ বাধ্য থাকবেন না। এবং স্পেনে ফ্যাসিস্ত বিদ্রোহের পর সংবাদপত্রের সেই বিবরণের তাৎপর্য এইখানেই। সংবাদপত্রে বলা হয়েছিল: "বার্সিলোনায় নৈরাজ্যবাদীরা শৃঙ্খলা বজায় রাখছে।"

ক্ষমতাকে সংহত করার একটা আবরণ। এর ফলে উৎপাদনের বর্ধিত সংগঠন দেখা দেয় না, দেখা দেয় বৃহত্তর নৈরাজ্য এবং তিক্ততর প্রতিযোগিতা। রেশানালাইজেশন প্রকৃতপক্ষে তার বিপরীত। এর ফলে ভিতরে এবং বাইরে দুই ক্ষেত্রেই নৈরাজ্য বৃদ্ধি পায়—ভিতরের দিক থেকে বাড়ে যুদ্ধায় শিল্পের এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বদলে বিলাস সামগ্রীর শিল্পের বৃদ্ধি ঘটার কারণে এবং সাধারণভাবে মজুরিবৃদ্ধির কারণে অর্থনীতিতে এক গভীর ব্যাঘাত ঘটার ফলে—এবং বাইরের দিক থেকে বাড়ে শুল্কবৃদ্ধির কারণে এবং সাম্রাজ্যবাদ ও সাধারণভাবে যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কারণে। একমাত্র প্রকৃত সংগঠন বলতে বোঝায় সর্বহারার ও পেটিবুর্জোয়া শ্রেণীগুলির প্রতিবিপ্লবী জোটবদ্ধ হওয়া [regimentation] এবং শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠনগুলিকে চূর্ণ করা।

কিন্তু কারিগর নিম্নমুখী পথটাও সমানভাবে বেছে নিতে পারে এবং সেটা আরও বেশি সম্ভবপর এই কারণে যে শিল্পে সংকটের বিকাশ এবং অন্যদেশে ফ্যাসিবাদের বিষয়গত দৃষ্টান্তগুলির এই পথে চলার অনিবার্য পরিণতিকে উদ্ঘাটিত করতে থাকে। এই পথ হল সর্বহারা শ্রেণীর সঙ্গে নিজের মৈত্রী গড়ে তোলা এবং ফ্যাক্টরির মধ্যকার শ্রমিক সংগঠনগুলিকে সামগ্রিকভাবে উৎপাদনের সংগঠনে প্রসারিত করা। এই পথে যে সব অধিকারগুলি বাধা হয়ে দাঁড়ায় সেগুলিকে—উৎপাদনের উপায়গুলির ব্যক্তিগত মালিকানাকে নিশ্চিহ্ন করার দ্বারাই এই প্রসারণ ঘটান যায়। এই অধিকারই যেহেতু বর্তমান সমাজের প্রকৃত শক্তি সেই জন্য তার অর্থ হল পুঁজিপতিদের ক্ষমতার জায়গায় শ্রমিকদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা। কারিগর যখন এই পথটি বেছে নেয় তখন উৎপাদনে তার গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের জন্য, তার সুবিধাজনক আয়ের জন্য (যা তাকে আরও বেশি অবসর দেয় এবং সাংস্কৃতিক সুযোগ দেয়), এবং দায়িত্ববহনের অভিজ্ঞতা থাকার জন্য কারিগর এখন হয়ে ওঠে সর্বহারার স্বাভাবিক নেতা। এখন আর সে সর্বহারার সব থেকে বিশ্বাসঘাতক শত্রু থাকে না; বুর্জোয়ার সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ অবস্থায় তাই সে ছিল।

এই কারণের জন্যই এই কারিগর ও পেটিবুর্জোয়া গোষ্ঠির মধ্যেই—"অভিজাত শ্রমিকদের" মধ্যেই বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গীর অগ্রগতি ইংলণ্ডের বিগত তিন বছরের ইতিহাসে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। "অভিজাত শ্রমিক" গোষ্ঠিতে ইতোপূর্বে সমস্ত রকমের প্রতিক্রিয়াশীল লক্ষণগুলি দেখা গিয়েছিল যার ফলে কারিগরদের ইউনিয়নগুলি এদেশে কুখ্যাত হয়ে উঠেছিল এবং এদেরই অনেক মুখপাত্র জার্মানীতে ফ্যাসিস্ত শাসনের প্রকৃত সমর্থক হয়ে উঠেছিল। ট্রেড ইউনিয়ন

ব্যাপারের সঙ্গে যিনিই সুপরিচিত তিনিই জানেন যে কারিগরদের ইউনিয়ন-গুলি এবং যে সমস্ত শিল্পভিত্তিক ইউনিয়নে কারিগরদের বড় রকমের অংশ ছিল সেগুলি আগে সাধারণ শ্রমিকদের ইউনিয়নগুলিকে বড় বেশি জঙ্গী ও "সমাজতন্ত্রবাদ" বলে যেরকম বিরোধিতা করত এখন সেইরকম A. E. U, E.T.U, A.S.L.E. & T. F., N. A. U S. W & C এবং N. U. O'র মত কারিগরদের এবং আধা-পেশাভিত্তিক ইউনিয়নগুলি ট্রেডইউনিয়ন কংগ্রেস-গুলিতে এবং তাদের শাখাগুলিতে ও মেট্রোপলিটান কাউন্সিল বা জেলা কমিটিগুলিতে জঙ্গী কার্যকলাপের জন্য চাপ দিচ্ছেন এবং সাধারণ শ্রমিকদের ইউনিয়নগুলি বর্তমানে তাদের বড় বেশি চরম মনোভাবাপন্ন ও কমিউনিস্টপন্থী বলে নিন্দা করছে। একইভাবে যে সমস্ত কারিগররা তাদের আদর্শ তত্ত্বগত বিষয়বস্তুর কারণে বরং বুর্জোয়াদের মধ্যেই একটা বিশেষ অবস্থান লাভ করেছেন তাঁরা—ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক, স্থপতি ও শিক্ষকরা—এখন উদার-পন্থীদের থেকে মাঝপথে কিছুদিনের জন্য লেবার পার্টিতে ঘোরাফেরা না করেই সরাসরি বামপন্থীদের দিকে ঝুঁকছেন এবং ভালোরকম সংখ্যায় কমিউনিস্ট পার্টিতে প্রবেশ করছেন।

বুর্জোয়া বিভ্রমের এই একই অন্তিম চলন পিপলস ফ্রন্টের অগ্রগতির মধ্যেও প্রতিফলিত হচ্ছে। পিপলস ফ্রন্টে আধুনিক সমাজের কারিগর অংশের প্রতিনিধিত্বকারী সমস্ত উদারপন্থীরাই আনুষ্ঠানিকভাবে লিখিত মৈত্রী চুক্তির মাধ্যমে সর্বহারার নেতৃত্বকে মেনে নিচ্ছেন এবং সেই নেতৃত্বের পরিসরও সীমিত করে তুলছেন।

ইংরেজি কাব্যে এর প্রতিফলন দেখা যায় এই ঘটনার মধ্যে যে ইংরেজ কবিরা সুররিয়ালিস্ট নৈরাজ্যে আদৌ পুরাপুরিভাবে প্রবেশ না করে সুররিয়ালিজমের কাছাকাছি এক অবস্থান থেকে তার বিপরীত অবস্থানে—এক কমিউনিস্ট বিপ্লবী অবস্থান গ্রহণ করেন অডেন, লিউইস, স্পেণ্ডার ও লেহ্‌ম্যান যেমন করেছেন। এটা কতদূর যথার্থভাবে কমিউনিস্ট বা শিল্পের কোন্ স্তরের তা প্রতিনিধিত্ব করে সে সব আলোচনা আমরা আমাদের শেষ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত মুলতুবি রাখছি, কারণ এই চলনের ফলে বুর্জোয়া দ্বন্দ্ব তার সংশ্লেষণে [synthesis] পরিণত হয়। এটা তখন কেবল তার উৎপাদিকা শক্তি-গুলিকেই নয়, তার নিজের বিধেয়গুলিকেই বিপ্রবাহিত করতে সুরু করে। যে দ্বন্দ্বজনিত চাপের ফলে উৎপাদিকা শক্তিগুলি সৃষ্ট হয়েছে এই বিধেয়গুলি এখন সেগুলিকেই অসম্ভব রকমে সীমাবদ্ধ করে তুলছে। ফ্রান্সে এই চলন

আরও অগ্রসর হয়েছে, জিদ্‌, রল্যাঁ, মালরো ও আরাগঁ একদিন যে ইউনিফর্মকে ত্যাগ করেছিলেন সেই ইউনিফর্মই গায়ে দিয়েছেন। এদেশে সেটা সবে শুরু হয়েছে।

যে সব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ নিয়ামক-শক্তিগুলি বুর্জোয়া ইংরেজি কাব্যের উপর প্রভাব ফেলে তার এক সংক্ষিপ্ত পরিক্রমায় বিবরণ আমরা দিয়েছি। যে সামাজিক ও ঐতিহাসিক চলনগুলি কবির মনোভাবকে নির্ধারিত করে এবং সেই বিশেষ দ্বন্দ্বজনিত চাপ [tension] সৃষ্টি করে যার সমাধান একমাত্র কাব্য দ্বারাই করা যায়, সেই চলনগুলির আলোচনা থেকে ব্যক্তিগত শিল্পসৃষ্টির চলনের আলোচনায় এখন আমাদের যাওয়া প্রয়োজন। এই বাইরের চাপের কাছে ব্যক্তি যে বিশেষভাবে সাড়া দেয় এবং নিজের সহজ প্রবৃত্তিগত শক্তি থেকে ডায়ালেকটিক পদ্ধতিতে যে গতিবেগ তাকে সঞ্চার করে সেই বিষয়ে আলোচনায় এখন আমাদেব যাওয়া প্রয়োজন।

বুর্জোয়া কাব্যের চলন

	সাধারণ বৈশিষ্ট্য	করণকৌশলগত বৈশিষ্ট্য
প্রাথমিক পুঁজি-সঞ্চয় ১৫৫০-১৭০০	এলিজাবেথীয় যুগ—মার্লো, শেকস্পীয়র। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যে গতিশীল শক্তি সমস্ত বাইরের রূপগুলিকে চূর্ণ করার দ্বারা নিজেকে সার্থক করে তার প্রকাশ ঘটে কাব্যে। বিশিষ্ট নায়ক হলেন নিরঙ্কুশ ক্ষমতা-সম্পন্ন যুবরাজ, জনজীবনে যাঁর চমৎকার কার্যকলাপ থাকে। এই জনজীবন যৌথ জীবন এবং সেই কারণে এর মধ্য দিয়ে অন্যান্য ব্যক্তিও যুবরাজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে অস্বীকার না করেও নিজেদের সার্থক করে তুলতে পারেন।	(ক) আইয়েম্বিক ছন্দের, যা প্রাচীন জগতের পরিভাষায় বুর্জোয়া বিপ্লবের বীরত্ব-ব্যঞ্জক চরিত্রটিকে প্রকাশ করে তার অপরিসীম ও স্বাভাবিক স্ফুরণ হতে দেয়; ব্যক্তি-গত ইচ্ছার অবাধ ও সীমাহীন বিকাশকে এটা সূচিত করে। এটা যৌথ—আবৃত্তির উপ-যোগী; অভিজাত—যুবরাজসুলভ নির্দেশের পক্ষে উপযুক্ত; নমনীয়—কারণ যুবরাজের সমগ্র জীবন, এমন কি তার ঘনিষ্ঠ ব্যাপারগুলিও, সহজ অকপটতার মধ্যে যাপিত হয়। (খ) গীতিকবিতাগুলি সমবেতভাবে গীত হওয়ার উপযুক্ত (সরল ছন্দমাত্রা) কিন্তু রাজসভার যোগ্য (অলঙ্কারশোভিত স্তবক) এবং মার্জিত (উজ্জ্বল 'কনসিট')

উৎক্রান্তি
১৬০০-১৬২৫

জ্যাকোবিয়ান যুগ—জন, হেরিক, ডন, হার্বার্ট, ক্র্যাশ্‌অ। নিরঙ্কুশ ক্ষমতাশালী রাজা এখন এক দুর্নীতিসৃষ্টিকারী শক্তি হয়ে ওঠে, এবং রাজসভার দীপ্তিময় জনজীবন থেকে সরে গিয়ে ব্যক্তিগত পাঠকক্ষ ও গ্রামাঞ্চলে আশ্রয় নেওয়া দেখা যায়।

পিউরিট্যানরা গীতি-কবিতাধর্মী স্তবকগুলি গ্রহণ করলেন এবং সে-গুলিকে বিশদ ও পাণ্ডিত্য-পূর্ণ করে তুললেন। রাজসভারকাব্য অধ্যয়ন সাপেক্ষ শব্দসম্ভারবহুল শিক্ষিত লোকের কাব্য হয়ে উঠল। অমিত্রাক্ষর কবিতা (ওয়েবস্টার) যুবরাজোচিত গুণের অবনতি সূচনা করে এবং তা অভিজাত নিম্নস্বর [undertones] হারিয়ে ফেলে। গীতিকাব্য আর গীতযোগ্য থাকছে না এবং 'কনসিট' গ্রন্থিল ও চিন্তাপূর্ণ হয়ে ওঠে।

বুর্জোয়া বিদ্রোহ
১৬২৫ ১৬৬০

পিউরিট্যান বিপ্লব—মিলটন। বুর্জোয়া শ্রেণী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য নিজেকে যথেষ্ট শক্তিশালী বলে মনে করে, এবং "জনগণের" সাহায্যে স্টুয়ার্ট রাজাদের সিংহাসনচ্যুত করে। কিন্তু বুর্জোয়াদের এই স্বাধীনতা লাভ বিপজ্জনক বলে প্রমাণিত হল: জনগণও এর জন্য দাবি করতে থাকেন এবং একটা একনায়কতন্ত্র দেখা গেল যা বুর্জোয়া শ্রেণীকে বিচ্ছিন্ন করল

বীরত্ব ব্যঞ্জক বুর্জোয়া বিভ্রম প্রাচীন জগতের পরিভাষায় ফিরে এল কিন্তু তা আরও আত্ম-সচেতন এবং যুবরাজের মূর্তির মধ্যে তা প্রক্ষে-পিত নয়। নাটকীয় হওয়ার পরিবর্তে তা হল ব্যক্তিগত। রাজসভার বিরুদ্ধে পিউরিট্যানদের বিদ্রোহ একে এক নিরা-ভরণ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ শব্দ

তার পরে প্রতিক্রিয়ার আবির্ভাব ঘটল। আত্ম-আদর্শায়িত করা বিপ্লবীর অভিজাত সরলতা (স্যাটান, স্যামসন এ্যাগনিস্তেস, ক্রাইস্ট ইন দি ডেজার্ট) তারপর পরাজয়ের আবহাওয়ার মধ্যে লুপ্ত হয়ে যায়।

সভায় স্থান করল; এক কঠোরতর ছন্দে এই সচেতন সংযম প্রতিফলিত হল।

পিউরিট্যান-বিরোধী প্রতিক্রিয়া ১৬৫০-১৬৮৮

রেস্টোরেশন'এর যুগ—ড্রাইডেন, সাকলিঙ, লাভলেস। কাব্য তার মহান ভাবাবেগগুলি ভুলে গিয়ে হয়ে উঠল মানববিদ্বেষী, পরিমিত বা যুক্তিধর্মী। জনগণের পরিবর্তে অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে বুর্জোয়া শ্রেণীর মৈত্রী দেখা দিল; এবং রাজসভার প্রত্যাবর্তন ঘটল, কিন্তু এখন আর নিরঙ্কুশ ক্ষমতাশালী যুবরাজের রূপে নয়। যুবরাজ এখন "যুক্তির" অধীন।

"তেজ"কে সংযত করার জন্য রূপগত নিয়মাবলী আরোপ করা হল। তেজের প্রচণ্ডতা যে বিপজ্জনক তা প্রমাণ হয়ে গেছে। হিরোয়িক কাপলেটের চৌহদ্দির মধ্যে চলাফেরা করায় কাব্য যে আপোষ করতে প্রস্তুত তা সূচিত হয়। রাজসভার কাব্যের পুনরাবির্ভাব ঘটে, কারণ বুর্জোয়া শ্রেণী অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে মৈত্রীস্থাপন করেছে এবং সেইকারণে এলিজাবেথীয় গীতিকবিতার সহজ মাত্রা ও রাজসভার উপযুক্ত সুরুচি খিটখিটে পণ্ডিতদের কবিতাকে দূরে সরিয়ে দেয়। শব্দভাণ্ডার হয়ে ওঠে আরও কথ্য এবং সামাজিক।

বাণিজ্যধর্মিতা ও [মার্কেন্টাইলিজম] হস্তশিল্পের যুগ ১৬৮৮-১৭৫০

অষ্টাদশ শতক—পোপ। যে সব আইন ও বাধানিষেধ শ্রমের দর কম রাখবে এবং তাকে হস্তশিল্পের পর্যায়ের মধ্য দিয়ে বিকশিত হতে সক্ষম করবে সেই সব আইন ও বাধানিষেধকে বজায় রাখার উদ্দেশ্যে কৃষিভিত্তিক পুঁজিপতিদের (হুইগ "অভিজাতদের") সঙ্গে মৈত্রী চালিয়ে যেতে শ্রমিকের স্বল্পতা বুর্জোয়া শ্রেণীকে বাধ্য করে। রূপ ও বাধানিষেধ, সুরুচি এবং এক উচ্চশ্রেণীসুলভ "সুরের" ["tone"] সঠিকতা ও চিরস্থায়িত্বে বিশ্বাস কাব্যে প্রতিফলিত হয়।

বাহ্যিক "নিয়মশৃঙ্খলকে" এখন আপোষ হিসাবে নয়, বরং স্টাইলের সুস্পষ্ট ও যুক্তিসম্মত উপাদান হিসাবে মেনে নেওয়া হয়। কাব্য হয়ে ওঠে অগাস্তান এবং তা স্টাইলকে, পরিমিতিকে [measure], ভব্যতাকে [polish] ও যে বিরোধালংকার স্বাভাবিক সুপ্রতুলতাকে সংযত করে তাকে আদর্শায়িত করে। শব্দভাণ্ডার হয়ে ওঠে আচারভিত্তিক ও সুরুচিপূর্ণভাবে সৌখীন।

শিল্পবিপ্লব এবং "এ্যান্টি-জ্যাকোবিন" প্রতিক্রিয়া ১৭৫০-১৮২৫

রোমান্টিকতার পুনরাবির্ভাব—বায়রন, কীটস, শেলি ও ওয়ার্ডসওয়ার্থ। হস্তশিল্প থেকে যন্ত্রশক্তিতে বিকাশ কারিগর শ্রেণীকে সর্বহারায় পরিণত করে এবং বাণিজ্যধর্মিতার বাধানিষেধগুলিকে এখন অপ্রয়োজনীয় করে তোলে। এখন যখন বাজারের সম্প্রসারণ এবং শিল্পে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি হস্তশিল্পকে প্রামাণ্যকলের অধীনতামুক্ত করে এবং রাষ্ট্রে সর্বাধিক আধিপত্যবিস্তারী যন্ত্রশিল্প হিসাবে দেখা দিতে থাকে

হৃদয় এবং ভাবালুতা প্রতি আবেদন জানানর মধ্য দিয়ে কাব্য পুরাতন "রূপগুলির" বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। কাব্য একই সঙ্গে স্বাভাবিক কথা ভাষা [speech] এবং এলিজাবেথীয় ও জ্যাকোবিয়ান যুগের ছন্দমাত্রা ও শব্দভাণ্ডারে ফিরে যাওয়ার মধ্য দিয়ে কথাভাষাকে রোমান্টিক করে তোলাকে অন্তর্ভুক্ত করতে চায়। "বিমূর্ত"

তখন অভিজাত ভূস্বামীও পেটি বুর্জোয়ার মধ্যকার মৈত্রীর সমাপ্তি ঘটে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজি-গুলি এখন বিপুল সম্প্রসারণ ক্ষমতা অর্জন করে এবং ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে বুর্জোয়া শ্রেণীর মাথা ঘুরে যেতে থাকে। হস্তশিল্প যুগের রূপগুলি যন্ত্রশিল্পের উপর বাধার কাজ করে। "উদারপন্থী" পুঁজিপতিরা বিশেষ সুযোগ-সুবিধার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার নামে তার ধর্মযুদ্ধে জনগণকে নেতৃত্ব দেয়। কাব্য হয়ে ওঠে নিষ্ঠাবান ও অনুভূতিতে পূর্ণ। কাব্য তখন নিজের মধ্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী এলিজাবেথীয় যুগের সঙ্গে আত্মীয়তা দেখতে পায়। এ তখন ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং এক পূর্ণতর, স্বাধীনতর জীবনের জন্ম ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবে বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে জনগণের মৈত্রী সর্বহারা শ্রেণীর জন্মও বিপ্লবী দাবিতে পরিণত হয়। বুর্জোয়া শ্রেণী সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, নিজের দাবিগুলি প্রত্যাহার করতে থাকে, তার জনভিত্তি হারিয়ে ফেলে এবং অভিজাত ভূস্বামীর সঙ্গে মৈত্রী-বদ্ধ হয়ে এক প্রতিক্রিয়াশীল পথে পদার্পণ করে। কাব্য ধারণা প্রকাশক শব্দের অন্তর্ভুক্তি এবং একই সঙ্গে ইন্দ্রিয়ানুভূতিমূলক [sensuous] ও বস্তুগত-ভাবে "সত্য" শব্দ প্রচলিত হতে থাকে। দুটি মিলে বাস্তব জীবন থেকে কাব্যে ব্যবহৃত শব্দভাণ্ডার-কে পৃথক করে তোলে। ছন্দ—যা এলিজাবেথীয় যুগে ছিল আবৃত্তিধর্মী, জ্যাকোবিয়ান কাব্যে ছিল চিন্তাধর্মী, পিউরিটান কাব্যে ছিল উন্নীত [elevated] পর্যায়ের, অগাস্তান কাব্যে ছিল সুরুচিপূর্ণ— রোমান্টিক কাব্যে তা হয়ে উঠল সংবেশনমূলক [hypnotic]। কাব্যের করণ-কৌশলের বিকাশে এক বিরাট অগ্রগতি দেখা দিল।

	মোহভঙ্গ হয়ে আরও বেশি বেশি করে ব্যক্তিগত রোমান্সের জগতে নিজেকে গুটিয়ে নিতে থাকে। চূড়ান্ত ভণ্ডামি বা অন্তঃসারশূন্য আড়ম্বর ছাড়া সামাজিক বাস্তব নিয়ে বেশি হৈ চৈ করার অবস্থা তার নেই, কারণ বড় বেশি আপোষপন্থী সে হয়ে গিয়েছে। সমস্ত কবিরাই এখন যত বয়স বাড়তে থাকে ততই নিজেদের যৌবনকালের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে থাকেন।	
বৃটিশ পুঁজিবাদের অবনতি ১৮২৫-১৯০০	**ভিক্টোরিয়ান কবি**—টেনিসন, ব্রাউনিঙ, আর্নল্ড, সুইনবার্ণ, রসেটি, প্যাটমোর, মরিস। পুঁজিবাদের প্রথম সংকট ঘটল ১৮২৫এ। পুঁজিবাদী উৎপাদনের শর্তগুলি দ্বারা কবি যত সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে থাকলেন ততই কবি হয়ে উঠলেন নিরাশাবাদী বা আরও বেশি বেশি করে এক ব্যক্তিগত জগতের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন।	পূর্ববর্তী যুগে ইতোমধ্যেই যে সব করণকৌশলগত সম্পদ আবিষ্কার হয়েছিল সেগুলির সাধারণভাবে তীব্রতাবৃদ্ধি।
সাম্রাজ্যবাদের যুগ ১৯০০-১৯৩০	**"শিল্পের জন্য শিল্প"** দি পারনাশিয়ানস, প্রতীকবাদ, ভবিষ্যৎবাদ, সুররিয়ালিজম—চূড়ান্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, পণ্যের	শিল্পের জগৎকে সমাজের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করার চেষ্টা। প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসাবে

উপর অন্তভক্তি এবং সামাজিক সম্পর্কের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলার কারণে কবি বিদ্রোহ করেন। বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে কবিতা সামাজিক জগৎ থেকে গিয়ে পৌছায় পুরাপুরি এক ব্যক্তিগত জগতে। বুর্জোয়া শক্তিগুলির বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ পরিশেষে বুর্জোয়া উৎপাদনের বিধেয়গুলিকে চূড়ান্ত বিশুদ্ধতায় প্রকাশ করে। এইভাবে এ নৈরাজ্যের মধ্যে নিজেকে অস্বীকার করে এবং স্বভাবতঃই তাকে বুর্জোয়া বিভ্রমের বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। ইংরেজ পুঁজিবাদের নিশ্চিন্ত আশ্রয়প্রাপ্ত [sheltered] অবস্থার কারণে বিকাশের দিক থেকে ইংরেজি কাব্য এখন ইউরোপের অন্যান্য অংশের কাব্যের অনুসরণ করে। বিকাশের ধ্রুপদী উদাহরণ এখন হল ফরাসী কাব্য এবং (গৌণভাবে) ইতালিয়, স্পেনীয় ও রুশ কাব্য। ওয়াইল্ড, এলিয়ট, ফ্রেকার ও পাউণ্ডের নাম হয়ত করা যেতে পারে। নিশ্চিন্ত আশ্রয়প্রাপ্ত এলাকায় ভিক্টোরিয়া কাব্য টিঁকে থাকে: গ্রামাঞ্চল (হার্ডি, টমাস ও ডেভিস), অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ (হাউসম্যান, ব্রুক, স্কোয়্যার প্রভৃতি)। বিকশিত পুঁজি-

কাব্যের মধ্যে যাবতীয় বিশিষ্ট সামাজিক লক্ষণগুলিকে পরিত্যাগ করা। শব্দগুলি বেশি বেশি করে ব্যক্তিগত অনুষঙ্গের জন্য ব্যবহৃত। হয় সমস্ত ছন্দকে তার সামাজিক উদ্ভবের কারণে পরিত্যাগ করা, না হয় অনুষঙ্গগুলির মুক্তি ঘটানর জন্য তাকে সংবেশাত্মকভাবে ব্যবহার করা। যে অনুষঙ্গগুলি যত বেশি গভীর হবে এবং সেইকারণে যত তা অচেতনলোকের পরিচায়ক হবে সেগুলি তত বেশি ব্যক্তিগত হবে। পরিশেষে, সুররিয়ালিজমের "পুরাপুরি স্বাধীন" শব্দ।

	বাদের সমাধানের অতীত দ্বন্দ্বগুলিকে প্রথম বহাযুক্ত প্রকাশ করে এবং বিকশিত পুঁজিবাদের পরে এবং পুঁজিবাদের প্রথম সংকট দেখা দেওয়ার একশ' বছর পরে যে সাধারণ অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয় তা এই অধ্যায়টির সমাপ্তি ঘটায়।	
অন্তিম পুঁজিবাদী সংকট ১৯৩০—?	**ডিসিপলস ফ্রন্ট**—কাব্য এখন বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে বুর্জোয়া মতাদর্শী বা "কারুশিল্পীর" সঙ্গে সর্বহারা শ্রেণীর মৈত্রী গড়ে তুলে বুর্জোয়া শর্তগুলির বিরুদ্ধে এক বাস্তব বিদ্রোহকে প্রকাশ করে। ফ্রান্স এখনও নেতৃত্ব দিতে থাকে: আরাগঁ, জিদ্ ইত্যাদি। ইংলণ্ডে: লিউইস, অডেন ও স্পেণ্ডার।	পূর্ববর্তী পর্যায়গুলির চলনের ফলে বিকশিত সমস্ত করণকৌশলগত সম্পদগুলিকে সামাজিক মূল্য দেওয়ার জন্য আরও একবার চেষ্টা। পূর্ববর্তী চলনের শেষ দিকে কাব্য হয়ে উঠেছিল বিষয়বস্তুহীন এবং রূপাভিত্তিক। কাব্যের সমগ্র বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে এক পুরাপুরি পরিবর্তনের সূচনা এই যুগে দেখা যায়। যতক্ষণ না সামাজিক সম্পর্কের সমস্যাটি কাব্যের দিক থেকে সমাধান করা যাচ্ছে ততক্ষণ রূপের প্রশ্নটা এখন গৌণ হয়ে ওঠার প্রবণতা দেখা দিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কাব্যের বৈশিষ্ট্য

কাব্য বলতে আমরা আধুনিক কাব্যের কথা বলছি, কারণ আমাদের যুগ ও সময়কার কাব্য সম্পর্কে কেবল যে এক বিশেষ ও অন্তরঙ্গ ধারণা আমাদের আছে তাই নয়, আমাদের যুগের ধ্যানছায়ার মধ্য দিয়েই আমরা সমস্ত যুগের কাব্যকে দেখে থাকি। আধুনিক কাব্য এমন এক ধরনের কাব্য যা কাহিনী থেকে ইতোমধ্যেই আলাদা হয়ে গিয়েছে এবং বিকাশমান বুর্জোয়া শ্রেণীর নিজের পরিবেশের সঙ্গে তার চেতনার সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে।

এই আধুনিক কাব্যের—কেবল ভালো আধুনিক কাব্যেরই নয়, যে কোনও আধুনিক কাব্যেরই—বিশেষ লক্ষণগুলি কি? মিমেসিস, [Mimesis] যা ছিল গ্রীক কাব্যের বৈশিষ্ট্য তা বুর্জোয়া কাব্যের বিশিষ্ট লক্ষণ নয়, বুর্জোয়া গল্প ও নাটকেও তা দেখা যায়।

যে বৈশিষ্ট্যগুলি পরিশীলিত আধুনিক মানুষের কাছে কোনও সাহিত্য-কর্মকে কাব্য করে তোলে তা হল:

(ক) কাব্য ছন্দোময়

যে কোনও ভাষার "স্বাভাবিক" ছন্দের উপর আরোপিত কাব্যের সুস্পষ্ট ছন্দের মূল উৎস দু'টি বলে মনে হয়—

(১) ছন্দ সকলের সঙ্গে একযোগে আবৃত্তিকে অপেক্ষাকৃত সহজ করে তোলে এবং সেই কারণে কাব্যের যৌথ প্রকৃতির উপর বেশি গুরুত্ব দেয়। যে সামাজিক ছাঁচের মধ্যে কাব্যের জন্ম এটা তারই ছাপ। ফলে ছন্দের প্রকৃতি কাব্যের সহজপ্রবৃত্তিগত ও আবেগগত বিষয়বস্তুর সঙ্গে যে সামাজিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে আবেগ নিজেকে যৌথভাবে বাস্তবায়িত করে তার যথাযথ ভারসাম্যটিকে সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীলভাবে প্রকাশ করে। এইভাবে মানুষের সহজপ্রবৃত্তির সঙ্গে তার সমাজের সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানুষের আত্মমূল্যায়নের কোনও পরিবর্তন ঘটলে, তা মাত্রা ও ছন্দের যে প্রচলিত রীতির মধ্যে সে জন্মেছে তার প্রতি সেই মানুষের মনোভাবের মধ্যে প্রকাশ পায়; আর সেই জন্যই সে কবি হিসাবে কোন না কোন দিকে তার পরিবর্তন ঘটায়। ইংরেজি

বুর্জোয়া কাব্যের চলনকালে ছান্দিক কলাকৌশল সম্পর্কে মনোভাবের যে পরিবর্তন ঘটেছিল তার একটা মোটামুটি আলোচনা আমরা ইতোমধ্যেই করেছি। এবং এটা খুবই স্পষ্ট যে সমস্ত সামাজিক সম্পর্কগুলিকে অন্ধভাবে পরিত্যাগ করার জন্ত বুর্জোয়ার চূড়ান্ত নৈরাজ্যবাদী প্রচেষ্টা "মুক্তছন্দের" দিকে অন্তিম চলনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। সেটা ঘটবেই, কারণ মানুষ তার সামাজিক সম্পর্কগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে।

(২) কিন্তু এ থেকে কাব্যে বুর্জোয়া ছন্দের এক বিশিষ্ট লক্ষণে আমরা পৌঁছাই—তা হল যে বিশেষ পথে ছন্দ যৌথ আবৃত্তি ও আবেগকে সাহায্য করে সেই লক্ষণে। দেহের কয়েকটি স্বাভাবিক পর্যাবৃত্তি আছে (নাড়ীস্পন্দন, শ্বাসপ্রশ্বাস ইত্যাদি)। বাইরের ঘটনার সাময়িক বৈশিষ্ট্য এবং অহং [ego]-এর মধ্যে তা একটা সীমারেখা নির্দেশ করে এবং সময়কে আমরা যেন এক বিশিষ্ট ও সরাসরিভাবে বিষয়ীগত দিক থেকে উপলব্ধি করি—এই রকম একটা প্রতীতি ঘটায়। যে কোনও ছন্দোময় গতি বা কর্ম সেইজন্তই আমাদের সচেতন ক্ষেত্রের পরিবেশগত অংশটাকে কিছুটা খাটো করে শারীরবৃত্তিগত [physiological] অংশটাকে বড় করে তোলে। এবং তা এক বিশেষ ধরনের অন্তর্বৃত্তি [Introversion] গড়ে তোলে যেটাকে আমি আবেগগত অন্তর্বৃত্তি বলব এবং কোনও গাণিতিক সমস্যার দিকে আমরা যখন মনোনিবেশ করি তখন যে ধরনের যুক্তিগত অন্তর্বৃত্তির সৃষ্টি হয় সেটার সঙ্গে তার পার্থক্য দেখাব। গণিতের ক্ষেত্রে ছন্দের কোনও স্থানই নেই।

যৌথ উৎসবে ছন্দ মানুষকে পরস্পরের সঙ্গে শারীরবৃত্তিগত এবং আবেগ-গত দিক থেকে বিশেষভাবে যুক্ত করে। পরস্পরকে তারা ইতোমধ্যেই দেখে থাকে কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত সম্মিলনের মত এটা নয় বরং বিপরীত। যখন এই মানুষরা পরস্পরকে সেরকম স্পষ্টভাবে দেখে না, যখন প্রত্যেকেই নিজের নিজের শরীরের গভীরে একেবারে মগ্ন হয়ে যায় এবং একই শারীরবৃত্তিগত ও প্রাকৃতিকশক্তিগত [elemental] স্পন্দন অনুভব করে তখন তারা এক বিশেষ ধরনের যূথবদ্ধ সাধারণ ঐক্যের অংশীদার হয়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ একই বস্তুজগতে পরস্পরকে দেখার মধ্য দিয়ে যে সাধারণ ঐক্য অনুভব করা যায় এটা তা থেকে আলাদা। এটা সচেতন সাধারণ ঐক্যের বিপরীত এক সহজ প্রবৃত্তিগত সাধারণ ঐক্য; বিষয়গত ঐক্যের বিপরীত বিষয়ীগত ঐক্য। আবেগগত অন্তর্বৃত্তির ক্ষেত্রে মানুষ তার জেনোটাইপে ফিরে যায়, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে মোটামুটিভাবে সাধারণ অন্তর্বৃত্তিজ জীবনযাত্রার

বহির্বাস্তবের দ্বারা পরিবর্তিত হয় এবং অভিযোজিত হয় তার মধ্যে ফিরে যায়।

এই আবেগগত অন্তর্বৃত্তি নিজেই একটা সামাজিক ক্রিয়া। সমাজ যে একটা সুসংহত কার্যকর সমগ্ররূপ পায় তার কারণ সমস্ত মানুষের মধ্যে একই ধরনের অন্তর্বৃত্তি রয়েছে। যে উৎপাদন সম্পর্কগুলির মধ্যে মানুষ জন্মায়, যে পরিবেশের মধ্যে সে প্রবেশ করে তা তার চেতনাকে সামাজিকভাবে রূপ দেয় এবং সেই সমাজের সংহতিকে রক্ষা করে। এটা ঠিক যে, একজন আদিম অস্ট্রেলিয় সংস্কৃতির মধ্যে জাত এবং অপরজন আধুনিক ইউরোপীয় সংস্কৃতির মধ্যে জাত এমন দুটি একই ধরনের জেনোটাইপ দুটি ভিন্নরূপই নেবে এবং পরবর্তীকালে যদি এদের একই জায়গায় নিয়ে আসা হয় তাহলে তারা একটি সামাজিক ধাত্র গড়ে তুলতে পারবে না। কিন্তু একটি বানর ও একজন মানুষ একই সংস্কৃতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করে থাকলেও, একই ধরনের পরিবেশ হওয়া সত্ত্বেও তারা ভিন্ন ধরনেরই হবে এবং এরাও একই সামাজিক ধাত্র গড়ে তুলতে পারবে না। অন্তর্বৃত্তি ও সংস্কৃতির পরিবেশের মধ্যকার এই দ্বন্দ্ব সমাজের পক্ষে একান্ত মৌলিক। আমরা এর যে বিশেষ ধরনের রূপটির বিশ্লেষণ করছি তা যেমন পুঁজিবাদী সমাজের বিকাশকে চালিত করছে, ঠিক সেইরকম এই সাধারণ দ্বন্দ্ব সমস্ত ধরনের সমাজের বিকাশকে চালিত করে। শব্দ যে যুক্তিভিত্তিক বিষয়বস্তু বা বিষয়গত অস্তিত্ব বোঝায় এবং সেই একই শব্দ যে আবেগগত বিষয়বস্তু বা বিষয়ীগত মনোভাবও বোঝায়, এই দুইয়ের বিরোধিভাব মধ্য দিয়ে ভাষার ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্বটি সূচিত হয়। এই দুটিকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা অসম্ভব। কারণ, ভাষা যে উপায়ে জন্ম নেয়—প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে—তা থেকেই এর উদ্ভব। কিন্তু বিজ্ঞান (বা বাস্তব) হল প্রথমটির বিশেষ ক্ষেত্র, আর কাব্য (বা বিভ্রম) হল শেষেরটির এলাকা। অতএব কাব্য কোনও না কোনও ভাবে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রামের মতই সমাজের সঙ্গে চিরকাল যুক্ত, এটা এমন এক সংগ্রাম অর্থনৈতিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে যার পরিণতি হল সংঘবদ্ধতা [association]।

কাব্যের ক্ষেত্রে এই সংগ্রাম যে রূপ নেয় তা হল মানুষ নিজের মধ্যে মগ্ন হয়ে তার সহযাত্রী মানুষের সঙ্গে আবেগগত মিলন গড়ে তোলে। সেইজন্য বুর্জোয়া কবি যখন মনে করে যে তার অন্তরের অন্তঃস্থলে শিল্পের জগতে প্রবেশ করে বাস্তব থেকে পলায়ন করে সে তার ব্যক্তিসত্তাকে প্রকাশ করছে, সে তখন প্রকৃতপক্ষে যুক্তিগত বাস্তবের সামাজিক জগৎ থেকে আবেগগত সাধারণধর্মিতার

সামাজিক জগতে প্রবেশ করে মাত্র। বুর্জোয়া কবি যখন সমাজবিরোধী হয়ে ওঠে (তাই সে মনে করে) এবং "শিল্পের জন্ত শিল্পের" জগতে পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে, তার ছন্দ তখন উত্তরোত্তর নকাশীর এবং সংবেদনাত্মকভাবে জঞ্জাল হয়ে ওঠে; মালার্মের লাপ্রেমিদি দ্য ফন [L'Apre's midi d'un Faune] এবং আপলিনেয়র'এর আলকুলসে [Alcools] যেমন ঘটেছে। বুর্জোয়া যখন নৈরাজ্যবাদী স্তরে প্রবেশ করে গোটা বুর্জোয়া সমাজকেই অস্বীকার করে এবং কেবলমাত্র ব্যক্তিগত অনুষঙ্গযুক্ত শব্দই সুচিন্তিতভাবে নির্বাচন করে মাত্র তখনই ছন্দ অন্তর্ধান করে, কারণ সে যে অন্য মানুষের মত একই অন্তর্বৃত্তির অধিকারী, এই সামাজিক বন্ধনসূত্রটিকেও কবি এখন ভয় পায়, আর সেইজন্তই সেই ধরনের শব্দই মাত্র সে নির্বাচন করে যার বৌদ্ধিক বৈশিষ্ট্য [cerebral peculiarity] থাকবে। তীব্র আবেগগত অনুষঙ্গ রয়েছে এমন শব্দ যদি সে নির্বাচন করে তাহলে সেটা, তীব্র-ছন্দের সম্মোহনী-শক্তির সঙ্গে মিলে কবিকে মানবিক অন্তর্বৃত্তির সাধারণ স্তরে টেনে নামিয়ে আনবে। সেই কারণে শব্দচয়নের সুররিয়ালিস্ট কলাকৌশলে দেখা যায় যে শব্দসমষ্টির মধ্যে উদ্ভট এবং ব্যক্তিগত অনুষঙ্গ থাকলেও সেগুলি আবেগভিত্তিক নয়, বরং যুক্তিভিত্তিক। শেষ পর্যন্ত ভাষা ও তাৎপর্য থেকে সম্পূর্ণ সরে গিয়েই কেবলমাত্র তা সম্ভব, কারণ চেতনার সমস্ত বিষয়বস্তুই ধ্বনিগত এবং পরিবেশগত দুদিক থেকেই মূলতঃ সামাজিক।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে ছন্দ যদিও কাব্যের মৌলিক উপাদান, তাকে "ছন্দ সংবেদনাত্মক এবং হাইপার-এস্থেশিয়া সৃষ্টি করে" বা "ছন্দোগত ছক সামাজিক মানের প্রকাশ" এই ধরনের কিছু সরল সূত্র আউড়িয়ে বাতিল করে দেওয়া যায় না। ছন্দের তাৎপর্য ঐতিহাসিক এবং কোন নির্দিষ্ট যুগের ভাষার মধ্যে সমাজের মূলগত দ্বন্দ্বকে উদ্ঘাটন করার উপর তা নির্ভর করে।

(খ) কাব্য অনুবাদ করা কঠিন

কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে স্বীকার করা হয় যে কাব্যের অনুবাদ তার মূল যে বিশেষ আবেগের সঞ্চার ঘটায় তার অল্প অংশই মাত্র বহন করে। যে কোনও ব্যক্তি যিনিই কোন অনুবাদ পড়ার পর তার মূলের ভাষা শিখেছেন তিনিই এই কথাটি সমর্থন করবেন। পদের মাত্রা বজায় রাখা যায়। যাকে বলে মর্মার্থ [sense] তারও যথাযথ অনুবাদ সম্ভব। কিন্ত সেই বিশেষ কাব্যগত আবেগটি লোপ পেয়ে যায়। যেখানে অনুবাদটিও ভালো কবিতা হয় যেমন ফিটজেরাল্ডের রুবাইয়াৎ বা পোপের ইলিয়াড,

সেখানে কার্যতঃ পুনঃসৃষ্টি ঘটেছে। এই অনুবাদ যে কাব্যগত আবেগের পুনঃসৃষ্টি করে তার সঙ্গে মূলের সৃষ্ট কাব্যগত আবেগের মধ্যে যথেষ্ট মিল কদাচিৎ দেখা যায়।

একে কাব্যের কোনও রহস্যময় অলৌকিক গুণ বলার কোন অধিকার আমাদের নেই। তা হতেও পারে, নাও হতে পারে। যমকের একটা বিশেষ লক্ষণ এটা। কাব্যেরও একটা বিশেষ লক্ষণ এটা। ওয়ার এ্যাণ্ড পীস বা দি ইডিয়ট'এর মত মহৎ উপন্যাসের অনুবাদ মূলে যা কিছু ছিল তার সব কিছুই ইংরেজ পাঠকের কাছে তুলে ধরে নিশ্চয়ই কেউ তা দাবি করে না। কিন্তু, মনে করুন ইনফার্নো বা ওডেসির অনুবাদের সঙ্গে এই সব রচনার অনুবাদের তুলনা করলে সেই অনুবাদের মধ্যেও যে অসাধারণ শক্তি লক্ষ্য করা যায় তা থেকে অনুবাদের মধ্যে উপন্যাসের যে নান্দনিক গুণগুলি মোটামুটি রক্ষা করা যায় কবিতার ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়, আমাদের এই দাবির ন্যায্যতা প্রতিপন্ন হয়। অবশ্যই এটা রীতিসিদ্ধ মাত্রাগত সামগ্রিক আকারকে [formal metrical pattern] হুবহু বজায় রাখার সমস্যার জন্য ঘটে না। বরং—যে কথাটা প্রায়ই আমরা খেয়াল করি না—ফরাসী গদ্যের ঘাতহীন কথ্য ছন্দকে ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করার মধ্যে তাকে যতটা রক্ষা করা যায় তার থেকে ফরাসী কাব্যের ইংরেজি অনুবাদের মধ্যে এই রীতিসিদ্ধ মাত্রাগত সামগ্রিক আকারকে অনেক বেশি পরিমাণে রক্ষা করা যায়। তা সত্ত্বেও কোন বিদেশী কবির সামান্য একটু স্বাদ পাওয়ার জন্য ব্যাকুল সমালোচকরা ছন্দোবদ্ধ অনুবাদের থেকে আক্ষরিক গদ্য অনুবাদ বেশি পছন্দ করেন।

(গ) **কাব্য যুক্তিনিরপেক্ষ** [irrational]

তার অর্থ এই নয় যে কাব্য কোন অসংলগ্ন বা অর্থহীন ব্যাপার। কাব্য ব্যাকরণের নিয়ম মেনে চলে এবং সচরাচর তার অন্বয় করা যায়; অর্থাৎ, এতে যে সব বক্তব্য বিষয়গুলি থাকে একই বা অন্য ভাষায় বিভিন্নভাবে তার গদ্যরূপ দেওয়া যায়। কিন্তু স্পিনোজার দর্শন যেমন কোন শিষ্যের ব্যাখ্যায় স্পিনোজার দর্শনই থাকে এবং তলস্তয়ের কোনও উপন্যাস অনুবাদ হলেও তা তলস্তয়ের উপন্যাসই থাকে এবং কোনও রূপকথা যে যাই বলুক না কেন তা রূপকথাই থাকে, কবিতার অন্বয়ের মধ্যে মূলের সমস্ত বক্তব্য বিষয়গুলি একই থাকলেও সেই কবিতাটি আর একই কবিতা থাকে না—এমন কি খুব সম্ভব তা আর আদৌ কবিতাই থাকে না। "যুক্তিসাপেক্ষ" [rational] বলতে আমরা বুঝি পরিবেশের মধ্যে সব মানুষই যে শৃঙ্খলাবিন্যাস (orderings)

দেখতে সমস্ত হয় তা মেনে নেওয়া। বৈজ্ঞানিক যুক্তি যুক্তিসাপেক্ষ এই অর্থে, কাব্য তা নয়। আমরা ইতোমধ্যেই অবশ্য লক্ষ্য করেছি যে পরিবেশগত সাদৃশ্যের (congruence) থেকে ভিন্ন ধরনের এক সাধারণধর্মিতা (commonness) বা সামাজিক সাদৃশ্য তাদের মধ্যে আছে। তা হল আবেগগত বা বিষয়ীগত সাদৃশ্য। একে আমরা বলব "অভ্যন্তরীণ বাস্তবের সঙ্গে সাদৃশ্য"। আমরা এও দেখেছি যে কাব্যের এই বৈশিষ্ট্য তার ছন্দোভিত্তিক রূপের সঙ্গে যুক্ত। অতএব স্পষ্টতঃই, কাব্য তার পরিবেশগত সাদৃশ্যের ব্যাপারে যুক্তিনিরপেক্ষ, কারণ তার আবেগগত সাদৃশ্যের ব্যাপারে সে যুক্তিসাপেক্ষ, আর এই দুই ধরনের সাদৃশ্যের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব রয়েছে। এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব অসম্পৃক্ত নয়: তাদের মধ্যে এই দুটিই পরস্পরকে ভেদ করে, কারণ জীবনের ক্ষেত্রেও এরা পরস্পরকে ভেদ করে। প্রকৃতপক্ষে কাব্য মানুষের আবেগ আর তার পরিবেশের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তার একটি দিকের প্রকাশ মাত্র এবং সেটা প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রামেরই অত্যন্ত বাস্তব ও মূর্ত রূপ গ্রহণ করে। কাব্য যেহেতু এই সংগ্রামেরই ফল সেই কারণে তার ঐতিহাসিক বিকাশের প্রত্যেক স্তরেই পরিবেশের সঙ্গে মানুষের সক্রিয় সম্পর্ককে তা নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করে।

আয়ন থেকে ইতোমধ্যেই যে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে সেখানে প্লেতো কাব্যের এই বিশেষ ধরনের যুক্তিনিরপেক্ষতার উল্লেখ করেছেন। শেলিও সেই কথাই বোঝাতে চেয়েছেন যখন তিনি বলেন: "কাব্য এমন একটা জিনিস যা মনের সক্রিয় শক্তিগুলির অধীন নয়।"

(খ) কাব্য শব্দ দিয়ে গঠিত

এটা একটা সাধারণ ব্যাপার বলেই মনে হয়, কিন্তু কোনও কিছুই সাধারণ ব্যাপার নয় যদি যাদের সেটা জানার কথা তাঁরা প্রায় সর্বদাই এবং প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তা ভুলে যান। যেমন ধরুন, ম্যাথ্যু আর্নল্ড বলছেন: "কাব্যের ক্ষেত্রে ভাবটাই সব কিছু, বাকি যা কিছু তা এক ভ্রান্তির, ঐশী ভ্রান্তির জগৎ। কাব্যের আবেগ তার ভাবের [Idea] সঙ্গে যুক্ত; ভাবটাই হল সত্য [fact]। আমাদের আজকের দিনের ধর্মের সব থেকে শক্তিশালী অংশ হল তার অচেতন কাব্যটি।"

আমরা জানি যে শেষের বাক্যটি প্রকৃত সত্যের বিকৃতি ঘটিয়েছে। কিন্তু প্রথম দুটি এমন গোলমেলে যে প্রকৃত অর্থ উদ্ধার করা কঠিন, যদিও পরবর্তী

অধ্যায়গুলিতে দেখা যাবে যে একজন ভালো কারিগরের মতই আর্নল্ড কাব্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিকের কথাই দেখিয়েছেন।

শেলিও একই ধরনের আলগা কথা ব্যবহার করেছেন: 'ভাষা, বর্ণ, রূপ এবং কর্মের ধর্মীয় ও নাগরিক অভ্যাস, সবই কাব্যের উপকরণ ও উপাদান; ফলকে হেতুর সমার্থক হিসাবে ব্যবহার করার যে অলংকার আছে সেই অনুসারে এগুলিকে কাব্য বলা যেতে পারে।"

এই আলগা কথার আড়ালে যে সত্যটি রয়েছে তা এই যে, সমাজে মানুষের প্রকৃত অস্তিত্ব থেকেই কাব্যের সৃষ্টি।

তিনি আরও বলেছেন: "কবি ও গদ্য লেখকের মধ্যে পার্থক্য টানাটা একটা সাধারণ ভুল…প্লেতো মূলত: কবি ছিলেন। লর্ড বেকন কবি ছিলেন… বাহ্যিক সত্যের মধ্যে প্রকাশিত জীবনের প্রতিরূপই হল কাব্য।…"

এখানে এমন আলগাভাবে তিনি বলছেন যে কিছুই ঢাকা থাকছে না। বেকন কবি ছিলেন না। এই সব অতিশয়োক্তি হল বুর্জোয়া অর্থনীতির বিকাশ যখন "প্রকৃতিশোভন সম্পর্কগুলিকে" ঝেঁটিয়ে দূর করতে থাকার ফলে হীনমন্যতার দিকে কবিকে ঠেলে দিতে সুরু করেছে সেই সময় কাব্যকে সমর্থন করার প্রয়াস।

চিত্রকর বন্ধুকে দেওয়া মালার্মের উপদেশ সকলের জানা: "কাব্য শব্দ দিয়ে লেখা হয়, ভাব দিয়ে নয়।" যে ইতিবাচক বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা বলেছি তার সঙ্গে এ একটা নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য যোগ করছে; আমরা তা সমর্থন করতে পারি না। কাব্য অবশ্যই ভাব অর্থাৎ স্মৃতি-প্রতিরূপ জাগিয়ে তোলে, না হলে সেটা কেবলমাত্র ধ্বনি হত। আমরা সেই কারণে কেবল এই বক্তব্যটুকুর মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখব যে "কাব্য শব্দ দিয়ে রচিত।"

পাঠক লক্ষ্য করবেন যে "কাব্যের অনুবাদ করা কঠিন" এই পূর্ববর্তী বৈশিষ্ট্য থেকেই প্রকৃতপক্ষে এই বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি। কারণ কাব্য যদি কেবল মাত্র ভাব দিয়ে লেখা হত, অর্থাৎ, শ্রোতার মনে কেবল মাত্র ভাব উদ্দীপিত করার উদ্দেশ্যেই লেখা হত তা হলে ঐ একই ভাব জাগানোর উপযোগী অন্য ভাষার শব্দ নির্বাচন করে তার অনুবাদ করা যেত। যেহেতু তা করা যায় না, শব্দ যে ভাব জাগায় তার অতিরিক্ত কোনও উপাদান শব্দের মধ্যে থাকা চাই। অতএব আমরা বলতে পারি যে কাব্য শব্দ দিয়ে সেই ভাবে রচিত হয় যে ভাবে উপন্যাস রচিত হয় না। তার অর্থ এই নয় ধ্বনি-প্রতীক

বা যে কোনো চিহ্ন বলতে বস্তুগতভাবে শব্দ বোঝায় তার মধ্যে কোনও বিশেষ যাদু আছে। প্রকৃতপক্ষে শব্দ ভাব ছাড়াও এমন এক ধরনের একটা আবেগো-দীপক "দীপ্তি" [affective "glow"] জাগায় যা অনুবাদে বজায় রাখা যায় না।

(ঙ) কাব্য অ-প্রতীকধর্মী

এক্ষেত্রে অতিসাধারণ কিছু বলার অপরাধ আমাদের হবে না। বরং কথাটা অতিসাধারণের নেতিবাচক, কারণ কাব্য সম্পর্কে প্রচলিত ভাববাদী ধারণা হল এই যে তা অস্পষ্ট প্রতীক একটা কিছু। কিন্তু কাব্য যুক্তি-নিরপেক্ষ একথা বললে শেষ পর্যন্ত তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে তা অ-প্রতীক-ধর্মী।

আমরা যখন বলি শব্দ প্রতীকধর্মী, অর্থাৎ প্রতীক, অন্য কিছু নয়, তখন তার দ্বারা কি বোঝাই? এই বোঝাই যে শব্দ বা নিজেরা কিছুই নয়, তাতে আমাদের কোনও আগ্রহ নেই, শব্দ দিয়ে যেটার উল্লেখ করা হয় সেটাতেই আমাদের আগ্রহ।[১] কোন গণিতবিদ যখন লেখেন আট আর নয় যোগ করলে সতের হয়, এই শব্দগুলি সম্পর্কে তখন তাঁর কোনও আগ্রহ নেই, অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তবে পাওয়া কোনও সামান্যীকৃত শ্রেণীর বিন্যাসশৃঙ্খলায় তাঁর আগ্রহ। যেহেতু যে শব্দগুলি তিনি ব্যবহার করছেন তা প্রতীকধর্মী অর্থাৎ, ব্যক্তিগত কোন অর্থ তাতে নেই, যে শব্দই ব্যবহার করা হোক না কেন এই বাক্যটির যাথার্থ্য সুস্পষ্টভাবে একই থাকবে। উদাহরণস্বরূপ, যে বিন্যাসশৃঙ্খলার কথা উল্লেখ করা হল ফরাসী জার্মান বা ইতালিয়ান যে ভাষাতেই বলা হোকনা কেন তা একজন গণিতবিদের কাছে সুস্পষ্টভাবে একই থাকবে, যদিও তা বিভিন্ন শব্দের সাহায্যে বলা হল, কারণ ওই শব্দগুলিকে বিন্যাসশৃঙ্খলার প্রকৃত গাণিতিক প্রক্রিয়াসূচক একটা বিধিবহির্ভূতভাবে গৃহীত প্রথা [arbitrary convention] হিসাবে গণ্য করা হয়। এই কথাটাকে যদি অন্যভাবে বলা হয় ৮+৯=১৭, গণিতবিদের দৃষ্টিকোণ থেকে বাক্যটি তখনও ঠিক একই অর্থবোধক থাকবে। বাস্তবিক আমরা আরও কিছুটা এগিয়ে যেতে পারি এবং আগামী দিনে যদি গণিতবিদরা এই রকম একটা প্রথা মেনে নেন যাতে করে ৮এর বদলে ৯, ৯এর বদলে ৮ এবং ১৭র বদলে ২৩, যোগ চিহ্নের বদলে বিয়োগ চিহ্ন এবং সমান-এর বদলে বৃহত্তর চিহ্ন ব্যবহার করা হবে তখন ৯−৮<২৩ এই

১। ogden and Richards এর Meaning of Meaning পুস্তকে শব্দের এই উল্লেখসূচক চরিত্র সম্পর্কে ভাল আলোচনা আছে।

বাক্যটিই হবে ৮+৯=১৭ দিয়ে যে অভিজ্ঞতাভিত্তিক ক্রিয়াগুলিকে প্রতীক-ধর্মী ভাবে বোঝান হয় ঠিক তারই প্রকাশ। কিন্তু আগামী দিনে আমরা যদি স্থির করি যে সব শব্দকে বাতিল করে দেওয়া হবে এবং ইংরেজি অভিধানে প্রত্যেক শব্দের একটা করে নিজস্ব সংখ্যা দেওয়া হবে তাহলে হ্যামলেটের কোনও উক্তির কাব্যগত বিষয়বস্তুকে কয়েকটি সংখ্যার দ্বারা প্রকাশ করা যাবে না। তা করতে গেলে সংখ্যাগুলিকে আবার মনে মনে অনুবাদ করে সেই মূল শব্দগুলিতে ফিরে যেতে হবে।

অতএব গণিতের প্রতীকধর্মী ভাষার এই যে চরম অনুবাদযোগ্যতার কারণে তাকে বিশ্বজনীন গাণিতিক ভাষায় পরিণত করা সম্ভব হয়েছে তা অ-প্রতীকধর্মী কাব্যের অনুবাদযোগ্যতাহীনতার বিরোধী। এই বিশ্বজনীন গাণিতিক ভাষাকে সংখ্যাবিদ্যা [logistic] বা প্রতীকধর্মী যুক্তিবিদ্যা [symbolic logic] বলে।[১]

অতএব কাব্যের কোন কোন গুণ অনুবাদের মধ্যে যতটা পরিমাণে বহাল রাখা যায় কাব্যের মধ্যে প্রতীকধর্মিতা ততটা পরিমাণেই আছে।

কিন্তু এটাও আমরা দেখেছি যে যুক্তিভিত্তিক সাদৃশ্যে ঘাটতি থাকলেও কাব্য যেহেতু আবেগগত সাদৃশ্যে পূর্ণ অতএব যদিও তাতে বহির্বিষয়ক প্রতীক-ধর্মিতার—বহির্জগতের বস্তুর উল্লেখের ব্যাপারে—ঘাটতি থাকে, তবুও অভ্যন্তরীণ প্রতীকধর্মিতায়—আবেগগত প্রতিন্যাসের [attitudes] উল্লেখে তা পূর্ণ। প্রত্যেক প্রকৃত শব্দই আবার দুটি জিনিস বোঝায়—একটি বহির্জগতের উল্লেখ্য সামগ্রী, অপরটি বিষয়গত প্রতিন্যাস। অতএব বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে কিছুটা মূল্য-বিচার থাকে, সেটাকে কিছুতেই বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। একমাত্র সংখ্যাবিদ্যায় এই বিচারগুলি বাদ দেওয়া হয়। আর কাব্যে বহির্জগতের বস্তুর কিছুটা উল্লেখ থাকে—সেগুলিকে বাদ দিয়ে কাব্য হিসাবে অস্তিত্ব সম্ভব নয়।

বৈজ্ঞানিক যুক্তি থেকে সমস্ত মূল্য বিচারগুলি বাদ দিয়ে তাকে যেমন সংখ্যাবিদ্যা করে তোলা যায় সেই রকম কাব্য থেকে সমস্ত বহির্জগতের উল্লেখ যদি বাদ দেওয়া যায় তাহলে সেটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়? কাব্য হয়ে পড়ে "অর্থহীন" ধ্বনি, কিন্তু সে ধ্বনি আবেগগত উল্লেখে পরিপূর্ণ—অর্থাৎ, অন্ত

১। Peano এর আবিষ্কারক এবং Russell ও whitehead তার পরিবর্ধন করেন। দ্রষ্টব্য Principia Mathematica। আবিষ্কারকদের আশা কিন্তু এ পূর্ণ করতে পারে নি।

কথায় বলতে গেলে তা হয়ে দাঁড়ায় সংগীত ; আর সঙ্গীত সংখ্যাবিজ্ঞার মতই, অনুবাদ করা যায় এবং বিবজনীন। অর্থাৎ, দেখা যাচ্ছে যে উন্মেষ আর আবেগের সংমিশ্রণ—যা কাব্যের বৈশিষ্ট্য তা, কোনও ভেজাল নয়, বরং তা হল সহজপ্রবৃত্তি আর পরিবেশ এই দুই বিপরীত মেরুর মধ্যে এক দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক। এ এমন এক সম্পর্ক যার মূল রয়েছে মূর্ত সমাজজীবনের গভীরে, তা সে ইংরেজ ফরাসী বা এথেনীয় যাই হোক না কেন। কাব্য হল জমাট বেঁধে যাওয়া সামাজিক ইতিহাস, প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে মানুষের আবেগগত শ্রমের ফল।

(চ) কাব্য মূর্ত

আগে যে নেতিবাচক বক্তব্য বলা হয়েছে এটি তারই পরিপূরক এক ইতিবাচক বক্তব্য। কিন্তু মূর্ততা প্রতীকধর্মিতার স্বতঃক্রিয় বিপরীত নয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে সামান্যকে বাদ দিয়ে বিশেষকে ধরলে প্রতীকধর্মী ভাষা মূর্ত ভাষার বেশি কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছাতে পারে। বীজগণিতের থেকে পাটিগণিত বেশি মূর্ত, কারণ তার প্রতীকগুলি অপেক্ষাকৃত কম সামান্যীকৃত। যে গাণিতিক প্রতীকধর্মিতায় প্রতীক দুই বলতে দুটি ইট বোঝায় এবং দুটি ঘোড়া দুটি মানুষ ইত্যাদি বোঝাতে অন্য প্রতীকের প্রয়োজন হয়, স্পষ্টতঃই তা বর্তমান গাণিতিক প্রতীকধর্মিতার থেকে বেশি মূর্ত হবে ; কিন্তু সেটা কম প্রতীকধর্মী হবে না, কারণ তখনও তা প্রথা অনুযায়ী-ই থাকবে এবং ইচ্ছামত চিহ্ন পরিবর্তনের অধীনে থাকবে। কিন্তু এটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে কোনও প্রতীকধর্মী ভাষা যতই বেশি মূর্ত হয়ে ওঠে ততই তা বেশি ভারবহুল হয়ে পড়ে। যেহেতু কোনও দুজন ব্যক্তিই হুবহু এক নয় সন্তানের প্রতি জোড়া মানুষের জন্য পুরাপুরি মূর্ত প্রতীকধর্মী ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন প্রতীকের প্রয়োজন হবে

গণিতের সামান্যধর্মিতা হল বহির্জগতগত বাস্তবেরই সামান্যধর্মিতা, সেই কারণে গণিতের বিশেষধর্মিতাও বহির্জগতগত বাস্তবেরই বিশেষধর্মিতা। এবং যেহেতু বহির্জগতের বাস্তবে বস্তুর সংখ্যা অসীম, গণিতকে সেই কারণে সামান্যীকৃত হতেই হবে। বহির্বাস্তবের ক্ষেত্রে ব্যবহারের এটাই সব থেকে নমনীয় হাতিয়ার [tool], কারণ এটাই সব থেকে বেশি সামান্যীকৃত। যেহেতু কেবলমাত্র শৃঙ্খলাবিজ্ঞান অর্থাৎ শ্রেণী নিয়েই এর কারবার, বিশ্বজগতের অসংখ্য বিশেষধর্মিতাকে সেইজন্য তা বশ করতে পারে। গণিতে অসীম যে বার বার দেখা দেয় সেটা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়।

কাব্যের সঙ্গে তুলনা করা যাক। বিষয়ীগত প্রতিজ্ঞান হল এর এলাকা।

সচেতন ক্ষেত্র প্রকৃত বস্তু আর তার প্রতি বিষয়ীগত প্রতিভাস দিয়ে গঠিত। এই প্রকৃত বস্তুগুলিকে অত্যন্ত সামান্যীকৃতভাবে শৃঙ্খলাবিন্যস্ত করে গণিত পৌঁছায় অসীমে। অসীম হল একটি একক প্রতীক যা সমস্ত বহির্জগতগত বাস্তবকে নিজ আয়ত্তের মধ্যে রাখে। কিন্তু কাব্য যদি এই সমস্ত বিষয়ীগত প্রতিভাসকে সর্বাধিক সামান্যীকৃতভাবে শৃঙ্খলাবিন্যস্ত করে তাহলে তা হয়ে দাঁড়ায় অহং [ego], একটি একক প্রতীক যা সমস্ত বিষয়ীগত বাস্তবকে নিজ আয়ত্তে রাখে।

প্রকৃতপক্ষে বহির্জগতগত বাস্তবের ক্ষেত্রে যেরকম গণিত সেইরকম বিষয়ীগত বাস্তবের ক্ষেত্র কাব্য নয়, সংগীতই বিমূর্ত ও সামান্যীকৃত। সংগীতে পরিবেশ মগ্ন হয়ে যায়, অহং স্ফীত হয়ে ওঠে, এবং তারই চৌহদ্দির মধ্যে সমস্ত ঘাত প্রতিঘাত ঘটে। গণিত যেমন বহির্দিক থেকে বিমূর্ত ও সামান্যীকৃত, সংগীত অভ্যন্তরীণ দিক থেকে সেইরকম।

কিন্তু কাব্য বৈজ্ঞানিক যুক্তির মত; তা "অ-বিশুদ্ধ" ("impure")। তার আবেগগুলি প্রকৃত বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত, আর তার ফলে সেটা সেগুলিকে এক ধরনের বৈশিষ্ট্য দান করে। অহং-এর দৃষ্টিপথে বাস্তব ভীড় করে আসে। তার অর্থ এই যে কাব্য মূর্ত এবং বিশেষীকৃত, ঠিক যেমন বৈজ্ঞানিক যুক্তি হল মূর্ত ও বিশেষীকৃত, যদিও অবশ্য প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই মূর্তায়ন ও সামান্যধর্মিতা বাস্তবের বিভিন্ন এলাকাকে বোঝায়।

উদাহরণ হিসাবে কবি যখন বলেন

My love is like a red, red rose,

তখন তার ভাষা অ-প্রতীকধর্মী, কারণ কোনও প্রচলিত অর্থেই তার অন্বয় করা হয় না এই বলে যে "my fiancée is a flower of the genus **rosacea** var-red"।

মূল বক্তব্যে প্রকাশিত কাব্যগত আবেগটি এই উক্তির মধ্যে রয়েছে। পংক্তিটি অ-প্রতীকধর্মী। অতএব এটা মনে করা চলবে না যে একে মূর্ত হতেই হবে। কিন্তু যদি এটি মূর্ত না হত, বর্তমান রূপে প্রকাশিত বক্তব্যটি সাধারণভাবে বলতে গেলে সত্যই হত। অর্থাৎ, যদি এটা বিমূর্ত হত, তাহলে এটি একটি বিশেষ ক্ষেত্রের, এই বিশেষ কবির ক্ষেত্রের, একটি বিশেষ প্রেমের ক্ষেত্রের, একটি বিশেষ মেজাজের ক্ষেত্রের একটি বিশেষ কালের ক্ষেত্রের, একটি বিশেষ কবিতার ক্ষেত্রের পক্ষে যথোপযুক্ত একটি বক্তব্য হত না, বরং তা হত একটি সাধারণ বক্তব্য, যাতে করে যেখানেই কেউ এই কথা বলতে

পারে "my love is" শব্দে শব্দে অনিবার্যভাবে তার মনের মধ্যে এই কথাটি থাকবে, ইতোমধ্যেই নির্দিষ্ট একটি ঘটনা হিসাবে, যে সেই মেয়েটি "is like a red, red rose"।

কিন্তু যেহেতু কবিতা বিমূর্ত কিছু নয়, বরং তা এক মূর্ত অ-প্রতীকধর্মী ভাষা, পরবর্তী কবিতায়, ধরুন

My love is a white, white rose

বা

If flowers be blossoms, my love is no rose.

এ কথা লেখবার অধিকার আমাদের থাকে। কিন্তু যদি বিমূর্ত অপ্রতীকধর্মী ভাষা হত তা হলে যে কবিতার মধ্যে আমরা প্রথমে একথা লিখেছি তার থেকে আলাদা কোনও কবিতাতেই মাত্র একথা বলার অধিকার আমাদের থাকত, অর্থাৎ অন্য ভাষায়। এই কথাটা বুঝতে ভুল করার জন্যই প্লেতো সব কবিদের মিথ্যাবাদী মনে করতেন: আর এই কথাটা ঠিক মত বুঝতে পারার জন্যই সিডনী প্লেতোর জবাব দিয়েছিলেন এই ব্যাখ্যা করে যে কবি "মিথ্যাবাদী নয়, কারণ তিনি কিছুই হলফ করে বলেন না" ["is no lyar, for he nothing affirms"]।

অতএব কাব্যের বিষয়ীগত সামান্যীকরণের এই মূর্ত লক্ষণটির কারণেই কাব্যকে বিভ্রমের অর্থ সম্মতি দেওয়া প্রয়োজন—কাব্যের অলীককল্পনাধর্মী জগতে যখন থাকি তখন তার বক্তব্যকে মেনে নিই কিন্তু এ দাবি করি না যে, সমস্ত উপন্যাস ও কবিতায় যা কিছু বক্তব্য বলা হয় সেগুলিকে নিয়ে যে জগৎটি গড়ে ওঠে সেই জগতের ক্ষেত্রেও প্রকৃত বস্তুগত জীবনে যেভাবে বর্জন ও দ্বন্দ্বের যে সূত্রগুলি প্রয়োগ করা যায় সেই একইভাবে সেগুলিকে প্রয়োগ করা যাবে। এ কথা বলার অর্থ এই নয় যে উপন্যাস ও কবিতার মধ্যে কোনও সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন নেই। সেই সমন্বয়সাধনটিই হল নন্দন তত্ত্বের এলাকা। নন্দনতত্ত্বের মূল কাজই হল হেরিক'কে মিলটনের থেকে নীচে স্থান দেওয়া এবং শেকসপীয়রকে দুজনেরই উপরে স্থান দেওয়া এবং কেন ও কিভাবে এরা পৃথক তা সমৃদ্ধ ও জটিল বিশদতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করা। কিন্তু সে কাব্যের জন্য একটা মান (standard)—একটা সমন্বয়িত বিশ্ববোধ (integrated world-view) যা বৈজ্ঞানিক নয় অর্থাৎ যুক্তিভিত্তিক নয়—পরন্তু যা নান্দনিক—এমন একটা মানের প্রয়োজন স্বীকার করতে হয়। এই হল শিল্পের যুক্তি।

এই মূর্ততা ও বিশেষধর্মিতা বৈজ্ঞানিক যুক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কাব্যের মত সেটাও "অ-বিশুদ্ধ", কিন্তু বিপরীত মেরুর বেশি কাছাকাছি। প্রত্যেকেই জানেন যে জীববিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, সমাজবিদ্যা বা মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম কার্যকর, যদিও এগুলির মধ্যে একটা যোগসূত্রস্থাপক সূত্র আছে যা হল এই যে, অধিকতর সামান্যীকৃত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোনও নিয়মের বিপরীত কোনও নিয়ম অপেক্ষাকৃত কম সামান্যীকৃত ক্ষেত্রে যেখান চলে না। উদাহরণস্বরূপ, সমাজবিদ্যার নিয়মগুলি পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রের নিয়মগুলির বিরোধিতা করলে চলবে না। একইভাবে কাব্যেরও এই সাদৃশ্য থাকা চাই যে, যে কোনও অলীককল্পনাধর্মী জগতেই থাক না কেন এর অভিজ্ঞতাগুলি সব সময় একই "আমি"র ("I") ক্ষেত্রে ঘটবে, উপন্যাসেরও এই সাদৃশ্য থাকতে হবে যে "আমি" (চরিত্র—character) যাই হোক না কেন তার ঘটনাস্থল মানবসমাজের একই বাস্তব জগতে হওয়া চাই। আর এই আবেগগত "আমি" বা বাস্তব জগতের গঠনটাই (structure) নান্দনিক বিচারকে নির্ধারণ করে। প্রকৃতপক্ষে এই অহংই হল "বিশ্ব-বোধ" যার মধ্যে ইতোমধ্যেই একটা নির্দিষ্ট শিল্পের যুক্তি রয়েছে।

এই "অ-বিশুদ্ধতাব" অর্থ কি এই যে বিজ্ঞান বা কাব্য কোনটাই "প্রকৃতপক্ষে" সত্য নয়? ঠিক বিপরীত। যেহেতু সত্য একমাত্র বাস্তবের ক্ষেত্রেই, বাস্তব মূর্ত জীবনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং যেহেতু বাস্তব মূর্ত জীবন পুরাপুরি বিষয়ীগতও নয়, বিষয়গতও নয়, বরং তা এই দুইয়ের (প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম) মধ্যে এক দ্বন্দ্বমূলক সক্রিয় সম্পর্ক, অতএব সেই সংগ্রামের এই সব "অ-বিশুদ্ধ" ফলগুলির ক্ষেত্রেই মাত্র আমরা "সত্য" এই নির্ণায়ক প্রয়োগ করতে পারি। সত্যের সর্বদাই এক সামাজিক মনুষ্যগত উল্লেখ থাকে—তার অর্থ মানুষের সঙ্গে সম্পর্কে "সত্য"। সেই কারণেই রাসেল যেমন দেখিয়েছেন, গণিতের নির্ণায়ক হল সংগতি (consistency), "সত্য" নয়। একইভাবে সংগীতের নির্ণায়ক হল "সৌন্দর্য"। ভাষা থেকে সৃষ্টি সব কিছুতেই এই দুইয়েরই যে সংমিশ্রণ থাকে তার কারণ এই যে মানুষ তার বাস্তব জীবনে সর্বদাই কীটসের সেই ভবিষ্যবাণী, সুন্দরই সত্য, সত্যই সুন্দর পূরণ করার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করছে; পরিবেশকে সহজপ্রবৃত্তির সঙ্গে, সংগতিকে সৌন্দর্যের সঙ্গে, প্রয়োজনকে (necessity) বাসনার সঙ্গে মিল করার জন্য—এক কথায়, স্বাধীন হওয়ার জন্য সর্বদাই সে সংগ্রাম করছে। ভাষা সেই সংগ্রামের ফসল, কারণ এই সংগ্রাম কোনও একজন মানুষের নয়, সংঘবদ্ধ

মানুষের, আর এই সংঘবদ্ধ সংগ্রামের উপকরণ হল তারা; সেই কারণে তাদাতে সর্বত্রই মানুষের এবং মানুষের পরিবেশের দুইয়েরই ছাপ পড়ে। বিজ্ঞান যে রকম পরিবেশগত ক্ষেত্রে অবস্থিত, কাব্য সেই রকম সহজপ্রবৃত্তিগত ক্ষেত্রে। সংগতি হল বিজ্ঞানের গুণধর্ম, কাব্যের গুণধর্ম হল সৌন্দর্য—এরা কেউই কখনও বিশুদ্ধ সৌন্দর্য বা বিশুদ্ধ সংগতি হয়ে উঠতে পারে না, অথচ সেই লক্ষ্যে পৌঁছানর জন্যই এদের সংগ্রাম, সেই সংগ্রামই তাদের বিকাশকে চালিত করে। বিজ্ঞানের প্রয়াস সর্বদাই গণিতে পৌঁছানর দিকে, কাব্যের সংগীতে।

(ছ) ঘনীভূত আবেগোদ্দীপক [condensed affects] কাব্যকে বৈশিষ্ট্য দেয়। এই আবেগোদ্দীপকগুলি এমন উপযোগী আবেগোদ্দীপক, অর্থাৎ নান্দনিক আবেগোদ্দীপক। 'আপনার স্ত্রী গতকাল মারা গেছেন' এই টেলিগ্রামটি টেলিগ্রাম-পাঠকের কাছে অসাধারণভাবে ঘনীভূত আবেগোদ্দীপক সঞ্চার করতে পারে কিন্তু তাই বলে সেগুলি নিশ্চয়ই নান্দনিক আবেগোদ্দীপক নয়। এখানে ভাষাকে প্রতীকধর্মীভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, আর এই বার্তাপ্রাপ্ত হতভাগ্য স্বামী যদি আগেই জানত যে তার বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে এবং (কৃপণ স্বভাবের ব্যক্তি হলে) এই ব্যবস্থা করে রেখে থাকে যে তার স্ত্রীর মৃত্যু বোঝানর জন্য "মাছের বাপ" ["kippers" এই সংকেত শব্দ তাকে পাঠান হবে, তাহলেও সেই সংক্ষিপ্ত বার্তার সঙ্গে যুক্ত আবেগোদ্দীপকগুলি সমানই তীব্র হত। টেলিগ্রামটা আনুষ্ঠানিকভাবে কাব্যধর্মী হলেও একই কথা বলতে হয়। দি টাইমস পত্রিকার শোকসংবাদের স্তম্ভে যে সব টুকরো টুকরো কবিতা বেরোয় সেগুলিতেও কাব্যের রূপগত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকে এবং যারা সেগুলি ছাপতে দেয় তাদের কাছে এগুলি তীব্র আবেগোদ্দীপকযুক্ত। কিন্তু এই আবেগোদ্দীপকগুলি নান্দনিক নয়।

এই দুই ক্ষেত্রেই আর একটা পরীক্ষা করা যেতে পারে। অন্য যাঁরা শোকাহত নয়, তাদের কাছে এই শব্দগুলি একই আবেগোদ্দীপকযুক্ত নয়। অ-নান্দনিক আবেগোদ্দীপকগুলি ব্যক্তিগত আবেগোদ্দীপক, যৌথ নয় এবং সামাজিক অভিজ্ঞতা নয়, বিশেষের অভিজ্ঞতার উপরেই তা নির্ভর করে। অতএব, এই আবেগ যদি একটা সামাজিক আকারে বাস্তব রূপায়নের যোগ্য না হয় বা বাস্তবে রূপায়িত নয় এমন কোনও বিশেষ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাজাত হয় সেক্ষেত্রে কাব্যের মধ্যে আবেগগত তাৎপর্য থাকা উচিত, এটুকুই যথেষ্ট নয়। আবেগ সংঘবদ্ধ মানুষের অভিজ্ঞতাজাত হতেই হবে। এবং এখন আমরা বুঝতে

পারি কাব্যধর্মী "অহং এর" সাধারণধর্মিতা কি দিয়ে গঠিত। সভ্য সমাজে কোনও একজন ব্যক্তির "আমি" এটা নয়, যেমন গণিতের অসীম কোনও একজন ব্যক্তির প্রত্যক্ষগত জগতের অসীম নয়। গণিতের অসীম হল বস্তু-জগতের অসীম—সমস্ত মানুষের প্রত্যক্ষগত জগতের মধ্যে যে সাধারণ জগৎ থাকে সেই জগতের অসীম। আর কাব্যের "আমি" হল সমস্ত সংঘবদ্ধ মানুষের আবেগগত জগতের "আমি"। বুর্জোয়া সমালোচনা "সভ্য সমাজে স্বতন্ত্র ব্যক্তির" দৃষ্টিভঙ্গীর ঊর্ধ্বে কখনও উঠতে পারে না। নান্দনিক সামগ্রী ও নান্দনিক আবেগকে অন্য সামগ্রীর থেকে কোন কারণ যে পৃথক করে সেই সমস্যার সমাধান বুর্জোয়া সমালোচনা কি করে করবে? নান্দনিক সামগ্রীগুলি যে পরিমাণে সেই আবেগ জাগিয়ে তোলে যা ব্যক্তি মানুষের বৈশিষ্ট্য নয়, যা সংঘবদ্ধ মানুষের বৈশিষ্ট্য, সেই পরিমাণে তা নান্দনিক। নান্দনিক আবেগের নিরাসক্ত, নিরালম্ব ও বিষয়গত চরিত্র (disinterested, suspended and objective character) এ থেকেই উৎপন্ন হয়।

* * * * * * * * * *

সংক্ষেপে কাব্য ছন্দোবদ্ধ, অনুবাদ করা যায় না, যুক্তি নিরপেক্ষ, অ-প্রতীকধর্মী, মূর্ত এবং বর্ণাঢ্য নান্দনিক আবেগোদ্দীপক দ্বারা বিশিষ্টতাপ্রাপ্ত। এই বৈশিষ্ট্যগুলিই সাহিত্যের সমগ্র এলাকা থেকে কাব্যকে পৃথক করার পক্ষে যথেষ্ট। এখন আমরা এর পদ্ধতি, এর করণকৌশল, এর ক্রিয়া এবং এর ভবিষ্যৎ কি সে সম্পর্কে আরও বেশি পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করার দিকে এগিয়ে যেতে পারি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

জগৎ ও "আমি"

১

তাবার প্রকৃতি এবং সমাজ, মানুষ ও বাস্তবের সম্পর্কে কাব্যের সক্রিয় ভূমিকা (function) থেকে কাব্যের বৈশিষ্ট্যগুলি অপরিহার্যভাবে প্রবাহিত হয়।

"মানুষ" বলতে আমরা সেই জেনোটাইপ বা ব্যক্তিকে বোঝাই যে সহজপ্রবৃত্তিধর্মী মানুষ হিসাবে সে জন্মগ্রহণ করেছে সেইভাবে "কেবলমাত্র নিজে নিজেই" যদি তাকে বাড়তে দেওয়া হত তাহলে সে এক মূক, পশুর মত একটা প্রাণী হয়ে উঠত, কিন্তু তার পরিবর্তে সে এক বিশেষ ধরনের মানুষ হয়ে ওঠে—যেমন এথেনীয়, আজ্‌টেক বা লণ্ডনবাসী। জেনোটাইপকে পুরাপুরি নমনীয় ও নিরবয়ব মনে করা আমাদের উচিত নয়। তার কয়েকটি সুনির্দিষ্ট সহজপ্রবৃত্তি ও সুপ্তশক্তি (potentialities) থাকে, সেইগুলিই তার শক্তি ও অস্থিরতার উৎস। সব জেনোটাইপও একই ধরনের নয়। সহজাত বৈশিষ্ট্যের কারণেই মানুষে মানুষে পার্থক্য। সমাজ অবশ্য এই সহজাত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিরোধী নয়, বরং বিপরীতভাবে, সভ্যতা বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যে পার্থক্য দেখা দেয় সেইটিই মানুষের বৈশিষ্ট্যগুলি অর্জনের উপায়। যে সমাজে শিল্পও নেই, বিজ্ঞানও নেই সেই সমাজে শিল্পী হব না বৈজ্ঞানিক হব এই পছন্দ করাটাও সম্ভব নয়, বিজ্ঞান যেখানে অস্পষ্ট জ্যোতিষ জাতীয় কুসংস্কারের বেশি কিছু নয় সেখানে জীববিদ্যা আর মনোবিদ্যার মধ্যে পছন্দ অনুযায়ী বেছে নেওয়াও সম্ভব নয়।

এই জেনোটাইপ "একেবারে কাঁচা" অবস্থায় কখনও পাওয়া যায় না। সুনির্দিষ্ট মতামত, বস্তুগত পারিপার্শ্বিক এবং শিক্ষা সহ এক সুনির্দিষ্ট যুক্ত সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত একজন মানুষ হিসাবেই জেনোটাইপকে সর্বদা দেখা যায়। এই মানুষের থাকে চেতনা, যে চেতনা অন্য মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক দ্বারা সাপেক্ষীকৃত (conditioned)। এই সম্পর্ক সে বেছে নেয়নি, এর মধ্যেই তার জন্ম।

মানুষে মানুষে এই সম্পর্ক প্রথম গড়ে ওঠে প্রকৃতির বা বহির্বাস্তবের সঙ্গে মানুষের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। ব্যক্তি কয়েকটি নিয়মের অধীন—শারীরবৃত্তগত ও মনস্তাত্ত্বিক। কিন্তু বাস্তবের একটা অংশ হিসাবে মানুষ নিজেকে অপর

অংশটি (প্রকৃতি) থেকে যতটা পরিমাণে পৃথক করেছে, তার থেকে সম্পর্কছিন্ন হওয়ার জন্য নয়, বরং তার সঙ্গে সংগ্রামের উদ্দেশ্যে এবং তার ফলে অর্থনৈতিক উৎপাদনে তার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে—সেই পরিমাণেই মানুষ আরও এক নিয়মের ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে। এই নিয়মগুলি সমাজবিদ্যার নিয়ম। এই নিয়মগুচ্ছের [set of laws] কোনটাই পরস্পরের বিরোধিতা করে না; এরা পরস্পরকে সমৃদ্ধ করে।

কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে সমাজবিদ্যার ক্ষেত্রটির একটি বিশেষ স্থান আছে, কারণ এটি মানুষ ও প্রকৃতির পরস্পরভেদী ক্ষেত্র এবং মতাদর্শগতভাবে অন্যান্য নিয়ম সৃষ্টির এটি উৎস।

মানুষ ও প্রকৃতির সংগ্রাম একটা বস্তুগত চলন। চিন্তার ক্ষেত্রে সেটা দর্শনের বা প্রাচীনতম সমস্যা সেই বিষয়ী-বিষয় সম্পর্কের রূপ নেয়। এটা যে এক সমাধানহীন সমস্যার রূপ নেয় তার একমাত্র কারণ এই যে, সমাজ শ্রেণী-বিভক্ত হওয়ায় প্রকৃতির সঙ্গে সক্রিয় সংগ্রামের থেকে যে শ্রেণীটি মতাদর্শের জন্ম দেয় তাকে পৃথক করার দ্বারা বিষয় থেকে বিষয়ী পৃথক হয় এবং যার ফলে তারা পরস্পরের অসম্পৃক্ত বিপরীত হয়ে ওঠে, এই মতাদর্শের মধ্যে সেই পৃথকীকরণকে প্রতিফলিত করে।

সমাজের মধ্যে মানুষ ও প্রকৃতির এই সংগ্রাম সামগ্রিকভাবে চিন্তার ক্ষেত্রে বাস্তব বা "সত্য" হিসাবে প্রতিফলিত হয়। এই সত্য বা বাস্তব আকাশ থেকে নেমে আসা কিছু নয়, এটা হল জীবন্ত, বর্ধমান, বিকাশমান একটা ধারা। যেহেতু তা বিশ্ব সম্পর্কে সত্য, সেই কারণে তা বস্তু সম্পর্কেও সত্য। বিশ্বকে যখন বস্তুগত বলি তখন আমরা তার দ্বারা এইটাই বোঝাতে চাই যে সমস্ত প্রতিভাসের মধ্যেই হেতু বা নির্ধারক সম্পর্কের রূপে অপ্রকাশিত যোগসূত্র থাকে, যার এক চরম সমসত্তা থাকে যার নাম "বস্তু"। এটা হল বিজ্ঞানের প্রথম অঙ্গীকার, কারণ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রের মধ্যে কোনও কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করার অর্থই হল এই ধরনের যোগসূত্র যে আছে তা সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করে নেওয়া। কোনও প্রতিভাসের মধ্যকার এই যোগসূত্রকে অস্বীকার করার অর্থ হল তার জ্ঞেয়তাকে অস্বীকার করা এবং সেইজন্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তার অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনাকেই অস্বীকার করা। এই যোগসূত্রগুলির আবিষ্কার ও বিষয়গত হিসাবে সেগুলিকে প্রদর্শন করাই হল বিজ্ঞানের ইতিহাস। কেবল মাত্র ধ্যানের দ্বারা সেগুলির আবিষ্কার সম্ভব নয়, বরং প্রত্যেক পর্যায়েই পরীক্ষণের [experiment]—যোগসূত্রগুলির ব্যবহারিক প্রদর্শনের—প্রয়োজন।

অতএব সত্য হল প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রামের এক সংগঠিত উৎপন্ন [organised product]। এই সংগ্রাম যতই পুঁজি (করণকৌশল ও জ্ঞান) সঞ্চয় করতে থাকে এবং বেশি বেশি করে জটিল হয়ে উঠতে থাকে, ততই সত্য, যা বাস্তবের প্রতিফলন, মানুষের মস্তিষ্কে প্রস্ফুটিত হতে থাকে। কোনও একটি কালে, কোনও একজন মানুষের মস্তিষ্কে এই সত্যের একটি আংশিক দিকই মাত্র থাকতে পারে। বিকৃত, আংশিক ও সীমাবদ্ধ অবস্থায়, একজনের মস্তিষ্কে থাকলেও বাস্তবের এই প্রত্যক্ষ সমস্ত জীবিত মানুষের মস্তিষ্কে সত্যের শক্তি, বিজ্ঞানের শক্তি অর্জন করতে পারে, কারণ সমাজের শর্তগুলির দ্বারাই তা সংগঠিত হয়। সমাজের এই শর্তগুলি আবার অর্থনৈতিক উৎপাদনের প্রয়োজন থেকেই উদ্ভূত। এইভাবে যে কোনও কালে সমস্ত মানুষের মস্তিষ্কে বাস্তবের আংশিক প্রতিফলনের দ্বারা গঠিত এক বিশেষ ধাত্র হল সত্য—কেবলমাত্র যা হোক করে জড় করা একটা ব্যাপার নয় সেটা—বরং কোনও নির্দিষ্ট সমাজে, তার পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক করণকৌশলের স্তর, তার বৈজ্ঞানিক রচনাদি, ভাবের আদানপ্রদান ও আলোচনার মাধ্যম এবং গবেষণাগারের সুযোগ প্রভৃতির দ্বারা এই ধারণাগুলি সংগঠিত।

"সত্য" প্রত্যেক মানুষের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও স্মৃতির রূপ নেয়। প্রত্যক্ষ বলতে বোঝায় মানুষ তার ইন্দ্রিয়ানুভূতির সাহায্যে বাস্তবের যা কিছু ধরতে পারে সেইটা। আর স্মৃতি হল সেই জিনিস যা কোনও পূর্ববর্তী প্রত্যক্ষের মুহূর্তে সক্রিয় থাকে এবং তার বর্তমান প্রত্যক্ষকে প্রভাবিত করে। যেহেতু এই মানবচেতনাগুলির বিষয়বস্তু যখন অনুষঙ্গ দ্বারা সংগঠিত হয়ে দেখা দেয় তখন তা প্রবল শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং সত্য হয়ে ওঠে, সেইজন্য ব্যক্তির মধ্যে তা পুনরায় আরও বেশি বেশি তেজস্বতাসহ প্রতিফলিত হয়। সমাজের মধ্যে থাকার কারণে ব্যক্তির স্মৃতি ও প্রত্যক্ষ এইভাবে আরও বেশি বেশি রূপান্তরিত হয়। ব্যক্তির চেতনা এই অর্থে এক সামাজিক উৎপন্ন (product)।

সত্য হল প্রতিভাসের যোগসূত্রগুলি সম্পর্কে ব্যক্তির অভিজ্ঞতা, যে অভিজ্ঞতা এই ধরনের অন্য লক্ষ লক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে সমঞ্জস হয়ে ওঠার দ্বারা সংগঠিত হয়ে উঠেছে। এটা এই কারণে সংগঠিত হতে পারে যে এই প্রত্যক্ষ জগৎগুলি হল একই বস্তুগত বিশ্বে দেখা যায় এমন ঘটনা। আর প্রতিটি মানুষ সেই একই বস্তুগত বিশ্বের অংশ। অসংখ্য ব্যক্তিগত বিষয়ীগত বিশ্বের কোনও প্রতিভাস সেগুলি নয়। এই সামান্য উপাদানটি না থাকলে ব্যক্তিগত জগৎ-গুলির কোনও সাদৃশ্য থাকত না, অর্থাৎ কোনও বিষয়গত সত্যও থাকতনা।

সেই কারণে বিজ্ঞান, যা হল বিষয়গত সত্য, তার কাজহল প্রতিভাসের বস্তুগত যোগসূত্র বা "কার্যকারণতা"কে ["causality"] প্রদর্শন করা।

অনপেক্ষ সত্য বলে কিছু নেই। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট কালে সমাজ ক্রমাগত যে সত্যে পৌছাতে চাইছে তার একটা সীমা থাকে। বিশ্ব নিজেই হল বিমূর্ত সত্যের এই সীমা। যখন মানুষ সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির সঙ্গে পরস্পরভেদী হয়ে যাবে…। এই তত্ত্বগত সীমাও এই দুই-ই ধরে নেয় যে একটা বিশ্ব আছে যা স্থির এবং সেই বিশ্বের বাইরে একটা সত্য আছে। সত্য অবশ্য বিশ্বেরই একটা অংশ। অথচ বাস্তবের বাকি অংশের সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম থেকেই সত্যের জন্ম। এবং সেই কারণে, এই সংগ্রামের প্রত্যেক পর্যায়ে এক নতুন বাস্তবের জন্ম হয় এবং জগৎ আরও জটিল হয়ে ওঠে। ফলে বাস্তব নিজেই সমৃদ্ধ হয় এবং বাস্তবের জটিলতার এই বৃদ্ধি যতটা হয় "অনপেক্ষ সত্যের" লক্ষ্যস্থলও ততটাই দূরে সরে যায়। মানুষ যেমন কিছুতেই তত লম্বা হতে পারে না যাতে করে সে নিজেকেই উপর থেকে দেখতে পায়, সমাজও সেইরকম কখনই অনপেক্ষ সত্যে পৌছাতে পারে না। তবে ক্রমাগত লম্বা হতে থাকলে মানুষের দৃষ্টিগোচর ক্ষেত্র যেমন আরও বিস্তৃত হতে থাকে সমাজের বিকাশও সেইরকম তার সত্যকে ক্রমাগতই প্রসারিত করতে থাকে।

প্রকৃতির সঙ্গে সংঘবদ্ধ সংগ্রামের ভাষা হল মানুষের সেই সর্বাধিক নমনীয় উপকরণ [instrument] যা মানুষ গড়ে তুলেছে। প্রকৃতিকে গভীরভাবে কর্ষণ করতে মানুষ একা পারে না। কিন্তু সংঘবদ্ধ মানুষ হিসাবে, অর্থনৈতিক উৎপাদনের প্রভু হিসাবে প্রকৃতির উপর তার সক্রিয় প্রভাবকে সে বিস্তৃত করে এবং সেই কারণে সেই কার্যের উৎপন্ন ফল যে সত্য তাকেও সে সম্প্রসারিত করে। ভাষা হল মানব সংঘবদ্ধতার একান্ত প্রয়োজনীয় হাতিয়ার। এই কারণেই সত্য এত বেশি মাত্রায় সংঘবদ্ধতা থেকে সৃষ্ট যে ভাষায় প্রকাশিত উক্তি ব্যতীত সত্যের বিষয়ে কেউ চিন্তাই করতে পারে না।

ভাষার মধ্যে সত্য কিভাবে প্রকাশিত হয়? শব্দ হল একটা ভঙ্গী, একটা চীৎকার। উদাহরণস্বরূপ, এক পশুর দলের কথাই ধরা যাক। বিপদে পড়লে তারা এক ধরনের চীৎকার করে। একজন যখন চীৎকার করে তার ফলে অন্যদের মধ্যে আদিম নিষ্ক্রিয় সহানুভূতির স্রোত বয়ে যায়, অন্যরাও ভীত হয়ে পড়ে এবং সকলে এক সঙ্গে পালায়।

অতএব এই চীৎকারের একটা বিষয়ীগত দিক আছে, একটা "অনুভূতি-

সুর" ["feeling-tone"] আছে, চীৎকারের ফলে সকলেই ভীতি অনুভব করে।

কিন্তু চীৎকারের দ্বারা ভীতিজনক একটা বস্তুও সূচিত হয়,—কোন শত্রু, বা কোন বিপদ। অতএব এই চীৎকারের একটা বিষয়গত দিকও আছে, বাস্তবে প্রত্যক্ষ করা যায় এইরকম একটা কিছুর উল্লেখ (reference)।

সাহজিক নিছক প্রাণীগত অস্তিত্বের জন্য অল্প কয়েকটি সংক্ষিপ্ত চীৎকারই যথেষ্ট। কোনও কোনও প্রাণী আবার মূক। কিন্তু সংঘবদ্ধভাবে অর্থনৈতিক উৎপাদনে ব্যাপৃত প্রাণীর—মানুষ নামক প্রাণীর কাছে এই চীৎকার একটি শব্দ (word) হয়ে ওঠে। এর "মূল্য" আর এখন সহজপ্রবৃত্তিগত নয়—অভ্যাস পরিবেশের সঙ্গে জেনোটাইপের সম্পর্ক থেকে উৎপন্ন কিছু নয়—এটা এখন হয়ে ওঠে "বিধিবহির্ভূত" ("arbitrary")—অর্থনৈতিক উৎপাদনের কৃত্রিম পরিবেশের সঙ্গে রূপান্তরিত জেনোটাইপের সম্পর্ক থেকে উৎপন্ন। অর্থনৈতিক উৎপাদনের উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধতার কারণে শব্দ হয়ে উঠতে হলে এই চীৎকারের তখনও সহজপ্রবৃত্তিগত অনুভূতি-সুর এবং অভিজ্ঞ প্রত্যক্ষগত মূল্য এই দুটি দিকই বহাল থাকে কিন্তু দুটিই অনেক যথাযথ এবং আরও জটিল হয়ে ওঠে।

মূথের অনুভূতিগুলির মধ্যে একটা সাধারণ সাদৃশ্য থাকে, কারণ তাদের সহজপ্রবৃত্তিগত গঠনের (instinctive make-up) মধ্যে একটা সাদৃশ্য থাকে। তাদের জীবনযাত্রার মধ্যে একটা সাদৃশ্য থাকার কারণে তাদের প্রত্যক্ষগুলির মধ্যেও একটা সাদৃশ্য থাকে। অপরের প্রত্যক্ষজগৎগুলি যতটা সদৃশ বলে প্রত্যেকেই জানে এই সকল অনুভূতিগুলি তার বেশি সদৃশ বলে স্বতন্ত্র প্রাণীদের জানা থাকে না। স্বতন্ত্র প্রাণী একা একা অনুভব করে এবং দেখে। আমরা যারা তাদের লক্ষ্য করি, প্রাণীদের ব্যবহারের সাদৃশ্য থেকে তাদের আবেগগত এবং প্রত্যক্ষ জগতের মধ্যে যে সাদৃশ্য আছে আমরা তা সিদ্ধান্ত করি, কিন্তু একটা সদৃশ জগৎ যে আছে সে বিষয়ে প্রাণীরা এইভাবে সচেতন হতে পারে না

মানুষের জগতে যে একটা সাদৃশ্য আছে মানুষ তা জানে। তার উদাহরণ, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, প্রত্যক্ষ বাস্তবের জগতে এই সাদৃশ্য প্রকাশ পায়। একই ভাবে মানুষ জানে যে অনুভূতিগুলির মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্য শিল্পের ক্ষেত্রে, আবেগাত্মক বাস্তবের মধ্যে প্রকাশ পায়।

মানুষ যখন অন্য মানুষের সঙ্গে সংযুক্ত হল তখনই মাত্র তার প্রত্যক্ষ

জগতের ক্ষেত্রে এই সাদৃশ্যকে মানুষ জানতে পারল। এই সংঘবদ্ধতায় সে আবদ্ধ হল কেন? তার প্রত্যক্ষ জগতকে পরিবর্তিত করার জন্যই। এই দ্বন্দ্ব বিজ্ঞানের মূলগত দ্বন্দ্ব ছাড়া আর কিছুই নয়—সে দ্বন্দ্ব হল এই যে বাস্তবকে পরিবর্তিত করার মধ্য দিয়েই মানুষ বাস্তবকে চেনে। কোন পরীক্ষণ যখন করা হয় তখন ঠিক সেইটাই করা হয়, আর বিজ্ঞানের পক্ষে পরীক্ষণ হল চরম সমস্যামূলক [crucial]। এই বিশেষ দ্বন্দ্বটি চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে হাইজেনবার্গের অনির্ণেয়তাবিষয়ক সূত্রের মধ্যে। সেই সূত্র অনুসারে বাস্তব সম্পর্কে সমস্ত জ্ঞান বাস্তবের পরিবর্তনকে অন্তর্ভুক্ত করে। বিজ্ঞানের সমস্ত নিয়মই হল সেই সব নিয়ম যা বলে দেয় কোন্ ক্রিয়া বাস্তবের কোন পরিবর্তন ঘটায়। মানুষ তার ইতিহাসে প্রত্যক্ষ জগতে যে পরিবর্তনগুলি ঘটায় সেগুলির সংরক্ষিত, সংগঠিত সহজব্যবহারযোগ্য, সংক্ষিপ্তসারাত্মক ও ভেদ্যতাযুক্ত রূপের যোগফল হল বিজ্ঞান।

অনুরূপভাবে, মানুষ অন্য মানুষের অহংগুলির মধ্যে যে সাদৃশ্য আছে তা জানতে পারে সেগুলির পরিবর্তন ঘটানর প্রচেষ্টার দ্বারা। মানুষ হিসাবে সংঘবদ্ধ হয়ে বেঁচে থাকার পক্ষে এই পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন। মানুষের সহজপ্রবৃত্তি হল সর্বদাই এটা ওটা করা। অতএব যতক্ষণ না ভিন্ন ধরনের কিছু করানর জন্য এই সহজপ্রবৃত্তিগুলিকে রূপান্তরিত করা হচ্ছে ততক্ষণ মানুষ সাপেক্ষীকৃতভাবে সাড়া না দিয়ে সহজপ্রবৃত্তিগতভাবে সাড়া দেবে এবং সমাজবদ্ধ থাকা সম্ভব হবে না। পরস্পরের অনুভূতিকে ক্রিয়া দ্বারা মানুষ যতটা পরিবর্তিত করতে পারে ঠিক ততটা পরিমাণেই মানুষ একটি সাধারণ অনুভূতির জগতের মধ্যে বাস করে। শিল্পের পক্ষে এই পরিবর্তন চরমসমস্যা-মূলক। এই পরিবর্তনগুলির যোগফল, সংগঠিত ও মানুষ অনপেক্ষ করে তোলা হলেই তা হয় শিল্প, বিমূর্তনার মধ্যে নয়—মূর্ত জীবনের মধ্য থেকেই বেরিয়ে আসে।

বিজ্ঞান ও শিল্প দুইই প্রাণীদের মধ্যে ভ্রূণমান (nascent) অবস্থায় থাকে। স্ত্রী-প্রাণীর প্রস্তাব, শত্রুর ভয় এদের অর্থ হল সক্রিয় প্রাণীটিকে অন্যের অনুভূতিকে পরিবর্তিত করতে হবে। [illegible] নৃত্য এবং লড়াইয়ের আগে ভয় দেখান ভঙ্গীগুলি শিল্পের ভ্রূণ। কিন্তু দুইই করা হয় সহজপ্রবৃত্তিগতভাবে। এতে স্বাধীনতা নেই এবং [illegible]। এগুলি সামাজিকভাবে সাপেক্ষীকৃত জগতের নয়। কেবলমাত্র যে অনুভূতিগুলি মানুষের প্রকৃতিতে বা প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে স্পষ্টভাবে সুনির্দিষ্ট থাকে না এমন কোনও

উপায়ে পরিবর্তিত হয় সেগুলিই শিল্পের বিষয়। সহজপ্রবৃত্তিগুলিকে যত রকমে প্রভাবিত করা সম্ভব ততরকমভাবে তার উপর প্রভাব পড়ার পর শিল্প যতখানি সহজপ্রবৃত্তিগুলির প্রকৃত প্রয়োজনকে উদ্ঘাটিত করে, শিল্প সেই পরিমাণেই অনুভূতির জগতের প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং সেইজন্য স্বাধীন হয়েও ওঠে। শিল্প হল অনুভূতির জগতে মানুষের যে স্বাধীনতা তার প্রকাশ। ঠিক যেমন বিজ্ঞান হল ইন্দ্রিয়লব্ধ প্রত্যক্ষের জগতে মানুষের যে স্বাধীনতা তার প্রকাশ। কারণ এই দুইটি তাদের জগতের প্রয়োজনগুলি সম্পর্কে সচেতন এবং সেগুলির পরিবর্তন ঘটাতে পারে—শিল্প অনুভূতির জগৎ বা অভ্যন্তরীণ বাস্তবকে পরিবর্তিত করে, বিজ্ঞান করে প্রতিভাসের জগৎ বা বহির্বাস্তবকে।

কোন চীৎকার শুনে কোনও ভীতিজনক বস্তুর থেকে পশুযূথ যে ছুটে পালায় সেটা হল বিজ্ঞানের ভ্রূণ অবস্থা। কিন্তু তা বিজ্ঞান হয়ে ওঠে তখনই যখন তা প্রত্যক্ষ জগতে যে পরিবর্তন ঘটল সে সম্পর্কে সচেতনতা, সহজপ্রবৃত্তিগত ভাবে বিপদ থেকে পালিয়ে গিয়ে নয়, অর্থনৈতিকভাবে তাকে পরিবর্তিত করেই তা বিজ্ঞান হয়ে ওঠে—যেমন ধরুন, অস্ত্র বা ফাঁদ তৈরি করে সেই বিপজ্জনক প্রাণীকে মেরে ফেলে বা পশ্চাদ্দলকে সুরক্ষিত রেখে সুসংগঠিত ভাবে পিছু হটে গিয়ে।

বিজ্ঞান ও শিল্প যদিও প্রত্যক্ষ এবং অনুভূতির জগতের সামাজিক সামান্য-ধর্মিতার প্রকাশ, কিন্তু তা মানুষকে পরস্পরের হুবহু নকল করে তোলে না। বরং বিপরীতটাই হয়। যেহেতু সম্ভবপর পরিবর্তনগুলি নিয়েই এর কার্যকলাপ এবং নতুন নতুন পরিবর্তন যেমন যেমন আবিষ্কৃত হতে থাকে সেই অনুপাতে এগুলির সম্প্রসারণ ও সমৃদ্ধি ঘটতে থাকে, সেইজন্য ব্যক্তিগত পার্থক্যগুলি বাস্তবায়িত করার উপায়ও এইগুলি। প্রাণীস্তরে যে পার্থক্যগুলি গন্নাকাটা [hare-lip] বা বাড়তি দেহভার ইত্যাদি রূপে দেখা দেয় এই স্তরে সেগুলি আবেগগত জগতের বা weltanschauung এর সূক্ষ্ম পার্থক্য হিসাবে দেখা দেয়। এই পার্থক্যগুলি বাস্তবের সমগ্র ধাত্রটিকে রঞ্জিত ও সমৃদ্ধ করে তোলে। ভাষা সেই বিশেষ মাধ্যম যার দ্বারা এই পরিবর্তনগুলি সামাজিক ভাবে প্রচলিত মুদ্রার রূপ নেয়। শব্দ হল মানবজাতির মতাদর্শগত বাজারের মুদ্রা। আধুনিক সামাজিক সত্তার সমস্ত দুরূহ জটিলতা যেমন অল্প কয়েকটি মুদ্রা-বিনিময়ের ক্ষেত্রে প্রকাশ পায় সেইরকম অল্প কয়েকটি ধ্বনিই আধুনিক মানুষের মতাদর্শগত জগতের আবেগ ও সত্যের সমৃদ্ধ ভাণ্ডারকে প্রকাশ করে।

২

শব্দের ব্যাপারটা চিন্তা করা যাক। একটা এক পাউণ্ডের নোটের মত একটা খুবই সরল জিনিসের কথা ধরা যাক। কিন্তু মূল্য ও দাম, যোগান ও চাহিদা বা লাভ ও খরচার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা যখন আমরা পর্যালোচনা করি তখন তার জটিলতা আমাদের হতবাক করে দেয়। শব্দও ঠিক সেইরকম মতাদর্শগত বিস্তারের এক বিপুল ক্ষেত্রের অতি ক্ষুদ্র সংস্করণ।

শব্দের একটা বিষয়ীগত দিক (অনুভূতি) আছে আবার একটা বিষয়গত দিকও (প্রত্যক্ষ) আছে। কিন্তু নিছক শব্দ হিসাবে ধ্যানের মধ্যে এইগুলি যে থাকে তাও নয়। ঠিক যেমন একটা এক পাউণ্ডের নোট কাগজ বা ছাপা হিসাবে একটা নিছক নোটই মাত্র নয় শব্দের মধ্যে গতিশীল সামাজিক কার্য হিসাবে এগুলির অস্তিত্ব; ঠিক যেমন বিনিময়ের মধ্যেই মাত্র একটা এক পাউণ্ডের নোটের অস্তিত্ব।

শব্দ বলা হয় এবং শোনা হয়। এই কাজে যারা লিপ্ত তাদের বক্তা ও শ্রোতা বলা যাক। শব্দ ইন্দ্রিয় শক্তির সাহায্যে প্রত্যক্ষযোগ্য বাস্তবের কিছু অংশকে সূচিত করে: এটা হল তার প্রতীকধর্মী বা উল্লেখসূচক প্রসঙ্গ। বক্তার ইচ্ছা শ্রোতার প্রত্যক্ষ জগৎকে এমনভাবে পরিবর্তিত করা যাতে শব্দটি যে জিনিসের প্রতীক সেটি সেই জগতের অন্তর্ভুক্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ, বক্তা বলতে পারেন "দেখুন দেখুন, একটা গোলাপ"। তিনি চান শ্রোতা একটি গোলাপফুল দেখেন, বা গোলাপ ফুল দেখার সম্ভাবনা সম্পর্কে সজাগ হন। অথবা তিনি বলতে পারেন: "কোন কোন গোলাপ নীল", সেক্ষেত্রে তাঁর ইচ্ছা শ্রোতার প্রত্যক্ষ জগৎকে এমনভাবে রূপান্তরিত করা যাতে নীল গোলাপ সেই জগতের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই রকম ভাবে ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত বিস্তারিত ও দুর্বোধ্য গাণিতিক আলোচনা পর্যন্ত এগুনো যায়।

কিন্তু তা করতে গেলে সকলেরই পরিচিত—বক্তা ও শ্রোতা দুজনেরই পরিচিত [commou] একটা প্রত্যক্ষ জগৎ থাকতে হয়—দুজনেরই পরিচিত প্রত্যক্ষগত প্রতীকও তাতে থাকবে—যে প্রতীকের সাহায্যে সেই সাধারণ জগতের সামগ্রীগুলি বোঝান হবে সেটা বক্তা ও শ্রোতা দুজনেই প্রচলিত বলে মেনে নিয়েছেন।

এই পরিচিত প্রত্যক্ষ জগৎ হল বাস্তবের বা সত্যের জগৎ। বিজ্ঞান হল তার সর্বাধিক সামান্যীকৃত প্রকাশ। কি ভাবে পরিবর্তনশীল বাস্তব সম্পর্কে মানুষের অভিজ্ঞতার দ্বারা এটা গড়ে উঠেছে আমরা তা ইতোমধ্যেই দেখেছি।

একে কখন কখন প্রত্যক্ষের বা প্রত্যয়ের (এই ভেদটা কৃত্রিম) জগৎ বলে বর্ণনা করা হয়। যেহেতু "নীল" এবং "গোলাপ" এই জগতের সাধারণ সামগ্রী; বক্তা সেই জগতে একটি নীল গোলাপ এনে শ্রোতার প্রত্যক্ষ জগৎকে পরিবর্তিত করতে সক্ষম। নীল আর গোলাপ এখন মিলে গেছে— এবং এমন একটা নতুন সামগ্রী গড়ে তুলেছে যেটা সেই সাধারণ প্রত্যক্ষ জগতে পূর্বে ছিল না কিন্তু এখন পরস্পরকে রঞ্জিত ক'রে একটা পূর্ণ সামগ্রী গড়ে তুলছে যা আগেকার অংশগুলির সমষ্টির থেকে বেশি একটা কিছু।

এই আদানপ্রদানের ফল তাহলে কি দাঁড়াল? যে নীল গোলাপটি বক্তার প্রত্যক্ষজগতে ছিল উভয়ের সাধারণ প্রত্যক্ষজগতে বা শ্রোতার প্রত্যক্ষজগতে ছিল না সেটি উভয়ের সাধারণ 'common' প্রত্যক্ষ জগতে স্পষ্ট হল এবং শ্রোতার প্রত্যক্ষ জগতে তা প্রবিষ্ট করা হল। সুতরাং, শ্রোতার প্রত্যক্ষ জগৎ এবং উভয়ের সাধারণ প্রত্যক্ষ জগৎ দুই-ই পরিবর্তিত হল। অতএব, এখন যদি বক্তা বলেন "নীল গোলাপ গন্ধহীন", তাহলে সেই বাক্যটির এমন একটি অর্থ হবে যা আগে তার ছিল না, কারণ বক্তা ও শ্রোতা উভয়ের সাধারণ প্রত্যক্ষ জগতে নীল গোলাপের অস্তিত্ব এখন আছে।

লক্ষ্য করুন যে সাধারণ প্রত্যক্ষ জগতে কোন নতুন সামগ্রী নিয়ে আসতে হলে নতুন কোনও শব্দের একান্ত প্রয়োজন নেই যদিও কখন কখন তা ব্যবহার করা হয়। আমরা একথাও বলতে পারতাম, "ক একটি নীল গোলাপ" "ক গন্ধহীন"। নতুন শব্দসৃষ্টি করবার [neologism] থেকে বরং যে প্রতীকগুলি বর্তমান রয়েছে সেগুলিকে অভিনবভাবে যুক্ত করে, তার প্রসারণ ঘটিয়ে তার অধিকতর সঙ্কীর্ণন [illegible] বা তার সম্প্রসারণ ঘটিয়ে বেশির ভাগ নতুন সামগ্রীর প্রবর্তন ঘটান হয়

কিন্তু এই আদানপ্রদান কেবলমাত্র শ্রোতার এবং উভয়ের সাধারণ প্রত্যক্ষজগৎকেই পরিবর্তিত করে না। কারণ কোনও নতুন ফুল সম্পর্কে বক্তার নিজের কোনও 'গন্ধের বা রূপের' অভিজ্ঞতাকে শরীরী রূপ দিয়ে শ্রোতার কাছে পৌঁছে দিতে হলে তাকে প্রচলিত ভাষায় পরিবর্তিত করতে হবে। আগে কখনও দেখা যায়নি বা তার পর থেকে আজ অবধি আর দেখা যায়নি এই রকম একটি অনুপম ফুল থেকে তার কাছে একে একটা নীল গোলাপ - গোলাপ জাতির অন্তর্ভুক্ত একটি ফুল,—নীল বর্ণের অন্তর্ভুক্ত একটি গন্ধমান গোলাপ, হয়ে উঠতে হয়েছে। এইভাবে ভাবের আদানপ্রদান যেমন তা উভয়ের সাধারণ প্রত্যক্ষ জগৎকে এবং শ্রোতার প্রত্যক্ষ জগৎকে

পরিবর্তিত করে সেইরকম তার অভিজ্ঞতাকে পরিবর্তিত করে এবং সেটাকে যেন সামাজিক চৌহদ্দির মধ্যে ধরে রাখে।

কিন্তু সাধারণ জগৎ আমাদের বিশেষ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে প্রত্যয়মূলক ও পুরাতন করে তোলে এটা মনে করলে এই প্রক্রিয়াটিকে উল্টে ধরা হয়। মোটামুটি ধরনের সহজপ্রবৃত্তিগত চালিকাশক্তি [drives] নিয়ে আমরা অভিজ্ঞতায় সাড়া দিই এবং সেইগুলিই আমাদের অভিজ্ঞতাকে "ভোজ্য","অ-ভোজ্য", "বিপজ্জনক", "নিরপেক্ষ", "আলোকিত", "অন্ধকার" ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত করে। অভিজ্ঞতার সাধারণ জগৎ আমাদের অধিকারে থাকায় আমরা ফুলকে অ-ভোজ্যের মধ্যে, গোলাপকে ফুলের মধ্যে বর্ণকে আলোকিত হওয়ার মধ্যে এবং নীলকে বর্ণের মধ্যে আলাদা করে চিনে থাকি। চেতনার দরজায় ভিড় করে থাকা অস্ফুট গুঞ্জরণের মধ্য থেকে সামাজিক উপায়ের সাহায্যে এইভাবে বিষয়গত বাস্তব নিজেকে পৃথক করে তোলে। আমাদের সামাজিক জগৎ যত জটিল হয় ততই প্রতিভাস ততই বহু প্রত্যয়ের এক পারস্পরিক-ক্রিয়া [interaction] হয়ে ওঠে এবং সেই কারণে আরও স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। আবার আমাদের বলতে হয়: সমাজই হল ব্যক্তিসত্তার বাস্তবায়নের উপায় এবং সেই কারণে তা স্বাধীনতা অর্জনের পথ। প্রত্যক্ষ করার কাজটি সামাজিক চৌহদ্দির মধ্যে রাখাই হল তাকে সচেতন রাখা।

বক্তার ও শ্রোতার এবং উভয়ের সাধারণ প্রত্যক্ষ জগতের পরিবর্তনই হল শব্দের মূলগত ধর্ম। সব থেকে হাল্কা শব্দও যত তুচ্ছই হোক এই ধরনের পরিবর্তন ঘটায়। এই পরিবর্তনের মাত্রা দিয়েই আমরা শব্দের শক্তির পরিমাপ করি।

একটা গতিশীল সামাজিক ক্রিয়া ছাড়া অন্য কোনও ভাবে শব্দকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা যায় না। একটা এক পাউণ্ডের নোটের অস্তিত্ব যে কেবলমাত্র একটা সামাজিক ক্রিয়া হিসাবেই গুরুত্বপূর্ণ একথা যেমন আমরা ভুলে যাই, কারণ শ্রম বিভাগের ফলে যে জটিলতার উদ্ভব তা বাজারের উপস্থিতির জন্য উৎপাদনকারী ও ভোগকারীর মধ্যে যে প্রভাব পড়ে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, ঠিক সেই রকম এই কথাটাও আমরা ভুলে যাই শব্দের মত, এক পাউণ্ডের নোটটা একজনের কাছ থেকে আরেক জনের কাছে হস্তান্তরের একটা প্রকাশ মাত্র—এক ক্ষেত্রে তা মালের হস্তান্তর; অপর ক্ষেত্রে তা ধারণার। কিন্তু পণ্য উৎপাদনের শর্তগুলি তাদের উপর নিজ অধিকারে প্রত্যয় হিসাবে থাকার ক্ষেত্রে একটা রহস্যময় অস্তিত্ব আরোপ করে—একটি ক্ষেত্রে তা হয় "মূল্যের" প্রত্যয়, অন্যটির ক্ষেত্রে "অর্থের" প্রত্যয়।

অতএব মানুষের মস্তিষ্ককে আমাদের এমনভাবে দেখতে হবে যেন সেগুলি এই সমস্ত ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ জগতে পূর্ণ এবং তার সঙ্গে যোগ হয়েছে কয়েকটি সাধারণ প্রত্যক্ষ (বা প্রত্যয়) বা দিয়ে সাধারণ প্রত্যক্ষের জগৎটি সৃষ্ট ; এবং সেই কারণে তা তাদের কাছে পরস্পরের ব্যক্তিগত জগৎকে রূপান্তরিত করার উপায়টি হাজির করে। সত্য সমস্ত ব্যক্তিগত জগতের একটা স্তূপমাত্র নয় ; তা হল সেই সাধারণ জগৎ—সেই উপায় যার দ্বারা এই ব্যক্তিগত জগৎগুলি পরস্পরকে রূপান্তরিত করে। এই ব্যক্তিগত জগৎগুলির পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে, ঠিক যেমন সেগুলি মস্তিষ্কে বহন করে যে মানুষরা তাদের পরস্পরের মধ্যেও একটা সম্পর্ক থাকে। এই সম্পর্কের জালক'কেই [plexus of relations] সত্য বলে।

কিন্তু সত্য বা প্রত্যক্ষ কোনটিরই স্বয়ংসম্পূর্ণ একটা উপরিকাঠামো [superstructure] হিসাবে অস্তিত্ব নেই। বস্তুগত পরিবর্তনের প্রতিফলন হিসাবেই মাত্র তাদের অস্তিত্ব। সাধারণ প্রত্যক্ষ জগতে সত্যও আছে ভুলও আছে। সত্য বা মিথ্যা বলতে শুধু এইটুকু বোঝায় : "এক সাধারণ প্রত্যক্ষ জগতে বসবাস করা" ["living in the common perceptual world"]। বস্তুগত বাস্তবের সঙ্গে সাধারণ প্রত্যক্ষ জগতের সক্রিয় সম্পর্কের দ্বারাই মাত্র সত্য মিথ্যা থেকে পৃথক হয়।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক ক্রিয়া যে অর্থনৈতিক উৎপাদনের দ্বারা ক্রমাগত সমৃদ্ধ হয় এটা আমরা দেখেছি। অর্থনৈতিক উৎপাদনের জন্য সংঘবদ্ধতার প্রয়োজন—তার জন্য আবার শব্দের প্রয়োজন। মানুষকে একত্রে কাজ করতে হলে, অর্থাৎ অ-সহজপ্রবৃত্তিগতভাবে কিছু করতে হলে তার পরিবর্তনযোগ্য প্রত্যক্ষ বাস্তবের একটা সাধারণ জগৎ থাকা আবশ্যক। পরিবর্তনযোগ্য বলতে তাদের কাজের দ্বারা পরিবর্তনযোগ্য। তাদের কাজের দ্বারা পরিবর্তনযোগ্য এই কথা বলার মধ্যে আমি সম্ভাবনা নির্দেশযোগ্য পরিবর্তনকেও [predictable change] অন্তর্ভুক্ত করছি,—যেমন ভোর হওয়া, গ্রহণ লাগা, এবং স্থাননির্দেশযোগ্য [locatable] পরিবর্তন, যেমন "এখানে", "সেখানে"। কারণ নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকার ফলে তার পক্ষে, ধরুন, অমুক জায়গায় রাত্রে থাকা ইত্যাদি সম্ভবপর, এবং সেইজন্য কালপরম্পরা [sequence] ও স্থানের [location] সহজপ্রত্যক্ষগত বাছাই করার ফলস্বরূপ বাস্তবকে তার নিজের কাজের দ্বারা কার্যতঃ পরিবর্তন করা তার পক্ষে সম্ভবপর। অতএব, শব্দের সাহায্যে, অর্থনৈতিক উৎপাদনে মানুষের সংঘবদ্ধতা

তাদের ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষমূলক জগৎগুলিতে এবং সাধারণ জগতে ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটিয়ে উভয়কেই সমৃদ্ধ করে তোলে। মানুষের কর্মব্যস্ত হাত দুটির উপর এক বিরাট গতিশীল উপরিকাঠামো গড়ে ওঠে যা হল সে যুগে যুগে যা কিছু পরিবর্তন সাধন করেছে বা আবিষ্কার করেছে তারই প্রতিফলন। এই সাধারণ জগৎ যুক্ত সামাজিক জীবন থেকে অনতিবিলম্বে বাজারের গোপন রহস্য এবং তার অজ্ঞাত সৃজনশীল শক্তিগুলির মত জটিল ও দূরের জিনিস হয়ে ওঠে।

এটা হল চিন্তার বা মতাদর্শের ছায়াজগৎ। এটা হল মানুষের মস্তিষ্কে বাস্তব জগতের প্রতিফলন। এটা সর্বদাই এবং অপরিহার্যভাবে বাস্তব জগতের কেবল প্রতীকী মাত্র। এটা সর্বদাই এবং অপরিহার্যভাবে এমন এক প্রতিফলন বিষয়ের সঙ্গে যার একটা সক্রিয় ও তাৎপর্যপূর্ণ সম্পর্ক আছে। আর সেই প্রতিফলনের এই সক্রিয়তা ও তাৎপর্যই, প্রক্ষেপাত্মক গুণগুলি (projective qualities) নয়, তার সত্যকে সুনিশ্চিত করে। বিশ্বের প্রতিটি অংশই বাকি অংশটিকে প্রক্ষেপাত্মকভাবে প্রতিফলিত করে, কেবলমাত্র মানুষই তার পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন। বস্তুটা ধারণা নয়: প্রতিফলনটা বস্তু নয়; কিন্তু একটি অপরটিকে প্রকাশিত করে বা প্রতিফলিত করে। শব্দগুলি প্রত্যক্ষের সঙ্গে জড়িত। প্রত্যক্ষগুলি বাস্তবের খণ্ড খণ্ড অংশের আলোকচিত্রধর্মী স্মৃতি-প্রতিরূপ। এই প্রত্যক্ষগুলি একত্রিত হয়ে প্রত্যয় গড়ে ওঠে, ব্যাপকতম ও বিমূর্ততমভাবে সংগঠিত ও শৃঙ্খলাবিন্যস্ত হয়। অথবা, আরও সঠিকভাবে, "অস্তিত্বের" ব্যাপক গুঞ্জরিত ভিড়ের ভিতর থেকে সরলতম প্রত্যক্ষটি গড়ে ওঠে—পৃথকীভবন ও সমন্বয়সাধনের সাহায্যে অন্যান্য প্রত্যয় ও প্রত্যক্ষগুলি গড়ে ওঠে। মানুষ এই সমগ্র অলীক ছায়ামূর্তির প্রবাহটিকে (phantasmagoria) কেবলমাত্র প্রতীকী বলে স্বীকার করে নেয়, ঠিক যেমন স্মৃতিতে জাগরুক একটি প্রত্যক্ষকে প্রতীকী বলে স্বীকার করা হয়। মানুষ যখন কোন ঘোড়ার কথা স্মরণ করে বা "ঘোড়ার" প্রত্যয় নিয়ে চিন্তা করে তখন কোনও ক্ষেত্রটিতেই সে মনে করে না যে তার মাথার মধ্যে একটা ঘোড়া রয়েছে। এমন কি যখন সে "দুই" এই মার্জিত ধারণাটি নিয়ে চিন্তা করে তখনও সে একথা স্বীকার করে নেয় না যে সমস্ত দুটো জিনিসই তার মাথার মধ্যে আছে বা তার মাথাই দুটো।

শব্দ চিন্তার এই ছায়াজগৎকে উল্লেখ করে এবং তার কিছু কিছু অংশকে মানুষের মাথার মধ্যে জাগিয়ে তোলে। সাধারণ প্রত্যক্ষ জগৎ সব রকমের

ঘনীভবন, সংগঠন ও অপসারণ সংঘটিত হওয়ার পর, বহির্বাস্তবের উল্লেখ করে এবং তার প্রতীকের কাজ করে। এটা হল ক্রিয়ার জন্ম প্রস্তুত বাস্তবের যাবতীয় প্রত্যক্ষের সমষ্টি। প্রত্যক্ষের অন্তর্নিহিত বাস্তবে যখন আঘাত পড়ে তখন যা ঘটে এটা হল তার এক সংক্ষিপ্তসার। শব্দ নিজে যে ছায়াজগৎ সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছে সেই ছায়াজগতেরই সে প্রতীক। অতএব তা প্রতীকের প্রতীক।

এই হল সত্য ও ভুলের ক্ষেত্র। শব্দ কর্মের এক সামাজিক অভিসৃতিকে (a social convergence of action) প্রকাশ করে। "ক এখানে আছে"। এই উক্তিটি সত্য যদি কিছু সংখ্যক লোক কার্যতঃ একই সঙ্গে "এখানে" এসে উপস্থিত হয়। "গ নীল রঙের"—এই উক্তিটি সত্য যদি সেই সংবাদের ফলে গ-এর সঙ্গে সমাজের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে একটা সাধারণ সাদৃশ্য থাকে তবেই (উদাহরণস্বরূপ, তালিকায় উল্লেখ করা হয়েছে এই রকম কোন সর্বসম্মত রঙের সঙ্গে তার তুলনা করে)। সব সময়েই যে আমরা সমাজের মূর্ত জীবনের উল্লেখ করি, তা অবশ্য নয় – সাধারণ প্রত্যক্ষ জগৎ এমন সংগঠিত যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তার উল্লেখ করাই যথেষ্ট (তর্কশাস্ত্র, আইন, নথি)। কিন্তু এমন কোনও মতপার্থক্য যদি দেখা দেয় যা এই ছায়াজগতের সাহায্য নিয়ে সমাধানযোগ্য নয় (প্রকল্প বা hypothesis ও অভিজ্ঞতার মধ্যে দ্বন্দ্ব), তখন তার সমাধান বস্তুগত বাস্তবের সাহায্য নিয়েই মাত্র সম্ভব (চরম সমস্যাপূর্ণ পরীক্ষণ) যার দ্বারা সাধারণ প্রত্যক্ষ জগৎ পরিবর্তিত হয় (নতুন প্রকল্প)। এইভাবে ছায়াজগতের সঙ্গে বস্তুগত বাস্তবের এক জৈব যোগসূত্র (organic connection) গড়ে ওঠে এবং তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই তা অবিরাম প্রাণশক্তি ও পুষ্টি আহরণ করে। তত্ত্ব ও প্রয়োগের দ্বন্দ্ব উভয়কেই এগিয়ে নিয়ে যায়। তাদের জৈব ঐক্যই তাদের পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব জাগাতে সক্ষম। মিথ্যা উত্তরের বিরোধিতা করতে পারে না কারণ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে এদের অস্তিত্ব : তারা এক নয়। মিথ্যার বিরোধিতা করতে পারে সত্য, উত্তরের বিভ্রম। ছায়াজগতের চৌহদ্দির মধ্যে সত্য ও ভুল বিরোধহীন অবস্থায় থাকতে পারে না। তাদের বিরোধের সমাধান করতে হলে প্রকৃত বস্তুজগতের সাহায্য নেওয়া অবশ্য প্রয়োজন। ছায়াজগতের চৌহদ্দির মধ্যে যে মতবিরোধ থাকে তা সত্য না ভুল এই বিষয়ে মতবিরোধ নয়, তা হল সংগতির বিষয়ে মতবিরোধ। এই জগৎকে ব্যবহার করার সবটাকে বস্তুগত বাস্তবের সঠিক ও সারসংক্ষিপ্ত প্রতিফলন হতে হবে ; কেবলমাত্র স্থির প্রতিফলন নয়, হতে হবে গতিশীল প্রতিফলন।

৩

কিন্তু এবার আরেকটি জগৎকে আমাদের সামনে নিয়ে আসতে হবে—এ জগৎটিও শব্দের অন্তরালে থাকে—অনুভূতির জগৎ—মহৎ। সেই চীৎকারটি যেমন কেবলমাত্র বহির্জগতের কিছুর সঙ্গে এবং ভীতিজনক কিছুর সঙ্গেই যে যুক্ত ছিল তাই নয়, অভ্যন্তরীণ কোনও অবস্থার সঙ্গে, ভীত সত্তার সঙ্গেও তা যুক্ত ছিল। সমস্ত শব্দও সেই রকম বহির্জগতের কোন সামগ্রীকে সূচিত করা ছাড়াও সেই সামগ্রীর প্রতি এক অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিভঙ্গীকেও অন্তর্ভুক্ত করে। হিংস্র পশু, প্রাণী, জন্তু, দেহধারী জীব—এই শব্দগুলির সকলেই সদৃশ বাস্তব সামগ্রীকে সূচিত করে, কিন্তু প্রত্যেকটিই এক ভিন্ন গোষ্ঠীর অনুভূতি-স্তরকে সূচিত করে।

প্রশ্ন করা যেতে পারে: অনুভূতি-স্তরের জন্য একটা শব্দ, বস্তুর জন্য আরেকটি শব্দ ব্যবহার করা হয় না কেন? তা তো ভাষার নমনীয়তাকে বাড়িয়ে দেয় এবং স্পষ্টতায় সাহায্য করে। এর উত্তর হল: অভিজ্ঞতার প্রকৃতি বা সম্ভাবনার মধ্যে তা নেই; কারণ অনুভূতি-স্তর আর বাস্তব বস্তুকে আলাদা করাটা হল বিমূর্তকরণ। বাস্তবে তারা এক—একই সক্রিয় বিষয়ী-বিষয় সম্পর্কের অংশ। সচেতন ক্ষেত্রকে আমরা বাস্তব (বা বিষয়গত) গুণ এবং আপাতঃ (বা বিষয়ীগত) গুণ এই ভাবে আলাদা করে থাকি কিন্তু সেই আলাদা করাটা কৃত্রিম।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, যান্ত্রিক বস্তুবাদ যেখান থেকে শুরু করেছিল তা হল এই: যে গুণগুলির মধ্যে দ্রষ্টা নিজে প্রবেশ করে না সেই গুণগুলিই কেবল বাস্তব। এইভাবে প্রথমে জগৎ থেকে বর্ণ, অনুভূতি, গন্ধ এবং উষ্ণতাকে বাদ দেওয়া হল, কারণ এগুলির যে একটা নিরপেক্ষ উপাদান আছে সেটা সহজেই দেখান যায়। এই স্তরকে আইনস্টাইন আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলেন। তিনি দেখালেন আকৃতি, ওজন, স্থায়িত্ব ও গতি দ্রষ্টার উপর নির্ভর করে। অতএব এগুলিকেও বাদ দেওয়া হল এবং অপরিবর্তনীয় [invariant] হিসাবে পড়ে রইল একমাত্র টেনসর [tensor]; কিন্তু কোয়ান্টাম মেকানিক্সের বিকাশ একেও অস্বীকার করল এবং একটা সম্ভাব্যতা "তরঙ্গ" (probability "wave") অর্থাৎ গাণিতিক ক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই অপরিবর্তনীয় রইল না। সুতরাং পূর্ণ বিষয়গত বাস্তবের সন্ধানে যেখানে আমরা পৌঁছলাম সেখানে রইল এক গোছা সমীকরণ—অর্থাৎ, চিন্তা। যান্ত্রিক বস্তুবাদ পৌঁছাল তার বিপরীতে—আত্মকেন্দ্রিকতাবাদে (solipcism)।

কিন্তু ভাববাদীদের কর্মসূচিও সমান সর্বনাশা। "যেসব সামগ্রীতে বস্তুগত কিছু নেই সে সবই হল মন", এই বিপরীত কর্মসূচি থেকে সুরু করে যেখানে গিয়ে সে পৌঁছায় সেখানে অনপেক্ষ ধারণা বা প্রত্যয় ছাড়া আর সব কিছুকেই তাকে বাদ দিতে হয়। কিন্তু মানুষের মস্তিষ্কে কোনও প্রত্যয় হল একটা "কোন বস্তু" ("something") এবং মানুষের মস্তিষ্ক হল বস্তু। এইভাবে বস্তুগত মানবমস্তিষ্ক ছাড়া ভাববাদীর আর কিছু রইল না। অথবা প্রত্যয়গুলি মানবমস্তিষ্কের উপর নির্ভর করে একথা যদি সে অস্বীকার করে তাহলে সে হল এক অনপেক্ষ ভাববাদী এবং তার জগৎ হল প্রকৃত সামগ্রী (Realthings) দ্বারা গঠিত, ধারণাগুলি মানুষ থেকে বিষয়গত ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে অস্তিত্বশীল।

যতক্ষণ অভিজ্ঞতার মূর্ত উদ্ভবকে—তার সক্রিয় বিষয়ী-বিষয় সম্পর্ককে, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রামকে—অস্বীকার করা হবে ততক্ষণ এই দ্বৈত লুকোচুরি অনিবার্য। কারণ প্রত্যেক নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতার মধ্যে একটা সদৃশ (Like) এবং একটা বিসদৃশ (Unlike) থাকে—অর্থাৎ, পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার মধ্যে কিছু জিনিস নির্দিষ্ট থাকে, কিছু অ-নির্দিষ্ট থাকে। যে জিনিসটার (somethings) ইতোমধ্যেই সাক্ষাৎ ঘটেছে সেটা হল বিষয়, আর যে জিনিসটা নতুন সেটা হল অভিজ্ঞতালাভ—যা এই বিষয়কে বা বিষয়ের সঙ্গে এই সাক্ষাৎকে অন্যগুলির থেকে পৃথক করতে আমাদের সক্ষম করে। উদাহরণস্বরূপ, একই গোলাপকে আমরা প্রত্যহ দেখতে পারি, কিন্তু দিনের "স্থাপনাটি" ["setting"] ভিন্ন হতে পারে এবং সেই কারণে গোলাপের প্রতি আমাদের প্রতিজ্ঞানও (attitude) ভিন্ন হবে। এই বিশেষ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সেই নতুনত্ব বা পার্থক্য যেটা তা হল গোলাপের প্রতি আমাদের বিষয়ীগত প্রতিজ্ঞান—সেই অভিজ্ঞতার "অনুভূতি-সুর"। অবশ্যই "বাইরের" (Out there) কিছু একটাও এক্ষেত্রে অবস্থান করে যেটাতে এই নতুনত্বের অনুভূতির হেতু পাওয়া যায়। আর আমাদের অভিজ্ঞতায়, তার বিষয়ীগত দিকটিতে "প্রত্যভিজ্ঞা"ও ["recognition"] থাকে, গোলাপকে ফুল বলে, একটি বিষয় বলে, একটা প্রকৃত কিছু জিনিস হিসাবে "প্রত্যভিজ্ঞা"।

সমস্ত অভিজ্ঞতার মধ্যেই এই "অনুভূতি-সুর" অন্তর্নিহিত: একদিকে বাস্তব রয়েছে, একদিকে সচেতন ক্ষেত্রের বিষয়গত পক্ষ (sector) রয়েছে, অপরদিকে রয়েছে তার প্রতি বিষয়ীগত প্রতিজ্ঞান। একটি হল "আমি"র ক্ষেত্র, অপরটি বিশ্বের ক্ষেত্র। একথা, আমরা বলতে পারি যে আমাদের অভিজ্ঞতার ফলে প্রত্যেক প্রকৃত বিষয়ের সঙ্গেই বিষয়ীগত অনুষঙ্গ যুক্ত থাকে,

কিন্তু অবশ্যই এই অনুষঙ্গগুলি যান্ত্রিকভাবে যুক্ত থাকে না, বরং তা স্থাপনাটির উপর নির্ভর করে—অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দু'ধরনের স্থাপনারই উপর নির্ভর করে। একটি স্থাপনার গোলাপের অন্য স্থাপনার গোলাপের থেকে ভিন্ন অনুষঙ্গ থাকে।

সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়ার (conditioned response) নিয়ম হল এর সর্বাধিক সামান্য (general) রূপ। নিয়মটি হল এই যে, প্রবহতাযুক্ত বাস্তব সহজ-প্রবৃত্তিগত প্রতিক্রিয়ার দ্বারা বর্গীকৃত হয় এবং এই বর্গগুলি অভিজ্ঞতা অনুযায়ী বিস্তারিতভাবে স্থানান্তরিত ও পরিবর্তিত হয়।

বহির্বাস্তবের এই সহজপ্রবৃত্তিগত বর্গীকরণের সরলতম রূপটি অবশ্যই সংখ্যাগত—গণিত। প্রকৃতি থেকে "আমি"কে যেটা পৃথক করে সেটাই হল আত্ম-সচেতনতার সব থেকে প্রাথমিক কৌশল এবং পৃথকীভবনের, ধারাবাহিকতাহীনতার এই প্রত্যভিজ্ঞাকে যখন বিষয়ের মধ্যে সহানুভূতির সঙ্গে প্রবিষ্ট করা হয় (introjected) তখন তা বহু জিনিসের প্রত্যয়কে সম্ভব করে তোলে। এইভাবে গণিত হল অভিজ্ঞতার সেই শৃঙ্খলাবিন্যাস যার মধ্যে বিষয়ীগত বিষয়বস্তু (content) এতই আদিম যে প্রায় নেই বললেই চলে। গণিত গুণবিবর্জিত একথা বলা সঠিক হবে না, কারণ ইতোমধ্যেই সংখ্যার গুণগুলির মধ্যে পার্থক্য—যা নিজেই "আমি" এবং অন্যের মধ্যে পার্থক্যের একটা প্রতিফলন—আমরা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু তা প্রায় গুণ-বিবর্জিত এবং সেই কারণে, আমরা যা ইতোমধ্যেই লক্ষ্য করেছি, গণিতের ভাষা সব থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রতীকধর্মী। কিন্তু 'যেহেতু' তা আত্মসচেতনতার সর্বাপেক্ষা মৌলিক অংশের উপর প্রতিষ্ঠিত সেইজন্যই তা সব থেকে কম বিষয়গত এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সর্বাপেক্ষা "আদর্শস্থানীয়" বলে মনে হয়।

যেহেতু অন্য সব ভাষাই, তা সে যতই কঠোরভাবে বিষয়গত ও প্রতীকধর্মী হোক না কেন, অপরিহার্যভাবে গুণের বিশেষগুলি নিয়ে ব্যবহার করে, যেহেতু প্রকৃতপক্ষে যে কোনও নির্দিষ্ট বিজ্ঞানের ক্ষেত্রই যে বিশেষ গুণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেগুলির দ্বারাই তার সংজ্ঞা দেওয়া হয়। সুতরাং অন্য সমস্ত ভাষাতেই অপরিহার্যভাবে বিভিন্ন পরিমাণের অনুভূতি-সুর বর্তমান—অভিজ্ঞতার সেই বিষয়ীগত সারবস্তু যা "গুণেরই" একটা অংশ বিভিন্ন পরিমাণে তা বর্তমান।

গুণকে একমাত্র বিষয়ীগতভাবেই উপলব্ধি করা যায় এবং সুনির্দিষ্ট করা যায়। কিন্তু যেই সেটা আর নতুন কিছু থাকে না এবং তা একটা সামাজিক ঘটনা হয়ে ওঠে, তখনই বিষয়গতভাবে তাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় এবং

পরিমাণের ক্ষেত্রে সেটা এসে পড়ে। এইভাবে একবার আমরা যদি নীল বর্ণকে সামাজিকভাবে চিনতে পারি তখনই একটা নির্দিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সঙ্গে তাকে সংশ্লিষ্ট করা যায় এবং সেটা একটা বিষয়গত ঘটনা হয়ে ওঠে। তখন তাকে বিষয়গতভাবে দেখা যেতে পারে। কিন্তু প্রথম আবির্ভাবের সময় সেটা যেমন আশ্চর্য ও অনুপম জিনিস ছিল তখন থেকে একটা মুখপত্রের উপর নিছক একটা সংখ্যা হিসাবে মিলিয়ে যাওয়া অবধি বিষয়ীগত দিকের কিছু উপাদান তাতে বজায় থাকে।

বিষয়ীগত অভিজ্ঞতা এই যে অধিকতর বিষয়গত ক্ষেত্রের দিকে সরে যায় এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অভিজ্ঞতার মধ্যে বিষয় থেকে—এবং সেইজন্য শব্দ থেকে—অনুভূতি-স্বরকে যে কখনই সম্পূর্ণ পৃথক করা যায় না এবং তা সত্ত্বেও কেবলমাত্র অনুভূতি বোঝানর জন্যই "ভীত", "ভয়" ইত্যাদির জন্য শব্দ কি করে থাকতে পারে সেটা আমরা এর থেকে বুঝতে পারি। কিন্তু "ভীতি" ও "ভয়" এক্ষেত্রে বিষয়গত বাস্তবকে সূচিত করে। মন অন্তর্দর্শন করতে পারে এবং তারপর অন্য মানুষকে লক্ষ্য করতে পারে যাতে করে তার অনুভূতিগুলি, সামাজিক জগতে প্রক্ষেপিত হয়ে বিষয়গত হয়ে ওঠে, তার ধ্যানের সামগ্রী হয়ে ওঠে। "ভীত" এই শব্দের দ্বারা সূচিত অভিজ্ঞতার মধ্যে সেটা বিষয়গত-ভাবে যে বিষয়ীগত অবস্থা সূচিত করে সেটাই পাই আবার লোক ভীত হয়েছে এই চিন্তার মধ্যে যে বিষয়ীগত অনুভূতি-স্বর থাকে সেটাও পাই।

এইভাবে অভিজ্ঞতা নিজের উপরেই জাল বুনে চলে, তার স্থাপনার দ্বারা সর্বদা রূপান্তরিত হয়, সর্বদাই নতুন নতুন স্বর ও ধাত্র [tones and complexes] সৃষ্টি করে এবং তা সত্ত্বেও শব্দের দ্বারা তা যতটা পরিমাণে সক্রিয় হয়ে ওঠে সেই পরিমাণে সর্বদাই বহির্বাস্তব ও অভ্যন্তরীণ অনুভূতির প্রতীক হয়ে ওঠে।

শব্দ যেমন বিষয়গত বাস্তবের একটা অংশকে সূচিত করে অর্থাৎ, তার ধারণার উদ্দীপক সেইরকম তা অনুভূতি স্বরেরও উদ্দীপক[১]। শব্দভাণ্ডারের সীমাবদ্ধতার কারণে কোনও নির্দিষ্ট শব্দ প্রকৃতপক্ষে বহির্জগতের সম্ভবপর

১। শব্দের আবেগোদ্দীপকগত তাৎপর্য ও যুক্তিভিত্তিক তাৎপর্যের মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে। হিন্দু দর্শনে "ধ্বন" ["dhvana"] বা শব্দের লুক্কায়িত অর্থকে কাব্যের বৈশিষ্ট্য বলে শিকার করা হয়েছে। দান্তে signum rationale এবং signum sensuale এর মধ্যে পার্থক্য করেছিলেন। সেটা আবার william of occam যে বিভাগ স্বীকার

সমস্ত শ্রেণীর, সামগ্রীর বা চলনের সমগ্র একটি ক্রমের সুপ্তশক্তিপূর্ণ উদ্দীপক—উদাহরণ স্বরূপ "সমুদ্র" শব্দটি। অন্য শব্দের সঙ্গে ব্যাকরণের দিক থেকে যুক্ত হলে অবশ্য এর অর্থগুলির একটা অংশমাত্র উপলব্ধি করা যায়—একে কেবল মাত্র সমুদ্র বা কোনও নির্দিষ্ট অবস্থায় সমুদ্রকে সূচিত করতে দেখা যায়। কোন শব্দের সম্ভবপর অনুভূতি—অনুষঙ্গগুলির ক্ষেত্রে এই একই নির্বাচন প্রযোজ্য, যার সবগুলিই যে কোনও নির্দিষ্ট কালে উৎপন্ন হয় তা নয়।

সর্বসম্মত প্রতীক সহ একটা সাধারণ প্রত্যক্ষ জগৎ আছে বলেই যে আমরা বহির্বাস্তব সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতার একটা অংশ অপরের কাছে আদান-প্রদান করতে পারি তা আমরা দেখেছি। একইভাবে, সর্বসম্মত প্রতীকসহ একটা সাধারণ অনুভূতির জগৎ আছে বলেই আমাদের অনুভূতিগুলিও আমরা অপরের কাছে আদানপ্রদান করতে পারি। এই সাধারণ প্রত্যক্ষ জগৎটি "প্রকৃত" জগৎ বা সমাজের চেতনার মধ্যে প্রতিফলিত সত্য ছাড়া অন্য কিছু নয়। তাহলে সাধারণ আবেগোদ্দীপকগত জগৎটা কি? এই সাধারণ আবেগোদ্দীপকগত জগৎটি মানুষ তার সামাজিক অভিজ্ঞতার ফলে যে "আমি"কে গড়ে তোলে সেটি ছাড়া অন্য কিছু নয়।

সবিচার ভাববাদী [critical idealist] বা তার বিপরীতে ব্যবহার-বাদীদের দুজনদেরই উভয়সংকট আমরা জানি। বস্তু নিজেই যে কি রকম তা সবিচার ভাববাদীরা জানতে পারে না আর সেইজন্য বস্তুকে তারা অস্বীকার করে। অন্য মানুষেরা নিজেদের কাছে কি রকম তা ব্যবহারবাদী জানতে পারে না, আর সেইজন্য সে চেতনাকে অস্বীকার করে। প্রয়োগের সাহায্যে ভাববাদীকে খণ্ডন করা যায়। এটা দেখান যায় যে বস্তুর উপর কোনও নির্দিষ্ট ক্রিয়া সম্পাদন করলে নির্দিষ্ট প্রতিভাসকে বস্তু প্রকাশ করে এবং পরিবর্তনের এই সমস্ত সম্ভাবনাগুলিকে যখন জানা যায় তখন সবস্তু (thing-in-itself) যা হয়ে ওঠে বস্তু-আমাদের কাছে যা [thing-for-us]। একই ভাবে প্রয়োগের সাহায্যে ব্যবহারবাদীকেও খণ্ডন করা যায়, সঙ্গী মানুষদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের মত তাদেরও সহজপ্রবৃত্তি-

---

করতেন তার উপর প্রতিষ্ঠিত। সরল, ইন্দ্রিয়ানুভূতিমূলক এবং অতিরাগ-সম্পন্ন বলে মিলটনের দেওয়া কাব্যের সুপরিচিত সংজ্ঞাটি যে এই ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। শব্দের অর্থ সম্পর্কে Ogden এবং Richards এর যে বিশ্লেষণ সেটাও শব্দের প্রতীকী ও আবেগগত অর্থের মধ্য-কার পার্থক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

মূলক প্রেষণা [instinctual drives] আছে এবং তা যে একই ধরনের ক্রিয়ার রূপ নেয় তা ধরে নিই এবং সহানুভূতির সঙ্গে তাদের মধ্যে "নিজেদের অনুভব করি" যাতে করে তাদের নিজেদের সম্বন্ধে সচেতনতা আমাদের কাছে ব্যবহার [behaviour-for-us] হয়ে ওঠে।

সংঘবদ্ধ মানুষের সাধারণ জীবন—যা একজন ব্যক্তির জীবনের অভিজ্ঞতার থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী বহির্বাস্তবের সঙ্গে আদানপ্রদানের সমগ্র পর্যায়টি প্রতীকীভাবে সংক্ষিপ্ত করেছে এবং সেইভাবে এই আদানপ্রদানগুলি প্রত্যেকেই ব্যবহার করতে পারেন এবং তাদের পরিচিত বিশ্বকে গড়ে তোলেন। একইভাবে সংঘবদ্ধ মানুষ আবেগোদ্দীপকগত অভিজ্ঞতার এক বিপুল ভাণ্ডার জমিয়ে তুলেছে যেগুলিকে এইভাবে সে সহজেই ব্যবহার করতে পারে এবং সাধারণ অহং [common ego] বা মন [mind] গড়ে তোলে।[১]

এদিকে বহির্বাস্তব সম্পর্কে একজন সভ্য মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী [view] প্রায় সবটাই গড়া সাধারণ প্রত্যক্ষ জগৎ দিয়ে: সূর্যকে একটা জলন্ত নক্ষত্র, গরুকে প্রাণী, লোহকে ধাতু হিসাবে সে দেখে থাকে। ভাষার অসাধারণ ক্ষমতা ও বিশ্বজনীনতা একে সুনিশ্চিত করে। কিন্তু এটাও ঠিক যে সূর্য, লোহ, গরু ইত্যাদির সম্পর্কে তার সমগ্র আবেগগত চেতনা, তার সমগ্র অনুভূতি প্রতিন্যাস [feeling-attitude] যে সাধারণ অহং মানুষ হিসাবে মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত হয়ে বসবাস করতে আমাদের সক্ষম করে তোলে সেই সাধারণ অহং থেকেই তার প্রায় সবটা গঠিত।

১। বেশর ভাগ দার্শনিক ও মনোবিদ এই শব্দটিকে এমন বিভ্রান্তিপূর্ণ-ভাবে ব্যবহার করেছেন যে "মন" শব্দটিকে ব্যবহার করতে দ্বিধা হয়। gestalt মনোবিজ্ঞানে এই শব্দটির ব্যবহারের ক্ষেত্রেই সম্ভবতঃ এই শব্দটির সর্বাধিক সুসংগতিপূর্ণ ব্যবহার ঘটেছে। যে কোনও সচেতন ক্ষেত্রের মধ্যে ইন্দ্রিয়জ বা বিষয়ীগত মেরুর সর্বাধিক ঘনিষ্ঠভাবে সংলগ্ন উপাদানগুলি নিয়ে মন গঠিত। ভাববাদী দার্শনিকেরা মন শব্দটিকে আরও শিথিলভাবে ব্যবহার করেন। সমগ্র প্রতিভাসকেই মানসিক বলে গণ্য করা হয় কারণ সেগুলি সচেতন ক্ষেত্রের অংশ গড়ে তোলে এবং যেহেতু সমস্ত বিষয় কেবল মাত্র প্রতিভাস হিসাবেই জানা যায়, সমস্ত বিষয়কেই মানসিক বলে গণ্য করা হয়। এইভাবে ভাববাদী বাস্তবকে "মন" এ পর্যবসিত করেন এবং যেহেতু তিনি প্রতিভাসকে তাঁর সচেতন ক্ষেত্রের [conscious field] অংশ হিসাবে জানেন অতএব বাস্তব হল কেবলমাত্র "তাঁর মনটিই"

একথা পুনরায় জোর দিয়ে বলতে হয় যে, সাধারণ প্রত্যক্ষ জগৎ বা সাধারণ অহং কোনটাই মানুষকে একটা সর্বজন স্বীকৃত মান অনুসারে [in a standardised way] চিন্তা করতে বা অনুভব করতে বাধ্য করায় না। বরং বিপরীতভাবে, এইগুলিই সেই উপায় যার দ্বারা মানুষ নিজের ব্যক্তিগত পার্থক্যগুলিকে বাস্তব রূপ দিতে পারে। একটি পশু প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত পশুদের সকলের কাছে জগৎটা প্রায় একই রকম মনে হয় কারণ সেটা খুবই সরল এক জগৎ: সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে তাদের জীবন খুব একটা পৃথক ধরনের নয়। উচ্চ পর্যায়ের সভ্য সমাজে যে মানুষ জন্ম গ্রহণ করেছে তার কাছে জগৎটা এতই জটিল ও বিস্তারিত যে তার জীবনটা অনুপম হতে পারে—তার জনিগত ব্যক্তিসত্তাকে সম্পূর্ণ বাস্তব রূপায়নযোগ্য করা যায়। একই ভাবে, একই প্রজাতির পশুদের আবেগগত জীবন একই ধরনের: তাদের আবেগগত জগৎ এতই সরল। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে শিল্পকলা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা সামাজিক অহং এত সূক্ষ্ম ও মার্জিত হয়েছে যে তার চৌহদ্দির মধ্যে এক জন ব্যক্তি তার আবেগগত বৈশিষ্ট্যগুলিকে বাস্তব রূপ দিতে পারে।

পশুর কাছে সূর্যাস্তের কোন মূল্যই নেই, আমাদের কাছে এর যা মূল্য শিল্প তা সৃষ্টি করেছে। শব্দ যখন আমাদের মধ্যে একটা অনুভূতি-সুর জাগায় তখন সেটা আমরা পাই সামাজিক অহং থেকে; না হলে মাত্র একটা ধ্বনি কি করে, পিয়ানোতে বাজানো একটা সুরের মত, সামাজিকভাবে স্বীকৃত মূল্যের মানক [scale of values] থেকে বেছে নেওয়া সেই অনুযায়ী এক আবেগগত অনুরণন জাগাতে পারে?

যেহেতু জটিল সামাজিক জগৎ ও সামাজিক অহং ব্যক্তিসত্তাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার সম্ভাবনাগুলিকে এই রকম সুযোগ দেয় সেই কারণেই সমাজ ব্যক্তি-সত্তাকে রুদ্ধশ্বাস করছে এই অভিযোগ আমরা আধুনিক সভ্যতায় এত বেশি শুনতে পাই। অসভ্য সমাজে এ ধরনের কোনও অভিযোগ নেই কারণ স্বাধীনতার সম্ভাবনা তাতে তখনও থাকে না। মানুষ সেখানে খুবই সরল ও গণ্ডীবদ্ধ। উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশ সামাজিক জগতে এবং সামাজিক অহং-এর ক্ষেত্রে বিকাশের ফলে যখন আয়ত্ত করা গেছে যাতে করে আত্ম-বাস্তবায়নের অকল্পনীয় সম্ভাবনা মানুষের কাছে তুলে ধরেছে অথচ উৎপাদন সম্পর্কগুলির দ্বারা এই শক্তিগুলির সদ্ব্যবহার স্পষ্টতঃই রুদ্ধগতি হয়, তখন সমৃদ্ধ চেতনার জগতে "আবেগগত উপবাস" ও "ব্যক্তিত্বের পঙ্গুত্বপ্রাপ্তির" বিরুদ্ধে চারদিক থেকে প্রতিবাদ উঠতে থাকে; প্রাচুর্যের জগতে যেমন অপুষ্টি

ও বেকারত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এই অভিযোগগুলি যেমনি মস্তার্থগত ক্ষেত্রে তার পরিপূরক প্রতিবাদ। এগুলি হল আধুনিক সমাজের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান প্রতিবাদের অংশ। এগুলি হল বিপ্লবের আহ্বায়ক।

(৪)

আমরা দেখেছি যে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে বিষয় বা বিষয়ী, বস্তু বা মন, কোনটাই কখনও সম্পূর্ণ "বিশুদ্ধ" থাকে না এবং এই "অ-বিশুদ্ধতা" ভাষার মধ্যে প্রতিফলিত হয়। সেইজন্য সাধারণ জগৎ এবং সাধারণ অহং আলাদা বিরাজ ক'রে না, তারা পরস্পরের মধ্যে ভেদ করে। শব্দের মধ্যে সর্বদাই কোনও একটা নির্দিষ্ট বাস্তবের প্রতি কোনও একটা নির্দিষ্ট বিষয়ীগত প্রতিন্যাস নির্দিষ্ট থাকে। বিজ্ঞান বিষয়গত বাস্তবের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বলে বিষয়ীকে যতদূর সম্ভব বাদ দিতে বা দূর করার উদ্দেশ্যে শব্দকে ব্যবহার করে: শিল্প সেটা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তাকে ব্যবহার করে।

সমস্ত অভিজ্ঞতাই সংগঠিত ও বাস্তব। প্রতিভাসের মাত্র অস্ফুট আভাষ যে থাকে তা নয়, বরং জিনিসগুলি একটা প্রকৃত স্থানিক জগতে স্পষ্টভাবে নিজেদের পৃথক করে তোলে। একইভাবে অনুভূতিগুলিও সংগঠিত হয়, অহং-এর মধ্যে সেগুলি একটা নির্দিষ্ট 'বন্দুতে এসে মিলিত হয়, তাদের স্থায়িত্ব থাকে এবং তারা বিকিরিত হয় এবং তাদের ব্যাপক নোদনা ও সমসত্ত্ব [drives and homogeneity] থাকে।

সেইজন্যই শব্দগুলিকে এলোমেলোভাবে মিশিয়ে জগাখিচুড়ি করা যায় না। সেগুলি সংগঠিত হওয়া প্রয়োজন: একটা প্রকৃত কিছুকে, বিশেষ একটা অংশকে প্রকাশ করা আবশ্যক- এবং তার প্রতি একটা প্রকৃত প্রতি-ন্যাসকে—অহং-এর একটা অংশকে প্রকাশ করা আবশ্যক।

কোনও বিজ্ঞানসম্মত উক্তি যখন আমরা করি তখন যে জিনিসগুলিকে লক্ষ্য করা যায়—লক্ষ্য করা যায় এমন শৃঙ্খলাবিন্যাস-ক্রিয়া, লক্ষ্য করা যায় এমন বর্ণ, ক্রিয়া ইত্যাদি [observable operations of ordering, observable colours, actions and the like]—সেগুলির সম্বন্ধে আমরা সেই উক্তি করি। আমরা সর্বদাই অঙ্গীকার করে নিই যে "কেউ একজন" এই শৃঙ্খলাবিন্যাস ও গণনার কাজটি করছে। এই অঙ্গীকারটি এতই অন্তর্নিহিত ও সাদাসিধা ধরনের যে বিজ্ঞানীরা সব সময় এটা উপলব্ধিও করেন না যে তাঁরা এই অঙ্গীকার করে নিয়েছেন এবং তাঁরা প্রতিটি জিনিসকেই তা একজন দ্রষ্টার সঙ্গে যুক্ত হিসাবে উল্লেখ করেন। যদি প্রশ্ন করা হয় তাহলে তাঁরা জবাব

দেবেন যে এই দ্রষ্টা হলেন যে কোন "সঠিকভাবে চিন্তাকরেন এমন ব্যক্তি" ["right-thinking person"] এবং এটা তাঁরা একবারও ব্যাখ্যা করেন না যে এই বিভ্রান্তিকর বিপুল অভিজ্ঞতারাশির মধ্যে থেকেও কোন "সঠিকভাবে চিন্তাকরেন এমন ব্যক্তি" সেগুলির প্রতি এমন নিরপেক্ষ, এমন প্রশংসনীয় বিচারের মনোভাব বজায় রাখতে পারেন। এই উক্ত দ্রষ্টাকে একটা কাঠামো-মঞ্চ মাত্র [scaffolding] এবং প্রয়োজন হলে এই মঞ্চটিকেও সহজেই সরিয়ে দেওয়া যায় এবং তাতে ইমারতটির কোন তারতম্য ঘটবে না, এইরকম মনে করার প্রবণতা বিজ্ঞানীদের মধ্যে দেখা দিয়েছে। কিন্তু পদার্থবিদ্যার আধুনিকতম বিকাশ[১] এটাই দেখিয়ে দিয়েছে যে এই মঞ্চটাকে যদি সরিয়ে দেওয়া যায় তাহলে কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। ইমারতটা নিজের অবলম্বনের জন্য এই কাঠামো মঞ্চটির উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। বিজ্ঞানের এই অদ্ভুত বিশ্বব্যাপী "কৃত্রিম অহং"টি [Mock Ego] বিভ্রমাত্মক অথচ অথচ অপরিহার্য: বিজ্ঞানের দ্বারা বাস্তবের যা কিছুকে প্রতীকায়িত করে তা এই "দ্রষ্টার" সঙ্গে সংযুক্ত। একমাত্র গণিতই এই "দ্রষ্টাকে" এড়াতে পেরেছে বলে মনে হয়। সেটাও, আমরা যেমন লক্ষ্য করেছি, এই কারণেই মাত্র যে বহির্বাস্তব থেকে মানব মস্তিষ্কের মধ্যে তা পলায়ন করেছে এবং কৃত্রিম অহং-এর ব্যক্তিত্বের একটা সংযোজন মাত্র হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞানীরা অবশ্যই এই কৃত্রিম অহংকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন না। তাকে একটা বিমূর্তন [abstraction] হিসাবে দেখা হয়। তার পারিবারিক জীবন বা সপ সম্পর্কে কোনও আগ্রহ বিজ্ঞানীদের নেই।

ঠিক একইভাবে কাব্য —বা সাধারণভাবে সাহিত্যশিল্প—যখন সামাজিক অহংকে "প্রতীকায়িত" করতে চায় আবেগোদ্দীপকগত প্রতিন্যাসকে সংগঠিতভাবে বহন করতে চায়, তখনও তা বাস্তব সম্পর্কে কিছু উক্তি করতে বাধ্য। বাস্তব জীবনে আবেগগুলিকে কেবল মাত্র বাস্তবের কয়েকটি খণ্ডের সঙ্গেই জড়িত দেখা যায়, সেইজন্য আবেগগত প্রতিন্যাস জাগাতে হলে বাস্তবের খণ্ডগুলিকে—উপরন্তু সংগঠিত খণ্ডগুলিকে সর্বদাই উপস্থাপিত করতে হয়। কিন্তু অন্তর্নিহিত আবেগগত প্রতিন্যাসকে প্রকাশ করার জন্য নির্বাচিত বাস্তবের সম্পর্কে উক্তিটি বস্তুগত বাস্তব সম্পর্কে হতেই হবে এটা মনে করার কারণ নেই, যেমন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কৃত্রিম অহংকে বাস্তব মানুষ

১। বিশেষ করে Heisenberg এর Principle of Indeterminacy এবং Quantum physics এর সঙ্গে relativity physics এর কথা।

হতেই হবে তা মনে করার কারণ নেই। এটা একটা কৃত্রিম জগৎ, একটা বিভ্রম, যেটাকে সেইভাবেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, অনেক পথ ঘুরে আমরা সেই বিভ্রম, সেই মিমেসিস এই—যে মিমেসিস হল সাহিত্যশিল্পের সারবস্তু, তার রহস্য, তার পদ্ধতি সেই mimesis-এই এসে পৌছলাম।

বিজ্ঞানের এই কৃত্রিম অহং এবং শিল্পের এই কৃত্রিম জগৎ দুই-ই প্রয়োজনীয় কারণ অভিজ্ঞতার মধ্যে বিষয়ী ও বিষয় দুই-ই কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না, বরং তারা এক বিরামবিহীন সংগ্রামের দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। স্বরুতে এক শ্রমবিভাগের দ্বারা পুরাণ থেকে বিজ্ঞান ও শিল্প পৃথক হয়ে গিয়েছিল যাতে করে দুটিরই আরও ভালভাবে বিকাশ ঘটে, এখনও সেই পৃথক হওয়ার স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে নরওয়েজীয় trolls এর যেমন পিছন দিকটা ফাঁপা থাকে সেইরকম বিজ্ঞান ও শিল্প দুই-ই এক ধরনের ক্ষতচিহ্ন বা অন্ধ দিক বহন করছে : এই শূণ্যতা বা অন্ধ দিকটি হল বিজ্ঞানের কৃত্রিম অহং আর শিল্পের কৃত্রিম জগৎ। প্লেতোর সিম্পোসিয়ামে উল্লেখিত 'আরিস্তফানেস'এর কাহিনীতে যেমন আছে যে এক মূল উভলিঙ্গ ব্যক্তিকে ভাগ করে যে দুটি অর্ধাংশ পাওয়া গেল সেই অর্ধাংশ দুটি পরস্পরের পরিপূরক অংশকে আরও বেশি করে পেতে চায়, বিজ্ঞান ও শিল্প সেইরকম দুটি অর্ধাংশ। কিন্তু বিজ্ঞান ও শিল্প এই দুটিকে জোড়া দিলে তা' সম্পূর্ণ মূর্ত জগৎ গড়ে তোলে না। তারা এক সম্পূর্ণরূপে ফাঁপা জগৎ—এক বিমূর্ত জগৎ গড়ে তোলে—যে বিমূর্ত জগৎটি মূর্ত মানুষের যে মূর্ত জীবনধারণ থেকে তারা উৎপন্ন সেই মূর্ত মানুষের মূর্ত জীবনধারণকে তার অন্তর্ভুক্ত করেই মাত্র দৃঢ় ও জীবন্ত হয়ে ওঠে।

তাহলে বিজ্ঞান ও শিল্পের উদ্দেশ্য, তার সামাজিক ক্রিয়াটি কি? এই কৃত্রিম জগৎ এবং এই কৃত্রিম মানুষের উপর ভিত্তি করে কেন তাহলে বাস্তবের একটা নিষ্প্রাণ কিন্তু সত্য চিত্রণ গড়ে তোলা হয় এবং মানুষের নিজের চেহারায় এক অলীককল্পনাময় কিন্তু আবেগপূর্ণ প্রতিফলন গড়ে তোলা হয়?

দুটিই সামাজিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে সৃষ্ট হয় : এগুলি সামাজিক উৎপন্ন, এবং সামাজিক উৎপন্ন বস্তুগতই হোক আর মতাদর্শগতই হোক তার একটাই লক্ষ্য থাকে, তা হল স্বাধীনতা। প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে মানুষ যা সন্ধান করে তা হল স্বাধীনতা। যেহেতু ক্রিয়া [action] ভিন্ন অন্য কোনও উপায়ে এই স্বাধীনতা অর্জন করা যায় না সেইজন্য এটা কেবলমাত্র ধ্যানের স্বাধীনতা নয়। এটা লাভ করতে হলে একজন মানুষ নিজের মধ্যে „নিজ ইচ্ছামত চলা যাক" ["let himself go"] এইটুকুই মাত্র যে স্থাপিত করে

তা নয়। শিল্পের স্বতস্ফূর্ততা যেমন শ্রমসাধ্য ক্রিয়ারই ফল, সেই রকম স্বাধীনতারও মূল্য চিরসতর্কতা নয়, তা হল চির শ্রম। বিজ্ঞান ও শিল্প হল ক্রিয়ার পথনির্দেশক।

(১) বিজ্ঞান বহির্বাস্তব সম্পর্কে এক গভীরতর, জটিলতর অন্তর্দৃষ্টি ব্যক্তির হাতে তুলে দেয়। বিজ্ঞান এমনভাবে তার চেতনার প্রত্যক্ষগত বিষয়বস্তুকে রূপান্তরিত করে যাতে সে এমন এক জগতে বিচরণ করতে পারে যেটা সে আরও স্পষ্টভাবে, আরও ব্যাপকভাবে বুঝতে পারে; এবং বাস্তবকে এই ভেদ করা তার নিষ্প্রাণ পরিবেশকে অতিক্রম করে বিষয়গতভাবে বিবেচিত মানুষ পর্যন্ত প্রসারিত করে তোলে অর্থাৎ, মানুষকে তার ক্রিয়ার বিষয়, তার হাতুড়ির নেয়াই করে তোলে। যেহেতু সংঘবদ্ধ মানুষের দ্বারাই মাত্র এই বর্ধিত ও জটিল জগৎকে উন্মুক্ত করা যায়—একজন ব্যক্তির পক্ষে যা সাধ্যাতীত -তা হল অতএব সামাজিক বাস্তব, সমস্ত মানুষের এক সাধারণ জগৎ। অতএব এই জগৎকে বর্ধিত করাটা সংঘবদ্ধ মানুষকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত করাকে সম্ভব করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির স্বাধীনতাকেও প্রসারিত করে। এ হল বহির্বাস্তবের প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতনতা।

(২) শিল্পের এই অন্য জগৎটি, অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত সংগঠিত আবেগের জগৎটি, বা সামাজিক অহংএর সেই জগৎটি যা সব কিছু সহ্য করে এবং সব কিছু উপভোগ করে এবং তার অভিজ্ঞতার দ্বারা সব কিছুকে সংগঠিত করে। শিল্পের এই অন্য জগৎ ব্যক্তির কাছে অভ্যন্তরীণ অনুভূতি ও আকাঙ্ক্ষার এক নতুন সম্পূর্ণ বিশ্বকে তুলে ধরে। শিল্পের জগৎ সহজপ্রবৃত্তি ও "হৃদয়" নিজ অভিজ্ঞতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার বিভিন্ন পথকে উদ্ঘাটিত করে সহজ-প্রবৃত্তি ও "হৃদয়ের" সীমাহীন অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে প্রকাশ করে।

তারের যন্ত্রে যেমন হয় সেইভাবে আবেগের অভ্যন্তরীণ জগতের উপর শিল্পের জগৎ স্পন্দন তোলে। মানুষের চেতনার আবেগগত বিষয়বস্তুকে এমনভাবে পরিবর্তিত করে যে জগতের সঙ্গে তার আরও সূক্ষ্মভাবে এবং আরও গভীরভাবে প্রতিক্রিয়া ঘটে। মানুষ যেহেতু অভ্যন্তরীণ বাস্তবের এই ভেদনকে [penetration] সংঘবদ্ধভাবে অর্জন করে এবং তার জটিলতা এমনই যে একজন ব্যক্তির পক্ষে তা আয়ত্ত করা সম্ভব নয়, সেই কারণে তার সহযাত্রী মানুষদের হৃদয়কেও তা উদ্ঘাটিত করে এবং সমাজের সমগ্র সম্প্রদায়গত অনুভূতিকে জটিলতার এক নতুন স্তরে উন্নীত করে, অর্থনৈতিক উৎপাদনের দ্বারা অর্জিত বস্তুগত সংগঠনের নতুন স্তরের উপযোগী মানুষে মানুষে সচেতন

সহানুভূতি, সমঝোতা ও স্নেহপ্রীতির নতুন স্তর গড়ে ওঠা সম্ভব করে। উপজাতির নৃত্যের ছান্দিক অন্তর্মুখীনতায় [introversiou] যেমন প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী সঙ্গীদের সঙ্গে একযোগে একটা প্রত্যক্ষ জগৎ নয়, বরং একটা সহজপ্রবৃত্তি ও হৃদয়ের উত্তাপসমন্বিত [blood-worm] ছন্দের জগতের অংশীদার হওয়ার জন্য নিজের হৃদয়ের গভীরে চলে যায়, নিজের সহজপ্রবৃত্তির উৎসে গিয়ে পৌঁছায়, সেইরকম বর্তমানে শিল্পের সহজপ্রবৃত্তিগত অহং হল সাধারণ মানুষ যার মধ্যে আমাদের সঙ্গীদের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপনের উদ্দেশ্যে আমরা প্রবেশ করি। শিল্প হল প্রয়োজন সম্পর্কে সহজপ্রবৃত্তির সচেতনতা।

(৩) শিল্প যে বিজ্ঞানের থেকে বেশি কোনও প্রচার নয় একথা বোঝার দরকার। তার অর্থ এই নয় যে এদের কোনটিরই কোনও সামাজিক ভূমিকা পালন করার নেই। বরং বিপরীত, তাদের ভূমিকা হল সেই ধরনের ভূমিকা যা বলতে গেলে প্রচারের থেকে আরও প্রাথমিক এবং আরও বেশি মৌলিক ভূমিকা: তা হল মানুষের মনকে পরিবর্তন করার ভূমিকা। মানুষের মনকে এরা বিশেষ একভাবে পরিবর্তিত করে। উদাহরণ হিসাবে বিজ্ঞান যেভাবে বহির্বাস্তব সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীকে পরিবর্তিত করে তার একটা চরম দৃষ্টান্ত দেখা যাক। একটা গাণিতিক উপপত্তির [mathematical demonstration] কথাই ধরা যাক। সেটা যে আমাদের প্রত্যয় উৎপাদন করে তা বলা যায় না। একটা গাণিতিক উপপত্তি হয় সত্য না হয় মিথ্যা বলে দেখায়: যদি সেটা সত্য হয় তাহলে তা বহির্বাস্তবের একটা বাড়তি অংশ হিসাবে আমাদের মনে নিজেকে প্রবেশ করায়। যদি সেটা মিথ্যা হয়, তাহলে আমরা সেটাকে নিছক বাগাড়ম্বর বলে বর্জন করি। কিন্তু যদি আমরা সেটাকে স্বীকার করে নিই, তাহলে আমাদের সামনে একটা বাড়ি দাঁড়িয়ে থাকলে তার "সত্যতা" সম্পর্কে আমরা যতটা প্রত্যয়ান্বিত হই এটার সত্যতা সম্পর্কেও তার থেকে বেশি কিছু প্রত্যয়ান্বিত হই না। আমরা সেটাকে স্বীকার করে নিই না: আমরা সেটা দেখি। [See it]।

একই রকমভাবে, শিল্পের ক্ষেত্রে, Hamlet এর বিভ্রান্তি বা Prufrok এর জগৎ সম্পর্কে নিদারুণ ক্লান্তিবোধের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রত্যয়ান্বিত হই না, Elsinore এর বা প্রুস্তের madeline cake এর অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রত্যয়ান্বিত হই না। কবিতা বা নাটক বা উপন্যাসের সমগ্র অনুভূতি ধারটা আমাদের বিষয়ীগত জগতে প্রবিষ্ট করা হয়। এই এই জিনিসকে বা অমুক অমুক মানুষকে আমরা অনুভব করি। তাদের সত্যতা সম্পর্কে দাঁতের যন্ত্রণার

সত্যতা থেকে বেশি কিছু সম্পর্কে আমরা প্রত্যয়ান্বিত হই না: কিন্তু যাকে আমরা সুন্দর [Beauty] বলি সেই ইন্দ্রিয়ানুভূতির তীক্ষ্ণতা যারা আবেগগত ছক'এর সুস্পষ্টতা বা সামাজিক সর্বজনীনতা সূচিত হয়। সংগীত থেকে এর আরও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

সত্য বা সুন্দর হল ক্রিয়ার পথনির্দেশক। ঠিক সেই কারণেই এর কোনটিই প্রত্যয় উৎপাদন নয়। প্রত্যয় উৎপাদনকে পথনির্দেশক হলে চলবে না, তাকে হতে হবে ক্রিয়ার প্রতি একটা প্রত্যয় উৎপাদন, [a persuation to action], ভিন্নভাবে কিছু হয়ে ওঠা বা কিছু করার জন্য একটা চাপ হতে হবে তাকে। প্রকৃতপক্ষে, বিজ্ঞান আর শিল্প হল ভাষার দুই বপরীত মেরু এবং ভাষার প্রধান ক্রিয়া [main function] **প্রত্যয় উৎপাদনের** ভূমিকা পালন করা। এই মেরুগুলি সে কেবলমাত্র সৃষ্টি করেছে জীবনের অগ্রগতির পরিশীলন হিসাবে তার শানিত বর্শাকাগ্র [tempered spearheads] হিসাবে। শিল্প ও বিজ্ঞান হল সেই প্রত্যয় উৎপাদন যে প্রত্যয় উৎপাদন এমন বিশেষীকৃত হয়ে উঠেছে যে আর তা প্রত্যয় উৎপাদন থাকছে না, ঠিক যেমন ফুলের পাপড়ির ক্ষেত্রে পত্রগুলি এমন বিশেষীকৃত হয়ে উঠেছে যে সেগুলি আর পত্রের ক্রিয়া পূর্ণ করছে না।

ভাষা দৈনন্দিন জীবন থেকে তার প্রাণরস শোষণ করে এবং দৈনন্দিন জীবনে যে সব কথোপকথন বিষয়গতভাবে দেখা বহির্বাস্তব সম্পর্কে (যেমন বিষয়গতভাবে দেখা ঘটনা বা বক্তার অনুভূতি সম্পর্কে) বা অভ্যন্তরীণ বাস্তব সম্পর্কে (যেমন স্বরাঘাত, ক্রোধ বা সন্তোষের "স্বর", কথের ভঙ্গী, ঘুরিয়ে বলা, আদর বা মার্জিত বা কাটাকাটা, বা বিস্ময়-উৎপাদক বা সাদর শব্দগুচ্ছ) কোনও তথ্য দেয় না, সেগুলি আবিস্কৃতলীন অর্থে rhetorical বা আলংকারিক, অর্থাৎ, অন্যকে একটা নির্দিষ্টভাবে কিছু করতে বা একটা নির্দিষ্টভাবে কিছু অনুভব করতে প্রত্যয় উৎপাদন করার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত।

এখন বিজ্ঞান ও শিল্পের সঙ্গে ছন্দের যে সম্পর্ক তা হল এই যে, বহির্বাস্তব ব সহজপ্রবৃত্তির উপর ক্রিয়ার পথনির্দেশক তা নয়, বরং সর্বদাই তা মিশ্রিত বা counterpointed। এইভাবে কোনও নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কিছু করার জন্য একজন মানুষের যখন ইতোমধ্যে কোনও সহজপ্রবৃত্তিগত তাগিদ থাকে, তখন বহির্বাস্তবের প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করার জন্য এমনভাবে পরিচালিত প্রত্যয় উৎপাদন হয় যে, সেই বিশেষ কাজগুলি যেগুলি করতে আমরা তার প্রত্যয় উৎপাদন করতে চাই সেগুলি করার প্রয়োজন সে দেখতে পায়। অপরপক্ষে

পরিস্থিতি যদি সরাসরি ক্রিয়াকে সূচিত করে, আমাদের প্রত্যয় উৎপাদন তখন সেই ক্রিয়াটি পূর্ণ করার জন্ত আবেগগত তাগিদকে জাগিয়ে তোলার দিকে পরিচালিত হয়। এইভাবে একটা বিপরীত ধরনের শব্দ ব্যবহার দেখা যায় : আবেগগত কারণের জন্ত বিষয়গত উক্তি, আর বিষয়গত কারণের জন্ত আবেগগত উক্তি ব্যবহার করা হয়, কিন্তু সাধারণভাবে এই দুটিই মিশ্রিত করা হয়।

শব্দালংকার বা প্রত্যয় উৎপাদন হল ভাষার বিশ্বজনীন রীতি যার সাহায্যে মানুষ পরস্পরকে একদিকে তাদের করণীয় কাজের প্রয়োজনীয়তার দিকে অন্যদিকে সহজপ্রবৃত্তির দাবির কাছে স্বাধীনভাবে পথ দেখায় এবং পরিচালিত করে। শব্দালংকারের মূল ও বহির্বাস্তব এবং জেনোটাইপের মধ্যে প্রোথিত এবং যেহেতু তা আরও বেশি সরাসরি, জরুরী ও গল্পধর্মী সেইজন্য সেটা আরও বেশি আদিম ও দৈনন্দিন। সংবদ্ধতার উপকরণ হিসাবে ভাষার টানা-পোড়েন থেকেই বিজ্ঞান ও শিল্প যে আরও বেশি বেশি বিশেষীকৃত, বেশি বেশি সংগঠিত, বেশি বেশি নিষ্পৃহ, বেশি বেশি বিমূর্ত ও তাদের নিজ নিজ বিশেষীকৃত ক্ষেত্রে আরও বেশি বেশি বাস্তব ও বিশ্বাসজনক করে নিজেদের পৃথক করে তোলে তার কারণই হল এই যে তারা ঐ অবাস্তব ও বিভ্রমাত্মক কাঠামো-মঞ্চ [scaffolding], নকল-অহং এবং নকল জগৎকে ব্যবহার করে।

প্রত্যয় উৎপাদন যে বিপথে চালিত করতে পারে, শব্দালংকার যে শূন্যগর্ভ ও ভণ্ডামিপূর্ণ হতে পারে একথা বলাও বা আর অন্যভাবে সেই পুরাতন কথা—সত্য ও মিথ্যা দুইই আছে আর মানুষ ভুল করে থাকে—এই কথাও তাই। প্রত্যয় উৎপাদন তাই বলে নাকচ হয়ে যায় না। বিজ্ঞান মিথ্যা হতে পারে, শিল্প তুচ্ছসামগ্রী হতে পারে, প্রত্যয় উৎপাদন ভণ্ডামিপূর্ণ হতে পারে বা বিপথে চালনাকারী হতে পারে ; সমাজ যেমন ইতিহাসের দিক থেকে এগিয়ে চলে, মিথ্যা প্রত্যয়-উৎপাদনও সঙ্গে সঙ্গে সত্য প্রত্যয়-উৎপাদন থেকে নির্গত হতে থাকে।

* * * * * * *

তাহলে আমরা দেখলাম যে বহির্বাস্তবের একটা প্রাণহীন প্রতিরূপ মাত্রই ভাষা আদানপ্রদান করে না, তাছাড়া এবং একই সঙ্গে তার প্রতি একটা প্রতিন্যাসকেও আদান প্রদান করে [communicate] এবং সেটা যে করে তার কারণ প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম চলাকালেই সমস্ত অভিজ্ঞতা, সমস্ত

জীবন, সমস্ত বাস্তব সচেতনভাবে নির্গত হতে থাকে। বহির্বাস্তবের এই প্রতিরূপ এবং এই অহং খালের দুপাশের দুই পাথরের মত পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকে না তারা মূর্ত জীবনযাত্রা থেকে নির্গত হয় এবং আবার সেখানেই তারা ফিরে যায়, তারা এক দ্বান্দ্বিক বিকাশের ফল। এদের মাঝখানে রয়েছে বস্তুর সেতু। যে মাটি দেহ ও পরিবেশকে সংযুক্ত করে সেই মাটির উপরই এরা দুটিই গড়ে উঠেছে। ভাষার প্রকৃতিই সেই পরস্পর ভেদনের [interpenetration] প্রমাণ। সেইজন্য শিল্প ও বিজ্ঞান সামাজিক ক্রিয়ার উপায়গুলির মধ্য দিয়ে, প্রত্যয় উৎপাদনের মধ্যস্থতার মধ্য দিয়ে অবিরাম পরস্পরের সুবিধার জন্য বন্দোবস্ত করে। যেহেতু মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যকার দ্বন্দ্বের দ্বারা বর্তমান বাস্তবের থেকে মানুষের জীবন উদ্ভূত হয়, সেই-জন্য এই দ্বন্দ্বটির দ্বারাই বহির্বাস্তব ও অভ্যন্তরীণ অনুভূতি পরস্পরকে ও নিজেদের বিকশিত করে।

কাব্য মানব জীবন থেকে উদ্ভূত এবং তারই মত গণিত ও সংগীতের এক ফলপ্রদ বিবাদের থেকে তার জন্ম

নবম পরিচ্ছেদ

মানস ও অলীককল্পনা

১

কাব্য কবির দ্বারা লিখিত হয়। যে দ্বন্দ্ব থেকে তার জন্ম তা হল যে দ্বন্দ্ব সমাজকে চালিত করে এবং মানুষের বাস্তব জীবনে ও বাস্তব সচেতনতার ক্ষেত্রে যার নিষ্পত্তি হয় তারই এক বিশেষ রূপ। অর্থাৎ, মানুষের বাসনা ও প্রকৃতির নির্বন্ধতার মধ্যকার দ্বন্দ্ব। কবির সহজপ্রবৃত্তি ও অভিজ্ঞতার মধ্যকার দ্বন্দ্ব থেকে কবিতার জন্ম হয়। এই চাপ কবিকে এমন এক বিভ্রমাত্মক অলীক-কল্পনার জগৎ গড়ে তুলতে চালিত করে যার সঙ্গে যে বাস্তব জগৎ থেকে তা ফুটে ওঠে সেই বাস্তব জগতের তখনও একটা নির্দিষ্ট ও ক্রিয়াগত সম্পর্ক থাকে।

বিংশ শতকে অলীককল্পনার সাধারণ প্রকৃতি সম্পর্কে অনেক কিছু জানা গেছে। এই শতকের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারগুলির মধ্যে রয়েছে মানসিক রোগ নিরাময়ের কৌশল [psycho-therapy] সম্পর্কিত আবিষ্কারগুলি যাতে Charcot, Janet, Morton Prince এবং সর্বোপরি ফ্রয়েডের পথপ্রদর্শক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। ফ্রয়েডের শিষ্যরা অনেকগুলি প্রতিদ্বন্দ্বী মতগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করেন, তার মধ্যে ইয়ুং (সমীক্ষণমূলক মনোবিদ্যা) ও অ্যাড্‌লার (ব্যষ্টিগত মনোবিদ্যা)-এর মতগোষ্ঠি সর্বাধিক পরিচিত।

ফ্রয়েড তাঁর প্রথম দিকের গবেষণাগুলি থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি লাভ করেছিলেন পরবর্তীকালে সেগুলি বিকাশের ক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞানের মূলগত দুর্বলতা যতখানি স্পষ্টভাবে দেখা গেছে ততখানি বোধ হয় আর কোনও ক্ষেত্রেই দেখা যায় নি। দুর্বলতাটি এই যে, যে সব অভিজ্ঞতাভিত্তিক আবিষ্কারগুলি করা হয়েছে তার সঙ্গে খাপ খাওয়ানর মত কোনও সংশ্লেষণাত্মক বিশ্বদৃষ্টির অভাব। ফ্রয়েডের মত একজন মেধাবী গবেষকের গবেষণাগুলি আধুনিক মতাদর্শের নৈরাশ্যজনক বিভ্রান্তিকে দূর করার বদলে বাড়িয়ে তুলেছে।

বিজ্ঞানীর সামনে দুটি বিকল্প পড়ে আছে। একটি হল, একদিকে তিনি তাঁর আবিষ্কারগুলিকে নিজের বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ বলে মনে করেন এবং সামগ্রিকভাবে বাস্তবের প্রতি একটা পুরোপুরি সারসংগ্রহাত্মক মনোভাব [eclecticism] গ্রহণ করেন যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল বাস্তব মূলতঃ অজ্ঞেয়

এই দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠা এবং বিজ্ঞান সম্পর্কে এই ধারণা গড়ে ওঠা যে বিজ্ঞান যেন অভিজ্ঞতামূলক আবিষ্কারগুলির কার্যোপযোগী সংক্ষিপ্তসারের একটি সংগ্রহ মাত্র এবং সেগুলি যে সুসংলগ্নতা বা সংশ্লেষণের যোগ্য হতে হবে এমন কোনও কথা নেই। অথবা, অপরদিকে যে বিজ্ঞানী কোন গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেছেন তিনি সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞানের প্রতি এক সাধারণ বিশ্বদৃষ্টির অভাবে, নিজে যে বিশেষ আবিষ্কারগুলি করেছেন তারই সীমিত ভিত্তির উপর এক সম্পূর্ণ মতাদর্শ গড়ে তোলেন। স্বভাবতঃই সেই ধরনের এক মতাদর্শ বাস্তবের বিকৃতিই হবে এবং তা বাস্তবের ও মানব মনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলির অধিকাংশকেই ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হবে। যে জিনিসগুলিকে সেই মতাদর্শ ব্যাখ্যা করতে পারবে না সেগুলিকেই "ও কিছু নয়" এই স্থূল পদ্ধতির দ্বারা অন্যান্য অল্পসংখ্যক ঘটনার স্তরে জোর করে নামিয়ে আনবে।

অবশ্য এই কাজটা যদি বিজ্ঞানীর ইচ্ছাবিরুদ্ধ হয়, কিছুটা ব্যাপক সংস্কৃতি সম্পন্ন বিজ্ঞানীর ক্ষেত্রে যেমন তা হতে পারে, তাহলে সেই বিজ্ঞানী নিজের সীমাবদ্ধ বিশ্বদৃষ্টি দিয়ে অন্যান্য যে সব ঘটনার ব্যাখ্যা করা যাবে না সেগুলির এক অতীন্দ্রিয়বাদী ব্যাখ্যা দেবেন। বাস্তবের একটা বড় অংশকে সুবিধামত ধর্মের ক্ষেত্রে সরিয়ে নিয়ে আসা হবে, যেমন ঘটেছে প্রাণবাদী, পবিত্রতাবাদী, প্রকৃত্যাপূরবাদী এবং সাধারণভাবে আধ্যাত্মিকতাবাদীদের ক্ষেত্রে।

এই অভিজ্ঞতাবাদ ও তার সংকোচন পদ্ধতির প্রতিনিধি হলেন ফ্রয়েড, আর ইয়ুং এগিয়ে গেছেন আরও বেশি সারসংগ্রহবাদী ও অতীন্দ্রিয়বাদী দৃষ্টিভঙ্গীর দিকে।

যৌনতার কিছুটা ব্যাপক এক সংজ্ঞা ব্যবহার করে, ফ্রয়েড সমস্ত মানব মতাদর্শের মধ্যেই যৌনতার অস্তিত্ব দেখতে পান আর সব থেকে বেশি স্পষ্ট করে তা দেখতে পান স্নায়বিক সংঘাতের মধ্যে। এই উদ্‌গতিপ্রাপ্ত (sublimated) যৌনতা নানা রূপ ধরে: শিল্পগত, ধর্মীয় ও দার্শনিক। এটা প্রকৃতপক্ষে মানুষের সমস্ত ক্রিয়াকলাপের জনকশক্তি। আপত্তিকারক বলবেন, "কিন্তু যৌনতা যে যৌনতা ছাড়াও আর কিছু, যৌনতা তো সংজ্ঞা অনুসারে যৌন ক্রিয়া সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত একটা নির্দিষ্ট সহজপ্রবৃত্তি?" ফ্রয়েড জবাব দিচ্ছেন, "না, তা নয়। যৌনতা এই সরল রূপ নিতে পারে না, কারণ তা মানসের মধ্যে অবস্থিত অতি-অহং (super-ego) এবং অহং-এর কঠোর নিষেধের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। সেই দ্বন্দ্বের উদ্‌গতি ঘটানর যে প্রচেষ্টা সে করে তার ফলে মতাদর্শের সম্পদ সৃষ্ট হয়। এই মতাদর্শ ধর্ম, নীতি, শিল্প, দর্শন, স্নায়বিক পীড়া এবং স্বপ্নকে অন্তর্ভুক্ত করে।"

ফ্রয়েড তাঁর সুখ ও বাস্তব সংক্রান্ত সূত্রের ধারণার সাহায্যে এই বিধি-বহির্ভূত অহং-সহজপ্রবৃত্তির দ্বৈরথকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেছেন। মানসের যৌন অংশের সহজপ্রবৃত্তিগত বাসনার প্রতিনিধিত্ব করে সুখ-সূত্র, অহং জড়িত বাস্তব সংক্রান্ত সূত্রটির সঙ্গে। জীববিদ্যার ক্ষেত্রে প্রবৃত্তিধর্মী প্রাণী আর পরিবেশের সঙ্গে তার অভিযোজনের সেই সুপরিচিত বিরোধেরই একটা বিশেষ ধরনের নামান্তর ছাড়া আর কিছুই আমরা এক্ষেত্রে পাই না।

ফ্রয়েডের সুখ-সূত্র (যৌন প্রবৃত্তি ছাড়াও ক্ষুধা এবং অন্যান্য সহজপ্রবৃত্তিও অবশ্যই যার অন্তর্ভুক্ত বলে ফ্রয়েড নিজেই স্বীকার করেছেন) হল জীবনের স্বাভাবিক স্পৃহাধর্মী প্রয়াস, আর বাস্তব-সূত্র হল তার স্বাভাবিক স্পৃহার পরিবেশ দ্বারা সৃষ্ট সেই অভিযোজন বা সাপেক্ষীভবন। ইঁদুরের জন্য বিড়ালের ওৎ পেতে বসে থাকা, ভোঁদড়ের মাছধরা, হরিণের নজর রাখা ও পলায়ন করা হিসাবে এই অভিযোজনমূলক সহজপ্রবৃত্তি দেখা দেয়। কিন্তু দুইয়ের মধ্যে কোন ধরা বাঁধা পার্থক্যসূচক রেখা নেই। যৌনসঙ্গী সন্ধান, খাদ্যসন্ধান বা বিপদ এড়ানোর ক্ষেত্রে দেখা যায় সুখ-সূত্র অনুসরণ করা হচ্ছে কিন্তু প্রাণীটি বহির্বাস্তবকে অস্বীকার করতে পারে না, প্রকৃতপক্ষে, বাস্তবের সঙ্গে তার অভিযোজনের সাহায্যেই প্রাণী তার স্বাভাবিক স্পৃহাগত সহজপ্রবৃত্তিকে সন্তুষ্ট করে। প্রাণীদের ক্ষেত্রে তা হলে এই দুটি দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় না কেন? এবং সেই দ্বন্দ্ব থেকে একটা স্নায়বিক পীড়া এবং একটা মতাদর্শ সৃষ্ট হয় না কেন? মানুষের সচেতন অহংই বা কেন বাস্তব-সূত্রের সঙ্গে যুক্ত এবং যৌন—, ক্ষুধা—বা আত্মরক্ষা'র আরও বেশি "আত্মসর্বস্ব" স্বাভাবিক স্পৃহাধর্মী সহজপ্রবৃত্তি-গুলির সঙ্গেই বা যুক্ত হয় না কেন?

প্রকৃতপক্ষে ফ্রয়েড তাঁর নতুন কিন্তু সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রের সুপ্রাচীন, বিরোধগুলিকেই পুনরাবিষ্কার করেছেন মাত্র এবং সেগুলি তাঁর নিজের আবিষ্কারের ক্ষেত্রে যে পরিভাষা ও বিশেষ অর্থাবকৃতি লাভ করেছে সেগুলি সহ আবার মানব চিন্তার সমগ্র জগতে প্রয়োগ করেছেন। এ সেই বিষয়ী ও বিষয়ের, মানুষ ও প্রকৃতির, সহজপ্রবৃত্তি ও পরিবেশের, অবাধ ইচ্ছা ও নির্বন্ধতার বা প্রাণ ও বস্তুর মধ্যকার পুরাতন দ্বন্দ্ব যা ফ্রয়েডের মনোবিদ্যাতে তিনটি বিভিন্ন সাজে দেখা দিয়েছে: (ক) সুখ সংক্রান্ত সূত্র ও বাস্তব সংক্রান্ত সূত্র, (খ) জীবনাকাঙ্ক্ষা ও আত্মধ্বংসবৃত্তি এবং (গ) অহং (তার থেকে জাত অদস [id] এবং অধিশাস্তা [super-ego] সহ) ও কাম [libido] রূপে।

আমরা ইতোমধ্যেই এই বিষয়ী-বিষয় দ্বৈত (এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের

পর্যালোচনায় বরাবর বা স্থায়ী ক্ষেত্র হয়ে এসেছে) সম্পর্কে এই মন্তব্য করেছি যে, মানুষ এদের পরস্পর অসম্পৃক্ত বিপরীত হিসাবে পৃথক করতে চেয়েছে এবং এদের একটিকে মাত্র বাস্তবের মর্যাদা দিতে চেয়েছে। এইভাবে সমস্ত বাস্তবকে সেই সব ঘটনায় সংকীর্ণ করে আনা হয়েছে যেগুলির মধ্যে অপরটির কোনও অংশের অস্তিত্ব নেই। যেহেতু এই দুটি বিপরীত অসম্পৃক্ত নয়, বরং পরস্পরকে পরিব্যাপ্ত [interpenetrate] করে, সেই কারণে এই ধরনের সংকীর্ণ করে আনাটা কালক্রমে জগৎকেই একটা অর্থহীন নামে সংকীর্ণ করে আনে।

যেহেতু ফ্রয়েড একজন মনোবিদ, কিন্তু দার্শনিক নন, সেই কারণে তিনি সমস্ত বাস্তবের আলোচনা না করে কেবলমাত্র বিষয়গতভাবে বিবেচিত সচেতন ও অচেতন মননেরই আলোচনা করেছেন। কিন্তু এখানেও, সামগ্রিকভাবে জ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমনটি ঘটেছিল ঠিক সেই ভাবেই, সেই পরিবেশ এবং সহজ-প্রবৃত্তির পরিব্যাপ্তি ঘটে, এবং কোন মননকে তা বিশেষভাবে সহজপ্রবৃত্তিগত এবং কোনভাবেই তা পরিবেশ দ্বারা সাপেক্ষীকৃত নয় এইভাবে পৃথক করা কখনও সম্ভব নয়। সেরকম প্রচেষ্টায়, যে সমস্ত মননের উপর পরিবেশের ছাপ পড়েছে সগুলিকে "অতিরিক্ত" বা "উদ্‌গতিপ্রাপ্ত" বলে বাতিল করার প্রচেষ্টায়, চেতনার স্তরের পর স্তরকে গৌণ এবং অবাস্তব বলে বর্জন করতে হয় যতক্ষণ না একটা অস্পষ্ট ও নির্দিষ্টরূপহীন কিছুকে—"কাম" কে, যা একটা নাম মাত্র, তাকেই একমাত্র প্রকৃত মানসগত বাস্তব বলে মেনে নিতে হয়।

অথচ এই আবিষ্কার প্রকৃতপক্ষে মনোবিদ্যার প্রতি ফ্রয়েডের বুর্জোয়া দৃষ্টি-ভঙ্গীর মধ্যে শুরু থেকেই ছিল। বুর্জোয়া দার্শনিক সভ্যসমাজে ব্যক্তির দৃষ্টি-ভঙ্গীর উর্ধে উঠতে পারেন না। সমস্ত সামাজিক কার্যকলাপ হল ব্যক্তির অবাধ ইচ্ছা এবং প্রকৃতির সঙ্গে সরাসরি বোঝাবুঝি করার ফলে তৎক্ষণাৎ উদ্ভূত গতিশীল তাগিদের ফল। যেহেতু ব্যক্তির সহজপ্রবৃত্তিগত কেন্দ্র হল তার স্বাধীনতার উৎস, সেইকারণে সামাজিক সম্পর্ক তার উপর কোন বাধা-নিষেধ আরোপ করলে তার কার্যকলাপের পরিসরকে তা পঙ্গু ও বিকৃত করে তোলে।

এই ধারণা অবশ্য সেই শ্রেণীর পক্ষে উপযুক্ত যে শ্রেণীর অস্তিত্বের সর্তই হল এই যে তা বাজার অনুযায়ী তার কাছে যা সব থেকে ভালো বলে মনে হয় ঠিক সেইটাই উৎপাদন করার স্বাধীনতা তার থাকে। বাজার নিজেই হল প্রকৃতির বা পরিবেশের এক ধরনের প্রসারণ। এই ধরনের শ্রেণী যার বিকাশের

প্রাথমিক শর্তই হল এই যে সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ককে তা বিনষ্ট করেছে, সেই শ্রেণীর কাছে স্বাধীনতা স্বভাবতঃই কোন ঐশ্বরিক অধিকারের কারণের জন্যই ব্যক্তির মধ্যে অন্তর্নিহিত বলে মনে হয় এবং যে সামাজিক সম্পর্কগুলি ব্যক্তির বাসনাকে প্রভাবিত করে সেগুলির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অজ্ঞতাকেই স্বাধীনতা বলে প্রতীয়মান হয়।

এই ধরনের ধারণা সমাজ ও স্বাধীনতা সম্পর্কে পুরাপুরি একটা মিথ্যা দৃষ্টিভঙ্গীর দিকেই নিয়ে যায়। এবং সেই কারণে তা মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে মানস'এর সামাজিক বিষয়বস্তু এবং সহজপ্রবৃত্তিগুলি কিভাবে স্বাধীন হয়ে ওঠে সে সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যায় গিয়ে পৌছায়। যে শ্রেণীর নিজের বিকাশমান স্বাধীনতা পরিবেশের সঙ্গে সক্রিয় সংগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সেই কারণে যে শ্রেণীর মতাদর্শে ইতোমধ্যেই বিষয়ী ও বিষয়ের বিচ্ছেদ দেখা দিয়েছে এর মধ্যে সেই শ্রেণীরই দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত হয়। বিষয়ী ও বিষয় যে পরস্পরের সংগ্রাম দ্বারাই সক্রিয়ভাবে পৃথকীকৃত হয়—এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী তা দেখে না, বরং ধরে নেয় যে বিষয়ী ও বিষয় তাদের পরস্পর অসম্পৃক্ত প্রকৃতির দ্বারা ইতোমধ্যেই ধ্যানের দিক থেকে পৃথকীকৃত হয়ে গেছে। এই ধরনের ভুল বোঝা জগৎকে হয় বিষয়ীবাদ না হয় যান্ত্রিকতার পরিভাষায় ব্যাখ্যা করার দিকেই মাত্র নিয়ে যায় এবং ফ্রয়েড নিজেকে বস্তুবাদী বলে মনে করলেও বিষয়ীকেই বেছে নিয়েছেন। কাম, যা নাকি অবাধ ক্রিয়ার উৎস, যে মানসগঠ ও পরিবেশ সৃষ্টি করে তা নিজেকেই পঙ্গু করে। ফ্রয়েডের ভাববাদী প্রাক্‌প্রত্যয় হল রুশোর "স্বাভাবিক মানুষ"-এর সেই সরল প্রাকপ্রত্যয়ই। রুশোর মতে এই "স্বাভাবিক মানুষ" স্বাধীন হয়েই জন্মগ্রহণ করেছে এবং সর্বত্রই সে শৃঙ্খলিত।

কিন্তু আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি যে সহজপ্রবৃত্তিগুলি সমাজ দ্বারা অনভিযোজিত অন্ধ এবং সেই কারণে স্বাধীনতাহীন। পশু স্বাধীন নয়; পিপীলিকা তার সহজাত প্রতিক্রিয়ার [responses] দাস। মানুষের স্বাধীনতা সংঘবদ্ধতা থেকে পাওয়া। এই সংঘবদ্ধতাই প্রকৃতির প্রয়োজন এবং নিজের প্রয়োজন সম্পর্কে সক্রিয়ভাবে সচেতন হয়ে প্রকৃতির উপর আধিপত্য অর্জনে মানুষকে সাহায্য করে। নিজেকে এই সংঘবদ্ধ করার ফলে প্রয়োজনের দিক থেকে কিছু বিধিনিষেধ, প্রথা ও দায়দায়িত্ব আরোপ করতে হয়, যেমন ভালো ব্যবহার, ভাষা ও পারস্পরিক সাহায্য। কিন্তু এই সব সামগ্রীগুলি অবাধ সহজপ্রবৃত্তির (কাম) উপর বন্ধনশৃঙ্খল নয়। এগুলি হল উপকরণ যার সাহায্যে

সহজপ্রবৃত্তিধর্মী মানুষ তার স্বাধীনতাকে বাস্তব রূপ দান করে। বাস্তব সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গীকে বিজ্ঞান বলা হয়, অনুভূতির যে নিয়মকানুনকে শিল্প ও নীতি বলা হয় সেগুলি বাইরে থেকে সহজপ্রবৃত্তির উপর আরোপিত হয়। তা সত্ত্বেও সেগুলি বন্ধনশৃঙ্খল, বিকৃতি, বাধ, বা উদগতি নয়। এগুলি হল সেই সব উপায় যার সাহায্যে সহজপ্রবৃত্তি তার স্বাধীনতাকে বাস্তব রূপ দান করে কারণ সেগুলি প্রকৃতির প্রয়োজন এবং তার নিজের প্রয়োজন সম্পর্কে তার বোধ জন্মায় এবং সেইজন্যই সেগুলি হল—একমাত্র উপায় যার দ্বারা ইচ্ছা নিজেকে সক্রিয়ভাবে বাস্তব রূপ দান করতে পারে—যেহেতু প্রকৃতি কেবল নিছক ইচ্ছার কাছে মাত্র নতি স্বীকার করে না। আর অহং, তার উদগতি, তার বিকৃতি এবং তার প্রাণবন্ত সমৃদ্ধ জটিলতা সহ মানুষের চেতনা তার মানসগত জনিরূপে [psychic genotype] স্বাধীনতাকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে অন্যান্য মানুষের সঙ্গে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করার সর্তগুলি দ্বারা সৃষ্ট অভিযোজন ছাড়া আর কিছুই নয়। চেতনা ব্যাপকতম অর্থে (সুতরাং অবচেতনকে, যা রূপান্তরিত সহজপ্রবৃত্তিরও সৃষ্টি, তাকেও এর অন্তর্ভূক্ত করে) হল এক সামাজিক উৎপন্ন। চেতনার একটা সামাজিক উপাদান আছে—কেবল এইটুকুই মাত্র নয়। চেতনা গঠিত হওয়া হল মানসের সামাজিকীকরণ।

অবশ্যই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য থাকে এবং এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তাদের চেতনাগুলিতে প্রতিফলিত হয়, যেমন মানুষের দৈহিক পার্থক্য ফুটে ওঠে তার পোষাকে। কিন্তু পোষাক হল পোষাক এবং তা রক্ত মাংস নয়, আর মানুষের মানসের এই সামাজিক অভিযোজনগুলি হল সেই সব উপায় যার সাহায্যে ব্যক্তিগত পার্থক্যগুলিকে বাস্তবরূপ দেওয়া যায় এবং সেগুলিকে বাড়িয়ে তোলা যায়। মানুষে মানুষে অভিজ্ঞতার পার্থক্যও আছে এবং চেতনা যেহেতু অভিজ্ঞতার দ্বারা নির্ধারিত হয় সেই কারণে ব্যক্তিগত চেতনায় পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু একথা বলার অর্থ এই যে শ্রমবিভাগের ফলে সমাজই নিজেকে এমন সুনির্দিষ্ট রূপে পৃথকীকৃত করে তুলেছে যাতে করে ভূগোলের জগতে বা অনুভূতির জগতে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ব্যক্তিগত দুঃসাহসিক কাজের সম্ভাবনা গড়ে তুলেছে। যূথবদ্ধ প্রাণীর মধ্যে জীবনের যে সরল অনুরূপভাব দেখা যায় তার সঙ্গে এই পার্থক্যকে আলাদা করে চেনা যায়। সমাজের বিকাশ হল সেই উপায় যার দ্বারা পার্থক্যগুলিকে বাস্তব রূপ দেওয়া যায় এবং ব্যক্তিত্ব তার পূর্ণ মর্যাদা লাভ করে—এই কথাটাই আবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

চেতনাগুলি যেহেতু উৎপাদিকা শক্তির নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক বিকাশের ফলে

প্রয়োজনীয় সামাজিক সংগ্রহ [social complex] দ্বারা নির্ধারিত হয়, এবং যেহেতু ফ্রয়েড যে রকম ধরে নিয়েছেন যে মানস'এর গঠনপ্রণালী দ্বারা সমাজ তৎক্ষণাৎ নির্ধারিত হয়, ব্যাপারটি সে রকম নয়, অতএব মতাদর্শ, অলীককল্পনা, স্বপ্ন ই-্যাদির ঐতিহাসিক উৎপাদন মানুষের সামাজিক সংগ্রহ-এর গঠনের ক্ষেত্রে যে ঐতিহাসিক পরিবর্তন ঘটে তারই উপর নির্ভর করতে বাধ্য একথা খুবই স্পষ্ট যে ব্যাপারটা এই রকমই হয়ে থাকে। কারণ মানসের সহজাত গুণগুলি যদি সামাজিক সংগ্রহ এবং তার অন্তর্ভুক্ত মানুষের চেতনা ও মতাদর্শগত উৎপাদনগুলিকে নির্ধারিত করে, তাহলে ঐতিহাসিক কালে মানুষের জনিগত গঠনের যখন আদৌ হেরফের ঘটে না, তখন যুগে যুগে এবং বিভিন্ন সংস্কৃতিতে সেগুলি এত ভিন্ন ধরনের কি করে হয়?

এটা দেখান যেতে পারে যে সমাজের বস্তুগত উৎপাদিকা শক্তিগুলি এবং সেগুলির কারণে মানুষে মানুষে সম্পর্কগুলির যে প্রয়োজনীয় হেরফের হয় সেগুলি সামাজিক ক্ষেত্র অনুযায়ী বিশেষ গুণসম্পন্ন নির্বস্তুতামূলক নিয়মাবলী অনুসারে ইতিহাসের দিক থেকে বিকশিত হয়। এবং যেহেতু এই সম্পর্কগুলির সঙ্গে মানুষের চেতনার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে এই বিকাশ ঘটে সেই কারণে অপরিবর্তনীয় মানসগত জনিরূপ [invariant psychio genotype] হওয়া সত্ত্বেও মানুষের মতাদর্শ ও ব্যক্তিগত চেতনার অবিরাম পরিবর্তনকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এই সব বস্তুগত কারণগুলিকে ফ্রয়েডের মত কেটে বাদ দিলে মতাদর্শের ক্ষেত্রে যে ঐতিহাসিক পরিবর্তনগুলি ঘটে সেগুলির হেতুকে বিজ্ঞান-সম্মতভাবে বোঝার একমাত্র উপায়টিকেই কেটে বাদ দেওয়া হয়।

এই ভাবে বাদ দিলে ফ্রয়েডের নিরাময় কৌশলেরও একটা স্থানীয় ও বিশেষ মূল্য ছাড়া আর কিছু থাকে না। যেহেতু সমস্ত স্নায়বিক দ্বন্দ্ব হ চেতনার বিকৃতি ও প্রকরণগুলি জীবনধারনের বস্তুগত সর্তগুলি দ্বারা সৃষ্ট হয় না, বরং সেগুলি মানসের নিজেকে দেওয়া যন্ত্রণা, অহং এর নিজেকে পৃথক করা এবং কামকে কড়া নির্দেশ দেওয়ার দ্বারা সৃষ্ট হয়, সুতরাং মানুষ তার দ্বন্দ্বের কারণ সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার দ্বারাই রোগমুক্ত হয়। যেহেতু তার মানসের মধ্যেই এই কারণগুলি সব বর্তমান অতএব সেই একই ইচ্ছার প্রচেষ্টার দ্বারা সেগুলিকে দূর করা যায়। অর্থাৎ ফ্রয়েডের রোগনিবারণ তত্ত্ব হল আত্মকেন্দ্রিকতাবাদী ও ধর্মীয়।

আত্মকেন্দ্রিকতাবাদী হওয়ার ফলে ফ্রয়েড অবশ্যই এটাকে সংগতিপূর্ণভাবে মেনে চলেন না। স্নায়বিক সংঘাতের বস্তুগত কারণ তিনি স্বীকার করেন, যেমন

পরিবার শিক্ষাদীক্ষা, অভিজ্ঞতা, অসন্তোষজনক পারিপার্শ্বিক ও গোঁড়া শিক্ষা থেকে উৎপন্ন মানসগত আঘাত[psychic traumata]। কিন্তু এটা তিনি সম্পূর্ণ লক্ষ্য করেন না যে পুরাপুরি-নির্বস্তুতাবাদী কোনও বিজ্ঞানসম্মত মনোভাবের ক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যাকে যদি এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় তাহলে চেতনাকে সংহত করবার দায়িত্ব গিয়ে পড়ে সমাজের বস্তুগত ভিত্তির উপর। তিনি সম্পূর্ণ দেখছেন না যে অতিঅহং বা অধিশাস্তা [super-ego] যদি মাতা-পিতার প্রতিফলন হয় তাহলে—যেহেতু সন্তানের প্রতি মাতাপিতার ব্যবহার এবং সেই সম্পর্কে তার পদমর্যাদা সেই যুগের অর্থনৈতিক বিকাশের প্রতিফলন (এঙ্গেলস: পরিবারের উৎপত্তি দ্রষ্টব্য)—যা বেশির ভাগ স্নায়বিক সংঘাতের চাবি-কাঠি সেই অধিশাস্তার সৃষ্টি সমাজবিদ্যামূলক নিয়মগুলি দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই কথা পুরাপুরি স্বীকার করলে, অর্থাৎ মানস ও পরিবেশের মধ্যকার যোগসূত্রগুলি একবার যদি বোঝা যেত—তাহলে তা মানসিক রোগ নিরাময় বিদ্যাকে [psycho-therapy] সামাজিক পরিবেশকেই কিভাবে পরিবর্তিত করা যায়, তা বোঝার জিনিস করে তুলত। স্নায়বিক রোগগ্রস্ত ধনীর ক্ষেত্রে পরিবেশকে অবশ্যই আরও সহজে পরিবর্তিত করা যায়। এবং যেহেতু ফ্রয়েডের রোগীরা প্রধানতঃ এই ধরনের, অতএব স্নায়বিক রোগ সৃষ্টির পরিবেশগত কারণের সমস্যাটি ফ্রয়েড যেরকম আংশিক অস্পষ্টভাবে বলেছেন সেই ভাবে বলাই যথেষ্ট। কিন্তু সামগ্রিকভাবে সমাজের ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা হলে এই ধরনের কোনও নিরাময় কৌশল হল আক্ষরিক অর্থে বৈপ্লবিক।

কারণ, সমাজ যদিও মানুষের স্বাধীনতার হাতিয়ার অতএব একথা কিছুতেই বলা যায় না যে সেটা একটা ত্রুটিহীন হাতিয়ার। বরং হাতিয়ারের এই ত্রুটিগুলোর জন্যই সমাজের নিয়ত পরিবর্তন ঘটে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের নিজস্ব প্রকৃতির কারণেই দেখা যায় যে উৎপাদিকা শক্তিগুলি—যার শক্তির উপর মানুষের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত—যে সামাজিক সম্পর্কগুলি তাদের প্রাথমিক বিকাশ সম্ভব করেছিল সেই সামাজিক সম্পর্কগুলি দ্বারাই বিভিন্ন মাত্রায় তা রুদ্ধ ও পঙ্গু হয়ে উঠতে থাকে। যে শ্রমবিভাগ সামাজিক উৎপাদন ক্ষমতাকে নতুন করে গড়েছিল শ্রেণীবিভক্ত সমাজ সেই শ্রমবিভাগেরই একটা ফল মাত্র। এই রকম যুগে অবশ্যই এটা মনে হয় যে মানুষের সামাজিক সম্পর্কগুলিই যেন তার স্বাধীনতার সম্ভাবনাগুলিকে পঙ্গু করে তুলছে। সেই রকম সময় মানুষ যন্ত্রণায় কাতরায়, ছটফট করে এবং চীৎকার করে ওঠে, কারণ বিধিনিষেধ-গুলি অর্থাৎ নীতি, ধর্ম এবং সমাজের সমস্ত সচেতন নিয়মগুলি তার "স্বাধীন"

সহজপ্রবৃত্তিগুলিকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। যে স্নায়বিক পীড়াগুলি ফ্রয়েড অনুধাবন করছেন এবং যেগুলি সবিশেষ আধুনিক সেগুলি এই ছটফটানিরই ফল, তা হল নতুন সমাজের প্রসববেদনা।

ফ্রয়েডকে সর্বদাই অপরিবর্তনশীল সহজপ্রবৃত্তি ও অপরিবর্তনশীল জৈবিক পরিবেশ থেকে চেতনা ও মননের পরিবর্তনশীল ঘটনার সিদ্ধান্ত করার উভয়-সংকটের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আমরা ইতোমধ্যেই দেখিয়েছি যে একটা তৃতীয়কে [variable] নিয়ে আসলে তবেই মাত্র সেটা করা যায়। অর্থনৈতিক উৎপাদনের পক্ষে প্রয়োজনীয় সম্পর্কগুলি হল সেই তৃতীয়। কিন্তু ফ্রয়েড এটা অস্বীকার করেন। সেই কারণে ব্যক্তিগত মানসের গঠন থেকে ঐতিহাসিক পরিবর্তন ঘটছে-এই সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য হন এবং সেই কারণে যেগুলি একটা বিশেষ সামাজিক পরিবেশের প্রতিফলন মাত্র সেগুলিকে তিনি মানসের একটা স্থায়ী অংশ হিসাবে কল্পনা করছেন।

মনোবিদ্যার ক্ষেত্রের দ্বন্দ্বগুলি সম্পর্কে ইয়ুঙ রীতিমত ওয়াকিবহাল। তিনি অবশ্য সেই দ্বন্দ্বগুলিকে যান্ত্রিক এবং পরস্পর অসম্পৃক্ত বিপরীত—যেমন অন্তর্মুখিনতা ও বহির্মুখিনতা, বা "শক্তির পরিমাণগত চূড়ান্তধর্মিতা" ["energic quantitative finality"] ও "বস্তুবাদী গুণগত কার্যকারণধর্মিতা"র [materialistic qualitative causality"] মত বিপরীত হিসাবে দেখেন। যে দ্বন্দ্বগুলি ইয়ুঙ তুলে ধরছেন কিছুতেই সেগুলির তিনি সমাধান করতে পারছেন না, কারণ মনোবিদ্যার দ্বন্দ্বগুলি থেকে কিছুতেই তিনি মনোবিদ্যার ঠিক নীচের ক্ষেত্রটিতে অর্থাৎ সমাজের ক্ষেত্রটিতে যাচ্ছেন না। তার বদলে তিনি বিপরীত মুখে চললেন। মনোবিদ্যা থেকে তিনি চললেন মানস যে জ্ঞানতত্ত্ব [epistemology] গড়ে তোলে সেই দিকে এবং বিষয়ী ও বিষয়ের সেই পুরাতন পরিচিত তত্ত্ববিদ্যাগত সমস্যাগুলির মধ্যে পথ হারিয়ে ফেললেন। এইভাবে আরও বেশি মাত্রায় দার্শনিক এবং কম মাত্রায় অভিজ্ঞতামূলক পথে চলে ইয়ুঙ এসে পড়লেন ফ্রয়েড যে উভয়সংকটের মধ্যে পড়েছিলেন তারই মধ্যে। স্নায়বিক সংঘাত যেহেতু জীবন ও বাস্তবের সংঘাত থেকেই জাত, যার উন্নতি ঘটানর জন্য বিভিন্ন রূপসহ ধর্মের উদ্ভাবন করা হয়েছে, রোগীকে তাহলে আরোগ্য করা যাবে কিভাবে? জলের জন্যই যে শুধু একথা রোগীকে বলার সুপারিশ ফ্রয়েড করেছেন এই বিশ্বাসে যে সেই ধাক্কা [shock] রোগীকে আরোগ্য করবে (অভিজ্ঞতাটির সাহায্যে আরোগ্য)। ইয়ুঙ সুপারিশ করছেন যে রোগীকে জলে বিশ্বাস করতে দিতে হবে এবং জলকে ঘিরেই

রোগী যেন তার কল্পনার জাল বুনে চলে (সংশ্লেষণের সাহায্যে আরোগ্য)। বিজ্ঞানকে এইভাবে ত্যাগ করার একটা ব্যাখ্যা ইয়ুং দিয়েছেন এই বিশ্বাসে যে, সমস্ত পুরাণশাস্ত্রের পিছনে রয়েছে মনের গভীরে আদিগঠনের (primeval structures) অস্তিত্ব (archtypes)। এই আর্চটাইপ বা মূল আদর্শগুলি রোগীর মতাদর্শের উপর ক্রিয়া করে এবং তা থেকে পুরাণের সৃষ্টি হয়। এগুলি যদিও প্রকৃতপক্ষে সত্য নয় তবু মনোবিদ্যার দিক থেকে সত্য (নায়কের জন্ম)। ইয়ুংও এইভাবে বিষয়ীকে এবং মূলতঃ এক ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে গ্রহণ করেছেন। এঁদের নিরাময় কৌশল হল ইচ্ছাশক্তি ও অতীন্দ্রিয় মন-নিয়ন্ত্রণের নিরাময় কৌশল। উভয় ক্ষেত্রেই মানসিক পীড়ার বস্তুগত অর্থাৎ পরিবেশ-গত কারণগুলি সুস্পষ্টভাবে ও প্রকাশ্যে দেখা দেয় না, বরং সমীক্ষকের প্রতি সামগ্রিক সঞ্চালনে সীমাবদ্ধ রূপ হিসাবে দেখা দেয়। সমীক্ষক সমাজের ভূমিকা পূরণ করার চেষ্টা করেন এবং স্পষ্টতঃই সেটা ক্ষুদ্রভাবে এবং সীমাবদ্ধ-ভাবে পূরণ করেন। দুজনের কেউই লক্ষ্য করেন না যে সমস্যাটির প্রকৃতিই এমন যে ক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন চিন্তনার ক্ষেত্রে মাত্র তার সমাধান সম্ভব নয়।

ফ্রয়েড বা ইয়ুং এটাও লক্ষ্য করেন না যে মানুষ যতই একটা ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতিকে জোড়াতালি দেওয়ার জন্য ধর্মকে নিয়ে আসে ততই আর্চটাইপের বা মনঃ সমীক্ষকের ধাত্রীকর্মের প্রয়োজন ব্যতিরিকেই নতুন নতুন পুরাণ সৃষ্টি করতে মানুষের কোনও অসুবিধা হয় না। প্রকৃতপক্ষে মুমূর্ষু বুর্জোয়া সংস্কৃতি ফ্যাসি-বাদের প্রবল ধর্ম, যায় তার পুরাণ ও স্তবপদ্ধতি [choragus] সহ গড়ে তুলেছে। জার্মানী ও ইতালিতে তা দেখা যায়। মানবিক সংঘাত একটা বাস্তব জিনিস এবং ইয়ুং ও ফ্রয়েড যখন সমস্ত সভ্য মানুষের মধ্যেই তার বীজ দেখতে পান তখন তাঁরা ঠিকই দেখেন। কিন্তু যখন তাঁরা মনে করেন যে এটা সভ্যতার একটা ব্যাধিজনিত ফল যা সভ্যতাকে বাদ দিতে পারলেই সেরে যেত তখন তাঁরা ভুল করেন। মানুষের সহজপ্রবৃত্তি ও পরিবেশের মধ্যকার সংঘাতই হল জীবন এবং সমাজের সব কিছু সৃষ্টি—টুপি, শিল্পকলা, বিজ্ঞান, বাড়ি, খেলাধূলা, নীতি, রাজনৈতিক সংগঠন—এ সব কিছুই সেই সংঘাতকে লাঘব করার ও আরোগ্য করার জন্য উদ্ভাবিত অভিযোজন। যেহেতু এই সংঘাতের সার্থক পরিণতি হল স্বাধীনতা সেই জন্য "অভিযোজন হিসাবে স্বাধীনতাকে" [freedom qua adaptations] এই অভিযোজনগুলি পঙ্গু করেছে এ কথা অর্থহীন। এই অভিযোজনগুলি যে মাত্রায় অপ্রচলিত হয়ে পড়ে এবং ইতোমধ্যেই যে স্বাধীনতার তারা জন্ম দিয়েছে তার বিকাশকে রুদ্ধ

করে সেই পরিমাণেই একজনি স্বাধীনতাকে পঙ্গু করে। অভিযোজনগুলিকে যে বর্জন করতেই হবে, এই পঙ্গু হওয়াটা তার লক্ষণ নয়। বরং নতুন অভিযোজনের প্রয়োজন যে দেখা দিয়েছে তারই লক্ষণ। অতএব, সহজ-প্রবৃত্তিগুলি ব্যর্থ ও পঙ্গু হওয়ার কারণে সভ্যতার জন্য এত মূল্য দেওয়ার কি দরকার ছিল—ফ্রয়েডের মত এ প্রশ্ন তোলা নিরর্থক। কারণ, পরিবেশের দ্বারা সহজপ্রবৃত্তিগুলির ব্যর্থ ও পঙ্গু হয়ে পড়াকে লাঘব করার ও প্রশমিত করার জন্যই সভ্যতার উদ্ভাবন করা হয়েছিল।

অতএব আধুনিক সভ্যতা যখন যুদ্ধ, বেকারী, বিশ্বব্যাপী অবনতি ঘৃণা ও হতাশায় ভেঙে পড়ছে সেই সময় মনঃসমীক্ষকরা একটা ক্ষুদ্র ভূমিকা পালন করছেন। স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে যে সহজপ্রবৃত্তি ও পরিবেশের মধ্যে একটা বিশ্বব্যাপী সংঘাত রয়েছে এবং সমাজের সমস্ত বিরাট ও বিস্তারিত উপরিকাঠামোটি -ধর্ম, শিল্প, আইন, বিজ্ঞান, রাষ্ট্র, স্বদেশপ্রেম, নীতি রাজনৈতিক লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষা, স্বাধীনতা, আরাম, শান্তি, জীবন নিজেই— এ সব কিছু নাড়া খেয়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছে। অথচ মানুষই এই চমৎকার সৌধটি গড়েছিল তার পরিবেশ ও সহজপ্রবৃত্তির মধ্যকার দ্বন্দ্বকে ফ্রয়েডীয় পরিভাষায় উপলব্ধিপ্রাপ্ত করতে, আমাদের পরিভাষায় সমাধান করতে। বিশাল এই মুমূর্ষু উপরিকাঠামো বিপ্লবীর মনেও ভীতি সঞ্চার করে। বিপ্লবী এই ভাঙনের কারণ দেখতে পান এবং এর জায়গায় অধিকতর জটিল যে কাঠামো গড়ে উঠবে তা দেখতে পেলেও তাঁর মনেও এই ভীতির সঞ্চার ঘটে। কিন্তু এই ভেঙেপড়া উপরিকাঠামোর জায়গায় মনঃসমীক্ষক গম্ভীরভাবে ফ্রয়েডীয় দর্শন বা ইয়ুঙপন্থী পুরাণশাস্ত্রের ক্ষুদ্র জগৎকে প্রতিবিধান হিসাবে তুলে ধরছেন। গোটা ইয়ুরোপব্যাপী মানুষের সম্পদ যে দ্বন্দ্বের সমাধান করতে পারলে না জীর্ণ কাঠকুটো দিয়ে সেই সংঘাতের সুরাহা করার দুরাশা!

এ্যাডলারের দৃষ্টিভঙ্গী আপাতঃদৃষ্টিতে বেশি বাস্তববাদী বলে মনে হয় অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম এবং তার থেকে সৃষ্ট হীনতাবোধ [inferiority complex] ও পরিপূরক কর্মক্ষমতার বিকাশ সম্পর্কে তাঁর তত্ত্বের মধ্যে বুর্জোয়া প্রতিযোগিতা তার চূড়ান্ত পর্যায়ে কি ভাবে মানুষের ব্যক্তিসত্তা ও কর্মক্ষমতার সমস্ত ভালো দিকটার শ্বাসরোধ করে তা তিনি উপলব্ধি করেছেন। পরিবেশকে তিনি স্বীকার করেছেন।

এ্যাড্‌লারের থেকে একটা উদ্ধৃতি দেওয়া যাক :

"যে সভ্যতায় একজন মানুষ অপর একজনের শত্রু—কারণ আমাদের সমগ্র

শিল্পব্যবস্থা সেটাই বোঝায়—সেই সভ্যতার নৈতিক অধঃপতনকে" সমূলে উৎপাটিত করা অসম্ভব, কারণ আমাদের যন্ত্রশিল্পের সভ্যতায় অস্তিত্বের জন্ত সংগ্রাম যেভাবে পরিচিত নৈতিক অধঃপতন ও অপরাধ হল তার উপজাত।

ভালো কথা। এই উক্তির মধ্যে ব্যক্তির উপর পুঁজিবাদের সাধারণ প্রভাবের একটা বিশ্লেষণ আমরা দেখতে পাই। এ্যাডলার কি প্রতিবিধান দিচ্ছেন ?

"এই নৈতিক অধঃপতনকে সীমিত করার ও দূর করার উদ্দেশ্যে আরোগ্য-বিধায়ক অধ্যাপনার একটি অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করতে হবে........"

২

তাহলে আমরা দেখলাম যে জীবনধারণের বাস্তব সমস্যাগুলির প্রতি মনোভাবের ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষকরা ভাববাদী এবং এ ব্যাপারে বড় বড় শ্রেণীভিত্তিক ধর্মগুলি যে ধরনের মনোভাব গ্রহণ করে এঁদের মনোভাবও তার থেকে ভিন্ন নয়। কারণ মানুষের যন্ত্রণা, অস্বাচ্ছন্দ্য ও দুঃখের বিষয়ীগত অনুভূতিগুলি যদি বাহিরের বস্তুগত কারণে না হয়ে পাপ (ধর্মগুলি যেভাবে এটিকে দেখায়) বা কমপ্লেক্সের (মনঃসমীক্ষকরা যেভাবে এটিকে দেখান) কারণে হয়ে থাকে, তাহলে মানুষের যন্ত্রণা, দুঃখ ও অস্বাচ্ছন্দ্যকে আরোগ্য করা যায়। আত্মনিয়ন্ত্রণ, মোক্ষ বা অভিস্ফোটব—সুসংগঠিত কার্যকর ক্রিয়া ব্যতিরেকে বিশুদ্ধ ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগকে যে নামই দেওয়া হোক না কেন—সাধারণ পাপকে দূর করে। প্রকৃতপক্ষে, শ্রেণীভিত্তিক ধর্মের অনেকগুলি আরও এগিয়ে গিয়েছে। বস্তুগত ক্রিয়ার সাহায্যে যন্ত্রণার কোন কোন দিক দূর করার জন্য তাদের উন্নত সংগঠন আছে—উদাহরণস্বরূপ রুগ্ন ব্যক্তিদের সেবা করার জন্য প্রতিষ্ঠান।

যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে মানস বিকশিত হয় এবং সেই পরিবেশের সামাজিক সম্পর্ক থেকে যে বাধা, সম্ভাবনা, অভিযোজন ও আকর্ষণ উদ্ভূত হয়—সেগুলিই যদি মানুষের যন্ত্রণার ব্যাপক এলাকার মূল কারণ হয়, তাহলে যে পরিবর্তনের ফলে হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটান সম্ভব সেইরকম একটা বস্তুগত পরিবর্তনের দ্বারাই সেগুলি দূর করা সম্ভব। এই দৃষ্টিভঙ্গী ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী এবং মনঃসমীক্ষণের দৃষ্টিভঙ্গী দুয়েরই বিরোধী।

বিপ্লবের কথা সম্পূর্ণ বাদ দিয়েই বলা যায় যে "শিক্ষা" দ্বারা একটা

মানসিক আত্ম-পরিবর্তনের দ্বারাই মানুষের সহজপ্রবৃত্তি ও পরিবেশের সংঘাতকে যদি আরোগ্য করা যায় তাহলে মানুষ কলকারখানা, পোষাক, বাড়ি রচনা, ভাষা, শিল্পকলা, ধর্ম, বিজ্ঞান ও রাজনৈতিক সংগঠন এই সব গড়ে তোলার জন্য কষ্ট করেছে কেন? এগুলি সবই সহজপ্রবৃত্তি ও পরিবেশের সংগ্রামের ফল এবং ফ্রয়েড ও ধর্মগুরুরা যদি সঠিক হন তাহলে এগুলি সবই অপ্রয়োজনীয়। কারণ মানুষের দ্বন্দ্বগুলির কারণ সম্পর্কে মানুষের কেবলমাত্র সচেতন হয়ে ওঠার দ্বারাই তার সমাধান করা যেত।

ক্ষুধার মত সহজপ্রবৃত্তির একটা সুস্পষ্ট উদাহরণের সামনে অবশ্য ফ্রয়েড বলতে পারেননি যে বাস্তবের সঙ্গে তার সংঘাতকে খাদ্যের বস্তুগত নিরাময় কৌশল ছাড়া অন্য কোনও উপায়ে নিবৃত্ত করা যেতে পারত। কিন্তু তাঁর তত্ত্বের যুক্তিগত ভিত্তিটা নিশ্চয়ই ভাববাদী বা "যোগী" আর সেইটাই শিল্পকলাকে, মানুষের স্বাধীনতার অন্যতম এক হাতিয়ারকে একটা ছেলেমানুষি ব্যাপার বলে এবং পলায়নমুখী প্রবণতা বলে দেখতে ফ্রয়েডপন্থীদের বাধ্য করেছে। তাঁরা দেখতে পান না যে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যে মানবসুলভ সংঘাত (স্নায়বিক সংঘাত যার একটা বিশেষ রূপ) তা মানুষকে স্বাধীন সংঘবদ্ধতার দিকে চালিত করে এবং শিল্পকলা হল এই সংঘবদ্ধতারই একটা প্রয়োজন, একটা উপায় যার সাহায্যে তা স্বাধীন থাকে এবং যেহেতু তা স্বাধীন সেই কারণে তা যে গভীরতা ও উচ্চতা লাভ করতে সক্ষম, দমনের মধ্য দিয়ে সংঘবদ্ধতা কখনই তা আয়ত্ব করতে পারে না।

সমগ্র মনঃসমীক্ষণমূলক রচনাবলী বুর্জোয়া জ্ঞানতত্ত্বের সেই বদ্ধ জলায় হাবুডুবু খাচ্ছে যেখানে শত শত আলেয়ার ছদ্মবেশে বিষয়ী ও বিষয় পরস্পর অসম্পৃক্ত বিপরীত হিসাবে দেখা দিচ্ছে এবং যেখানে মনের সমস্যাগুলির কোন সমাধান নেই এই কারণেই যে, যে সমাজে সেই আলোচনার সৃষ্টি সেখানে "বস্তু" থেকে "মন" অনেক দূরে সরে গিয়েছে--বিষয়ী ও বিষয় সক্রিয়ভাবে পরস্পরকে আর পরিব্যাপ্ত করছে না এবং সেই কারণে তারা পরস্পরের বিপরীত এই তত্ত্বগত পরিচয় কার্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করছে।

চেতনা কি? অ-চেতন স্তর কি? সহজপ্রবৃত্তি? বাস্তব? মন? বিভ্রম? স্পষ্টতঃই মনোবিদ্যার জন্য এই প্রত্যয়গুলিকে বোঝার প্রয়োজন,—আর এটা কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নয় যে ফ্রয়েডবাদ তার অতি-সরল রূপোপন্থী ভাববাদ নিয়ে কোনও সন্তোষজনক মনোবিদ্যায় পৌঁছতে পারে না।

ব্যক্তি কয়েকটি সহজপ্রবৃত্তি নিয়ে জন্মায়। সেগুলির স্বাক্ষর থাকে তার

ক্রিয়ায় (উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়া) এবং সেই ক্রিয়ার দ্বারা সেগুলি পরিবর্তিত হয় (সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া)। এই সাপেক্ষীভবন [conditioning] চেতনাকে অন্তর্ভুক্ত করে: প্রতিরূপ, চিন্তা, প্রত্যক্ষ ও প্রত্যভিজ্ঞা হল সহজপ্রবৃত্তির সাপেক্ষীভবন।

কিন্তু সহজপ্রবৃত্তির সব সাপেক্ষীভবনগুলিই চেতনা নয়। অচেতন মননের মধ্যে রহস্যজনক কিছু নেই, এটা বোঝা খুবই দরকার। যে পৌনঃপুনিকতা সুস্পষ্টভাবে ভিন্ন, যে আবর্তিত ছন্দ কম্বুগতি [spiral], যে প্রতিক্রিয়া পূর্ববর্তী ঘটনার কারণে পরিবর্তিত, তা মন বা জীবনের নিজস্ব কোনও বৈশিষ্ট্য নয়, তা বাস্তবের প্রক্রিয়ারই সাধারণ বৈশিষ্ট্য। সম, অর্থাৎ, স্থান, বিষমের, অর্থাৎ, কালের প্রবেশ ক্রিয়া দ্বারা সৃষ্ট। এই প্রক্রিয়া একমাত্র যখন জীবনের ক্ষেত্রে নিজস্ব স্বাক্ষর রাখে তখন আমরা তাকে মানসগত বলি, কিন্তু একে সচেতন বলার কোন কারণ নেই, স্বয়ংশাসিত স্নায়ু ব্যবস্থাতে যেমন উদ্দেশ্যপূর্ণ কার্যকলাপকে সচেতন বলার কারণ নেই, এটা তার থেকে বেশি কিছু নয়। অনধিকার প্রবেশকারী হিসাবে কোন জিনিসকে যদি ব্যাখ্যা করতে হয় এবং তার যুক্তি দেখাতে হয় তাহলে সেটা হল চেতনা, অচেতন স্তর নয়। সেটি সম্পর্কে আমাদের তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতাই মাত্র তাকে মেনে নেওয়ার পক্ষে আমাদের যুক্তি।

মনন যে মুহূর্তে সচেতন হয়ে ওঠে সেই মুহূর্তেই তার একটা গুণগত উল্লম্ফন ঘটে এবং তা অবাধ ইচ্ছার ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। অচেতন মননের থেকে সচেতন মনন যে ভিন্ন গুণধর্মসম্পন্ন তা কেবল এই কারণেই যে সেগুলি সচেতন। চেতনা এক প্রকৃত বস্তুগত গুণধর্ম এবং তা মস্তিষ্কের উপবস্তু [epiphenomenon] নয়; মননের ক্ষেত্রে এটা স্বাধীনতার গুণধর্ম।

ব্যবহারবাদীরা এই বলে তর্ক করেন যে অন্যের মধ্যে চেতনা যে আছে এই সিদ্ধান্ত করার কোন অধিকার আমাদের নেই। তাঁরা বলেন যে অন্যদের সমস্ত ক্রিয়াই পর্যাপ্ত উদ্দীপকের সাহায্যে নির্বস্তুতামূলকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। মনের অস্তিত্বহীনতা সম্পর্কে তাদের যুক্তি যতক্ষণ তত্ত্বের ক্ষেত্রে থাকে ততক্ষণ বস্তুর অস্তিত্বহীনতা সম্পর্কে বিষয়ীগত ভাববাদীর যুক্তির মতই তা নির্ভুল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে সেটা ভুল। ক্রিয়াগুলি যখন সচেতন চিন্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তখন তার মধ্যে একটা গুণগত পার্থক্য সম্বন্ধে আমরা নিজেরা সজাগ থেকে অন্যদের সঙ্গে আমাদের সক্রিয় সংযোগের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে অন্যদের ক্রিয়াগুলিতেও একই ধরনের গুণগত পার্থক্য

রয়েছে। অন্যদের সঙ্গে আমাদের আদানপ্রদানে আমরা অন্যদের চেতনার উপর যে পরিমাণে নির্ভর করি এবং যে পরিমাণে সেই আদানপ্রদানগুলি সফল হয় সেই পরিমাণেই আমরা তাদের চেতনার বাস্তবতা প্রমাণ করি।

এই ব্যাপারটি থেকে আমরা চেতনা কি সে সম্পর্কে একটা সন্ধানসূত্র পাই। চেতনা হল সংঘবদ্ধতার ফল: যূথের সংঘবদ্ধতা নয়, সহজপ্রবৃত্তি তার মধ্যস্থতা করে। এ হল অর্থনৈতিক উৎপাদনের জন্য সংঘবদ্ধতা যার মধ্যস্থতা করে চেতনা—মানবগত সহজপ্রবৃত্তির সুনির্দিষ্ট অভিযোজন যার মধ্যস্থতা করে। সাধারণ প্রত্যক্ষজগৎবিষয়ক তত্ত্বের পরিভাষায় আমরা কখনই চেতনাকে প্রমাণ করতে পারি না কারণ এটি সম্পূর্ণতঃ সেই জগৎটিই। একইভাবে আমরা অ-চেতনাকে (non-consciousness) (বস্তুকে) প্রমাণ করতে পারি না, কারণ এটি সম্পূর্ণতঃ সেই জগৎ নয়।

বিষয়গুলি সামাজিক মানুষের জন্য বিষয় হয়ে ওঠে সেই সংবেদের প্রবাহ [flux] থেকে বিষয় নিজেকে বিষয় হিসাবে পৃথক করে তোলে। সূর্য, যা প্রাণীদের কাছে আলোক গতিবৃত্তির [phototropism] এক অস্বীকৃত উৎস মাত্র মানুষের কাছে তা সামাজিকভাবে স্বীকৃত একটা বিষয় হয়ে ওঠে, তা ফসলকে পরিপক্ক করে, তা কাজের দিনের মাপকাঠি, শিকারির কাছে ঘড়ি ও দিকদর্শক যন্ত্র। মানুষের সম্মিলিত কাজের জন্য আকৃতির 'figure' তাৎপর্যের কারণেই প্রত্যক্ষ কেন্দ্র আকৃতি ও ভূমিতে [ground] সংগঠিত। এই সংগঠনের ভিত্তি হল সহজপ্রবৃত্তিমূলক ক্ষুধা কিন্তু তা এক উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়, এবং যে মুহূর্তে তা সমাজের জন্য সংগঠন হয়ে ওঠে সেই মুহূর্তেই তা সচেতন হয়ে ওঠে।

আমাদের আবেগোদ্দীপক জগৎ সম্বন্ধেও একথা সমানভাবে সত্য। সামাজিক জীব। নিজেই যে পরিমাণে অনুভূতি, ভাবাবেগ, অভিরাগ, স্থায়ী প্রবণতা, লক্ষ্য ও আশা-আকাঙ্ক্ষাও লাভ করে —সংঘবদ্ধ মানুষের সম্পর্ক থেকে যা তার স্থায়িত্ব লাভ করে,—যে পরিমাণে সংঘবদ্ধ করে এই সহজপ্রবৃত্তিমূলক সংগীতের প্রবহমান উপচ্ছায়াও সেই পরিমাণেই একটা সমগ্রিক আকার (pattern) লাভ করে ও সচেতন হয়ে ওঠে।

চেতনার রূপদানে ভাষা হল এক বিরাট হাতিয়ার। ভাষাই আমাদের সূর্য, নক্ষত্র, বৃষ্টি, সমুদ্র ইত্যাদি যে সব বস্তু প্রাণীদের কাছে শুধু মাত্র প্রতিক্রিয়া জাগায় [responses] তাদের সচেতনভাবে দেখতে বাধ্য করে। ভাষাই আমাদের সত্য ও সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম করে: কারণ সত্য

হল বাস্তবের একটা প্রত্যক্ষ এবং সাধারণ প্রত্যক্ষ জগতের মধ্যকার সম্পর্ক এবং সৌন্দর্য হল বাস্তবের একটা অনুভূতি-স্বর [feeling tone] ও সাধারণ অহং-এর (common ego) মধ্যকার একটা সম্পর্ক।

এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে মউগ্‌লির মত এক নেকড়ে জাতীয় ধাত্রীমায়ের হাতে পালিত হলে মানুষ যেরকম অচেতন পশু স্তরের মানুষ হয়ে উঠত আর সমাজে প্রকৃতই সে যেরকম সচেতন মানুষ হয়ে ওঠে এই পার্থক্যের কারণ হল বাস্তব সম্পর্কে সেই মানুষের নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং সাধারণ প্রত্যক্ষ-জগৎ ও সাধারণ আবেগোদ্দীপকগত অহং এর মধ্যকার সক্রিয় সম্পর্ক। বিজ্ঞান ও শিল্প এই জগৎকে এবং এই অহংকে প্রসারিত ও বিকশিত করে। বিজ্ঞান ও শিল্প এই জগৎগুলির মধ্যে যে ধরা আছে তা নয়; কর্মমুখর এক সমাজের সমগ্র ধাত্রটির মধ্যে তা নিঃসৃত হয়। বিভিন্ন কারণে বিজ্ঞান ও শিল্প কোন কোন দিক থেকে মূর্ত সামাজিক অভিজ্ঞতার লব্ধ প্রত্যক্ষ বাস্তব ও আবেগোদ্দীপকগত প্রতিন্যাসের [affective attitude] বিরোধিতা বা তাকে অস্বীকার করতে পারে। সেই রকম ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও শিল্প আর মানুষের চেতনার সঙ্গে সংঘাত ঘটছে বলে মনে হয়।

জীবন্ত ঐতিহাসিক বিকাশ হিসাবে প্রকৃতির সঙ্গে সংঘবদ্ধ মানুষের সক্রিয় সংগ্রাম থেকে সাধারণ জগৎ ও সাধারণ অহং সৃষ্ট হয়। আর এই সংগ্রামের সঙ্গে জৈব যোগসূত্রের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির চেতনা গড়ে ওঠে। আবার বলি যে, সাধারণ প্রত্যক্ষ জগৎ ও সাধারণ অহং জেনোটাইপ বা জনিরূপের উপর একটা সুস্পষ্টভাবে স্থিরীকৃত সামগ্রিক আকারের ছাপ দিয়ে দেয় না: যে সমাজের তারা সৃষ্টি এবং প্রতিফলন সেই সমাজের মতই এগুলি হল সেই সব উপায় যার দ্বারা জেনোটাইপ মানসগত ক্ষেত্রে তার স্বতন্ত্র পার্থক্যগুলিকে বাস্তব রূপ দান করে।

এই কারণেই চেতনা ও বিবেকের মধ্যে এত ঘনিষ্ঠ এক সম্পর্ক থাকে: কারণ বিবেক—যা হল সমাজের নীতিবিষয়ক নিয়মগুলির সংক্ষিপ্ত রূপের যে ছাপ পড়ে সেইটি—হল ব্যক্তিগত চেতনার একটা বিশেষ সমন্বয়; ঠিক যেমন সত্য, সৌন্দর্য ও বাস্তব হল অন্যান্য ধরনের সমন্বয় এবং যা একই ধরনের সামাজিক ভূমিকা পালন করে।

এ কথা বলার অর্থ এই নয় যে বিবেকের সংঘাত, বিভক্ত লক্ষ্য, এসব ঘটতে পারে না। একদিকে যেমন প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম কখনই অনাপেক্ষভাবে বিজয়ী হয় না এবং ভূমিকম্প বা ম্যালেরিয়ার আক্রমণ ইত্যাদির

মত "দুর্ঘটনা" যে কোনও বিজয়ের আপেক্ষিকতাই উদ্‌ঘাটিত করে, সেই রকম মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে উন্মাদরোগ, খুন, স্নায়বিক পীড়া বা বিষাদগ্রস্ততা এইটাই উদ্‌ঘাটিত করে যে মানুষের অভিযোজনগুলি নিজেকে বা প্রকৃতিকে পুরাপুরি জয় করা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে নি। মানুষ এখনও সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন নয়। চেতনায় এখনও সম্পূর্ণ সমন্বয় ঘটেনি—বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ধরনের প্রবণতা থাকতে পারে।

উপরন্তু মানুষের স্বাধীনতার হাতিয়ারটিতেই অর্থাৎ সমাজেই যে সব দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় সেগুলি প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রামকে জটিল করে তোলে। এর ফলে স্থানীয়ভাবে নানা ঘাত ও চাপ, বিরাট বিরাট অভ্যুত্থান, বিপ্লব বা সমগ্র সমাজটারই ধ্বংস ও অধঃপতন ঘটে। স্বভাবত:ই মানুষের চেতনায় সেটা প্রতিফলিত হয় যথা নীতিবিষয়ক সমস্যা, পাপবোধ, অপদার্থতা-বোধ ও হতাশা, ব্যাপক মৃত্যু চিন্তা, বিপুল আধ্যাত্মিক প্রয়োজন; বিশ্বাসের ক্ষয়—এই সব আবেগগত বেদনাগুলি সমাজের যন্ত্রণারই অংশ।

আদিম সমাজে, মানুষে মানুষে পার্থক্য তখনও স্পষ্ট হয়নি। বিবেক ও চেতনা সেখানে একইভাবে সরল, সরাসরি ও সমধর্মী এবং সেই কারণেই তাতে গভীরতা ও সতেজভাব থাকে না। আদিম মানব গোষ্ঠিগুলিতে "যৌথ প্রতিনিধিত্ব" এবং একটা অংশগ্রহণগত রহস্য [participation mystique] থাকে বলে মনে হয়। এই চেতনার উপর যখন আঘাত আসে তখন সেই আঘাতকে লঘু করে নেওয়ার মত কোনও জটিলতা বা শক্তির ভারসাম্য থাকে না; ভাঙনটা হয় পুরাপুরি। কোনও আদিম সমাজের ব্যক্তি একবার যদি নিশ্চিন্তভাবে বুঝতে পারে যে সে পাপ করেছে বা তাকে ভূতে পেয়েছে তাহলে খুব তাড়াতাড়িই তার মৃত্যু হয়—তথ্যসংগ্রহকারী নৃতাত্ত্বিকরা (field anthropologist) ভালোভাবেই এই ঘটনার সমর্থন করে থাকেন। তার বিযোজের [dissociation] সহজ সরলতার মধ্যেই তার চেতনার অগভীরতা উদ্‌ঘাটিত হয়। তার মানসকে সহজেই হিস্টিরিয়াতে পরিণত করা যায়। তার অভিভাবন প্রবণতার উচ্চ মাত্রা এবং তার আবেগগত প্রতিক্রিয়ার 'হয় সবটা, নয়ত কিছুই না" জাতীয় প্রকৃতির মধ্যেও সেটা উদ্‌ঘাটিত হয়। তার মনন যে "সভ্য" পৃথকীভূত মানুষের মনন থেকে আরও বেশি অ-চেতন এবং সহজপ্রবৃত্তিধর্মী এই সব হল তারই সাধারণ লক্ষণ।

আমরা যখন জন্মাই তখন কেবল মাত্র যে আদিম মানুষই থাকি তাই নয়, পশুও থাকি। আমাদের সহজপ্রবৃত্তিগুলি জনিগতভাবে অভিযোজিত হয়

না, সামাজিক পরিবেশের দ্বারাই সেগুলির অভিযোজন ঘটে। আমরা ইতোপূর্বেই দেখিয়েছি যে এটাই হল চেতনার সমগ্র অর্থ। আমাদের সহজ-প্রবৃত্তিগত অভিযোজনগুলি যেহেতু অর্জিত, সেই কারণে আমাদের মননে বিভিন্ন ধরনের অচেতনতার স্তর থাকে এবং তা কম-বেশি সহজপ্রবৃত্তিগত। এর বাইরের দিকে একটা সভ্যতার স্তর থাকে, তার নীচে থাকে আরও আদিম একটা স্তর, আরও নীচে থাকে একটা কেবলমাত্র পশুজাতীয় অভ্যন্তর। অনেকদিন ধরেই এটা সাধারণভাবে সকলের জানা; চেতনার সামাজিক ভিত্তি সম্বন্ধে সাধারণভাবে ভুল বুঝলেও অচেতন মননের গুরুত্ব বুঝতে পারা এবং তার অনুসন্ধানের জন্য একটা পদ্ধতি উদ্ভাবন করা মনঃসমীক্ষকদেরই কৃতিত্ব।

যেহেতু বিষয়ী ও বিষয়ের পরস্পরভেদন সম্পূর্ণ, যেহেতু জীবন ও অভিজ্ঞতা সবদাই পরিবেশের সঙ্গে সহজপ্রবৃত্তির সংগ্রাম, সেই কারণে সমস্ত মননের মধ্যে স্বভাবতঃই একটা বহির্বাস্তবের অংশ ও একটা সহজপ্রবৃত্তিমূলক অংশ থাকে। এটা চেতনার বিশেষত্ব নয়, সমস্ত প্রাণধারার প্রতিক্রিয়ারই এটা একটা বৈশিষ্ট্য। এমন কি স্বয়ংশাসিত স্নায়ুতন্ত্রও যে পরিবেশগত প্রভাবে সাড়া দেয় এবং তার দ্বারা সাপেক্ষীকৃত হতে পারে এই ঘটনা থেকে এটাই প্রকাশ পায় যে তারও মননের ক্ষেত্রে একটা "বাস্তব" অংশ আছে। অতএব, স্নায়বিক কার্যকলাপের সমগ্র ক্ষেত্রটি পরিবেশগত বা অর্জিত ফল এবং সহজাত বা সহজপ্রবৃত্তিগত ফল—এই দুইয়ের দ্বারাই পরস্পরভেদিত হয়। আগে মনোবিদ্যা মুখ্যতঃ অর্জিত ফল নিয়েই অর্থাৎ সচেতন ক্ষেত্রের "বাস্তব সামগ্রীগুলি" নিয়েই আলোচনা করত। এমন কি আগেকার মনোবিদ্যার ভাবাবেগ, অনুভূতি ও সহজপ্রবৃত্তি-গুলিও বিষয়গতভাবে গণ্য করা হত এবং সেগুলিকে বাস্তব সামগ্রী হিসাবেই দেখা হত। মনঃসমীক্ষণ সেইজন্য আবিষ্কারের ক্ষেত্র হিসাবে একটা নতুন জগৎ পেয়েছিল। বিষয়গতভাবে নয়, ক্রিয়ার মধ্যে, অর্থাৎ তাদের নিজেদের পরিভাষায় বিবেচিত সহজপ্রবৃত্তিগত বা সহজাত উপাদানগুলিকে মননের ক্ষেত্রে সন্ধান করার ক্ষেত্র হিসাবে পেয়েছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁরা অপর প্রান্তে চলে গেলেন এবং সমস্ত বস্তুগত অংশগুলিকে বাতিল করে দিলেন। তার ফল হল এই যে জীবন সংকীর্ণ হয়ে গিয়ে একটা অন্ধ গতিশীল কামে (libido) গিয়ে দাঁড়াল। মনে হল, এই লিবিডো যেন পূর্বগঠিত একটা সামগ্রী বা বাস্তবের মধ্যেই একটা প্রক্রিয়ার মধ্য থেকে সৃষ্ট না হয়ে তা যেন হয়ে ওঠে এক খৃষ্টীয় আত্মার দেহ ধারণ করে পৃথিবীময় ঘুরে বেড়ান।

মানুষকে যখন আমরা সহজপ্রবৃত্তি আর পরিবেশ এই দুই ভাগে ভাগ করি

তখন আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে মানুষের সহজপ্রবৃত্তি নিজেই পরিবেশগত অভিযোজনের (প্রাকৃতিক নির্বাচন) ফল। কিন্তু সেটা হল সহজাত জৈব অভিযোজন আর মানুষের সচেতন অভিযোজন হল সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে এবং সেই কারণে তা অর্জিত সাংস্কৃতিক অভিযোজন। জৈব বা সহজপ্রবৃত্তিগত আর সাংস্কৃতিক বা সচেতন অভিযোজনের মধ্যে সংঘাত দেখা দিতে পারে। স্বাভাবিক জীবনে এদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব ক্ষেত্র থাকে। পুরাপুরি জৈব অভিযোজন মানুষের পরিপাকশক্তির দিকে নজর দেয় ; পুরাপুরি সাংস্কৃতিক অভিযোজন মানুষের বাড়ির নক্সার দিকে। কিন্তু এদের ক্ষেত্র দুটি পরস্পরের সঙ্গে কোন কোন জায়গায় অধিক্রমণ ঘটায় [overlap] একটা পারস্পরিক বিকৃতি দেখা দিতে পারে। বিশ্রী বাড়িতে মানুষের পরিপাকশক্তির ব্যাঘাত ঘটতে পারে ; আবার তার বাড়ির নক্সা অর্থের তাগিদে—অর্থাৎ নিজেকে খাওয়ানর তাগিদে তৈরি করা হতে পারে। এমন একটা শিল্পকলা হয়ে ওঠে। শিল্পকলা হয়ে ওঠে ভরণপোষণের কার্যকলাপ। মনঃ-সমীক্ষণ এই বিকৃতি ও অধিক্রমণের সমীক্ষা করেছে। জৈব সহজপ্রবৃত্তিগুলি যেহেতু চেতনার ক্ষেত্রে আবেগ ও অনুভূতি-সুর সৃষ্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত (যথাযথ যোগসূত্রটি এখনও পর্যন্ত সন্তোষজনকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি), সেই কারণে সহজপ্রবৃত্তি দ্বারা চেতনার (নির্বাসনমূলক ইচ্ছা সহ) বিকৃতি সম্বন্ধে মনঃ-সমীক্ষণের সাহায্যে সমীক্ষা প্রধানতঃ মানুষের চিন্তা ও কর্মের উপর আবেগগত অনুষঙ্গ ও মাত্রাগুলির প্রভাব সম্বন্ধে সমীক্ষা হয়ে উঠেছে। এবং যেহেতু আমরা ইতোমধ্যেই শিল্পকলার দ্বারা চেতনার আবেগোদ্দীপকগত উপাদানগুলির একটি সাধারণ অহংয়ে সংগঠিত হওয়ার বিষয়টি আলোচনা করেছি সেই জন্য এটা সুস্পষ্ট যে শিল্পকলা বোঝার ব্যাপারে মনঃসমীক্ষণের আবিষ্কারগুলি অবশ্যই এক গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক।

৩

মননের কোন সন্তোষজনক শ্রেণীবিভাগ এখনও পর্যন্ত প্রস্তাবিত হয় নি। প্রতিরূপগুলির প্রবাহ (সেগুলি যে দৃশ্য প্রতিরূপই হতে হবে তা নয়) আমাদের আলোচ্য। সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ বা স্মৃতি থেকে এগুলিকে সুনির্দিষ্ট করার জন্য আমি এদের নাম দিতে চাই অলীককল্পনা বা phantasy। এগুলির নিম্নোক্ত শ্রেণীবিভাগ আমরা ব্যবহার করব: (ক) স্বপ্ন, (খ) দিবাস্বপ্ন বা reverie (গ) অবাধ অনুষঙ্গ, (ঘ) উদ্দেশ্যপ্রণোদিত চিন্তা বা Directed Thinking, (ঙ) উদ্দেশ্য প্রণোদিত অনুভূতি।

মনঃসমীক্ষণবাদীদের আগে পর্যন্ত কোনও মনোবিদ স্বপ্ন সম্বন্ধে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেননি। ফ্রয়েডের কল্যাণে এই বিষয়টিকে বাদ দেওয়ার অযৌক্তিকতা এখন আমাদের নজরে পড়ছে। স্বপ্ন তার আদিম চরিত্র ও অদ্ভুৎ লক্ষণের কারণে অলীককল্পনার প্রকৃতি ও চিন্তার ভূমিকা সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোকপাত করে।

স্বপ্নের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্যান্য ধরনের চিন্তা থেকে তাকে সুনির্দিষ্টভাবে পৃথক করে তোলে। এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে যেটি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ তা হল এই যে, এতে চিন্তা ঘনীভূত, অতিক্রান্ত (displaced) ও রূপান্তরিত প্রত্যক্ষের স্মৃতি-প্রতিরূপগুলি—বাস্তব পরিবেশের স্থান গ্রহণ করে। স্বপ্নের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এটি। অলীককল্পনার অন্যান্য সব ধরনের রূপের ক্ষেত্রে চিন্তাকারী তার নিজের পরিবেশ সম্বন্ধে অস্পষ্টভাবে তখনও সচেতন থাকে এবং তার খেয়ালের সৃষ্টিগুলির মধ্যে সে নিজেকে স্থাপিত করে না, সেগুলিকে সে অব্যবহিত পরিবেশের মর্যাদা দেয় না। স্বপ্নদর্শনকারী সেটি করেন। সেই কারণে অব্যবহিত [immediate] পরিবেশ মনোযোগের লক্ষ্যবস্তু হলে যেমন তার সর্বদা একটা সুস্পষ্টতা ও নিটোল যথাযথভাব থাকে সেইরকম এই খেয়ালের সৃষ্টিগুলিও সুস্পষ্টতা ও নিটোল যথাযথভাব লাভ করে।

চিন্তার এই "বস্তুরূপলাভ" হল অন্তর্মুখিনতার ফল, পরিবেশ থেকে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য মনোযোগ সরিয়ে নেওয়ার ফল। এই অন্তর্মুখিনতা দিয়েই নিদ্রা ...বি। ত্বকের অবশতা যাদের হয় সেই রোগীদের নিদ্রা আসার জন্য চোখ বুজলেই চলে—ঘরটি অবশ্য নিঃশব্দ হওয়া চাই। অন্ধকার, নিঃশব্দতা, মানসিক শূন্যতা—নিদ্রার এই সব সহায়কগুলি হল বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উত্তেজকগুলিকে কমানর উপায়।

অর্থাৎ স্বপ্ন চিন্তার বস্তুধর্মিতা ও সুস্পষ্টতা হল আপেক্ষিক মাত্র। স্বপ্নে দেখা মুখ, রূপ শব্দ ও দৃশ্য যদি কেউ স্মরণ করতে পারেন তাহলে দেখা যাবে য সেগুলি সবই অস্পষ্ট, আবছা, বর্ণহীন ও ছিন্নবচল, অনির্দিষ্ট ও অসম্পূর্ণ। কিন্তু যেহেতু এক্ষেত্রে সেগুলির সঙ্গে বিরোধ ঘটার মত কোনও বাহ্যিক ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বাস্তবের অস্তিত্ব থাকেনা সেই কারণে সেগুলি পরিবেশের মর্যাদা ও সুস্পষ্টতা গ্রহণ করে। মনোযোগের এই ঘনীভূত হওয়ার কারণে স্বপ্নের বস্তুগুলি তাদের বাস্তবতা ও সুস্পষ্টতা লাভ করে কিন্তু তাদের নিজেদের অভ্যন্তরীণ সুসংগতিলাভ ঘটে না। বরং স্বপ্নের বস্তুগুলি অবিন্যস্ত ও জোড়াতালিদেওয়া।

সাধারণ "অবাধ অনুষঙ্গ"—জাগ্রত অবস্থায় মন স্বাধীনভাবে বাইরের প্রতি সচেতন মনোযোগ ব্যতিরেকে যে প্রতিরূপগুলি সৃষ্টি করে তাদের একের সঙ্গে অপরের অনুষঙ্গগুলি নিয়ে ইয়ুঙ অনুসন্ধান করেছেন। স্বপ্ন হল অবিচ্ছিন্ন অবাধ অনুষঙ্গের একটা বিস্তারিত রূপ, যার মধ্যে অলীককল্পনার অবাধ প্রবাহ পরিবেশের বস্তুগত বাস্তবতা লাভ করে। স্বপ্নের এই অধিকতর বিস্তারিত অবাধ অনুষঙ্গের প্রক্রিয়া উদ্‌ঘাটিত করেছেন ফ্রয়েড।

সুররিয়ালিজমের করণকৌশলের ভিত্তি এই অবাধ অনুষঙ্গের উপর প্রতিষ্ঠিত। এইভাবে সুররিয়ালিজম এক স্বতঃস্ফূর্ত শিল্পসম্মত সৃষ্টি গড়ে তোলার আশা করে। স্বাধীনতা হল প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অজ্ঞতা—এই ধ্রুপদী বুর্জোয়া বিভ্রমই কেবলমাত্র তাতে প্রকাশ পায়। ফ্রয়েড ও ইয়ুঙ-এর পরীক্ষাগুলি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে যে স্বপ্ন বা অবাধ অনুষঙ্গ প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হওয়া দূরে থাক, তারা অচেতন প্রয়োজনীয়তার লৌহকঠিন নির্বন্ধতারই অধীন। সহজপ্রবৃত্তিগত চালিকাশক্তির বিকৃতিকে কমপ্লেক্স বা গ্রন্থি বলে। সেই কমপ্লেক্সগুলিই অলীক কল্পনাকে ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ খাতে প্রবাহিত হতে অমোঘভাবে বাধ্য করে।

খেদোন্মত্তের (manie) সৃষ্টি সম্পর্কে ম্যাককার্ডি যে গবেষণা করেছেন তা থেকে আপাতঃ স্বতঃস্ফূর্তভাব অন্তরালে সেই একই কঠোর নিয়ম যে কাজ করে তা দেখা গেছে। দীর্ঘকালব্যাপী সাংকেতিক লিপির সাহায্যে লেখা বিবরণের সযত্ন বিশ্লেষণ থেকে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে খেদোন্মত্তের ক্রোধোন্মত্ত উক্তির আপাতঃ অনায়াস ও বিস্ময়করভাবে বিপুল প্রবাহ সবটাই প্রকৃতপক্ষে কোন না কোন শিশুসুলভ সরল ইচ্ছা দ্বারাই নির্ধারিত হয়। একবার এই অচেতন নিয়মটা প্রকাশিত হলে দেখা যায় যে এই ক্রোধোন্মত্ত উক্তিটা কয়েকটি স্থূলতম প্রতীকের সীমানার মধ্যে দোলায়িত কয়েকটি চিন্তা ছাড়া আর কিছুই নয়।

স্বপ্নের কাজ কি? ফ্রয়েড এবং রিভার্স এ বিষয়ে একমত যে স্বপ্ন হল শরীরবিদ্যার দিক থেকে "নিদ্রার অভিভাবক"। যে সব উদ্দীপক নিদ্রিত ব্যক্তিকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করতে পারে—অর্থাৎ জাগিয়ে তুলতে পারে—সেগুলি যদি আবেগমূলক না হয় তাহলে তাদের অ-ক্রিয়াবাদী বা non motor খাতে প্রবাহিত করে। ঘণ্টাধ্বনির মত যার ধ্বনি স্বপ্নের সঙ্গে জড়িত হয়ে যায় সেইরকম কেবলমাত্র বাহ্য উদ্দীপকগুলিই নয়, অভ্যন্তরীণ উদ্দীপকগুলিও, যেমন বেদনা, ক্ষুধা, যৌন আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি, সহজপ্রবৃত্তিগত কামনার সমস্ত

নবজাত আলোড়নগুলিও—যা এমনকি কুকুরকেও ঘুমের মধ্যে দৌড়ানর গতিভঙ্গী গ্রহণ করায় সেগুলিও এই সব উদ্দীপকের অন্তর্ভুক্ত।

ফ্রয়েড এটাও লক্ষ্য করেছিলেন যে এই ব্যাখ্যায় ব্যাপারটা চুকে যায় না। যদি মেনে নেওয়াও যায় যে ব্যাঘাতসৃষ্টিকারী উদ্দীপকগুলি সত্ত্বেও স্বপ্ন মানুষকে নিদ্রিত অবস্থায় থাকতে সক্ষম করে তবুও প্রশ্ন থেকে যায় যে স্বপ্নগুলি তাহলে বিশেষ রূপ নেয় কেন? ফ্রয়েড দেখিয়েছেন যে স্বপ্নগুলি বাহ্যিক উদ্দীপককে যেভাবে সাড়া দেয় তা অলীককল্পনামূলক রূপ নিতে বাধ্য। এটা খুবই দুঃখের ব্যাপার যে স্বপ্নের এই সাধারণ গুণধর্মকে তিনি "ইচ্ছা-পূরণ" ["wish-fulfilment"] নামে বিশেষ গুণধর্ম বলে বর্ণনা করেছেন যা তাঁর অনুগামীদের ভুল পথে চালিত করেছে এবং ব্যবহারবাদ ও গেস্টাল্ট মনোবিদ্যার অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে মনঃসমীক্ষণকে পৃথক করার দিকে এগিয়ে গেছে।

মনে করা যাক একজন নিদ্রিত ব্যক্তিকে ডাকা হচ্ছে। ডাকটা তার স্বপ্নের মধ্যে প্রবেশ করে, এর সক্রিয় প্রতিক্রিয়াটি সাধারণভাবে লোকটির জেগে ওঠার রূপ নিত। সেই লোকটির অলীককল্পনাগত প্রতিক্রিয়া সেইজন্য সে যেন জেগে উঠছে এই স্বপ্নের রূপ নেয়—এ অভিজ্ঞতা আমাদের অনেকেরই আছে। একইভাবে কোন নিদ্রিত ব্যক্তি যদি ক্ষুধার তাড়নায় তাড়িত হয়, তার জাগ্রত হওয়ার প্রতিক্রিয়া হত খাওয়ার এবং সেইজন্য ক্ষুধার্ত অভিযাত্রী ক্রমাগত খাদ্যের স্বপ্নই দেখে থাকে।

অবশ্যই এটা "ইচ্ছা-পূরণ"। কারণ অলীককল্পনাগত কোন স্বপ্ন তার জেগে ওঠার বা খাওয়ার ইচ্ছাই পূরণ করে। কিন্তু সাধারণ বর্ণনা হিসাবে ইচ্ছা-পূরণ কথাটি আমাদের ভুলপথে চালিত করে। "ইচ্ছা" একটা পারিভাষিক শব্দ যা সাধারণতঃ একটি সচেতনভাবে স্থিরীকৃত লক্ষ্য সম্পর্কেই ব্যবহার করা হয় এবং তার ব্যবহার স্বপ্নের অলীককল্পনাগত প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে জাগ্রত জীবনের সক্রিয় প্রতিক্রিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে এখানে গোপন করে রাখছে। প্রাত্যহিক জীবনে যে সব অসংখ্য উদ্দীপক আমাদের কর্মে উদ্বুদ্ধ করে—কোনও আদেশ, কোনও প্ররোচনা, কোনও দৃশ্য সামগ্রী, ঔৎসুক্য, স্মারকলিপি, চিঠি, তীব্র যৌন আকাঙ্ক্ষা—এদের ইচ্ছা বলা যেতে পারে, কারণ স্পষ্টতঃই কোনও কাজ করার জন্য আমাদের মধ্যে কোন সহজপ্রবৃত্তিগত গতিশীলতা না থাকলে আমরা কোনও কাজই করতাম না। কিন্তু এই [illegible]নের কাজের বা স্বপ্নে তাদের তুল্য অলীককল্পনাগত রূপ সম্পর্কে "ইচ্ছা-[illegible]" এই পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করলে সেগুলিকে একটা অদ্ভুত ও

খামখেয়ালি রূপ দেওয়া হয় এবং "অপছন্দসূচক" স্বপ্ন ও "অতৃপ্তিকর" স্বপ্নকে ব্যাখ্যা করতে ফ্রয়েডকে অসুবিধায় ফেলে। মূর্ত জীবনের বিষয়ী-বিষয়গত সম্পর্কগুলি সম্পর্কে ফ্রয়েডের ভাববাদী বিষয়ীগত দৃষ্টিভঙ্গীরই এটা প্রতিফলন।

স্বপ্ন সচেতন। আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি যে চেতনার তথ্যমূলক উপাদানগুলি সামাজিকভাবে সুনির্দিষ্ট এবং ভাষা শিক্ষা ও সামাজিক সংযোগের দ্বারা মানুষ দেখতে পায় যে তার সহজপ্রবৃত্তিগত প্রতিক্রিয়াগুলিকে সাধারণ জগৎ ও সাধারণ অহং দ্বারা সাপেক্ষীকৃত হয়েছে ও চেতনার মর্যাদা পেয়েছে। অতএব স্বপ্নের মধ্যেও সমাজ মানুষের সঙ্গে থাকে। সামাজিক অহং এমন কি স্বপ্নের মধ্যেও সামাজিক জগতে মানুষের বাসনাগুলিকে অলীককল্পনার দিক থেকে পূর্ণ করে।

উপযুক্ত উদ্দীপকের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় মানুষ সামাজিক জগতে জেগে উঠতে পারে বা থেকে পারে। কিন্তু অনুষঙ্গের সর্তগুলি এই দাবি করে যে কোনও মানুষকে আঘাত করা বা কোনও রমণীকে চুম্বন করার সহজপ্রবৃত্তিগত বাসনা পূর্ণ করা সম্ভব নয়। সেইজন্ত সামাজিক জগতে এই ধরনের বেআইনী বাসনার সেই দুটি পরিণতির যে কোনও একটি ঘটতে পারে ফ্রয়েড যার নাম দিয়েছেন "অবদমন" ও "উদ্গতি"। ['repression' and 'sublimation']

বাসনাকে যখন আমরা "অবদমন" করি তখন ইচ্ছার প্রয়াসের দ্বারা সেটিকে সচেতন ক্ষেত্র থেকে বাতিল করে দিই। আমরা কিন্তু ইতোমধ্যেই দেখেছি যে চেতনা সহজপ্রবৃত্তিগত প্রতিক্রিয়ার "সামাজিকীকরণ" বা সভ্যতার সঙ্গে তাকে মানিয়ে নেওয়ার অনুযায়ী হয়ে থাকে। ফলে, যে বাসনার একটা সচেতন পোষাক থাকে তার বর্বর নগ্নতাকে ইতোমধ্যেই পোষাক পরানো হয়েছে; ইতোমধ্যেই তা অর্ধ-সভ্য। এই ধরনের কোনও বাসনা যখন এমন তীব্র হয়ে ওঠে যে তা অন্য স্বার্থ (অর্থাৎ, অন্যান্য সহজপ্রবৃত্তিগত চালিকাশক্তি) দ্বারা বাতিল হয় না, বরং তাকে ইচ্ছার কার্য দ্বারা অ-চেতনের ক্ষেত্রে জোর করে অবদমিত করতে হয় তখন এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এই অবদমনই সেই বাসনার উপর শিক্ষাদীক্ষার যে পালিশ পড়েছে তা ঘুচিয়ে দেয় এবং তাকে বর্বর ও বন্য করে তোলে। অতএব, অবদমনের কুফলগুলি, ফ্রয়েডপন্থীরা যা দেখিয়ে দিয়েছেন, ঠিক সেই কাজের ফলেই ঘটে যে কাজটি সেগুলির সামাজিক অভিযোজন ঘুচিয়ে দেয় এবং সেগুলিকে বন্য বন্দী করে তোলে। সচেতন বাসনাগুলির-এই বর্বর হয়ে ওঠা থেকেই জন্ম নেয় সত্তার প্রচণ্ড

নিষ্ঠুরতা, পিউরিটানদের তিক্ততা এবং হোলি ইনকুইজিশনের অকথ্য অত্যাচার।

উদগতির ক্ষেত্রে সহজপ্রবৃত্তিগুলিকে একটা সামাজিক অভিযোজন দেওয়া হয় যা সেগুলিকে চেতনার মধ্যে নিজেদের তৃপ্ত করতে অনুমতি দেয়। একটা "কড়া" চিঠি লেখা, বিপজ্জনক খেলায় বা অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা-এগুলি হল সেই সব উপায় যার মধ্যে আমাদের সহজপ্রবৃত্তিগত ইচ্ছাকে একটা সচেতন পোষাক পরাতে সমাজ আমাদের অনুমতি দিয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে পাল্লা কষা, আমাদের ঘৃণাকে একটা সৃজনশীল বস্তুগত নিক্রমণ পথ দেওয়া, এগুলি হল উদগতির আরও উচ্চতর রূপ। নৃত্য, প্রেমের কবিতা রচনা, যে রমণীকে ভালোবাসি তাকে সেবায় বা লেখায় প্রশংসা জানানো—এই সব পথে আমরা আমাদের যৌনতাকে সভ্যরূপ দিই। এইভাবে এই সব সহজপ্রবৃত্তিগুলি, যার অন্ধ শক্তি আমাদের তাদের অন্ধ ক্রীতদাসে পরিণত করতে পারে সেগুলি আমাদের তাদের প্রভু বলে স্বীকার করে এবং আমাদের স্বতঃস্ফূর্ততাকে বাড়িয়ে তোলে, কারণ সেগুলিকে একটি সচেতন এবং সেইজন্য সামাজিক অভিযোজন দেওয়া হয়। এখানেও দেখা যায় যে স্বাধীনতা হল প্রয়োজনীয়তা সম্পর্ক সচেতনতা।

কিন্তু উদগতির সম্ভাবনার বিস্তার, চেতনার এবং সেইকারণে স্বতঃস্ফূর্ততার বিস্তৃতি, আদর্শ জগতে স্থিরীকৃত নয়। তা হল সামাজিক সৃষ্টির একটা অংশ এবং সমাজের সমস্ত স্বাধীনতার মত এটিও শ্রম দ্বারাই সৃষ্ট হয়। অতীত চেতনার অধিকাংশটাই এবং সেই কারণে উদগতির সর্বাধিক বিস্তারটিও যে শ্রেণী সামাজিক সৃষ্টির অধিকাংশ অধিকার করেছিল তার ভাগেই পড়েছে, আর অন্য শ্রেণীর জন্য বিশ্রাম ও খাদ্যের জন্য সেই শ্রেণীর সামাজিকভাবে রুদ্ধগতি বাসনাগুলির উদগতি ধর্মের এবং স্বপ্নস্বর্গের অলীককল্পনামূলক কাঠামোর রূপ দিয়েছে।

স্বপ্নের "অহং" হল সেই সামাজিকীকৃত "অহং"টি, সাধারণ অহং-এর সংস্পর্শে রূপান্তরিত সহজপ্রবৃত্তিগত, অচেতন, জনিরূপগত অহং। স্বপ্নের জগৎ হল সেই সাধারণ প্রত্যক্ষ জগতের দ্বারা রূপান্তরিত পরিবেশের প্রতি সহজপ্রবৃত্তিগত প্রতিক্রিয়ার জগৎ। এই কারণেই বাস্তব জীবনের মত স্বপ্নেও ক্ষুধা ও জেগে ওঠার তাগিদে প্রত্যক্ষ [direct] অলীককল্পনা দ্বারা তৃপ্ত হয়—আমরা খাওয়ার বা পোষাক পরার স্বপ্ন দেখি—অথচ অন্য মানুষকে হত্যা বা ধর্ষণ করার সহজ-প্রবৃত্তিগুলির উদগতি ঘটে, অথবা ফ্রয়েড যেভাবে কথাটা বলেছেন, তা

"মনের প্রহরীর দ্বারা বিকৃতিগ্রস্ত হয়" ["distorted by the censor"]। অবশ্যই সহজপ্রবৃত্তি হিসাবে এগুলি হত্যা করারও নয় বা ধর্ষণ করারও নয়—কারণ বা হত্যা বা ধর্ষণ হল সামাজিক ধারণা, যৌনতা ও আত্মরক্ষার অচেতন সহজপ্রবৃত্তির বা অজানা। চেতনার নিজস্ব পরিভাষায় অচেতনতার আলোচনা করতে হলে এই শব্দগুলিকে ব্যবহার করতেই হয়।

একটা পৃথক মানসনিহিত মনের প্রহরীর [endo-psychic censor] ধারণাটি স্পষ্টতঃই একটা বিমূর্ত ধারণা। প্রকৃতপক্ষে এই মনের প্রহরী এবং "সে" যে বিকৃতি সৃষ্টি করে তা মানসের কোনও বিশেষ বিভাগের কাজ নয়, বরং তা চেতনার নিজের প্রকৃতির মধ্যেই প্রদত্ত। কোনও স্নায়বিক "স্মৃতি-পথচিহ্ন" ["engram"] যার কার্যকলাপ স্বপ্নচেতনার একটা অংশ তাকে স্বতঃতঃই কিছু সামাজিক নিয়ম মেনে চলতে হয়, কারণ সেই চেতনাই হল পোষাক বা প্রসাধনের মত একটা ব্যাপার—সে যে সভ্য হয়েছে তারই একটা চিহ্ন।

তাহলে স্বপ্নের মধ্যে কেন আমরা নিজেদের সেই সব কাজ করতে অনুমতি দিই যে সব কাজ বাস্তব জীবনে করতে আমরা লজ্জা পাই? স্বপ্নের এই নৈতিক শৈথিল্য সৃষ্ট হয় দুটি কারণের মিশ্রিত প্রভাবে। আগেই বলা হয়েছে যে জনিরূপ কেবল যে বন্য হয়েই জন্মগ্রহণ করে তা নয়, সে পাশবও, এবং সেই কারণে চেতনার বিকাশ হল বাইরে থেকে একটা আকৃতিলাভ করা, অকত গাছের গুঁড়ি থেকে খোদাই করা। চেতনার সূত্রপাত ঘটে আত্মস-চেতনতা থেকে, পরিবেশ থেকে নিজেকে অসম্পৃক্ত করা হিসাবে, কিন্তু কেবল মাত্র এইটি থেকেই চেতনা গড়ে ওঠে না; এক অর্থে এটি তার বিপরীতই এবং তা সহজপ্রবৃত্তিই মাত্র। একমাত্র যখন আত্মসচেতনতা পরিবেশের উপর ফিরে এসে পড়ে এবং অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিবেশের ছাপ নিজের উপর ফেলে তখনই তা বাস্তব সম্পর্কে, "অন্য কিছু ব্যাপার" সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। এটা একটা সামাজিক প্রক্রিয়া। নিজের চারপাশ সম্পর্কে আগ্রহী হওয়ার দ্বারা এবং সক্রিয় অভিজ্ঞতার সাহায্যে সেগুলি সম্পর্কে শিক্ষালাভ করার মধ্য দিয়ে শিশু সচেতন হয়ে ওঠে। যেহেতু ভাষা ও সামাজিক কার্যকলাপের সাহায্যে সে এই কাজ করে সেই কারণে বাস্তব সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা হল সাধারণ প্রত্যক্ষ জগতের বিপুল জটিল বাস্তবতার সম্পর্কেই অভিজ্ঞতা। নিদ্রার অন্তর্মুখিনতার মধ্যে পরিবেশ মগ্ন হয়ে যায় এবং সেইজন্য তার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবের সামাজিক জগতের অনেকটাই লোপ পেয়ে যায়। আমাদের প্রবণতা দেখা যায় বাল্য-

কালের অন্তর্মুখিনতার দিকে এবং শৈশবের সেই সবে-দেখা-দেওয়া আত্ম-সচেতনতার দিকে যার মধ্যে "অহং"ই হল সব কিছু এবং বাহ্যিক বাস্তবতা তখনও একটা অস্পষ্ট বিশৃঙ্খলতা মাত্র। স্বপ্নের অপ্রচলিত [archaic] ও শিশুসুলভ চরিত্রই যে মাত্র এ দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় তাই নয়, স্বপ্নের বিশ্লেষণও যে শৈশবের অভিজ্ঞতার প্রভাবকে কতটা পরিমাণে উদ্ঘাটিত করে তারও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এ থেকে। আমরা যখন নিদ্রা যাই আমাদের মন তখন শিশুর মত দেখায়। একই কারণে স্বপ্নে মা, গর্ভে ফিরে যাওয়া, অবৈধ আত্মীয়-কামনা এবং অন্যান্য সমস্ত ফ্রয়েডীয় উদ্দেশ্যগুলি [motives] একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্বপ্নের "অহং" এত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও একটা ক্ষুদ্র অহং মাত্র। কারণ, সামাজিক জীবনই হল সেটাকে বস্তুর রূপদান করার উপায়। স্বপ্নের জগতের মত স্বপ্নের "অহং"ও কেবলমাত্র আংশিকভাবে সামাজিকীকৃত। স্বপ্ন বাস্তব থেকে দুদিক হতে অসম্পৃক্ত—বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ। কোনও দিক থেকেই তা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়—তার বন্ধন শিথিল এই মাত্র।

স্বপ্ন এবং জীবনের পার্থক্যের বিষয়টি হিসাবের মধ্যে না রেখে স্বপ্ন থেকে জীবনের কথা সিদ্ধান্ত করাটা ভুল। এই পার্থক্য হল জীবনে পরিবেশের অধিকতর সক্রিয় ভূমিকাটি যার সচেতনভাবে প্রত্যক্ষীকৃত রূপটি হল একটা সামাজিক কাঠামো [construct]। আমরা একটা জনিরূপ হয়েই জন্মগ্রহণ করি—কেবলমাত্র সহজপ্রবৃত্তিমূলক। আমরা আত্ম-সচেতন হয়ে উঠি, এবং পরিবেশের সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়া দ্বারা সহজপ্রবৃত্তির অভিযোজন লাভ করি যা আমাদের শিশুসুলভ সচেতনতা ও শিশুসুলভ আশা আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্যগুলিকে নির্ধারিত করে। আমরা যখন সাবালক হয়ে উঠতে থাকি চেতনার বৃদ্ধিও তার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটতে থাকে—অর্থাৎ, পরিবেশের সঙ্গে আমাদের বালকসুলভ বাসনাগুলিরও আরও অনেক বেশিদূর-প্রসারী অভিযোজনও ঘটতে থাকে। আমাদের শিশুসুলভ সচেতনতা দ্বারা আমাদের সাবালক অবস্থার সচেতনতা নির্ধারিত হয় না। আমাদের সহজপ্রবৃত্তিমূলক জনিরূপ দ্বারা আমাদের শিশুসুলভ সচেতনতা যেটুকু নির্ধারিত হয়ে থাকে তার থেকে সেটা বেশি কিছু নয়। একটা পার্থক্য আছে। সেটা হল অভিজ্ঞতার পার্থক্য এবং এই অভিজ্ঞতা নির্ভর করে সমাজে বাস করার ফলে পরিবেশের গভীরতর ভেদনের উপর। আমরা বেঁচে থেকেছি, সেই জন্যই আমরা পরিবর্তিত হয়েছি। ফ্রয়েডতত্ত্ব স্বপ্নকে তার স্বীয় মূল্যে গ্রহণ করে,

চেতনার এই অভিযোজনগুলিকে সহজপ্রবৃত্তির উপর বন্ধন বা বাজে বলে নিরত বাতিল করে দেয়। এই অভিযোজনগুলি যে পরিবেশের সঙ্গে সহজপ্রবৃত্তির সংগ্রাম থেকেই সৃষ্ট হয় এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি এই তত্ত্বে লক্ষ্য করা হয় না। এই অভিযোজনগুলি বাদ দিলে সহজপ্রবৃত্তিগুলিও আরও কম স্বাধীন হয়ে পড়ে। কচ্ছপ বা কাঁকড়ার শক্ত খোলাটা বাদ দিলে তাকে স্বাধীন করা হয় না এবং তাকে পরিবেশের প্রয়োজনের সামনে নগ্ন করে ধরা হয়। এই অভিযোজনগুলির আপেক্ষিকভাবে রুদ্ধগণ্ডী হয়ে পড়ার সম্ভাবনাটি এতে অবশ্য বাদ পড়ে না—বস্তুগত অবস্থার পরিবর্তন দ্বারা ইতোমধ্যেই অন্যান্য যে অভিযোজনগুলি সম্ভব হয়েছে সেগুলির স্বাধীনতার সঙ্গে তা আপেক্ষিকভাবে রুদ্ধগণ্ডী। উদাহরণ স্বরূপ ক্যাকটাসের কণ্টকবহুল বহিরাবরণ মরু অঞ্চলে তার অবাধ বিকাশ সম্ভব করে কিন্তু সেটা যদি সরস হয়ে ওঠে তাহলে এই বহিরাবরণ ক্যাকটাসের বিকাশ রুদ্ধ করবে এবং হয় তার ত্বক বাতিল হয়ে যাবে, না হয় আরও পাতলা শাঁসওয়ালা ছোট ছোট গাছের ভিড়ে সে চাপা পড়ে যাবে। মানুষের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটি আরও বেশি জোরালো ভাবে ঘটবে, কারণ মানুষের সামাজিক সংগঠন তার উৎপাদিকা শক্তিগুলির অবিরাম ও দ্রুত পরিবর্তন সুনিশ্চিত করে।

অর্থাৎ স্বপ্নের এই শিথিলতার ধর্মটি তার শিশুসুলভ গুণধর্মের দ্বারা আংশিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। আমাদের সামাজিক সাপেক্ষীভবন পরিবেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। তার কারণ ইতোপূর্বেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পরিবেশগত শক্তি যত দুর্বল হয় আমাদের অভিযোজনও তত কমে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। আমাদের বাড়ির গণ্ডী থেকে দূরে, বা বন্ধুমহলে বা বিদেশে আমরা কি রকম ভিন্ন ধরনের ব্যবহার করে থাকি তা আমাদের সকলেরই জানা আছে। আমরা জানি যে ক্রোধের সহজপ্রবৃত্তিগত বিস্ফোরণ বা পানোন্মত্ত অবস্থায় অসামাজিক ব্যবহারের সময় পরিবেশের বাস্তবতার লাঘব ঘটে থাকে, "কোথায় আছি খেয়াল ছিল না।" নিদ্রার মধ্যে অন্তর্মুখিনতা পরিবেশের চূড়ান্ত বাস্তবতা ঘুচিয়ে দেয়, ফলে সেই অনুযায়ী সামাজিক সুসম্বদ্ধতার শিথিলতা দেখা দেয়, স্বপ্ন যতক্ষণ সচেতন থাকে ততক্ষণ অবশ্য সেটা একেবারে লোপ পায় না; অথচ তার মূল্য থাকতে হলে তাকে সচেতন হতেই হবে, কারণ সহজপ্রবৃত্তিগুলি তাদের দীর্ঘকালের সাপেক্ষীভবনের জন্য, সামাজিকভাবে স্বীকৃত বাস্তবের ভিত্তি ব্যতীত কাজ করতে পারে না এবং এই ধরনের সমস্ত বাস্তবই সচেতন।

স্বপ্নের অপ্রচলিত ও সহজপ্রবৃত্তিগত প্রকৃতির কারণে স্বপ্নের সচেতন উপাদান যে বাস্তব দিয়ে গঠিত তা জাগ্রত চেতনার বাস্তবের তুলনায় স্থূল ও সীমাবদ্ধ। যে বাহ্যিক বাস্তব স্বপ্নের মধ্যে "স্বপ্নের-চিন্তা" হিসাবে দেখা দেয় কেবল যে সেই ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য তা নয়, যে অভ্যন্তরীণ-বাস্তব, যে "অহং" সেগুলির অভিজ্ঞতা অর্জন করে সেই ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। এই "অহং" হল এক নীচ, ক্ষুদ্রমনা ও স্বার্থপর "অহং"। এই "অহং"-এর মধ্যে আমরা কোনও মহত্ব বা বিরোচিত গুণ দেখতে পাই না, বরং এ এমন কিছু করে না যা নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি। এমন কি এর সাফল্যগুলিও অতি সহজেই অর্জিত হয়। স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠার পর আমরা যে "সত্যিই ঐরকম নই" এতে খুবই খুশি হই। এবং প্রকৃতপক্ষে আমরা ঐরকম নইও কারণ অনুযঙ্গের পদ্ধতিটাই মানুষকে মহৎ ও বীর করে যা মানুষের চরিত্রে অধিকতর সৌন্দর্য ও মর্যাদা দান করে। অতএব স্বপ্নের "অহং" তার সামাজিক অভিযোজনের থেকে অনেকখানি বাদ যাওয়ায়, তার বিরাটত্ব ও মানবিক মূল্যও বাদ যায়।

তা সত্বেও আমরা স্বপ্নকল্পনাকে এমন কি স্বপ্নরূপেও একটা উন্নতি-সাধনকারী ভূমিকার দিকে পৌঁছাতে দেখি। স্বপ্নে অহং বাস্তবের উপর কাজ নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করে, কিন্তু এই বাস্তব হল এক নমনীয় বাস্তব যার মধ্যে বস্তুগত সামগ্রীর কাঠিন্য নেই। বাহ্যির পরিসরে বাস্তবের [১] সঙ্গে সরাসরি সংস্পর্শের অব্যবহিত চাপ থেকে মুক্ত থেকে এবং বাস্তব সামগ্রীকে নিয়ে নাড়াচাড়া করার গণ্ডী থেকে মুক্ত থেকে নতুন নতুন ভাবে মিলিত হওয়া সম্ভব।

বাস্তবের সেই সব নতুন রূপ যা আমাদের সহজপ্রবৃত্তির পক্ষে অধিকতর সুসংগত সেগুলি নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করা এবং এই রূপগুলি কি রকম অনুভূত হবে এবং তাদের অর্জিত সাফল্যগুলির সঙ্গে আমাদের সহজ-প্রবৃত্তিগুলির কি ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটবে সে সম্পর্কে একটা আপাততঃ

---

[১] নিদ্রার অন্তর্মুখিনতার মধ্যে সম্ভবপর মানসিক উপাদানগুলির এই নমনীয়তা ও পুনর্মিলনের ধর্মটি সম্ভবতঃ দেহের সমস্ত উন্নততর কোষগুলির মধ্যে একই ধরনের শারীরবৃত্তগত প্রক্রিয়ার প্রতিরূপ এবং সেই কারণে নিদ্রার জৈব "মুক্তির" প্রতিফলন। স্বপ্নের মধ্যে চেতনার যে ধরনের বিলুপ্ত ও পরিপাক ঘটে নিদ্রার মধ্যে সমগ্র দেহের সেই রকম সাপেক্ষীভবন হতে পারে।

কার্যকরভাবে অভিজ্ঞতালাভ করা সম্ভব। অর্থাৎ স্বপ্নের বিভ্রমের এই জৈব মূল্য আছে যে সম্ভাব্য বাস্তবের সঙ্গে এবং সেগুলির প্রতি মনোভাবের সঙ্গে আদর্শগতভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এই বিভ্রম বাস্তবের সেই পরিবর্তন ঘটানোর পথ প্রস্তুত করে। স্বপ্ন কর্মের পথ প্রস্তুত করে; সম্ভাব্য কোন কাজ করার আগে মানুষকে প্রথমে সে বিষয়ে স্বপ্ন দেখতে হয়। একথা সত্য যে স্বপ্নটি যেমন ঠিক তেমনটি করে আমাদের সেই স্বপ্নকে আমরা কখনও সফল করে তুলতে পারি না; সেটি অন্যরকম দেখতে হয়, অন্যরকম বলে অনুভূত হয়। তা সত্ত্বেও আমাদের বাসনার সঙ্গে তার কিছুটা মিল থাকে এবং স্বপ্নটি পূর্বে দেখা গিয়েছিল এবং আমাদের লুব্ধ করেছিল বলেই তাকে সফল করে তোলা সম্ভব হয়েছিল। যেমন ফসল তোলার উৎসবই ফসল তোলাকে সম্ভাব্য করে তুলেছিল। সভ্য মানুষের যুক্ত জীবনযাত্রায় যথেষ্ট মূল্য থাকার পক্ষে স্বপ্ন বড় বেশি অপ্রচলিত রূপবিশিষ্ট এবং সামাজিক বাস্তব অলীককল্পনার দিক থেকে তা বড় বেশি বিচ্ছিন্ন।

স্বপ্নকে নির্মূল করাই স্বপ্নের বিভ্রমাত্মক চরিত্রের "প্রতিকার" নয়, বরং সেই প্রতিকার হল স্বপ্নকে এমন বড় করে তোলা ও বিস্তৃত করা যে তা যে লক্ষ্য অর্জন করার পূর্বাভাস দেয় আরও বেশি বেশি করে তারই খুব কাছা-কাছি হয়ে ওঠে। সেই স্বপ্নকেই আরও বেশি প্রাণশক্তি, বাস্তবতা ও সুস্পষ্ট বিষয়বস্তু দিয়ে ভরিয়ে তুলতে হয়। পুনরায় প্রমাণিত হয় যে, প্রয়োজন সম্পর্কে চেতনাকে প্রসারিত করার দ্বারাই স্বাধীনতার প্রসার ঘটে। এই কর্ম-সূচি স্বপ্নের সামাজিকীকরণেরই ডাক দেয়।

৪

অতএব কল্পনা করুন পশু উপ-মানব তার প্রায় ব্যক্তিগত বাস্তবজগতে প্রায় নিঃসঙ্গ সহজপ্রবৃত্তির জীবন যাপন করছে, কুকুর যেমন যে সরলতম কাজগুলি তার বাসনা পূরণ করে মাত্র সেইগুলিরই স্বপ্ন দেখে সেইরকম স্বপ্ন দেখছে এবং সেই স্বপ্নকে আরও বাস্তব, আরও বিষয়বস্তুপূর্ণ, আরও উপকারী করে তোলার প্রয়োজন হয়েছে এমন এক বাস্তবের মুখোমুখি সে।

কাব্যের জন্ম প্রসঙ্গে আলোচনার সূত্রে এই মানুষের সমাধান কি ধরনের হবে তা আমরা ইতোপূর্বেই উল্লেখ করেছি। যখন মানুষ তার জাগ্রত জীবনে স্বপ্নকে প্রবেশ করাল তখন সে একটা বিপুল অগ্রগতি ঘটাল, যা তাকে জাগ্রত অবস্থার বাস্তবের বিষয়গুলির উত্তর দিতে বাধ্য করল।

কিন্তু এটাও অবশ্য করণীয় যে, যে বিশেষ গুণ স্বপ্নকে প্রয়োজনীয় করে তুলেছে, সেই বিশেষ গুণটিকে অর্থাৎ তার নমনীয়তাকে বিসর্জন দিয়ে এই উপকারী কাজটি মানুষকে করতে হবে। এখন চেতনাকে যদি বাহ্যিক বাস্তবের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সমাপতিত হতে হবে এই দাবি দেখা দেয় তাহলে তাকে আর প্রত্যক্ষ থেকে পৃথক করা যায় না। প্রত্যক্ষ বলতে আমার চারদিকে যে সব সামগ্রী বর্তমানে বিদ্যমান সেই সম্পর্কে প্রত্যক্ষ আমার অভ্যন্তরে যে সব অনুভূতি বর্তমানে বিদ্যমান সেই সম্পর্কে প্রত্যক্ষকে বোঝান হচ্ছে।

অতএব এই জাগ্রত অবস্থার চেতনার সন্ধিস্থলগুলিকে যে কোনওভাবে শিথিল করতে হল। মনে করুন স্থান কালের কঠিন স্ফটিকের মধ্যে একটি বিন্দুতে "অহং" অবস্থিত। "অহং" যতক্ষণ স্থান-কালের সঙ্গে তার সম্পর্কগুলি সম্বন্ধে সচেতন ততক্ষণ সেগুলি "অহং" থেকে অসীমের দিকে বেরিয়ে যাওয়া একটা প্রত্যক্ষের জালক [network] মাত্র।

এই শিথিল হওয়াটা দুভাবে সম্ভব :

(১) একটি ক্ষেত্রে বিষয় থেকে বিষয়ীর পৃথকীকরণ ঘটে। এ থেকে আবার আরও দুটি বিভাগের সম্ভাবনা দেখা দেয়।

(ক) অনুভূতি-স্তরের বাস্তবতাকে ঘনীভূত করে বহির্বাস্তবের স্ফটিকটিকে দ্রবীভূত করা সম্ভব। তার অর্থ এই নয় যে বহির্বাস্তব লোপ পেয়ে যায়; তার অর্থ এই যে বহির্বাস্তবকে মুখ্যতঃ তার নিজের নিয়ম অনুযায়ী কৌশলে চালনা না করে সহজপ্রবৃত্তিগত ও বিষয়ীগত নিয়ম অনুযায়ী কৌশলে চালনা করা হয়। অতএব স্বপ্নের নমনীয়তা রক্ষিত হয়, কিন্তু স্বপ্নকে সমৃদ্ধ করতে বিষয়ীগত সচেতনতার জাগ্রত বাস্তবকে তার মধ্যে প্রবেশ করান হয়। ফলে আমরা পাই বিভ্রমাত্মক নকল জগতের [Mock world]। কিন্তু প্রকৃত সাধারণ অহং-এর ক্ষেত্র, শিল্পের জগতের ক্ষেত্র।

(খ) অথবা, বিষয়ের বাস্তবতাকে ঘনীভূত করে অভ্যন্তরীণ বাস্তবের কেন্দ্রটিকে [nucleus] দ্রবীভূত করা যায়। তার অর্থ এই নয় যে "অহং", অর্থাৎ পর্যবেক্ষণকারী লোপ পেয়ে যায়। তার অর্থ এই যে "অহং" তার নিজের বাসনা অনুযায়ী কৌশলে চালিত না হয়ে, বহির্বাস্তবের প্রয়োজন অনুযায়ী কৌশলে চালিত হয় [manipulated]। স্বপ্নের নমনীয়তা আবারও রক্ষিত হচ্ছে, কিন্তু স্বপ্নতে কাঠিন্য সঞ্চারের [stiffen] জন্য জাগ্রত পরিবেশের বাস্তবকে স্বপ্নের জগতে নিয়ে আসা হচ্ছে। ফলে আমরা পাই নৈর্ব্যক্তিক, সর্বত্রব্যাপী, অনাবেগ নকল অহং-এর [Mock Ego] বাস্তব প্রত্যক্ষ জগৎ, বিজ্ঞানের জগৎ।

(২) বিষয় থেকে বিষয়ীকে পৃথক করা ছাড়াও কাল থেকে স্থানকে, বিষয় থেকে সময়কে, গুণ থেকে পরিমাণকে পৃথক করা সম্ভব। তার অর্থ এই নয় যে স্থান বা কাল লোপ পেয়ে যায়। তার অর্থ এই যে এদের একটি না হয় অপরটিই সেই "বহুধার" manifold যার মধ্যে বিকৃতি ঘটে।

(ক) স্থানিক সংগঠন থেকে আমরা পাই বর্গীকরণমূলক বিজ্ঞানগুলি এবং কাব্য,

(খ) কালিক সংগঠন থেকে আমরা পাই বিবর্তনমূলক বিজ্ঞানগুলি এবং কাহিনী।

বর্গীকরণমূলক বিজ্ঞানগুলি, গণিত যার রাণী এবং পদার্থবিদ্যা যার এক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র, কাল নিরপেক্ষ স্থান-সম শৃঙ্খলা [space-like ordering] নিয়ে আলোচনা করে। কাল এতে প্রবেশ করে কেবলমাত্র একটা সমসত্তা-বিশিষ্ট দোলন homogeneous oscillation] হিসাবে যার মধ্যে এনট্রপি [entropy] ছাড়া অন্য কোন নতুন গুণের উদ্ভব ঘটে না। এটি হল কালহীন শৃঙ্খলার পরিমাণের, যান্ত্রিক বস্তুবাদের ক্ষেত্র।

বিবর্তনমূলক বিজ্ঞানগুলির পরবর্তীকালে বিকাশ ঘটেছে। এই বিজ্ঞানগুলির দৃষ্টিভঙ্গী ইতিহাসভিত্তিক। বাস্তবকে একটা প্রক্রিয়া হিসাবে, এগুলি নতুন গুণাবলীর উদ্ভব হিসাবে আলোচনা করে। সমাজবিদ্যা ও শরীরবিদ্যা হল সেই ধরনের বিজ্ঞান যেগুলি কালের ব্যাপারে আগ্রহী যেগুলি কালের মধ্য দিয়ে বিচরণশীল এবং সেই কারণে কালকে দূর থেকে কাছে এনে [telescope] ঘনীকৃত করে এবং সাধারণীকৃত করে সিদ্ধান্ত করে, ঠিক যেমন বর্গীকরণমূলক বিজ্ঞানগুলি স্থানকে দূর থেকে কাছে এনে, ঘনীভূত করে এবং সাধারণীকৃত করে। স্বভাবতঃ এই ক্ষেত্রগুলি পরস্পরকে ভেদ করে। কেবলমাত্র গণিত হল বিশুদ্ধ বর্গীকরণমূলক এবং ডায়ালেকটিকস বিশুদ্ধ বিবর্তনমূলক। ১৭৫০ থেকে ১৮৫০ এর মধ্যে বিবর্তনমূলক বিজ্ঞানগুলির উত্থান ঘটে এবং তা কঁদিলাক, হলবাক ও দিদেরোর যান্ত্রিক বস্তুবাদকে মার্ক্স ও এঙ্গেলসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদে রূপান্তরিত করে এবং তাকে ভাববাদ কর্তৃক বিকশিত বিষয়ী বিষয় সম্পর্কের সমস্ত সক্রিয় দিকটিকে নিজের অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম করে তোলে।

শিল্পের ক্ষেত্রে একই রকমভাবে বিভাগ করলে একই রকমের পার্থক্য দেখা যায়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে উপন্যাস হল বিবর্তনমূলক এবং কবিতা হল বর্গীকরণ-মূলক। এই পার্থক্যটি যেহেতু মূলগত সেইজন্য পরে এর বিস্তারিত আলোচনা

করার প্রয়োজন।

স্পষ্টতঃই আমরা যেমন চিন্তা করে স্বপ্নের এই সব বাহ্যিকিকরণগুলি বার করেছি বর্বর যুগের মানুষ তা করেনি। প্রকৃতির সঙ্গে তার সংগ্রামের দ্বারা, সেই সংগ্রামের সংঘবদ্ধতার প্রয়োজনের দ্বারা এবং সেই সংঘবদ্ধতার প্রয়োজনে ধ্বনিগত ও দৃশ্যগত যে সব প্রতীকের বিকাশ ঘটেছিল তার দ্বারা এগুলির সৃষ্টি হয়েছিল। নকল অহংয়ের সাহায্যে আবিষ্কৃত বাস্তব জগৎ এবং নকল জগতের সাহায্যে উদ্ঘাটিত বাস্তব অহং হল সচেতন জগৎ ও সচেতন অহং এবং সেই কারণে তা সামাজিক জগৎ ও সামাজিক অহং।

নৃত্য এবং মন্ত্রপাঠের মধ্য দিয়ে মানুষ অব্যবহিত বাস্তবের জগৎকে নাকচ করে আধ-ঘুমের মধ্যে ডুবে যায়। এর ফলে সে বহির্বাস্তবকে ইচ্ছামত দৃঢ়ভাবে বা লঘুভাবে নিতে সক্ষম হয়, তাকে ভাঙা গড়া করতে পারে। কিন্তু বিধি-বহির্ভূতভাবে ও নিয়মহীনভাবে নয়—সে ধরনের কাজের কোনও উদ্দেশ্য বা যুক্তি থাকে না। সামাজিক অহংয়ের নিয়ম মেনেই মানুষ তা গড়ে তোলে এবং মানুষ সেটা যে করে তার কারণ নৃত্যের ও মন্ত্রপাঠের মধ্যে বহির্বাস্তবের জগৎ থেকে সে সরে গেলেও মানুষ তার দেহকে ছন্দে ছন্দে দোলায়িত ক'রে, একত্রে একই শব্দের আবৃত্তি ক'রে, সংগীতের স্বরধ্বনি, নৃত্যের মধ্যে প্রাণীর গতিভঙ্গীর অনুকরণ, সামাজিকভাবে স্বীকৃত সামগ্রী বা অভিজ্ঞতাসূচক শব্দের মত সামাজিকভাবে সাধারণ বস্তুর সাহায্যে পরস্পরের মধ্যে জাগিয়ে তোলা সাধারণ অনুভূতির এক আবেগের জাল বুনে মানুষ তার সঙ্গীদের বিষয়ীগত জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে। এইভাবে সাধারণ প্রত্যক্ষ জগতের সামগ্রীগুলি নির্বাচিত, সংঘবদ্ধ, সংমিশ্রিত ও সামাজিক অহংয়ের চারদিকে পুনঃস্থাপিত হয়। এই সামাজিক অহংই ছিল প্রাচীন গ্রীক ধর্মানুষ্ঠানের "দেবতা", যে দেবতা তাঁর পূজারীদের মধ্যে আবির্ভূত হতেন এবং এই দেবতা নৃত্যের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট উৎকর্ষতাপ্রাপ্ত সাধারণ অহংয়ের প্রতীক ছাড়া আর কিছুই নয়।

সমাজ অবশ্য, যখন আরও অগ্রসর হল তখন কাব্যও সাধারণ উৎসব অনুষ্ঠান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। সভ্য মানুষ আরও সহজে শারীরবৃত্ত ও অন্তর্মুখিনতায় পৌছায়—কাব্যের ছন্দই সেখানে পৌছিয়ে দিতে যথেষ্ট—এবং শব্দের যৌথ বিষয়ীগত তাৎপর্য সভ্য মানুষের সঙ্গে তার সঙ্গীদের যোগাযোগ রক্ষা করে। এখন আর সেই যৌথ উৎসব অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নেই। শ্রম-বিভাজনের ফলে সেই উৎসব অনুষ্ঠান এখন অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে। তাথার

নিজেরই ব্যাপকতর বিস্তৃতি ও বৃহত্তর সঞ্চয়ের মধ্যে এই শ্রমবিভাজনের প্রতিফলন দেখা যায়।

এই ধরনের শিল্প কালসীমাহীন, কারণ মানুষ নিজেই এখনও কাল-সীমাহীন, যুগে যুগে তখনও সে বর্তমানের মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে বাস করে, তার আছে কেবল এক অবিভক্ত অতীত ও ভবিষ্যৎ। এই আদর্শ কালসীমাহীনতা থেকে এই ঘটনাই প্রতিফলিত হয় যে মানুষের শ্রমবিভাজনটাই এখনও কালের মধ্যে বিস্তৃত হয় নি। সে দিন আনে দিন খায়, আধুনিক মানুষের মত সে পরিবর্তনশীল পুরুষানুক্রমিক মানুষের সমস্ত মূলধন, জমাটবাঁধা শ্রম, করণ-কৌশল ও সাংস্কৃতিক সম্পদের উত্তরাধিকারী নয়। মৃত এবং অজাত মানুষের সঙ্গে তার কেবল নামমাত্র সামাজিক সম্পর্কগুলি রয়েছে। একথা ঠিক যে সামান্য কিছু যন্ত্রপাতি, সীমাবদ্ধ করণকৌশল ও একটা অলিখিত ভাষা তার তখন রয়েছে এবং অতীতের সঙ্গে এই সাধারণবোধ একটা স্বর্ণযুগ ও সেকালের বীর, একজন প্রমিথিউস বা মোজেস, বর্বর মানুষের কাছে জ্ঞান-আনয়নকারীদের নিয়ে গড়ে তোলে। অল্প কিছু কালসংক্রান্ত পুরাকাহিনীর [time-myths] মধ্যে প্রতিফলিত। কিন্তু সাধারণভাবে, কাব্যের কাল-সীমাহীনতা মানুষের নিজেরই শিশুসুলভ সরলতার যোগ্য—এই সরলতা থেকেই সে ট্রাহের্নের [Traherne] মত মনে করে গম ছিল সোনালী এবং অমর, এমন এক শস্য যা কখনও বুনতেও হয়নি, মাঠ থেকে ঘরে তুলতেও হয়নি।

কিন্তু ইতিহাস যত এগিয়ে যেতে থাকে মানুষের পরিবর্তনশীল অতীতের সঙ্গে মানুষের ঘাত প্রতিঘাত প্রতিফলিত হতে থাকে শহর, দেবালয়, রাষ্ট্র ও শ্রেণীব্যবস্থা এবং শেষ পর্যন্ত গল্পকাহিনীর মধ্য দিয়ে—কালের মধ্যে সংবদ্ধ মানুষের পরিবর্তনশীল জীবনের ছবির মধ্য দিয়ে। অতএব এক নতুন শিল্প যার চরম রূপ উপন্যাস ও চলচ্চিত্র—ঠিক যে সময়ে বিবর্তনমূলক বিজ্ঞানগুলি একে একে বড় করে দেখা দিচ্ছে সেই ১৮০০ খৃষ্টাব্দের পর থেকেই দেখা দিতে থাকে। এই গোটা নতুন অন্তর্দৃষ্টি আবার শিল্পায়নের দ্বারা প্রকৃতিতে যে দ্রুত ও ঐতিহাসিক পরিবর্তন ঘটান সম্ভবপর হয়েছে তারই ফল।

গল্পে মানুষ ছোট থেকে বড় হয় এবং এই পরিপক্কতালাভ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানুষের বাহ্যজগৎ এবং তার নিজের হৃদয় কিভাবে পরিবর্তিত হয় সেটা লক্ষ্য করাতে আমাদের আগ্রহ। মানসের বিষয়ীগত বিষয়বস্তু এবং একটা কালগত আখ্যানের মধ্যে তার বাস্তব পরিবেশের এই বিন্যাসকরণ, সংগঠন, মনোভবন ও নির্বাচন গল্পকে কবিতা থেকে পৃথক করে।

এ থেকে আবার উপন্যাসের অধিকতর পরিশীলন উদ্‌ঘাটিত হয়। অ-পৃথকীকৃত গোষ্ঠীর মধ্যে সমস্ত মানুষের এক স্থানে ও একই কালে এক মন হওয়া এবং এই সম্মেলন থেকে সকলের হয়ে এক স্বরে কথা বলতে পারে এমন এক সর্বজনীন ও কালসীমাহীন অহংয়ের উদ্ভব হওয়া সম্ভব। কিন্তু আধুনিক সমাজের অধিকতর পৃথকীকৃত জীবন বিপরীত সুরধর্মী [contrapuntal], বহু মানুষের জীবন পরস্পরের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে এক জটিল নক্সার [tapestry) সৃষ্টি করে এবং তাদের সকলের মন ও আবেগ মিলিত হয়ে একটি জনজীবনগত সর্বজনীন "অহং" গড়ে তোলে এমন মুহূর্ত কদাচিৎ দেখা যায়। সেই কারণে উপন্যাসের নায়ক কবিতার "নায়কের" মত এক সর্বজনীন সাধারণ "অহং" নয়, তা হল এক বাস্তব মূর্ত ব্যক্তিবিশেষ [a real concrete individual]।

উপন্যাসের "যৌথধর্ম" কি করে সুনিশ্চিত করা হয়? উপন্যাসে সর্বদাই যে বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়—ক্রিয়াগুলির বাস্তবতা, অন্যান্য চরিত্রের বাস্তবতা, এবং একটি সামাজিক জালক [social plexus] হিসাবে বিবেচিত ঘটনাগুলি—তার মধ্যেই এই যৌথধর্ম নিহিত থাকে। এইভাবে বাহ্যিক বাস্তব পাঠকের তাৎক্ষণিক মনোযোগ থেকে অন্তর্মুখিনতার সাহায্যে বাতিল হয়ে অন্য এক বেশে ফিরে আসে—বর্তমান-বাস্তব [reality-now] হিসাবে নয়, যে ঘরটিতে "আমি" বসে পড়ছি সে হিসাবে নয়, যা হয়েছে বা যা হতে পারে সেই বাহ্যিক বাস্তব হয়ে ফিরে আসে। আর এটা কেবল সম্ভব এই কারণেই যে উপন্যাস কালের মাত্রায় নমনীয়। সুতরাং উপন্যাসের নকল জগতের যাথার্থ্য পাঠকের তাৎক্ষণিক বাস্তবকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দেয় বা তাকে মুছে ফেলে আর সেই কারণেই তা কাব্যের ঝকঝকে স্বপ্নের মত নকল জগতের থেকে অনেক বেশি বাস্তবসম্মত ও তথ্যানুগ।

উপন্যাসের সঙ্গে এই ব্যাপারে দিবাস্বপ্নের সাদৃশ্য। সাধারণ স্বপ্নের তুলনায় দিবাস্বপ্নে বাস্তবের পরিমাণ বেশি। তা থাকে সম্ভবপরের কোঠায়, স্বপ্নের বাধাবন্ধহীন অপরিমিতি বা আকস্মিক উৎক্রান্তি তাতে থাকে না। দিবাস্বপ্ন আরও বেশি মাত্রায় সুশৃঙ্খল ও কম মাত্রায় আদিম আর তার প্রয়োজনও আছে, কারণ দিবাস্বপ্নের ক্ষেত্রে আমরা জেগে থাকি এবং সেই কারণে অলীককল্পনায় এই বস্তুগত সুসংবদ্ধতা থাকা আবশ্যক। প্রাত্যহিক পরিবেশকে যাতে আড়াল করতে পারে এবং মনকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে পারে সেইজন্য বাস্তব শৃঙ্খলায় বিকল্প বিষয়গুলির কঠিনতালাভের

প্রয়োজন হয়। দিবাস্বপ্নে এবং উপকথায় এই "বস্তুর" পরিমাণের জন্য সেগুলির কালিক সংগঠনের প্রয়োজন, কারণ সেই ধরনের একটা সংগঠন না থাকলে আখ্যানবস্তু বেশি ভারি হয়ে পড়বে, অসংবদ্ধ হয়ে পড়বে এবং শেষ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ বাস্তবের নিজের মধ্যর, অনিয়ন্ত্রণযোগ্য গতির সঙ্গে মিলিত হতে গিয়ে ছড়িয়ে পড়বে—এবং তখন তার আর কোনও মূল্য থাকবে না বা আবেগোদ্দীপকগত সংগঠনের কোনও সম্ভাবনা থাকবে না। স্বপ্ন তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অন্তর্মুখিনতার দ্বারা এবং কাব্য তার ছন্দ ও ধ্বনীভবনের দ্বারা বাস্তবের এতবেশি কঠিনতালাভের এবং কালের সীমানায় এমন সুস্পষ্ট "সংগঠনের" প্রয়োজনকে অতিক্রম করতে পারে। তাদের সংগঠন হল স্থানের সীমানায়।

চরিত্রগতভাবে দিবাস্বপ্ন অলীককল্পনার এক অধিকতর সত্য রূপ। তা হল বাস্তবের মধ্যে নমনীয় এক ব্যক্তি হিসাবে মানুষের প্রকাশ, ঠিক যেমন স্বপ্ন হল মানুষের মধ্যে নমনীয় এক বাস্তবতা। একটি প্রকাশ করে প্রকৃতির উপর মানুষের ক্ষমতাকে, যে ক্ষমতা মানুষ নিজেকে পরিবর্তিত করে লাভ করেছে : অপরটি প্রকাশ করে নিজের উপর মানুষের ক্ষমতাকে, যা সে লাভ করেছে প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করে। দিবাস্বপ্নে নিজেকে বাস্তবের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া নিয়ে মানুষ পরীক্ষানিরীক্ষা করে ; স্বপ্নে বাস্তবকে নিজের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া নিয়ে, এই দুই বৈশিষ্ট্যই নিজ নিজ শিল্পের ক্ষেত্রে স্থান পায়।

বিজ্ঞান তার বৈরাজ্যের মধ্যে একই উৎসের সন্ধান দেয়। বর্গীকরণমূলক বিজ্ঞানগুলিতে অঙ্ক কোন পূর্বগামী বা পরবর্তী বাস্তবের চিন্তাকে উপস্থাপিত করে বর্তমান বাস্তব থেকে নিজেকে অন্তর্মুখী করে না। বরং নিজের থেকে উদ্ভূত বিধেয়গুলিকে বর্তমান বাস্তবের উপর বিস্তার করে নিজেকে অন্তর্মুখী করে তোলে। প্রকৃতপক্ষে এইটিই হল বিন্যাস বা পরিমাণের ক্ষেত্র। মানুষ যেমন প্রত্যক্ষ থেকে বিশেষ বিশেষ সহজপ্রবৃত্তিগত সাধারণধর্মিতা লাভ করে, ঠিক সেই রকম প্রত্যক্ষ থেকে সে বিশেষ বিশেষ প্রত্যক্ষগত সাধারণধর্মিতা লাভ করে। বিষয়ীগত দিকগুলি বাদ দিলেও তিনটি গরু, তিনটি লাঠি, তিনটি আপেল (গরু এক একজন মানুষের কাছে এক এক রকম, বিভিন্ন মানুষের কাছে আপেলের মূল্য ভিন্ন) ইত্যাদির মধ্যে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে একটা প্রত্যক্ষগত সাধারণধর্মিতা থেকে যায় বা হল "তিন-এর ধর্ম" ["threeness"], সংখ্যা, পরিমাণ। বর্গীকরণের এই সমস্ত ভাবরহিত বিষয়গুলি

বর্তমান থেকে তার সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলিকে কেড়ে নিয়ে সমস্ত বাস্তবকে কালসীমাহীনভাবে "বিমূর্ত" করতে, সংমিশ্রিত করতে, নির্বাচন করতে ও সংযুক্ত করতে মানুষকে সাহায্য করে। একটি স্থানে একটি মানুষের বৈশিষ্ট্য হিসাবে যে সব গুণগুলি থাকে সেগুলি সাধারণ অহং থেকে বহিষ্কৃত করে বাস্তবের সমগ্র ক্ষেত্রটির উপর মানুষকে এক অলীককল্পনাগত ও নমনীয় আত্মাধিকার দেওয়া সম্ভবপর হয়ে ওঠে। এই প্রক্রিয়া বাস্তব থেকে তার অন্তর্ভুক্ত কালকে কেড়ে নেয়—নতুন গুণের উদ্ভব থেকে বঞ্চিত করে।

এই কারণেই অধিকতর গুণযুক্ত ইতিহাসমূলক বিজ্ঞানগুলির উদ্ভবের আগে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে গণনার, যা গো-মেষপালকের বিজ্ঞান (ভারতবর্ষ) ও জ্যামিতির, যা কৃষিজীবীর বিজ্ঞান (মিশর), তার উদ্ভব ঘটে। অপেক্ষাকৃত বেশি আদিম সমাজে মানুষের প্রতিদিন প্রায় একই সাধারণ অভিজ্ঞতা ঘটে এবং সকলে এক সঙ্গে মিলে, নিজেদের অভিজ্ঞতাগুলি থেকে একটি স্থান-কাল'এর দৃষ্টিকোণ থেকে একটি বিশ্ব-পরিপ্রেক্ষিতের গুচ্ছ গড়ে তোলা, গুণরহিত, অনুভূতি-সুর-রহিত একটি গুচ্ছ গড়ে তোলা তাদের পক্ষে সহজ হয়—গণিত বলতে ঠিক সেইটাই বোঝায়। পরিবেশ থেকে সমস্ত অনুভূতি-সুরকে এবং সেই কারণে সমস্ত গুণকে বিযুক্ত করে সেই পরিবেশ থেকে নিজেদের "বিমূর্ত" করে তোলা তাদের পক্ষে সহজ। যেহেতু তারা একত্রে তাদের কর্তব্য কাজ করে সেইজন্য সমস্ত কর্তব্যকাজের মধ্যকার সাধারণ ধর্মকে—সেগুলির মধ্যকার পরিমাণগত উপাদানকে, কতগুলি গরু তারা দেখাশুনা করল, কত একর জমিতে বীজ বুনল—তাকে বিমূর্ত করা তাদের পক্ষে সহজ।

এইভাবে নিদ্রার যে অন্তর্মুখিনতা পরিবেশ থেকে সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উদ্দীপককে বর্জন করে তার জায়গায় যখন গণিতের অন্তর্মুখিনতা, যা সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণগুলিকে দূরে রাখে এবং সেইজন্য বর্তমান বাস্তবকে ছাড়িয়ে সমস্ত বাস্তবের উপর তার আত্মাধিকারকে বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়, সেই গণিতের অন্তর্মুখিনতাকে উপস্থাপিত করা হয় তখন স্বপ্ন গণিত হয়ে ওঠে। নিদ্রার মধ্যে শ্বাসগ্রহণের এবং রক্তপ্রবাহের ছন্দ প্রত্যক্ষ জগৎকে অহংয়ের মধ্যে নিয়ে আসে; গণিতে শ্বাসগ্রহণের এবং রক্তপ্রবাহের ছন্দ অহংকে প্রত্যক্ষ জগতের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয়।

কেবল মাত্র অনেক পরবর্তী কালে, সভ্যতা যখন বিপরীত সুরধর্মী [Contrapuntal] হয়ে ওঠে এবং নানা মানুষের শ্রম, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্যগুলি পরস্পরকে ছেদ করে ও পরস্পরের সঙ্গে জাল বোনে তখনই বিবর্তনমূলক

বিজ্ঞানগুলি দেখা দেয়। এক্ষেত্রে চেতনা থেকে সমস্ত গুণগুলিকে বিমূর্ত করে বর্তমান বাস্তব থেকে অন্তর্মুখিনতা অর্জিত হয় না, বরং একটা অহং যার গুণকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা কালের সীমানায় সীমাবদ্ধ, বিকৃত ও সংগঠিত সেইরকম এক অহংকে তার জায়গায় উপস্থাপিত করেই এই অন্তর্মুখিনতা ঘটে। গণিতের নকল অহং সর্বত্রই দৃষ্টিপাত করে কিন্তু কোথাওই গুণকে দেখে না। এই নকল অহং কিন্তু সেই গণিতের নকল অহংয়ের মত নয়। এই অহং সর্বত্র দৃষ্টিপাত করে কিন্তু কেবল একটি বিশেষ ধরনের গুণকেই মাত্র দেখে—সেই নির্দিষ্ট বিজ্ঞানের ক্ষেত্র যে নির্দিষ্ট গুণগুলিকে নিয়ে আলোচনা করে মাত্র সেই গুণগুলিকেই দেখে। ফলে, বিবর্তনমূলক বিজ্ঞানগুলির উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান নানা ক্ষেত্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে যার প্রত্যেকটিরই নিজ নিজ নির্দিষ্ট গুণ থাকে—রসায়ন, জীববিদ্যা, মনোবিদ্যা, সমাজবিদ্যা ইত্যাদি। এই ক্ষেত্রগুলি পরস্পরের বিরোধিতা করে না; এই ক্ষেত্রগুলি হল গুণের সেই একই বিশ্বব্যাপী চলন যাকে বলে বাস্তব, তারই বিভিন্ন নির্বাচিত ক্ষেত্র। কিন্তু এই শ্রমবিভাজন ব্যতিরেকে সেগুলি মানুষের আয়ত্তের বাইরেই থেকে যেত।

এই ক্ষেত্রগুলি বিধিবহির্ভূতভাবে নির্বাচিত হয় না, বাস্তবের প্রকৃতি অনুযায়ী এবং তার সঙ্গে মানুষের সক্রিয় সম্পর্ক অনুযায়ী সেগুলি নির্ধারিত হয় এবং সেগুলি পর্যায়ক্রমে জড় প্রকৃতি, দেহ হিসাবে স্বয়ং, নিজের মন এবং সমাজ বা তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ধাত্র [matrix] এইগুলি সম্পর্কে মানুষের আগ্রহকে চিহ্নিত করে। এমন কি একটি মাত্র ক্ষেত্রেরও গুণগুলির প্রাচুর্যের কারণে সেগুলিকে কালের সীমায় সংগঠিত ও ঘনীভূত করারও প্রয়োজন, ঠিক যেমন মানুষ পরবর্তীকালে চিন্তা করে নিজের অভিজ্ঞতাকে সংগঠিত করে—বাস্তবের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই ক্ষেত্রে যে গুণগুলির উদ্ভব হয় সেগুলিকে যেমন ঘনীভবন, সংমিশ্রণ ও সংযুক্তিকরণের সাহায্যে সংগঠিত করে।

উপন্যাসের নায়ক একটি ব্যক্তি যিনি এমন সব ঘটনাবলী ও ব্যক্তিসমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত যেগুলি যার জন্য উপন্যাস লেখা হচ্ছে তার বিষয়ীগত প্রতিক্রিয়াকে সক্রিয়ভাবে জাগিয়ে তোলে। ঠিক সেই রকম যে কোন বিবর্তনমূলক বিজ্ঞানের নায়কও হল গুণের এক বিশেষ ক্ষেত্র যেটা নকল অহং লক্ষ্য করে। সেই নকল অহং বা একটি-ইন্দ্রিয়শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি যার দৃষ্টির বৈশিষ্ট্যগুলি, যে সম্পর্কগুলিকে সংগঠিত করা ও অনুধাবন করার জন্য সেই বিশেষ বিজ্ঞানটির উদ্ভব, সেই সম্পর্কগুলিকে জাগিয়ে তুলবে।

৫

শিল্প ও বিজ্ঞানের এই বিকাশ স্থির বাস্তবের কেবলমাত্র যে ধ্যানগত আবিষ্কার তা নয় ; তা হল প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সক্রিয় সম্পর্কের অংশ। শিল্পের অলীককল্পনা মানুষের অহংয়ে সংগঠনের যে অবিরাম পরিবর্তন ঘটায় তার দ্বারা মানুষকে তার সহজপ্রবৃত্তির প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে এবং সেই হেতু তাকে স্বাধীন করে তোলে। এটা কোনও অনপেক্ষ স্বাধীনতা নয়, বরং তা পরিবর্তনের উপায়গুলির সঙ্গে আপেক্ষিক—শিল্পের আলিঙ্গনে মানুষ যে জটিল, সমৃদ্ধ সামাজিক অহং-এর বিপরীতে নিজের স্বল্প অহংকে স্থাপিত করে তার সঙ্গে আপেক্ষিক। এই সামাজিক অহং আবার আদর্শ সারবস্তু দিয়ে গড়ে ওঠে না। তা এক বাস্তব, মূর্ত সমাজে বাস করার কারণে মানুষ যে বাস্তব মূর্ত আবেগ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার অভিজ্ঞতা অর্জন করে তার থেকে গড়ে ওঠে।

উদাহরণস্বরূপ, এটা প্রকাশ পায় সাহিত্যের উপাদানসামগ্রীর প্রকৃতির মধ্যে—শব্দের মধ্যে ; ঠিক সেই শব্দগুলিরই মধ্যে যেগুলি সংঘবদ্ধ কাজকর্মে মানুষের হাতিয়ার, তা সে যত সাধারণই হোক না কেন ; রাজসভা, যুদ্ধশিবির ও রান্নাঘরের ভাষার মধ্যে প্রকাশ পায়।

বিজ্ঞান ও শিল্প হল অলীককল্পনার দুটি সীমান্ত। মূর্ত অনুভূতি ও প্রত্যক্ষের সর্বাধিক বিমূর্ত, সর্বাধিক সাধারণীকৃত, সর্বাপেক্ষা মূলগত নিয়মগুলি নিয়ে এগুলি গঠিত। এরা "বিশুদ্ধ" এবং সেই কারণে এরা পরস্পরের থেকে পৃথক হয়ে গেছে। নতুনকে নিয়ে এদের কারবার, সামাজিক অভিজ্ঞতার যে সাধারণ বিষয়গুলি যা ইতোপূর্বেই বর্তমান সাধারণ অহং ও সাধারণ প্রত্যক্ষ জগৎকে প্রতিবেধিত করে ঠিক সেই সাধারণ বিষয়গুলি নিয়েই এর কারবার এবং সেই কারণে অহং এবং জগৎ উভয়ের বিস্তারকে (নতুন শিল্পকর্মগুলির নতুন প্রকল্পগুলিকে) তাদের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি রাখে। এইভাবে তত্ত্বের সঙ্গে প্রয়োগ সংযুক্ত হয়। কারণ মানুষের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা মানুষের ইতোপূর্বেই নির্দিষ্ট চেতনার মধ্যে দ্বন্দ্ব ঘটায় এবং তার রূপান্তর দাবি করে। যারা যান্ত্রিকভাবে চিন্তা করে তাদের কাছে মনে হয় বিজ্ঞান ও শিল্প বুঝি জাবন্ত অভিজ্ঞতা দ্বারা পরস্পর ভেদিত নয়—বরং সেগুলি এর বিরোধিতা করে, কারণ সেগুলি হল এদের দ্বন্দ্বের ফল।

বিজ্ঞান ও শিল্পকে যখন সত্তাদর্শগত ক্ষেত্র হিসাবে দেখা হয় তখন তাদের জীবন থেকে কৃত্রিমভাবে বিচ্ছিন্ন করা হয়। প্রয়োগ হিসাবে,

অনুভূত ও জাত অভিজ্ঞতা হিসাবে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম থেকে প্রতি পদে পদে এরা উদ্ভূত হয়।

অলীককল্পনার জগৎ নিজের "অভিভাবক" হিসাবে দেখা দেয় কারণ নিদ্রিত অবস্থায় মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সক্রিয় সংগ্রাম থেকে বিশ্রাম নেয় এবং মানুষ তার বাসনা অনুযায়ী তার শরীরে সেই সংগ্রামের যে সব চিহ্ন থেকে যায় সেগুলিকে ঘটনার জায়গায় প্রতীক গ্রহণ ক'রে নতুন করে সাজায়। জাগ্রত অবস্থায় বাস্তবের সামাজিক জগতে প্রবিষ্ট হয়ে এই জগৎ বিভক্ত হয়ে যেতে বাধ্য হয় এবং একদিকে যেমন বহির্বাস্তবের প্রয়োজনকে প্রতিফলিত করতে তেমনি অপরদিকে নানা মানুষের হৃদয়ের ছাপ গ্রহণ করতে তা বাধ্য হয়। এইভাবে মানুষ পরস্পরের আবেগগত অভিজ্ঞতার দ্বারা এবং বাস্তবের অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রভাবিত হয়। মানুষ বলতে যা বোঝায় তা মানুষের পরস্পরের সৃষ্টি।

শিল্পী এবং বৈজ্ঞানিক এই সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা সেই মানুষ যাঁরা জীবন সম্বন্ধে এক বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন—শিল্পীর ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতা আবেগোদ্দীপকগত, বৈজ্ঞানিকের ক্ষেত্রে তা প্রত্যক্ষগত। এই অভিজ্ঞতা সাধারণ অহং বা সাধারণ সামাজিক জগৎকে প্রতিষেধিত [negates] করে এবং সেই কারণে নতুন অভিজ্ঞতাকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এই জগৎগুলি নতুন করে সাজান দরকার হয়। ঠিক যেমন সমাজের জন্য দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনকারী উৎপন্ন সামগ্রীগুলিকে সাধারণ বাজারে এনে হাজির করে সেই রকম শিল্পী ও বৈজ্ঞানিক তাঁর বিশেষ অভিজ্ঞতাকে একটা সজ্জিত রূপে [fashioned form] মতাদর্শগত বাজারে এনে হাজির করেন।

উৎপন্ন সামগ্রীগুলিতে যাতে সামাজিকভাবে উৎপন্ন দ্রব্যের ছাপ থাকে, পণ্যের ছাপ থাকে সেইজন্য সেগুলির এমন একটা আকার থাকতে হয় যা তাদের সামাজিক উপযোগ-মূল্য দান করে (use-value)। সামাজিক উপযোগিতার জগতের বাসিন্দা হতে সেগুলির শ্রমের দ্বারা সজ্জিত হওয়া আবশ্যক। একইভাবে শিল্পী বা বৈজ্ঞানিককে তাঁর অভিজ্ঞতাকে একটা সামাজিক তাৎপর্য দিতে হয়, সেটাকে সমাজের মতাদর্শগত জগতের অন্তর্ভুক্ত হতেই হয়। এই সাজানটাই হল শিল্পের বা বিজ্ঞানের শ্রম এবং তা শিল্পী বা বৈজ্ঞানিককে নিজেকে উৎপাদনকারী বলে মনে করার অধিকার দেয়।

ইয়ুঙ অলীককল্পনা বা অবাধ অনুষঙ্গের বিপরীতে "উদ্দেশ্য প্রণোদিত চিন্তাকে" স্থাপিত করেছিলেন। "উদ্দেশ্য-প্রণোদিত চিন্তা" হল সেই চিন্তা

বা "যুক্তিভিত্তিক" [rational] পথকে, বাস্তব সম্বন্ধে আমাদের সচেতন জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ পথকে অনুসরণ করতে বাধ্য হয়। আমরা আগেই দেখেছি যে এই সচেতন জ্ঞান সাধারণ প্রত্যক্ষ জগৎ থেকেই সৃষ্ট। অতএব উদ্দেশ্য প্রণোদিত চিন্তা হল বৈজ্ঞানিক চিন্তা; উদ্দেশ্য-প্রণোদিত চিন্তার দ্বারা বহির্বাস্তব সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতাকে আমরা একটা সামাজিক উৎপন্ন হিসাবে গড়ে তুলি।

ইয়ুঙের উদ্দেশ্য-প্রণোদিত চিন্তার ধারণার সঙ্গে আমরা "উদ্দেশ্য-প্রণোদিত অনুভূতির" ধারণা যোগ করতে চাই। আমরা যেটা সঠিক বলে মনে করি তার সঙ্গে, আমাদের "প্রকৃত" সত্তার সঙ্গে, যা যুক্তিসিদ্ধ [valid], বা যা সুন্দর তার সঙ্গে, আমাদের যেটা উত্তম দিক বলে আমরা মনে করি তার সঙ্গে, আমাদের প্রত্যেকের মনে যে আদর্শ আছে তার সঙ্গে—যখনই আমরা আমাদের অনুভূতিগুলিকে সুসংগত করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত করি তখনই আমরা এই কাজ করি। উদ্দেশ্য প্রণোদিত চিন্তা যেমন যুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং সত্যের সামাজিক বিনির্ণায়ককে স্বীকার করে সেই রকম উদ্দেশ্য প্রণোদিত অনুভূতি হৃদয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং সৌন্দর্য বা সৎগুণের [goodness] সামাজিক বিনির্ণায়ককে স্বীকার করে।

সৎগুণকে সৌন্দর্য থেকে, বিবেককে হৃদয় থেকে বিচ্ছিন্ন করা শ্রেণীধর্মের অপরাধ। ধর্মের উদ্ভব পুরাণকাহিনী হিসাবে, প্রথম যুগের কাব্য থেকে, যার মধ্যে বিজ্ঞান ও শিল্প তখনও মিলেমিশে রয়েছে, কারণ যৌথ অলীককল্পনা তখনও যৌথ স্বপ্নের বেশি কিছু নয়। মানুষ পরিবেশ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করে নি। অহং এবং পরিবেশের মধ্যকার দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে তখনও সে সচেতন নয়, এবং যেহেতু সে সচেতন নয় সে এই দ্বন্দ্বের দাস, তার অনুভূতি ও ঘটনা দ্বারা অন্ধভাবে এদিক ওদিক নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু বিজ্ঞান ও শিল্প যখন পৃথক হয়ে যায় ধর্ম তখন আর কোনও উপযোগিতাপূর্ণ [useful] ভূমিকা পালন করে না। ধর্ম তখন এই দুটিকে জোড়া দিতে চেষ্টা করে; সেই কারণে তা বিজ্ঞানের সত্যকে বিকৃত করে এবং শিল্পের নমনীয়তার পায়ে বেড়ি পরায়।

আমরা দেখেছি যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অলীককল্পনা ভেদ করার ক্ষমতা লাভ করেছিল, পরিবেশকে আরও সঠিকভাবে প্রতিফলিত করার ক্ষমতা লাভ করেছিল। কারণ বাস্তব মূর্ত অহং-এর জায়গায় তা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল কল্পিত অহংকে বা এমন এক কাঠামো মঞ্চকে [scaffolding] যার নমনীয়তা

অলৌকিককল্পনার ছাঁচকে যথিষ্ঠভাবে পরিবেশাহৃত করেছিল। কিন্তু ধর্ম এখনও বিষয়ীকে বিষয়ের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। মানুষ যাকে সত্য বলে আশা করে সেটাকেই তা সত্য বলে ঘোষণা করে। বাস্তব সম্বন্ধে এর মতামতগুলি মানুষের আবেগোদ্দীপকগত চালিকাশক্তির দ্বারা বিকৃত। তাদের বিষয়ীগত বিশ্বাসের জন্য কাব্যগত বিভ্রমের মূল্য এবং সত্য বলে যেগুলি বিবেচিত সেই কাব্যগত বিভ্রমকে ধর্ম গ্রহণ করে এবং এই দাবি করে যে মানুষ সেগুলিকে বহির্বাস্তবের প্রতীকী বিবৃতির মর্যাদা দিক। কিন্তু যেহেতু মানুষের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা বৈজ্ঞানিক প্রকল্পের সত্যতা সপ্রমাণ বা অপ্রমাণ করে, ধর্ম তার বিভ্রমগুলির স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে যাওয়াকে রুখতে পারে কেবলমাত্র সেগুলিকে বস্তুজগৎ থেকে ভিন্ন এক অন্য জগতের—ঈশ্বরের রাজত্ব, "পরলোক" ইত্যাদির প্রতীকী করে তুলেই। সুতরাং আদিম ধর্ম থেকে এটা অধঃপতন [Degeneration]। আদিম ধর্ম তার বিশ্বাসগুলিকে [tenets] বিজ্ঞানসম্মতভাবে উপস্থাপিত করেছিল, সেগুলিকে দৃশ্যমান বস্তুজগতের সঙ্গে জড়িত বলে উল্লেখ করে, যেমন অলৌকিক কাজ ঘটান, বস্তুগত পাহাড়কে সরান ইত্যাদির উল্লেখ করে এবং তার ভুলগুলিও সেই কারণে ব্যবহারযোগ্য হওয়ায়, নিজেদের স্বরূপ উদ্ঘাটনের দ্বারা বিজ্ঞানের জন্ম দিতে পারত।

কিন্তু শ্রেণীধর্ম তার প্রতীকী বিবৃতিগুলিকে বস্তুগত পরীক্ষা থেকে সযত্নে রক্ষা ক'রে সেগুলিকে এমন এক স্বর্গরাজ্যের চৌহদ্দির মধ্যে ঘিরে রাখে যা বাস্তব জগতের অন্তরালে অদৃশ্যভাবে হয় বর্তমান থাকে, না হয় আরও পরিশীলিত রূপে সহজ কথায়, 'মানুষের হৃদয়ে' অবস্থান করে ; অর্থাৎ, শেষ পর্যন্ত সেগুলি বিষয়ীগত। সেক্ষেত্রে ধর্মের সত্য হল সহজ কথায় অনুভূতি-সুরের প্রতীকী এবং ধর্ম এইভাবে নিজেকে সংকুচিত করে শিল্পে পর্যবসিত করে। কেবল এই তার পার্থক্যটুকু থাকে যে এর আবির্ভাবের পদ্ধতিটাই একে একটা গোঁড়ামিপূর্ণ ও শিক্ষানবীশ সুলভ আড়ষ্টতা দেয় যা সচেতন শিল্পের নমনীয়তা ও করণ-কৌশলগত সমৃদ্ধির বিরোধী। সচেতন শিল্প তার ভূমিকা, তার উপাদান, তার সমস্যা, তার করণকৌশল ও তার ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন।

এইভাবে যত সমস্ত কিছু যা টিঁকে আছে অথচ যত দেহহীন তার কার্যভার গ্রহণ করেছে সেইরকম আধুনিক ধর্মও তার অধঃপতনের চিহ্নগুলিই প্রকাশ করে। এবং আমরা আগেই যা দেখিয়েছি, এর সমস্ত মতাদর্শগত গঠনটাই সে সব কারণগুলি একে টিঁকিয়ে রেখেছে তা প্রকাশ করে, সেই একই কারণ যা রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, যাজকতান্ত্রিক সুযোগসুবিধা ও সেই ধরনের

অ-ক্রিয়াধর্মী [non-functional] চিহ্নগুলিকে টি*কিয়ে রেখেছে। অপ্রচলিত সুযোগসুবিধার রক্ষাকারী এক শ্রেণী-সমাজের বিশেষ সর্তগুলিকে ও নিষেধ-ভয়গুলিকে প্রকাশ করে।

ধর্মের অবিকৃততা—বিষয়ী ও বিষয়ের অবিকৃততা এমন এক সমাজকে প্রতিফলিত করে যে সমাজ বিষয়ী ও বিষয়ের সক্রিয় সম্পর্কের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নিজেই অবিকৃত হয়ে উঠেছে। আর কেবলমাত্র এইটাই পারস্পরিক প্রতিবর্ত-মূলক গতির দ্বারা এই দুটির মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়। যে সমাজে পরিবেশ (বিষয়) থেকে চেতনা (বিষয়ী) বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে কারণ চিন্তাশীল শ্রেণী শ্রমিক শ্রেণী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, সেই সমাজে প্রয়োগ দ্বারা বাস্তব সম্বন্ধে মানুষের মতাদর্শগত প্রতিচ্ছবির যে নিয়ত সংশোধন ঘটে এবং যার ফলে বিজ্ঞানের সুস্থতা ও বিকাশ সম্ভব হয় সেই নিয়ত সংশোধন সম্ভব হয় না। বিজ্ঞান, যা তার নিজস্ব বিশিষ্ট ক্ষেত্রে সক্রিয় পরীক্ষানিরীক্ষার সাহায্যে বাস্তবকে ঘনিষ্ঠভাবে মেনে চলে, তাকে কোনও শ্রেণীর বিশ্বজনীন "দর্শনের" সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যায় না। তা ভেঙে অত্যন্ত বিশেষীকৃত, পরস্পরবিরোধী নানা বিজ্ঞানের এক বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়। আর এই পৃথকীকরণের ফলে চিন্তার ক্ষেত্রে দ্বৈত দেখা দেয়। এমন কি একজন বৈজ্ঞানিকও অবৈজ্ঞানিক বিশ্বদৃষ্টি পোষণ করেন—এইটাই নিয়ম হয়ে পড়ে। সেই কারণে বাস্তবের একটা বিষয়ীগত-ভাবে বিকৃত চিত্র দেখা দেওয়া সম্ভব হয় এবং এই বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে কর্মের মধ্য দিয়ে তার সংশোধন ঘটাও আর সম্ভব হয় না। তারা যে স্বাধীন নয় এবং ঈশ্বর যে মঙ্গলময় নয়, এটা ক্রীতদাসের পক্ষে অন্তভাবে জানা সম্ভব। কিন্তু তাদের প্রভুরা কি করে এদের অভিজ্ঞতার অংশীদার হবে? এবং একইভাবে আর এক জগতের বিকাশ—এই বস্তুজগৎ নয়, বরং উজ্জ্বল, আবেগোদ্দীপক বর্ণে আঁকা এক জগতের বিকাশ সৃষ্ট হয়। দুঃখকষ্ট ভোগীশ্রেণী যে বস্তুজগতের দুঃখকষ্ট ভোগ করে তার থেকে এই জগতটি সৃষ্ট হয়। তাদের বস্তুজগতের দুঃখকষ্টের ক্ষতিপূরণ করা হয় ভবিষ্যতের আনন্দ দিয়ে। অতএব ধর্মের বিপ্রতীপ জগৎ দেখা দেয়। বিপ্রতীপ যে হয় তার কারণ সমাজের জগৎটাই তখন বিপ্রতীপ হয়ে যায়। এই দুটি কারণের সংযোগেই ধর্ম এমন এক কালেও টিকে থাকে যখন বিজ্ঞান ও শিল্পের বিকাশ সূক্ষ্মতর হাতিয়ার আবিষ্কার দ্বারা ধর্মকে স্থানচ্যুত করে থাকে—তার জায়গায় "শিল্পের সচেতন বিভ্রমকে বিজ্ঞানের নৈর্ব্যক্তিক সত্তাকে এবং এই দুটিই যে সমৃদ্ধতর মূর্ত জীবন-যাপন সম্ভব করেছে, তা প্রতিষ্ঠিত করেছে।

কর্মজাত, কর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে অলীককল্পনা বিকশিত হয়। কর্ম থেকে এর জন্ম, আবার ফিরে কর্মকেই তা পূর্বাহ্ণে দেখতে পায় এবং সমৃদ্ধতর-রূপে তাকে ডেকে আনে। আর প্রয়োগ, সমৃদ্ধতর হয়ে অলীককল্পনার পূর্বাশাকে সংশোধন করে এবং সাফল্যের এক নতুন স্তরকে সম্ভবপর করে তোলে। এইভাবে অলীককল্পনা মানুষকে দুদিক থেকে অভিযোজিত করে—তার সহজপ্রবৃত্তিকে সমাজের অহং-এর সঙ্গে এবং তার প্রত্যক্ষকে সমাজের প্রত্যক্ষজ্ঞানের সঙ্গে। এই অভিযোজন জনিরূপের সেই মূক বর্বরকে মুক্ততর করে এবং স্বাধীন করে, কারণ সমাজের অহং এবং সমাজের প্রত্যক্ষ সাহায্যহীন একক ব্যক্তির অহং ও প্রত্যক্ষের থেকে হাজার গুণ বেশি চেতনশীল ও সমৃদ্ধ ও জটিল, ঠিক যেমন প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সংঘবদ্ধ মানুষ একক নিঃসঙ্গ ব্যক্তির থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী।

সমস্ত চিন্তা, সমস্ত অনুভূতিই কিছু পরিমাণে বিজ্ঞান ও শিল্পের বিষয়গুলিকে প্রতিফলিত করে। বিজ্ঞান ও শিল্প সৃষ্ট হয় আমাদের প্রাত্যহিক অস্তিত্বের মধ্য দিয়ে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও শিল্প-কর্ম এই প্রাত্যহিক মূর্ত জীবনের সংগঠনের উচ্চতর রূপ, তার সারবস্তু।

কোনও শিল্পগত গঠন [construction] থেকে নকল জগৎকে বাদ দিয়ে তার জায়গায় যখনই আমরা বাস্তব জগৎকে বসাই বা বিজ্ঞানসম্মত গঠন থেকে নকল নৈর্ব্যক্তিক অহংকে বাদ দিয়ে তার জায়গায় বাস্তব মানুষকে বসাই তখনই বিজ্ঞান ও শিল্প হয়ে ওঠে ব্যবহারিক এবং মূর্ত বাস্তব জীবনে এগুলি প্রবেশ করে। প্রথম ক্ষেত্রে এক অনাসক্ত মানব-বাসনাকে একটা বাস্তব বস্তুগত রূপ দিই ও দ্বিতীয়টিতে বাস্তবের একটি অংশকে মানব-বাসনার একটি উদ্দেশ্যের আকার দিই। এইভাবে, বাস্তব মূর্ত জীবনে প্রবেশ করে শিল্পগত ও বিজ্ঞানগত গঠন construction] যেন মিশ্রিত, "অবিশুদ্ধ", সাধারণের জায়গায় বিশেষ, বিমূর্তের জায়গায় মূর্ত একটা কিছু হয়ে ওঠে এবং সেটা সম্ভব করার জন্য যে ভাষা আমরা ব্যবহার করি তা প্রত্যয় উৎপাদনের ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত—প্রাত্যহিক জীবনের আটপৌরে ভাষা, যে ভাষা বিজ্ঞান ও শিল্পের জগতের বিশুদ্ধ ও "অ-ব্যবহারিক" ভাষা থেকে ভিন্ন। এই যে মেনে নিতে আমরা বাধ্য হই তার জন্য আক্ষেপের কিছু নেই। বিজ্ঞান ও শিল্প মানুষের জন্যই সৃষ্ট হয়েছিল, বিজ্ঞান ও শিল্পের জন্য মানুষ নয়। কিন্তু এর মধ্যে আরও কিছু কথা আছে। বিজ্ঞান ও শিল্প মানুষ থেকে সৃষ্ট হয়েছিল, বিজ্ঞান ও শিল্প থেকে মানুষ সৃষ্ট হয়নি। বাস্তব "অবিশুদ্ধ" জীবন-অভিজ্ঞতার

ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও শিল্প যে এই স্তরে গিয়ে পৌঁছায় এটাই তাদের সংশোধিত, পরিমার্জিত ও বিকশিত করে যাতে এগুলি আবার জীবনের মধ্যে এই পুনর্জন্মের ফলে আরও জ্ঞানযুক্ত হয়ে, সমৃদ্ধতর হয়ে, আরও বেশি বিমূর্ত ও বিশুদ্ধ হয়ে নিজেদের সুউচ্চ লোকে ফিরে যেতে পারে। এবং বিজ্ঞান ও শিল্প বর্তমানে যদিও এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বায়বীয় স্তরের তবু শৈশবদশায় এরা মূর্ত জীবনযাত্রার মতই মূর্ত ছিল।

অর্থনৈতিক উৎপাদনের জন্য সংঘবদ্ধতা'র দ্বারা সৃষ্ট এই অলীককল্পনার আদানপ্রদান ঘটে বস্তুগত প্রতীকের সাহায্যে—ভঙ্গী, ধ্বনি, চিত্র, স্পর্শ; মানুষের ইন্দ্রিয়শক্তিগুলির প্রকৃতির কারণে প্রথমদিকে ধ্বনিই হয়েছিল মানুষের পছন্দসই ইন্দ্রিয়শক্তি আর বাহ্য পরিবেশকে লক্ষ্য করার জন্য রইল মানুষের চোখের স্বাধীনতা। শ্রমবিভাজনের ফলে পরিবেশ সম্পর্কে একই কালে সব মানুষের সজাগ থাকার দরকার আর রইল না। শ্রমবিভাজন দৃষ্টির সুযোগসুবিধাগুলি পুনরুদ্ধার করল এবং ধ্বনি হয়ে উঠল দৃশ্য প্রতীক—লিখন। অলীককল্পনার আদানপ্রদানের জন্য পছন্দসই হাতিয়ার হিসাবে ভাষা বিকশিত হল। অঙ্কিত নক্সা বা চিত্র-লিপির থেকে উচ্চতর হাতিয়ার এটা। ভাষার এই মূর্ত ভূমিকা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও তার রূপগত দিকগুলির উপর একান্ত মনঃসংযোগ করার ফলে অনেক দার্শনিকই ভাষাকে এক অদ্ভুত পৃষ্ঠপোষকতার দৃষ্টিতে দেখেন।

এই সব দার্শনিকরা ভাষাকে মনে করেন "অসম্পূর্ণ" [imperfect], আদর্শ ভাষা থেকে বিচ্যুত এবং অযৌক্তিক—জীববিজ্ঞানী যদি প্রজাতি নিয়ে পর্যালোচনা করতে গিয়ে সেগুলি কোনও আদর্শ প্রাণী থেকে সরে গেছে বলে তাদের তিরস্কার করেন-অনেকটা সেইরকম। এই ধরনের দার্শনিকরা মনে করেন চেতনা হল ধ্যান—বাস্তবের এক বিকলাঙ্গ প্রতিরূপ। একইভাবে তারা মনে করেন বিশ্বের এক নিষ্ক্রিয় আলোকচিত্র হল ভাষার অস্তিত্ব। Wittgenstein এর Tractatus Logico—Philosophicus এই অঙ্গীকারের উপরই সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত। এ হল ফিলিস্তিনদের ভ্রান্তি। তারা মনে করে কোনও দৃশ্যের চিত্র হবে যেমনটি আছে ঠিক সেইরকমটি। এটা এই দার্শনিকরা দেখতে পান না যে, যে জিনিস আমাদের ইতোমধ্যেই আছে সেই জিনিসের যথাযথ নকল করা নির্বোধের কাজ। এবং বাস্তবের সঙ্গে ভাষার ও চিন্তার সম্পর্ক একটা নিষ্ক্রিয় প্রতিফলন নয় বরং তা এক সক্রিয় ও উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়া এবং এই সক্রিয়তা ও উদ্দেশ্যপূর্ণতাই, যা একটি

প্রতিক্রিয়া মাত্র, তাকে সচেতন ও পরিচিত হয়ে উঠতে সক্ষম করে। দর্পণ যথাযথভাবে প্রতিফলিত করে ; কিন্তু নিজে জানে না। বিশ্বের প্রতিটি কণাই বাকি বিশ্বকে প্রতিফলিত করছে, কিন্তু বাস্তবের বাকি অংশের সঙ্গে সক্রিয় ও সামাজিক সম্পর্ক থাকার ফলে মানুষই মাত্র জ্ঞান পেয়েছে। জ্ঞান হল একটা অর্থনৈতিক উৎপন্ন।

Wittgenstein-তত্ত্বকে রাসেল এইভাবে প্রকাশ করেছেন : "ভাষার মূল কাজ হল ঘটনাকে স্বীকৃতি দেওয়া বা অস্বীকার করা" কিন্তু এটা কোনও কাজই নয়। ঘটনা নিজেই নিজেকে স্বীকৃতি দেয় বা অস্বীকার করে : অর্থাৎ, হয় তার অস্তিত্ব আছে, না হয় তা অস্তিত্বহীন। বাহ্যিক বাস্তবে মানুষ তাকে হয় দেখে, না হয় দেখে না। সে মূক হয়ে থাকে। জীবনের প্রসারণ হিসাবে ভাষার কাজ হল কোন্ ঘটনাগুলি স্বীকৃতি দেওয়া বা অস্বীকার করার যোগ্য সেটা স্থির করা ; মানুষের জন্য কোন্ ঘটনাগুলির অস্তিত্ব আছে এবং কোন্ গুলির অস্তিত্ব নেই। ভাষার কাজ হল একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ বিশ্বদৃষ্টিতে ঘটনাগুলিকে স্থাপন করার জন্য সর্বাপেক্ষা উপযোগী হাতিয়ার হওয়া, যা সেই ঘটনাগুলিকে নির্বাচন করতে, বা সংক্ষিপ্ত করতে বা ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগের দিক থেকে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করতে পারে, এবং সেই রকম বিশ্বদৃষ্টিতে বিষয়ীকে অবশ্যই প্রবেশ করতে হয়। সমাজকে দুবার আবির্ভূত হতে হয়। অহং হিসাবে এবং জগৎ হিসাবে। এবং দুটি ক্ষেত্রেই তার সঙ্গে সঙ্গে তার বস্তুগত ইতিহাসকেও তা টেনে নিয়ে আসে। ভাষা সম্পর্কে রাসেলের দৃষ্টিভঙ্গী হল সেই বাস্তববাদ মহিলার মত, যিনি কার্লাইলকে বলেছিলেন, "আমি বিশ্বকে স্বীকার করে নিয়েছি"। কিন্তু মানুষ বিশ্বকে স্বীকার করে নেয় না, কারণ বিশ্ব মানুষকে স্বীকার করে নেয় না। মানুষকে সেটা পরিবর্তিত করতেই হয় ; না হলে তার নিজেরই লোপ পেয়ে যাওয়ার বিপদ থেকে যায়। এই পরিবর্তন সে ঘটাতে পারে কেবল মাত্র সংবদ্ধ হয়ে। অতএব অর্থনৈতিক উৎপাদনের জন্য সংবদ্ধ অবস্থায় অনুভবকারী মানুষ [Feeling men] হিসাবে এবং প্রত্যক্ষকারী মানুষ [perceiving men] হিসাবে মানুষে মানুষে যে পারস্পরিক সম্পর্ক ভাষা তাকেই প্রতিফলিত করে।

ভাষার এই ঐতিহাসিক ভূমিকা থেকেই ব্যাখ্যা করা যায় কেন উইটগেনস্টাইন কর্তৃক নির্ধারিত "যুক্তিসম্পূর্ণ" ভাষা থেকে বর্তমান ভাষাগুলি এত ভিন্ন ধরনের। সেই ধরনের যুক্তিসম্পূর্ণ ভাষা সম্পূর্ণরূপে অনুপযোগী হত। তা বস্তু জগতের এমন এক চিত্র যার বাহ্যিক বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কটি হত বস্তুর সঙ্গে

দর্পণে বস্তুর প্রতিবিম্বের সম্পর্কটির মতই। কিন্তু তা হলে সেটি প্রতিবিম্বিত সামগ্রীর থেকে নিকৃষ্ট একটা সামগ্রী হত, এবং সেটা হত একটা অনুপযোগী নির্মিতি। জগতের উপর বা বিষয়ের উপর তার কোন লুক্কায়িত ক্ষমতা থাকত না। যেহেতু ভাষা অনুভূতিকে প্রকাশ করে এবং তা বাস্তবের অংশগুলিকে বিচার করে এবং চিত্রিতও করে ঠিক সেই কারণেই তা মূল্যবান। ভাষা ত কেবল বাস্তব কি সেটাই প্রকাশ করে না (বাস্তব কি তা মানুষের সামনে খুবই স্পষ্ট হয়ে উপস্থিত), সেই বাস্তবকে নিয়ে কি করা যেতে পারে—তার অন্তর্নিহিত লুক্কায়িত নিয়মগুলি, এবং মানুষ তা নিয়ে কি করতে চায় —মানুষের নিজের অচেতন প্রয়োজনগুলি—সেটাও প্রকাশ করে। মানুষের সঙ্গে সম্পর্কে বাস্তব কি—সেইটি প্রকাশ করার হাতিয়ার হল ভাষা—বিমূর্ত মানুষের নয়, মূর্ত মানুষের।

এটা কি তাহলে স্পষ্ট নয় যে ধর্ম সম্বন্ধে দার্শনিকদের-ভ্রান্তির উৎস আর ভাষার ব্যাপারে তাঁদের ভ্রান্তির উৎসও একটাই?—শ্রেণীবিভক্ত সমাজে বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর বিচ্ছেদটাই সেই উৎস নয় কি? তখন চিন্তা কেবলমাত্র ধ্যান বলে প্রতীয়মান হয় এবং যে কার্যকলাপ তার জন্ম দেয়, তাকে বিকশিত করে এবং তাকে সংশোধিত করে সেই কার্যকলাপ থেকেই তা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ভাষা, এবং তাকে যে সৃষ্টি করেছে সেই অলীককল্পনা, এবং যে সচেতন মানস তাদের উভয়ের সন্তান এবং সংঘবদ্ধ হয়ে প্রকৃতির সঙ্গে যে মানুষের সংগ্রাম এই তিনটিকেই সৃষ্টি করেছে সেই মানুষ পরস্পরের সঙ্গে একটি সম্পর্কে গ্রথিত বা মার্ক্স ই প্রথম প্রকাশ করেন সেই তাড়াহুড়া করে লেখা ফয়েরবাক সম্পর্কে গবেষণামূলক এগারটি নিবন্ধে যা মানুষের চিন্তার জগতে এক নতুন যুগের সূত্রপাতকে সূচিত করে: "দার্শনিকরা জগৎকে বিভিন্নভাবে কেবল ব্যাখ্যাই করেছেন; আসল কথাটা অবশ্য হল তাকে পরিবর্তিত করা"।

দশম পরিচ্ছেদ

কাব্যের "স্বপ্ন-নির্মাণ"

১

আগের একটি পরিচ্ছেদে আমরা বলেছি যে আধুনিক কাব্য শব্দ দিয়ে তৈরি, তা অ-প্রতীকধর্মী, যুক্তিবিহীন, মূর্ত, ঘনীভূত আবেগোদ্দীপক দ্বারা বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্ত এবং ছন্দোময়। স্বপ্ন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে আমরা দেখেছি যে অলীককল্পনার অন্যান্য রূপের তুলনায় এটিও অ-প্রতীকধর্মী এবং যুক্তিবিহীন। কাব্য শব্দ দিয়ে তৈরি; স্বপ্ন স্মৃতি-প্রতিরূপ দিয়ে তৈরি। বহির্বাস্তব থেকে নেওয়া যুক্তিধর্মী নিয়মগুলিকে স্বপ্ন-প্রতিরূপগুলি মেনে চলে না, বরং মনঃসমীক্ষণ প্রমাণ করে দিয়েছে যে তার প্রতিরূপ-প্রবাহ আবেগোদ্দীপক সংক্রান্ত নিয়মগুলির দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়।

স্বপ্ন উদ্দেশ্য প্রণোদিত চিন্তাও নয়, উদ্দেশ্য প্রণোদিত অনুভূতিও নয়—তা হল স্বাধীন—অর্থাৎ অ-সামাজিক—অনুষঙ্গ। সেই কারণে স্বপ্নের অনুষঙ্গগুলি হল ব্যক্তিগত এবং স্বপ্নদর্শনকারীর ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে তার উল্লেখ থেকেই কেবলমাত্র তা বোঝা সম্ভব। স্বপ্নের গঠনের লুক্কায়িত নিয়মই হল "স্বপ্ন-নির্মাণ" ["dream-work"]।

স্বপ্নের সঙ্গে কাব্যগত যুক্তিনিরপেক্ষতার মিল এইখানে যে তার প্রতিরূপ-প্রবাহকে আবেগোদ্দীপক সংক্রান্ত নিয়ম দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়; কিন্তু স্বপ্নের ক্ষেত্রে যেরকম হয়ে থাকে এটা সেই রকম "স্বাধীন" অনুষঙ্গ নয়। কাব্যের অনুভূতি হল উদ্দেশ্য-প্রণোদিত অনুভূতি—সামাজিক অহং দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অনুভূতি। কাব্যের অনুষঙ্গগুলি সামাজিক।

স্বপ্নদর্শনকারী যেমন তার স্বপ্নের প্রতিরূপগুলির মধ্যেই পুরাপুরি বাস করে, অন্য বাস্তবের সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকে না, সেইরকম কাব্যের পাঠকও কাব্যের শব্দগুলির মধ্যেই বাস করে। বহির্জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকে না। কবির জগৎই হল তার জগৎ। তিনি যখন কবিতা পড়েন তখন কবির আবেগই তিনি অনুভব করেন। মরাল নাগিনী বা মুরা দেবতা যার ওপর ভর করেছেন সেই ব্যক্তি যেমন ঈশ্বরের হয়ে উত্তম পুরুষে কথা বলেন সেই রকম কাব্যের পাঠকও কাব্যগত বিভ্রমের প্রভাবে কবির হয়ে উত্তম পুরুষে [illegible]।

কাজের ধ্যানধারণাগুলির মত স্বপ্নের প্রতিরূপগুলিও মূর্ত। প্রতিটি স্বপ্নে এবং প্রতিটি কবিতায় স্মৃতি-প্রতিরূপ এবং শব্দ ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা পালন করে এবং সেই কারণে তাদের অর্থও ভিন্ন ভিন্ন হয়। স্বপ্ন এবং কবিতা নিজের নিজের মধ্যে সঙ্গতিবিহীন। প্রতিটি স্বপ্ন এবং প্রতিটি কবিতাই এক একটি স্বকীয় জগৎ।

কাব্য ছন্দোময়। ছন্দ শারীরবৃত্তগত চেতনার উৎকর্ষসাধনকে সুনিশ্চিত করে যার ফলে পরিবেশ সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষকে সম্পূর্ণ বাইরে রাখা যায়। নৃত্য, সংগীত বা গানের ছন্দে সচেতন হওয়ার পরিবর্তে আমরা আত্মসচেতন হয়ে উঠি। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ও শ্বাসগ্রহণের ছন্দ এবং শারীরিক পর্যাবৃত্তি পরিবেশের বস্তুগত ছন্দকে প্রতিরোধ করে। এই অর্থে নিদ্রাও ছন্দোময়। স্বপ্নদর্শনকারী দেহের দুর্গের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়।

গল্পের থেকে কবিতায় "শারীরবৃত্তগত" অন্তর্মুখিনতার প্রয়োজন এত বেশি কেন যাতে ছন্দ ও মিলের দুরূহতাকে কবিকে স্বীকার করে নিতে হয়? তার উত্তর এই যে কবিতায় অন্তর্মুখিনতা বেশি শক্তিশালী হওয়া চাই। অন্তর্মুখিনতা বলতে কেবলমাত্র তাৎক্ষণিক পরিবেশ থেকে মুখ ফেরান নয়—সেটা ত' নিরিবিলি পড়ার ঘরে, যেখানে কোনও গোলমাল নেই সেখানে বসে থাকলেই সুনিশ্চিত করা যায়। সমস্ত রকম চিন্তার মধ্যেই সেরকম অন্তর্মুখিনতা সমানভাবে কাম্য; বৈজ্ঞানিক চিন্তা এবং উপন্যাস বা কবিতা-পাঠের জন্যও তা প্রয়োজন। এবং সেটা শব্দের বিন্যাস দ্বারা সুনিশ্চিত হয় না, বরং মনঃসংযোগের প্রয়াসের দ্বারাই সেটা সুনিশ্চিত হয়। কোনও কোনও লোক কোনও কঠিন বিজ্ঞানবিষয়ক বা কাব্য বিষয়ক গ্রন্থে এমন পরিবেশে "মনঃসংযোগ" করতে পারে যে পরিবেশে অন্যরা পারে না। এই ধরনের অন্তর্মুখিনতা সেই কারণে শব্দের বিন্যাসের উপর নির্ভর করে না। ছন্দোবদ্ধ করে বিজ্ঞানবিষয়ক রচনাকে সহজতর করার কথাও কেউ বলেন নি।

কিন্তু অন্তর্মুখিনতার আরও একটি দিক আছে। এটা ঠিক যে বিজ্ঞান-বিষয়ক অলীককল্পনার জন্য অন্তর্মুখিনতার ক্ষেত্রে আমরা তাৎক্ষণিক পরিবেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিই। কিন্তু তা সত্ত্বেও শব্দগুলি বহির্বাস্তবের যে যে অংশের প্রতীক সেই সেই দিকেই মুখ ফেরাই। ভাষার আড়ালে বহির্বাস্তবের যে বর্ণনা থাকে সেটাকেই আমরা সাধারণতঃ দেখি। কিন্তু কাব্যের ক্ষেত্রে শব্দগুলির নিজেরই যে অনুভূতি-সুর থাকে চিন্তাকে সেইদিকে পরিচালিত করতে হয়। কাব্যের দ্বারা বহির্বাস্তবের যে অংশগুলিকে প্রতীকায়িত করা

রয়েছে, মনোযোগকে তার নীচে ডুব দিতে হয়; সেই অংশগুলির সঙ্গে জড়িত যে আবেগগত গহীনলোক থাকে সেইখানে গিয়ে আমাদের পৌছতে হয়। কাব্যের ক্ষেত্রে আমাদের আত্মনকে [soil] নানা রঙের বস্তু বেরাটোপ ভেদ করে তার অভ্যন্তরে যে শুভ্র দীপ্তি বিরাজ করে সেখানে পৌছতে হয়। সেই কারণে শারীরবৃত্তগত অন্তর্মুখীনতার প্রয়োজন। এই অন্তর্মুখিনতা পাঠকের তাৎক্ষণিক পরিবেশ থেকে মুখ ফেরান নয়, তা হল সেই কবিতায় বর্ণিত পরিবেশ (বা বহির্বাস্তব) থেকে মুখ ফেরান। সেই কারণে কাব্য ভাষার ব্যবহারে আত্মনের গঠনকে উন্নীত করার জন্য বাস্তবের গঠনকে ক্রমাগত বিকৃত ও অস্বীকার করে। যে সব শব্দের মধ্যে কোনও যুক্তিসাপেক্ষ যোগসূত্র নেই, অর্থাৎ, বহির্বাস্তবের জগতের মধ্যে যার কোনও কেন্দ্রবিন্দু [nexus] নেই,—মিল, স্বরসংগতি বা অনুপ্রাসের মাধ্যমে কাব্য সেই শব্দগুলিকে পরস্পর-যুক্ত করে তোলে। কবি শব্দগুলির তর্কশাস্ত্রগত [logical] গঠনকে ভেঙে চুরে শব্দগুলিকে ইচ্ছামত দৈর্ঘ্যের পংক্তিতে ভাগ করেন। বহির্বাস্তবের জগৎ থেকে সঞ্জাত শব্দের অনুষঙ্গগুলিকে তা ভেঙে ফেলে। বিপ্রতীপকরণ এবং যত রকমের সম্ভব কৃত্রিম গুরুত্বদান [stressing] ও ভিন্নস্বরের [counterpoint] মাধ্যমে সেই কাজটি করা হয়।

এইভাবে বহির্বাস্তবের জগৎটি যায় পিছিয়ে। তার জায়গায় সহজপ্রবৃত্তির জগৎ, শব্দের আড়ালে যে আবেগোদ্দীপকগত আবেগের যোগসূত্র থাকে সেইটি সামনে এসে দাঁড়ায়। এবং সেটাই হয়ে ওঠে বাস্তবের জগৎ। বিষয় থেকে উদ্ভূত হয় বিষয়ী: সামাজিক জগৎ থেকে সামাজিক অহং। ওয়ার্ডসওয়ার্থ সঠিকভাবেই বলেছিলেন: "ছন্দের প্রবণতা হল ভাষা থেকে তার বাস্তবের ভার কিছুটা পরিমাণে লাঘব করা এবং এইভাবে সমগ্র রচনাটির উপর এক ধরনের বস্তুহীন অস্তিত্বের অর্ধ-সচেতনতা বিস্তার করা।" একইভাবে কোলরিজও অনেকটা আমাদেরই মত একটা ধারণাতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন: "মাত্রা বা metre হল এমন এক উদ্দীপক সামগ্রী যা মনোযোগকে জাগিয়ে তোলে"—যে কোনও মনোযোগের নয়, একটা বিশেষ ধরনের মনোযোগের উদ্দীপক—শব্দগুলির নিজের যে আবেগোদ্দীপকগত অনুষঙ্গ আছে সেইদিকে মনোযোগ।

কাব্য ও উপন্যাসের মধ্যে এখানে একটা পার্থক্য রয়েছে। এটা লক্ষ্য করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপন্যাসেও বিষয়াগত উপাদানগুলিকে তাদের নিজেদের জন্যই মূল্য দেওয়া হয়ে থাকে এবং সেগুলি সামনে এসে দাঁড়ায়,

সেটা হয় ভিন্নভাবে। উপন্যাস বহির্বাস্তবকে মুছে দিয়ে তার জায়গায় পাঠক এবং বাস্তবের মধ্যে দাঁড়াতে পারে এমন যথেষ্ট "আসলবস্তু" সম্পন্ন ["stuff"] একটা কমবেশি সঙ্গতিপূর্ণ নকল বাস্তবকে স্থাপিত করে। তার অর্থ এই যে উপন্যাসে আবেগগত অনুষঙ্গগুলি শব্দের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করে না। শব্দের দ্বারা প্রতীকায়িত নকল বাস্তবের গতিশীল প্রবাহের সঙ্গে সেগুলি জড়িত। এই কারণেই ছন্দ, "মূল্যমর্যাদা" ["preciousness"] এবং স্টাইল উপন্যাসের পরিপন্থী; উপন্যাসকে ভালোভাবে অনুবাদ করা যায়; উপন্যাস শব্দ দিয়ে রচিত নয়। নাটকের মত উপন্যাসও দৃশ্য, ক্রিয়া, [actions] আসলবস্তু, এবং [stuff] মানুষ নিয়ে রচিত। উপন্যাসের পক্ষে "রত্নখচিত" ["jewelled"] স্টাইল একটা অসুবিধা, কারণ তা সামগ্রী থেকে ও মানুষ থেকে আমাদের চোখকে শব্দের দিকে নিয়ে যায়—শব্দ হিসাবে নয়, কালো কালো সীমারেখা হিসাবে নয়, সেই সব প্রতীক হিসাবে যার সঙ্গে নানা রকমের অনুভূতি-সুর সরাসরি জড়িয়ে আছে। যেমন ধরুন, কেউ যখন বলে ওঠে "জানোয়ার!" আমরা তখন জন্তুর কথা এবং পরে তাদের জাস্তবগুণের কথা ভাবি না, বরং নিষ্ঠুরতা ও কদর্যতার ইঙ্গিতবহ একটা জোরালো বিষয়ীগত প্রতিক্রিয়া ঘটে। শব্দের প্রতি এটা একটা কাব্যগত প্রতিক্রিয়া, অন্যটি হল কাহিনীগত প্রতিক্রিয়া।

যেহেতু শব্দের সংখ্যা অল্প সেইজন্য সেগুলি ফ্রয়েড যাকে বলেছেন "অতি-নির্ধারিত" ["Over determined"]। একটি শব্দের অনেক আবেগোদ্দীপক-গত অনুষঙ্গ থাকতে পারে, কারণ তার অনেক অর্থ আছে (উদাহরণস্বরূপ, "জানোয়ার" শব্দটির দ্বারা বোকালোক, নিষ্ঠুর লোক, প্রাণীর স্তর ইত্যাদি বোঝাতে পারে)। উপন্যাস রচনায় শব্দগুলি এমনভাবে সাজানো হয় যাতে বাস্তবের যে অংশটি দরকার সেটি ছাড়া অন্য সব অংশগুলি বাদ চলে যায় এবং যে কাঠামোটি শেষ পর্যন্ত গড়ে ওঠে তারই সঙ্গে আবেগগত অনুষঙ্গটি ঘটে। কাব্য রচনায় লক্ষ্য থাকে আবেগগত অনুষঙ্গগুলি এমন করে তোলা যাতে বাস্তবের একটি সুসংগত অংশের সঙ্গে কোনও পূর্বসঙ্গ ব্যতিরেকে তারা পরস্পরকে হয় বাদ দেয়, না হয় জোরদার করে। উদাহরণস্বরূপ—উপন্যাস রচনায় "ভারত মহাসাগর" এই বাক্যাংশের মধ্যে "মহাসাগর" শব্দটি এমন একটা সুনির্দিষ্ট ভৌগলিক মহাসাগরের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে পাঠকের কাছে যার তাৎক্ষণিক আবেগগত অনুষঙ্গ আছে। কাব্যে "ভারতসমুদ্র" বাক্যাংশের অন্য অর্থ। কারণ তার আবেগগত অনুষঙ্গ কোনও একটা বিশেষ সমুদ্রের সঙ্গে

নয়, তার সম্বন্ধ হল "ভারত" শব্দটির সঙ্গে এবং "সমুদ্র" শব্দটির সঙ্গে, যে দুটি শব্দ পরস্পরকে প্রভাবিত করে এবং মিলিতভাবে এক উজ্জ্বল বৈষম্যের "অনুভূতির" সৃষ্টি করে উপন্যাস রচয়িতার বাক্যাংশটির থেকে যা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

উপন্যাসের মধ্যে অবশ্যই কাব্যধর্মী রচনার রেশ [stretches] থাকতে পারে (যেমন Proust, Malraux, Lawrence এবং Melville এর রচনায়) বা কাব্যের মধ্যে উপন্যাস রচনায় (শেকস্পীয়রের নাটকে কেবলমাত্র ব্যাখ্যানসূচক অংশগুলি) রেশ থাকতে পারে। কিন্তু সেটা সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রভাবিত করে না। এই পার্থক্যটা এতই সুস্পষ্ট যে অনেক বড় বড় ঔপন্যাসিক কাব্যের প্রতি যে অদ্ভুৎ অসাড়তা দেখিয়েছেন এবং একইভাবে অনেক বড় বড় কবি যে অপকৃষ্ট উপন্যাসের প্রতি আকর্ষণ দেখিয়েছেন তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কাব্য ও উপন্যাসের করণকৌশলের এই পার্থক্য এই দুই শিল্পের ক্ষেত্রের মধ্যকার পার্থক্যটিকে নির্ধারিত করে।

২

সাহিত্যের ভিত্তি কি? কোন্ অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের ফলে তার অগ্রগতি ঘটে? স্পষ্টতঃই সেটা যে দ্বন্দ্ব থেকে সমাজের সামগ্রিক গতি সৃষ্ট হয়, সহজপ্রবৃত্তি ও পরিবেশের দ্বন্দ্ব, মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে যে অন্তহীন সংগ্রাম চলছে, যাকেই বলে জীবন—সেই দ্বন্দ্বেরই একটা বিশেষ রূপ।

আমি এক শিল্পী, আমার কিছু নির্দিষ্ট চেতনা আছে যা আমার সামাজিক জগতের ছাঁচে গড়ে উঠেছে। শিল্পী হিসাবে আমার শিল্পগত চেতনার ব্যাপারে আমি সংশ্লিষ্ট। আমার এই শিল্পগত চেতনা আমি যা কিছু শিল্প অনুভব করেছি তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবের এবং যা কিছু আবেগগত সংগঠন আমার মধ্যে একটা সচেতন বিষয়ীর সৃষ্টি করেছে তার প্রতিনিধিত্ব করে। আমার অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই চেতনার দ্বন্দ্ব ঘটে—অর্থাৎ, আমার একটা নতুন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দেখা দিল। অর্থাৎ এমন একটা কিছু দেখা দিল যেটা কাব্যের সামাজিক জগতে ছিল না। সেই কারণে আমার একটা বাসনা দেখা দেয়, যাকে বলা হয় আত্মপ্রকাশের বাসনা, কিন্তু যা আসলে আত্ম-সামাজিকীকরণ, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে এমন একটা রূপ দেওয়া যাতে সেটা শিল্পের সামাজিক জগতের অঙ্গীভূত হবে এবং সেটাকে একটা শিল্পকর্ম হিসেবে মনে হবে। এই শিল্পকর্ম হল প্রতিষেধের প্রতিষেধ [negation of negation]—শিল্পের বর্তমান জগৎ (বর্তমান চেতনা বা তত্ত্ব) এবং আমার অভিজ্ঞতার (জীবন বা প্রয়োগ) মধ্যে সংশ্লেষণ [synthesis]।

অতএব শিল্পকর্মটি সম্পন্ন হলে শিল্পের জগৎটি আমার শিল্পকর্মটির প্রবেশের ফলে পরিবর্তিত হবে। শিল্পী হিসাবে আমার ভূমিকার এই হল বিপ্লবী দিক কিন্তু আমার চেতনাও পরিবর্তিত হয়ে যাবে, কারণ শিল্পের জগতের মাধ্যমে আমার জীবনের অভিজ্ঞতা, যা ছিল নতুন, মূক, ও অসংগ্রথিত তাকে সচেতন হয়ে উঠতে, আমার সচেতন ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে বাধ্য করেছি। শিল্পী হিসাবে আমার ভূমিকার সেটি হল অভিযোজনাত্মক দিক। একইভাবে শিল্পের সমঝদারের ক্ষেত্রে তাঁর চেতনাও একটা নতুন শিল্পকর্ম তার মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ার ফলে বিপ্লবায়িত হবে ; কিন্তু সেটি সম্পর্কে তাঁর রসাস্বাদনও সেই পরিমাণেই মাত্র সম্ভব হবে যে পরিমাণে তাঁর জীবনে কোনও অনুরূপ অভিজ্ঞতালাভ ঘটেছে। প্রথম প্রক্রিয়াটা হবে বিপ্লবাত্মক, পরেরটা অভিযোজনাত্মক।

বিপ্লবাত্মক শব্দটি ব্যবহারের থেকে বিবর্তনমূলক শব্দটি ব্যবহার করা বেশি ভাল। বিপ্লবাত্মক শব্দটি অন্যান্য সেই সব ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য সীমাবদ্ধ রাখা যেতে পারে যেখানে অভিজ্ঞতার নতুন বিষয়বস্তু [content] চেতনার বর্তমান স্তরের এমনভাবে বিরোধী যে একটা সামগ্রিক পরিবর্তন প্রয়োজন, যে বিধেয়গুলি রয়েছে সেগুলিকে (প্রথা, ঐতিহ্য, শিল্পগত মান) অন্তর্ভুক্ত করার জন্য একটা পুরাপুরি সংশোধন প্রয়োজন। সেটা এমন এক সংশোধন যা কেবলমাত্র এইজন্যই সম্ভব যে সেই কালপর্বে মূর্ত জীবনের নিজেরই অনুরূপ পরিবর্তন ঘটে গেছে। এলিজাবেথীয় যুগ ছিল এইরকম একটা যুগ। এই ধরনের আর একটি যুগের মুখে আমরা দাঁড়িয়ে আছি।

এটা সুস্পষ্ট যে শিল্পীর কারবার আবেগগত চেতনা নিয়ে—যে চেতনা সরাসরি সহজপ্রবৃত্তি থেকে উদ্ভূত। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ও তাঁর প্রকল্প (শিল্পকর্মের সমপর্যায়ের) এবং তাঁর যুক্তিনিষ্ঠিক চেতনা, যে চেতনা সরাসরি প্রত্যক্ষ থেকে উদ্ভূত, এই দুইয়ের মধ্যেও ঠিক একই সম্পর্ক কাজ করে।

শিল্পের প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী উৎপাদকটি যেহেতু ব্যক্তির অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কিত সামাজিক অহং, সেই কারণে এটা সুস্পষ্ট যে শিল্পকর্ম যে সমন্বয় ঘটায় তা কেবলমাত্র এই সর্তেই সম্ভব যে, যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিষয়টি সমন্বয়িত হচ্ছে তা হল কে, গুরুত্বপূর্ণ, গভীর আবেগগত নোদনার [drives] সঙ্গে তা সংশ্লিষ্ট। পরিবর্তনহীন সহজপ্রবৃত্তিগুলির সঙ্গে তা সংশ্লিষ্ট, সংস্কৃতির পরিবর্তনশীল অভিযোজনগুলির নীচে সেগুলি একই থেকে যাওয়ার কারণে এই পরিবর্তনহীন সহজপ্রবৃত্তিগুলি কাঠামো হিসাবে যুগ যুগ ধরে শিল্প

যে সামাজিক বন্ধন গড়ে তুলেছে তার প্রধান সংগঠনী শক্তি হিসাবে কাজ করে। (খ) তা হল সার্বিক, সেটা শিল্পীর বা দু' একজন মানুষের বিশিষ্ট অভিজ্ঞতার একটি ব্যক্তিমূলক বিষয় নয় বরং বেশির ভাগ মানুষের অভিজ্ঞতায় মূক অচেতনভাবে সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এমন একটা ব্যাপার সেটা—না হলে তাদের কাছে শিল্পের অর্থ থাকবে কেন, শিল্পীর অভিজ্ঞতাকে তা সমৃদ্ধ করতেই বা পারে কি করে, আর তাকে প্রকাশ করতেই বা পারে কি করে?

'ক' শর্তটি এটাই সুনিশ্চিত করে যে বৃহৎ শিল্পে, অর্থাৎ যে শিল্প এক ব্যাপক ও গভীর অন্বয় সাধন করে, সেই শিল্পে, বিশ্বজনীন কিছু, কালসীমাহীন কিছু ও যুগে যুগে শাশ্বত কিছু থাকে। এই কালসীমাহীনতা সহজপ্রবৃত্তিগুলির কালসীমাহীনতা বলে, সভ্যতার সমস্ত সমৃদ্ধ উপরিকাঠামোর নীচে জনিরূপের পরিবর্তনহীন সংগোপন মুখচ্ছবি বলে আমরা এখন দেখে থাকি। আমাদের কাছে সমসাময়িক শিল্পের একটা বিশেষ ও লক্ষ্যণীয় অর্থ যে কেন থাকে, তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় "খ" শর্তটি থেকে; এমন কি সমসাময়িক দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিদের মধ্যেও কেন যে একটা প্রাণধর্মী ও অব্যবহিত [vital and immediate] কিছুর সন্ধান পাই যা হোমার, দান্তে বা শেকসপীয়রে পাই না, তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এঁরা একই জগতে বাস করেন এবং যে কায়াহীন শক্তিগুলির ক্ষমতা তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন এঁরাও সেইগুলিরই মুখোমুখি হন।

শিল্প সম্পর্কে একটা বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থাকাটা যে কেন সঠিক, কোনও যুগের সামাজিক সম্পর্কগুলির প্রতিফলন দেখতে হলে কেন যে সেই যুগের শিল্পকর্মগুলিকে লক্ষ্য করাটা সঠিক, তার ব্যাখ্যাও পাওয়া যায় এই থেকে। কারণ, সাধারণভাবে মানুষের অভিজ্ঞতা সেই যুগের সামাজিক সম্পর্কগুলির দ্বারা সাধারণভাবে নির্ধারিত হয়ে থাকে, অথবা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, সেই যুগের সামাজিক সম্পর্কগুলি মানুষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলির গড় ছাড়া আর কিছুই নয়, ঠিক যেমন প্রজাতি হল একই গোষ্ঠিভুক্ত প্রাণীদের শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলির গড়। যেহেতু সামাজিক জগতেই শিল্পের অস্তিত্ব এবং মানুষের সাধারণ অভিজ্ঞতাগুলিকে সমন্বয়িত করেই কেবল তার মূল্য, সেই কারণে এটা স্পষ্ট যে কোনও যুগের শিল্প সেই যুগের মানুষের সাধারণ অভিজ্ঞতাগুলিকেই মাত্র প্রকাশ করতে পারে। এক নিঃসঙ্গ প্রাণী হওয়া দূরে থাক, শিল্পী হল সেই যুগের স্বাভাবিক [normal] মানুষ—কারণ সে শিল্পী। অবশ্য চেতনার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকতা [normality] দৃষ্টিশক্তির ক্ষেত্রে স্বাভাবিকতার মতই দুর্লভ এবং শেষেরটির সঙ্গে এর পার্থক্য এই যে, এটা একটা

স্থিরীকৃত শারীরিক মান নয়, বরং বছরে বছরে তার তারতম্য ঘটে। উপরন্তু, তার স্বাভাবিকতা হল, যাকে বলে অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতার [abnormal experience] এর আদর্শমান [norm]। এ হল সমসাময়িক মানুষের জীবনের বৈচিত্র্য ও নবত্ব ও আকস্মিকতার আদর্শ মান: অভাবনীয়ের যত কিছু আবির্ভাব যা সমকালীন মানুষের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া চেতনাকে নাড়িয়ে দেয়। সেই কারণেই শিল্পীর যত আপাতঃ অস্বাভাবিকতা।

পরিশেষে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শিল্পও যে কেন শ্রেণী-শিল্প হয় তারও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এই থেকে। কারণ মার্ক্সীয় অর্থে শ্রেণী বলতে এই মাত্র বোঝায় যে তা হল মানুষের একটি গোষ্ঠী যাদের জীবনের অভিজ্ঞতা মূলতঃ একই ধরনের; অর্থাৎ, অন্যান্য শ্রেণীর মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাদের বাহ্যিক পার্থক্য যতটা থাকে তার থেকে তাদের অভ্যন্তরীণ পার্থক্য গড়পড়তা-ভাবে কম। অবশ্যই এই পার্থক্যের একটা অর্থনৈতিক ভিত্তি থাকে, অর্থনৈতিক উৎপাদনের অপরিহার্য সর্তগুলি থেকে সৃষ্ট একটা বস্তুগত কারণ থাকে। সেই কারণে যে গোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা স্বভাবতঃই শিল্পীর নিজের শ্রেণীর অভিজ্ঞতার সাধারণভাবে অনুরূপ সেই গোষ্ঠীর নতুন অভিজ্ঞতাকেই সে সমন্বয়িত করবে এবং সেই গোষ্ঠীর চেতনাকেই সে ভাষা দেবে। এটি হবে সেই শ্রেণী যে শ্রেণী শিল্পের চর্চা করে—সেই শ্রেণী, যে যেকতে সমাজের স্বাধীনতা ও চেতনা এসে সমবেত হয়, আর সমস্ত যুগেই সেই শ্রেণী হল শাসক শ্রেণী।

এই হল সাহিত্যের সর্বাধিক সাধারণ চলন, যা সমাজের সর্বাধিক সাধারণ নিয়মকে প্রতিফলিত করে। কাব্য ও উপন্যাসের করণকৌশলগুলির পার্থক্যের কারণে—ইতোপূর্বেই তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে—এই চলন কাব্য ও উপন্যাসে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ পায়।

বস্তু বা সামগ্রী যে শব্দ দ্বারা প্রতীকায়িত তার কাছে প্রথমে গিয়ে এবং তারপর তা থেকে আবেগোদ্দীপকগত অনুষঙ্গ আহরণ না করে কাব্য শব্দের তাৎক্ষণিক আবেগোদ্দীপকগত অনুষঙ্গের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে। শব্দ যে বস্তুগুলির প্রতীক সেগুলির থেকে শব্দের সংখ্যা যেহেতু কম, কাব্যের আবেগোদ্দীপকগুলিও সেই অনুপাতে ঘনীভূত। কিন্তু কাব্য নিজেই সেই অনুপাতে অস্বচ্ছ ও বহুঅর্থবাচক। এই বহুঅর্থবাচকতাকে [ambiguity] এম্পসন [Empson] কাব্যের সারবস্তু বলে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটা একটা উপজাত। এখন, প্রথমে প্রতীকায়িত বাস্তবের কাছে এবং তারপর সেই

বাস্তবের অনুভূতি-স্বরের কাছে যাওয়ার পরিবর্তে শব্দের আবেগোদ্দীপকগত স্বরের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করাটা—তাবার নিজস্ব প্রকৃতির কারণেই—হল মানুষের চেতনার অপেক্ষাকৃত বেশি মূক ও সহজপ্রবৃত্তিগত অংশের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা। এটা হল মানুষের চেতনার অপেক্ষাকৃত বেশি সহজপ্রবৃত্তিগত সাধারণ অংশের দিকে অভিগমন। এটা হল অভিযোজিত মানুষের মধ্যকার জনিরূপের পরিবর্তনহীন কেন্দ্রবস্তুর দিকে অভিগমন। কাব্যে শারীরবৃত্তগত অন্তর্মুখিনতার গুরুত্বটাও সেই কারণেই।

এই জনিরূপ হল অ-পৃথকীভূত, কারণ তা অপেক্ষাকৃত পরিবর্তনহীন। উপন্যাসের কালপারম্পর্যের তুলনায় সেই কারণেই কাব্যের কালসীমাহীনতা। কাব্য কালসীমাহীনতার দিক থেকে সেই একটি সাধারণ "অহংয়ের" কথা বলে সমস্ত অভিজ্ঞতা যার চারপাশে বিন্যস্ত [orientated]। কাব্যে মানুষের সমস্ত আবেগগত অভিজ্ঞতা সহজপ্রবৃত্তিগুলির চারপাশে,"অহংয়ের" চারপাশে বিন্যস্ত। কাব্য হল একটি স্থান থেকে নেওয়া বাস্তবের বিভিন্ন সহজপ্রবৃত্তিগত পরিপ্রেক্ষিতের গুচ্ছ। কাব্য যেহেতু অস্বচ্ছ ও বহুঅর্থবাচক ঠিক সেই কারণেই কাব্যের দৃষ্টিপথ [view] হল সুদূরপ্রসারী ; তার দিগন্ত উন্মুক্ত ও ব্যাপক এবং সুদূর অস্পষ্ট অসীমের দিকে তা প্রসারিত বলে মনে হয়। কাব্য যেহেতু সহজপ্রবৃত্তিগত, সেই কারণে তা দীর্ঘস্থায়ী। কাব্যে সহজপ্রবৃত্তিগুলি উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করে। সামগ্রিকভাবে সমসাময়িক জীবনের সঙ্গে প্রতিটি মানুষের সাধারণ সম্পর্কের মধ্যে যেটি সকলের মধ্যেই বর্তমান এই আহ্বান সেটিকে প্রকাশ করে।

কিন্তু বাস্তব থেকে তার বিষয়ীগত অনুষঙ্গগুলিকে আহরণ করার জন্য উপন্যাস প্রথমে যায় বাস্তবের কাছে। সেই কারণে উপন্যাসকে আমরা "নিজেদের মধ্যে" অনুভব করি বলে মনে হয় না, উপন্যাসের অনুভূতি-স্বরগুলির সঙ্গে আমরা আমাদের অনুভূতিগুলিকে অভিন্ন করে ফেলি না। উপন্যাসের সকল জগতের অভ্যন্তরে দাঁড়িয়ে আমরা তার চারদিক লক্ষ্য করি ; বড় জোর নায়কের সঙ্গে আমরা নিজেদের এক করে দেখি এবং তার সঙ্গে একযোগে তার পরিবেশের "ভিন্নতাকে" লক্ষ্য করি। সহজপ্রবৃত্তি ও পারিপার্শ্বিকের মধ্যকার সাধারণ চাপকে [tension] উপন্যাস প্রকাশ করে না, বরং তা পারিপার্শ্বিকের (জীবনের অভিজ্ঞতার) পরিবর্তনের ফলে চাপের যে পরিবর্তনগুলি ঘটে তাকেই প্রকাশ করে। যে পৃথকীভূত সমাজে বিভিন্ন মানুষের পরস্পরের মধ্যে কাজ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সুস্পষ্টভাবে পৃথক সেই

পৃথকীভূত সমাজে কাব্য উপাদানটির (বাস্তবকে একটি প্রক্রিয়া হিসাবে দেখলে) এই জোর করে আবির্ভূত হওয়াটা [incursion] যে এত প্রয়োজনীয় তার অর্থ এই যে, উপন্যাসকে বিশেষীকরণ [particularise] করতেই হবে এবং তার চরিত্রগুলিকে এমন হতে হবে যার কাজকর্ম ও অনুভূতিগুলিকে বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। কাব্য হল অন্তান্তরীণ—একটি বিন্দু থেকে, কবির দিক থেকে নেওয়া জগতের "অহং" পরিপ্রেক্ষিতগুলির একটি গুচ্ছ। কাহিনী হল বাহ্যিক—জগতের বিভিন্ন অংশ থেকে নেওয়া একটি মাত্র "অহংয়ের" (চরিত্রের) পরিপ্রেক্ষিতগুলির একটি গুচ্ছ।

স্পষ্টতঃই উপন্যাস সেই সমাজে দেখা দিতে পারে যেখানে বিভিন্ন মানুষের অভিজ্ঞতাগুলি পরস্পরের মধ্যে এত সুস্পষ্টভাবে ভিন্ন যে এই বিষয়গত অভিগমনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে, এবং অভিজ্ঞতার এই পার্থক্যটি নিজেই হল সমাজে দ্রুত পরিবর্তনের একটি ফল ক্রিয়ার একটা বর্ধিত পৃথকীভবন [an increased differentiation of functions] হিসাবে, জীবনকে প্রক্রিয়া হিসাবে, ডায়ালেকটিক হিসাবে বেশি বেশি করে উপলব্ধি করার একটা ফল। কাব্য এক উপজাতির সৃষ্টি, জীবন যেখানে এমনভাবে প্রবাহিত যে যৌবন ও বার্ধক্যের মধ্যে তেমন কিছু পরিবর্তন ঘটে না; উপন্যাস সেই অস্থির যুগের সৃষ্টি যেখানে মানুষের জীবনে সর্বদাই নতুন নতুন ঘটনা ঘটছে এবং সেই কারণে মানুষও সর্বদা পরিবর্তিত হতে থাকছে।

•

তা সত্ত্বেও সমস্ত শিল্পই হল বিষয়ীগত। সমস্ত শিল্পই আবেগমূলক এবং সেইকারণে সেই সহজপ্রবৃত্তির সঙ্গেই তার কারবার সামাজিক জীবনের সঙ্গে যার অভিযোজন থেকে আবেগগত চেতনার সৃষ্টি। সেইজন্য জনিরূপের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে শিল্প এড়াতে পারে না। জনিরূপের গোপন বাসনাগুলি মানুষের সমগ্র সংস্কৃতিকে একটি সীমাহীন সূত্রে গাঁথে।

এই জনিরূপকে দুটি দিক থেকে বিবেচনা করা যায়; কালসীমাহীন ও কালসীমাযুক্ত, পরিবর্তনবিহীন ও পরিবর্তনশীল, সাধারণ ও বিশেষ।

(ক) জনিরূপ কালসীমাহীন, পরিবর্তনবিহীন ও সাধারণ এই দিক থেকে যে সামগ্রিকভাবে তা সমস্ত সমাজে এবং সব মানুষের মধ্যে বস্তুতঃ স্থির। মানুষের একটা অধঃস্তন স্তর তাতে থাকে। প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাহায্যে চিহ্নিত সহজাত পার্থক্যের ফলে মানুষ এথেনীয় থেকে প্রাচীন বৃটন ও পরে লণ্ডনবাসী হয়ে ওঠেনি। এই পরিবর্তন ঘটেছে সামাজিক বিবর্তন থেকে

আবৃত অর্জিত পরিবর্তনের ফলে। কাব্য সেই স্থির সহজপ্রবৃত্তিগত উপাদানকে প্রকাশ করে।

(খ) আবার এই সংস্কৃতির নীচে জনিরূপ ব্যক্তিগত পার্থক্যকে উদ্‌ঘাটিত করে। কারণ জনিরূপগুলি জিনের গুচ্ছ। এই জিনগুলির অবিরাম নতুন নতুন বিন্যাস ঘটছে যার ফলে নতুন ব্যক্তিত্ব উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। যেহেতু মানুষের পরস্পরের মধ্যেই এইভাবে একটা পার্থক্য থাকে সেইজন্য তারা যৌথ সম্পত্তির সরল উপজাতীয় জীবনে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। তারা চায় "বিলাস", স্বাধীনতা, বিশেষ উৎসব, যে চাহিদা এই ধরনের আদিম অর্থনীতির চৌহদ্দির মধ্যে মেটান অসম্ভব। এর ফলে সমাজে একটা অর্থনৈতিক পার্থক্য দেখা দেয় যা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে দমন করার পথ নয়, যা হল তাকে বাস্তব রূপদান করারই পথ। এটা আমরা আগেই ব্যাখ্যা করেছি। অতএব এই ব্যক্তিগত জনিগত পার্থক্যগুলি কালগত পরিবর্তন ঘটায় এবং চরিত্রের বাস্তব রূপদানও ঘটায়, সামাজিক "আদর্শমান" ["norm"] থেকে মানুষের বিচ্যুতি ঘটায়। অর্থাৎ, তদানীন্তন সমাজে চরিত্রগুলি কিভাবে তাদের ব্যক্তিগত পার্থক্য বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করছে উপন্যাসের করণকৌশলই তাকে সেই ব্যাপারে আগ্রহী করে তোলে।

সমাজে মানুষের সাধারণ কালসীমাহীন ঐক্যের মধ্যে যে স্বাধীনতা অন্তর্নিহিত কাব্য সেই স্বাধীনতাকে প্রকাশ করে; সমাজকে সাধারণ সহজপ্রবৃত্তিগত প্রবণতাগুলির সমষ্টি ও অভিভাবক হিসাবে দেখাতেই কাব্যের আগ্রহ। মৃত্যু, প্রেম, আশা, দুঃখ ও হতাশাকে সমস্ত মানুষই যেভাবে হৃদয়ঙ্গম করে কাব্য সেই কথাই বলে। মানুষ সমাজে তাদের ঐক্যের মধ্যে নয়, তাদের পার্থক্যের মধ্যে যে স্বাধীনতার সন্ধান করছে উপন্যাস সেই স্বাধীনতার রূপ দেয়; সমাজের রন্ধ্রের মধ্যে মানুষের স্বাধীনতাসন্ধানকে এবং সেই কারণে নিজেদের থেকে ভিন্ন অন্যান্য ব্যক্তিদের সম্পর্কে মানুষের বীতরাগ, তাদের সঙ্গে সংঘর্ষ ও তাদের বিপক্ষে মূর্ত শক্তিকেই তা প্রকাশ করে।

পুঁজিবাদের আওতায় সেইজন্য উপন্যাসের বিকাশ ঘটতে বাধ্য। পুঁজিবাদে শ্রমবিভাজনের ফলে উৎপাদিকা শক্তিগুলির বৃদ্ধি সমাজের এই পৃথকীভবনকে যে কেবল বিপুল পরিমাণে বাড়িয়ে তুলল তাই নয়, তার নিজের ভিত্তিতেই অবিরাম বিপ্লব ঘটিয়ে জীবনেও এক সীমাহীন প্রবাহ ও পরিবর্তন ঘটাল। সমানভাবে, পুঁজিবাদ যত নিঃশক্তি হতে থাকল উপন্যাসও ততই মানুষের এই অভিজ্ঞতাকেই রূপ দিতে থাকল যে অর্থনৈতিক পৃথকীভবন এবং

আর স্বাধীনতালাভের উপায় না থেকে তা পরিবর্তিত হয়ে ব্যক্তিত্বকে শিকলে বেঁধে ফেলা একটা শৃঙ্খলবোধের মাত্র হয়ে উঠেছে (শ্রেণীগুলির শিলীভবন), এবং উৎপাদিকা শক্তিগুলি সেগুলির বিকাশকে রুদ্ধগতি করার ফলে জীবনের অবাধ গতিকে ব্যাহত করছে (সাধারণ অর্থনৈতিক সংকট)। স্বভাবতঃই এই রকম যুগে উপন্যাসের অবক্ষয়ের সঙ্গে একটা সাধারণ বিপ্লবী আলোড়নও দেখা দেয়।

অর্থাৎ কাব্য ও উপন্যাসের করণকৌশলগত পার্থক্যের মধ্যে পরিবর্তনহীন্‌তা ও পরিবর্তন, স্থান ও কালের মধ্যে যে পার্থক্য তা আমরা দেখতে পাই এবং এটা পরিষ্কার যে এইগুলি পরস্পরের সঙ্গে অসংশ্লিষ্ট বিপরীত নয়, বরং এই বিপরীতগুলি পরস্পরকে ভেদ করে এবং পরস্পর থেকে যতই দূরে সরে যেতে থাকে ততই সেগুলি ক্রমাগত এক সমৃদ্ধিসৃজনকারী বাস্তব গড়ে তুলতে থাকে।

এই পার্থক্যগুলিও হল সেই বিবর্তনমূলক ও বর্গীকরণমূলক বিজ্ঞানগুলির মধ্যকার পার্থক্যের মতই। কাব্যের করণকৌশল যেমন শব্দের উপর তাৎক্ষণিক মনঃসংযোগ দাবি করে সেইরকম বর্গীকরণমূলক বিজ্ঞানগুলিও, যেমন জ্যামিতি ও গণিত, প্রতীকের উপর তাৎক্ষণিক মনঃসংযোগ দাবি করে। উপন্যাসের দাবি হল আমরা যেন প্রতীক থেকে বাস্তবে পৌঁছাই এবং তার পরেই মাত্র আবেগোদ্দীপকগত সংগঠনে উপনীত হই। জীববিদ্যা দাবি করে আমরা যেন প্রথমে মূর্ত বাস্তবের কাছে যাই এবং তার পরেই মাত্র সেই বস্তুগুলির যুক্তিভিত্তিক সংগঠনে উপনীত হই। কাব্য শব্দ থেকে সরাসরি আবেগোদ্দীপকগত সংগঠনে পৌঁছায়, বাস্তবকে সে গ্রাহ্য করে না, বাস্তবের সম্পর্কটি শব্দের মধ্যে ইতোমধ্যেই নির্দিষ্ট বলে কাব্য স্বীকার করে নেয়। গণিত প্রতীক থেকে সরাসরি প্রত্যক্ষগত সংগঠনে পৌঁছায়। মূর্ত বস্তুকে সে গ্রাহ্য করে না, মূর্ত বাস্তবের গুরুত্বপূর্ণ ধর্মগুলি (তার সঙ্গে সম্পর্কিত) প্রতীকটির মধ্যে ইতোমধ্যেই স্ফটিকিকৃত [crystallised] বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়। এই জন্যই জীববিজ্ঞানবিদ্‌ বা ঔপন্যাসিকের ক্ষেত্রে যেটুকু আলগা উক্তি অনুমোদন করা যেতে পারে তার তুলনায় কবির ও গণিতবিদের কাছে যথাযথ উক্তির—সুনিশ্চিতভাবে সঠিক শব্দের বা সঠিক প্রতীকের গুরুত্ব অনেক বেশি।

আমরা দেখেছি যে সংগীত হল কাব্যের এক ধরনের চরম রূপ, এবং বস্তুর বিষয়গত গুণগুলিকে গণিত যেমন প্রায় সবটাই বর্জন করেছে সেই রকম সংগীত (কাব্যের মত নয়) ধ্বনির বিষয়গত উল্লেখগুলির প্রায় সবটাই বর্জন

করেছে। সেইজন্য সংগীতকার তাঁর ভাষার ব্যাপারে এমনকি কবির থেকেও বেশি যথাযথ এবং সংগীতের প্রতীক সংক্রান্ত আবেগোদ্দীপকগত নিয়মগুলি গণিতের প্রতীক সংক্রান্ত প্রত্যক্ষগত নিয়মগুলির মত সঠিক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ।

এখন আমরা আরও স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি কেন স্বপ্নের করণকৌশলের সঙ্গে কাব্যের করণকৌশলের এত সাদৃশ্য। স্বপ্নের বৈশিষ্ট্য এই যে স্বপ্নে স্বপ্নদ্রষ্টা সর্বদাই প্রধান ভূমিকা পালন করে। স্বপ্নে সর্বদাই সে উপস্থিত, কখনও কখনও (বিশ্লেষণ করে যা দেখা গেছে) নানা ছদ্মবেশে সে উপস্থিত থাকে। একই অহংকেন্দ্রিকতা কাব্যেরও বৈশিষ্ট্য। কবি খুব সাদাসিধেভাবে তাঁর সমস্ত মনোগত ছাপ, অভিজ্ঞতা, চিন্তা প্রতিরূপ সরাসরি লিপিবদ্ধ করেন। কাব্যের সমস্ত আপাতঃ অহংধর্মিতাও সেই কারণেই। কারণ সব কিছুই সরাসরি দেখা হচ্ছে এবং অভিজ্ঞতালব্ধ হচ্ছে। কাব্য হল স্মৃতি-প্রতিরূপের এমন এক সম্পর্ক যাতে দুটি মাত্র শব্দ মধ্যস্থতা করে—"আমি" এবং "যেমন"।

কিন্তু এটা স্বপ্নের অহংধর্মিতা নয়, এই অহংধর্মিতা সামাজিক। কবির বিশেষ আবেগগত সংগঠনটি শব্দের মধ্যে ঘনীভূত হয় এবং শব্দগুলি পঠিত হয় এবং পাঠকের মানস একই আবেগগত পুনঃসংগঠনের [emotional reorganisation] অভিজ্ঞতা লাভ করে। পাঠক যখন কবিতাটি পাঠ করতে থাকেন তখন নিজেকে কবির অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং কবির চোখ দিয়ে দেখতে থাকেন। পাঠকই তখন হয়ে যান কবি।

শেলির কোনও কবিতায় আমরা শেলি হয়ে যাই। যখন শেকসপীয়র পড়ি তখন তাঁরই গভীর দীপ্ত দৃষ্টি দিয়ে দেখি। কবির অপ্রত্যাশিত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যও সেই কারণেই। কাব্যে যদিও "চরিত্র" নয়, সাধারণ মানব, অনিরূপই সাধারণ তৎকালীন দৃশ্যকে দেখছে কিন্তু সে একজন মানুষের চোখ দিয়ে দেখছে, কবির মানসের গবাক্ষপথে সে দেখছে।

এটা কি ভাবে ঘটে? কাব্যের করণকৌশলের সেটাই বিশেষ রহস্য। কাব্যকে যেমন স্বপ্নের সমতুল্য করা যায় সেই রকম কাব্যের করণকৌশলও স্বপ্নের করণকৌশলের সদৃশ। স্বপ্ন-সমীক্ষকরা "স্বপ্ন-নির্মাণ" এই সাধারণ নামে স্বপ্নের করণকৌশলের স্বরূপ আবিষ্কার করেছেন।

স্বপ্নের দুটি স্তর আছে। তার পরিস্ফুট অর্থটি সুস্পষ্ট। সমুদ্রের ধারে বেড়াচ্ছি, একটা জাহাজ এসে পাশে দাঁড়াল, আমরা জাহাজে উঠলাম, ফ্রান্সে গিয়ে নামলাম, কিছু দুঃসাহসিক ঘটনা ঘটল, ইত্যাদি। এটা

হল স্বপ্নের পরিস্ফুট অর্থ [manifest content] যা পরের দিন সকালে খাওয়ার টেবিলে বাড়ির লোকদের কাছে আমরা বলি আর তারা শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে পড়ে, তারা বুঝতে পারে না সেটা নিয়ে আমাদের এত আগ্রহ কেন। কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের আগ্রহ এই কারণেই যে বিষয়টা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। যতক্ষণ স্বপ্ন দেখাটা চলছিল ততক্ষণ সেই ব্যাপারগুলি সত্য সত্যই ঘটছিল বলে আমাদের মনে হচ্ছিল। আর এই স্পষ্টতা অবশ্যই কোনও আবেগোদ্দীপকগত কারণ থেকেই উদ্ভূত। কিন্তু স্বপ্নে যত দুঃসাহসিক ঘটনার মধ্যেই পড়ি না কেন প্রকৃত আবেগ আমরা খুব অল্পই অনুভব করি। আর আবেগ অনুভব করলেও সেটা স্বপ্নে যে সব দুঃসাহসিক ঘটনায় আমরা পড়েছিলাম তার সঙ্গে যথাযোগ্য আনুপাতিক নয়। আশ্চর্যজনক সব ঘটনা ঘটে অথচ আমরা আশ্চর্য হই না। তুচ্ছ ঘটনা ঘটে অথচ আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি। আবেগোদ্দীপকগুলি বাস্তবের সম্পর্কে অতিক্রান্ত [displaced] হয়। বিভিন্ন উপাদান প্রতিরূপগুলি যেমন যেমন আমাদের মনে পড়তে থাকে সেই অনুযায়ী সেগুলির সঙ্গে আমাদের অনুষঙ্গগুলির যদি বর্ণনা দিতে বলা হয় তাহলে অতিক্রান্ত আবেগোদ্দীপকগত জীবনের এক সম্পূর্ণ ছায়াচালিত জগৎ উদ্ঘাটিত হবে। প্রতিটি প্রতীকই আমাদের জীবনের নানা স্মৃতির সঙ্গে অনুষঙ্গযুক্ত, ভাবের অনুষঙ্গ দ্বারা নয়, আবেগোদ্দীপকগত অনুষঙ্গের দ্বারা সেগুলি অনুষঙ্গযুক্ত।

"স্বপ্ন-নির্মাণের" বৈশিষ্ট্য এই যে প্রতিটি স্বপ্ন প্রতীক অতি-নির্ধারিত এবং তাদের নানা ভিন্ন ভিন্ন আবেগগত তাৎপর্য থাকে। আমরা আগে লক্ষ্য করেছি যে কাব্যধর্মী শব্দেরও এটা বৈশিষ্ট্য এবং সেও সেই একই কারণে। স্বপ্ন প্রতীকগুলির মূল্য সরাসরি তাদের আবেগোদ্দীপকগত অর্থের [affective content] জন্য এবং যে সুসংবদ্ধ নকল জগতে আমরা প্রথমে নিজেদের বিন্যস্ত করি তার প্রতীক হিসাবে এর মূল্য নয়। সেই কারণে স্বপ্নের অসংলগ্নতার সঙ্গে তুলনীয় কাব্যের "অযৌক্তিক" ছন্দ ও স্বরসংগতি [assonance]।

মানসের সংগঠনটি এমন যে নিদ্রার মধ্যে সহজপ্রবৃত্তিগত অংশের সমস্ত সচেতন ইচ্ছা, আশা, ভীতি ও প্রেমের জায়গায় আপাতঃ বিধিবহির্ভূত স্মৃতি-প্রতিরূপগুলি দেখা যায়, কিন্তু এগুলি প্রকৃতপক্ষে সরল অচেতন ইচ্ছার আবেগোদ্দীপকগত বন্ধন দ্বারা অনুষঙ্গযুক্ত। মানসের সহজপ্রবৃত্তিগত অংশের এবং সেই কারণে মানসের বিনির অংশটির, যা যেহেতু জীবজগতের বিবর্তনমূলক দিক থেকে অচলতাপ্রাপ্ত [archaic] সেইহেতু অ-রূপান্তরিত ও সমাজ-বিরোধী,

যা একত্রে থেকে অ সামাজিক, তার স্বাভাবিক সম্পূর্ণগত কার্যকলাপ দ্বারা সেগুলি সংগঠিত হয়। এই আবেগোদ্দীপকগত নিয়ন্ত্রণটি স্বপ্নে সচরাচর দেখা দেয় না। এটা "অবদমিত" থাকে। কেবলমাত্র আপাতঃদৃষ্টিতে অসংযুক্ত বিধি-বহির্ভূত প্রতীকগুলি, চেতনায় দেখা দেয়। কিন্তু এই আবেগোদ্দীপকগত ভিত্তিই হল স্বপ্নের 'যুক্তি" এবং তা স্বপ্নের গতিপথকে দিকনির্দেশ করে। এটা হল সুপ্ত অর্থ। কিন্তু স্বপ্নের স্মৃতি-প্রতিরূপগুলির সঙ্গে আবেগোদ্দীপকগুলির সম্পর্কেরও একটা "যুক্তি" আছে। অর্থাৎ, দ্বিগুণ বিকৃতি ঘটছে—বাস্তবের বিকৃতি এবং আবেগের বিকৃতি—বিষয়ী ও বিষয়ের দু'বার স্থানান্তর।

নিদ্রায় কেন আমরা কোনও উদ্দীপক সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন অবস্থায় পৌঁছাই না? তা সরল উত্তর হল এই যে নিদ্রা মৃত্যু নয়, বা পূর্ণ অচেতনতা নয় কিন্তু এমন একটা অবস্থা যাতে আমাদের মনোযোগের একটা অংশ জেগেই থাকে। নিদ্রায় মনোযোগ যদিও বহির্জগৎ থেকে সরে আসে কিন্তু সম্পূর্ণ নিস্ক্রিয় হয়ে পড়ে না, তা হলে বাহ্য উদ্দীপক কখনই আমাদের জাগিয়ে দিত না। যথেষ্ট উচ্চ মাত্রায় কোলাহলের সাহায্যে নিদ্রিত ব্যক্তির মনোযোগকে আকৃষ্ট করা যায়। স্পষ্টতঃই অতিমাত্রায় গভীর নিদ্রা পশুদের পক্ষে বিপজ্জনক। ন্যূনতম প্রয়োজনীয় স্তরের নীচের মাত্রায় উদ্দীপকগুলি, যেমন বাইরের মৃদু কোলাহল, মুখের উপর রোদ পড়া, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর চাপ, অভ্যন্তরীণ পরিপাক প্রক্রিয়ার গোলযোগ, তাদের উপযুক্ত স্নায়ুকণিকাপথে চালিত না হয়ে অচেতন সহজপ্রবৃত্তির "গুচ্ছ" ['Foto"] দ্বারা নির্দেশিত অন্য পথে চালিত হয়।

কোন অচেতন ইচ্ছার বাস্তবতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে পরীক্ষা করা যায়। নিদ্রিত ব্যক্তি যদি নিদ্রাগত হওয়ার আগে স্থির করে রাখেন যে কোনও একটি জিনিস তিনি নিদ্রিত অবস্থায়ও হাতে ধরে থাকবেন তাহলে জাগ্রত হওয়ার পরও দেখা যাবে যে তিনি সেটি ধরে আছেন। এ থেকে এইটাই দেখা যায় যে, কিছু বিদিষ্ট স্নায়ুকণিকা অচেতনভাবে ইচ্ছা প্রক্রিয়া চালিয়ে গেছে এবং ক্রিয়াবাহী স্নায়ুর [efferent nerves] পথ ধরে পেশীগত সংকোচন বজায় রাখার জন্য আঙুল পর্যন্ত স্নায়বিক তাড়নার অবিরাম প্রবাহ পাঠানর প্রক্রিয়া চালিয়ে গেছে। এই ধরনের উদ্দীপকগুলির দ্বারা আবেগোদ্দীপকগুলি যদি জেগে উঠত তাহলে নিদ্রারও সমাপ্তি ঘটত। অতএব সহজপ্রবৃত্তিগত অচেতন স্নায়ুকণিকা থেকে আবেগোদ্দীপকগত সামগ্রিক আকার পর্যন্ত অনুবন্ধমূলক পথগুলি কোনও না কোনভাবে অন্যদিকে চালিত হয়েছে এবং উদ্দীপকগুলি যথাযথ জায়গায় না

দিয়ে এক পর্যায় ঘুরে অনুষঙ্গযুক্ত সামগ্রিক আকারের দিকে, অর্থাৎ স্মৃতি-প্রতিরূপের দিকে চালিত হয়েছে। এগুলি এই অন্তর্পথে চালিত আবেগো-দ্দীপকগত সামগ্রিক আকারের সঙ্গে অনুষঙ্গের সূত্রে যুক্ত, কিন্তু নিজেরা এই আবেগোদ্দীপকগুলির দ্বারা সিক্ত নয়। এই স্মৃতি-প্রতিরূপগুলি স্বপ্নে দেখা দেয় এবং মনোযোগের ফলকগুলিকে কেন্দ্রীভূত হওয়ার মত একটা উপলক্ষ্য যোগায়। তা না হলে মনোযোগ উদ্দীপকগুলির উপর কেন্দ্রীভূত হত এবং সেই কারণে নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগিয়ে দিত। উচ্চতর প্রাণীদের ক্ষেত্রেই যে নিদ্রা দেখা যায় এটা কিছু আকস্মিক ঘটনা নয়—উচ্চতর প্রাণীদের জীবন অর্জিত অভিযোজনে পূর্ণ, সেই জন্য নিদ্রার মধ্যে শারীরবৃত্তের দিক থেকে সেগুলির "সমাধানের" ["working out"] প্রয়োজন। কীটপতঙ্গের মধ্যে বিস্তারিত সহজাত অভিযোজনের অস্তিত্ব, তারা নিদ্রা যায় না। বা যখন তারা "নিদ্রা" যায়ও, যেমন শুঁয়োপোকার ক্ষেত্রে, সেটা হল একটা চূড়ান্ত এবং অনেক বেশি সুসম্পূর্ণ অভিযোজন, যাতে দেহের সমস্ত কোষগুলিই নতুন করে বিন্যস্ত হয়।

অতএব, স্মৃতি-প্রতিরূপের আবেগগত সংগঠন—তাদের সুপ্ত অর্থ—তাদের উদ্ভূত হওয়ার প্রক্রিয়ার দ্বারা সুনির্দিষ্ট। উদ্দীপক যদি কোনও একটা প্রারম্ভিক মূল্য অতিক্রম করে বা ঠিক পথে চালনা শুরু করার ব্যাপারে যদি কোনও গোলযোগ দেখা দেয় তাহলে অত্যন্ত শক্তিশালী আবেগোদ্দীপক মুক্ত হতে থাকে, নিদ্রিত ব্যক্তি আরও সচেতন হয়ে ওঠে এবং তৎক্ষণাৎ সে জেগে ওঠে। মানুষ যে সহজেই স্বপ্ন ভুলে যায় তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় আবেগোদ্দীপকগত বাস্তবের অভাব থেকে, অথচ শক্তিশালী আবেগোদ্দীপকের কারণে দুঃস্বপ্নের ক্ষেত্রে নিদ্রিত ব্যক্তি জেগে ওঠে বা প্রায় জেগে ওঠার অবস্থায় পৌঁছায় এবং সেগুলি সুস্পষ্টভাবে মনে থাকে। আমরা জেগে যে উঠি তার কারণ আবেগোদ্দীপকগুলি বাস্তবায়িত হওয়ার এবং সেইজন্য কর্মে তার পরিণতি ঘটার উপক্রম হয়েছিল।

তাহলে স্বপ্নের একটা পরিস্ফুট অর্থ আছে এবং একটা সুপ্ত অর্থ আছে। পরিস্ফুট অর্থটা হল প্রতিরূপগত অলীককল্পনা, সুপ্ত অর্থটা হল আবেগোদ্দীপক-গত বাস্তব। স্বপ্নের মধ্যে প্রকাশিত অলীককল্পনাগত আবেগোদ্দীপকতার সঙ্গে এবং সুপ্ত অর্থের সঙ্গে যুক্ত প্রতিরূপগত বাস্তবের সঙ্গে এই দুটিরই একটা দ্বিত্ব সংযোগ আছে। মনঃসমীক্ষকরা এই পার্থক্যটা দেখাননি, কারণ স্বপ্নের বিশ্লেষণ হয় মুখের কথা থেকে। প্রতিরূপ ও আবেগোদ্দীপককে ভাষায় রূপান্তরিত করার সময় একটা জ্ঞানতত্ত্বগত ছিদ্র থেকে যায়। সেটা তাঁরা

দেখেননি। তাদের মধ্যে প্রতিরূপ ও আবেগোদ্দীপক যুগপৎ বিরাজ করে এবং তাদের পৃথক করা যায় না। দুটিই সামাজিক ও সচেতন। এই ব্যাপারটি অবহেলা করায় মনঃসমীক্ষক একটা দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়ে পড়েন: স্বপ্নের সুপ্ত অর্থ অনুসন্ধান করার সময় স্বপ্নদ্রষ্টা কখনই মনঃসমীক্ষককে একগুচ্ছ "অচেতন" আবেগোদ্দীপককে অনুষঙ্গ হিসাবে দিতে পারেন না। কারণ স্বপ্নদ্রষ্টা কেবলমাত্র তাদের সাহায্যেই নিজেকে প্রকাশ করেন, আর তাদের মধ্যে আবেগোদ্দীপক একটা প্রতিরূপের সঙ্গে, বহির্বাস্তবের একটা প্রতীকের সঙ্গে সর্বদাই সংশ্লিষ্ট, এবং তা নিজেই একটা সচেতন অনুভূতি-স্তর। সেইজন্য স্বপ্ন-প্রতিরূপের সুপ্ত অর্থ হিসাবে সমীক্ষক পান—সচেতন আবেগোদ্দীপক সংযুক্ত আরও বহু প্রতিরূপ। এই কারণে অচেতন আবেগোদ্দীপকগুলিকে তাদের সামাজিক রূপান্তরের সঙ্গে এক করে দেখার প্রবণতাই যে কেবল সমীক্ষকের থাকে তাই নয়, স্বপ্নের ও শিল্পের মধ্যকার ব্যবধানটিও তিনি দেখতে পান না। স্বপ্নে আবেগোদ্দীপকগত সংগঠন হল অচেতন এবং সেই কারণে তা ব্যক্তিগত; আর শিল্পে আবেগোদ্দীপকগত সংগঠন হল সচেতন এবং সেই কারণে তা সামাজিক। এই পার্থক্য হল অবাধ অনুষঙ্গ আর পরিচালিত অনুভূতির [directed feeling] পার্থক্য।

৪

এই থেকে আমরা পৌঁছাই সুররিয়্যালিস্ট করণকৌশল ও তার অপরিচালিত অনুভূতি ও ব্যক্তিগত আবেগোদ্দীপকগত সংগঠনের জগতে যেখানে স্বাধীনতা হল, প্রকৃত বুর্জোয়া কায়দায়, প্রয়োজন সম্বন্ধে অচেতনতা। অর্থাৎ যে আবেগোদ্দীপকগত সংগঠন চিত্রকল্পের প্রবাহকে নির্ধারিত করে এবং উত্তম কাব্যে যা সচেতন সেই আবেগোদ্দীপকগত সংগঠন সম্পর্কে অজ্ঞতা। এইজন্যই সুররিয়্যালিস্ট শিল্পের মস্তিষ্কগত ও দর্শনেন্দ্রিয়গত বৈশিষ্ট্য। সুররিয়্যালিজমের জন্ম যা থেকে সেই প্রতীকবাদের দর্শনের মধ্যে এই বুর্জোয়া স্বাধীনতা ইতোমধ্যেই স্থান পেয়েছিল। প্রতীকবাদের দার্শনিক রেমি ছ গুর্ম সঠিকভাবেই বলেছেন: "সর্বোপরি এটি একটি স্বাধীনতার তত্ত্ব; চিন্তা ও রূপের অনপেক্ষ স্বাধীনতা এর অন্তর্নিহিত: এ হল নান্দনিক ব্যক্তিত্বের অবাধ ও ব্যক্তিগত বিকাশ।" আর প্রতীকবাদী কবিকুলচূড়ামণি র‍্যাবো বলেছিলেন: "আমার মনের বিশৃঙ্খলাকে আমি পবিত্র বলে মনে করতে শিখেছি।"

স্বপ্নের মত কাব্যেরও পরিস্ফুট ও সুপ্ত অর্থ আছে। কাব্যের অন্তর

করলে তার পরিস্ফুট অর্থ মোটামুটি পাওয়া যায়। সেটা হল চিত্রকল্প বা "ভাব" ["ideas"]। অন্বয়ের মধ্যে সুপ্ত অর্থ অর্থাৎ আবেগগত বিষয়বস্তু প্রায় অদৃশ্য হয়ে যায়। এটা তাহলে শব্দের দ্বারা প্রতীকায়িত বহির্বাস্তবের মধ্যে ছিল না (কারণ সেটি রক্ষিত হয়েছে); তা ছিল শব্দগুলিরই মধ্যে। পরিস্ফুট অর্থ হল "যুক্তিভিত্তিক দিক থেকে" ব্যাখ্যাত কাব্য। তা হল কাব্যের মধ্যকার বহির্বাস্তব। এটাকে অন্য উপায়ে এবং অন্য ভাষায় প্রকাশ করা যায়। কিন্তু কাব্যের সুপ্ত অর্থ থাকে শব্দবিন্যাসের সেই বিশেষ রূপটির মধ্যেই, অন্য কোনও রূপের মধ্যে তাকে পাওয়া যায় না।

সুপ্ত অর্থ কিভাবে শব্দগুলির বোধার্থের [sense] মধ্যে—অর্থাৎ শব্দগুলি বহির্বাস্তবের যে অংশগুলিকে প্রতীকায়িত করে তার মধ্যে না থেকে মূল শব্দের মধ্যে থাকতে পারে? পরিস্ফুট অর্থ বহির্বাস্তবের যে অংশটিকে প্রতীকায়িত করে আবেগগুলি তার সঙ্গে আবেগোদ্দীপকগত দিক থেকে অনুষঙ্গযুক্ত নয়, কারণ বহির্বাস্তবের সেই একই অংশটিকে অন্য ভাষার দ্বারা প্রতীকায়িত করা যায় কিন্তু তবু তা সেই কবিতাটি হবে না। মূল শব্দগুলি তাহলে যে জিনিসগুলিকে তারা প্রতীকায়িত করেছিল তার মধ্যে নয় "নিজেদেরই মধ্যে" আবেগগত বিষয়বস্তুকে কি করে ধরে রেখেছিল? স্বপ্নের বিশ্লেষণ থেকে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। তা হল ভাবের আবেগোদ্দীপকগত অনুষঙ্গের সাহায্যে। কোনও ভাবানুষঙ্গের ক্ষেত্রে দুটি প্রতিরূপ একটা ভিন্ন কিছুর দ্বারা সংযুক্ত থাকে, যেমন দড়ি দিয়ে বাঁধা কাঠি। কাব্যে সেগুলি বাঁধা থাকে আবেগোদ্দীপক দিয়ে।

কোনও শব্দকে যদি তার প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে, স্বপ্নসমীক্ষক যেমন তাঁর রোগীকে কোন এক বিশেষ প্রতিরূপের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে বলেন সেইভাবে, মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা যায় তাহলে মনের মধ্যে অনেক অনুষঙ্গ অস্পষ্টভাবে জেগে উঠবে। "spring" এর মত একটি সাধারণ কথারও শত শত অনুষঙ্গ থাকে; সবুজত্ব, তারুণ্য, ঝরণা, লাফান। প্রতিটি শব্দ নিজের পিছু পিছু আবেগগত অনুষঙ্গের এক বিরাট বোঝা বয়ে আনে, যে সব হাজার হাজার ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল তা থেকেই এই অনুষঙ্গগুলি সংগৃহীত। এই অনুষঙ্গগুলিই আবেগোদ্দীপকের সুপ্ত অর্থ সরবরাহ করে। আর সেটাই হল সেই কবিতাটি। "সবুজত্ব" বা তারুণ্যের ভাবটিকে নয়, spring শব্দটির সঙ্গে সবুজত্ব ও তারুণ্যের ভাবকে যে আবেগোদ্দীপকগত বন্ধনসূত্রটি সংযুক্ত করছে সেইটিই হল কাব্য সৃষ্টির কাঁচামাল।

অবশ্যই spring শব্দ দ্বারা সূচিত বসন্ত (ঋতু) জিনিসটিরও অনেক আবেগোদ্দীপকগত অনুষঙ্গ আছে। সেগুলি উপন্যাসে ব্যবহার হয়। "spring" শব্দটির সঙ্গে যে অধিকতর সাধারণ, সূক্ষ্ম ও সহজপ্রবৃত্তিগত আবেগোদ্দীপক-গুলি তাৎক্ষণিক ভাবে অনুষঙ্গযুক্ত, কাব্য সেগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং সেইজন্য ঝরণা অর্থে ও লাফান অর্থে spring শব্দের এই প্রায় সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক অনুষঙ্গগুলিকেও তা অন্তর্ভুক্ত করে। এই কারণে কাব্যের প্রবণতা হল শব্দ নিয়ে খেলার, প্রকাশ্য বা গোপনভাবে যমক [pun] প্রয়োগ করার, শব্দের বুনট [texture] নিয়ে আনন্দ দেওয়ার। কাব্যের করণকৌশলের এটা একটা অংশ। শব্দের তাৎক্ষণিক এবং এমন কি পরস্পরবিরোধী আবেগোদ্দীপকগত সুর অর্জন করার জন্য কাব্য শব্দকে ব্যাকরণবিরোধীভাবে ব্যবহার করে। উপন্যাস শব্দকে ব্যাকরণসম্মতভাবে ব্যবহার করে ; যার ফলে বাস্তবের একটি সুস্পষ্ট খণ্ড ছাড়া শব্দটির অন্য সমস্ত অর্থকে এবং সেই কারণে অন্য সমস্ত আবেগোদ্দীপকগত সুরকে সুনিশ্চিতভাবে তা থেকে বাদ দেওয়া যায় এবং তারপর বাস্তবের সেই খণ্ডটি এবং কাহিনীর মধ্যকার বাস্তবের অন্যান্য খণ্ডের সঙ্গে তার সক্রিয় সম্পর্ক থেকে প্রত্যক্ষগত জীবন-অভিজ্ঞতার অংশ হিসাবে তা আবেগগত বিষয়বস্তুটি আহরণ করে।

আমরা যখন এক পংক্তি কবিতা পড়ি তখন অন্যান্য ভাবের সঙ্গে জড়িত আবেগোদ্দীপকগুলির কথা আমাদের মনে আসে না। কাব্যের মধ্যে "ঋতু" এই অর্থসূচক spring শব্দটির ব্যবহারে আমরা "বসন্তের" চঞ্চল ও উচ্ছ্বসিত ভাবটি পাই কিন্তু একেবারে খোলাখুলি কাব্য বিষয়ক যমক ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে আমরা ঝরণা বা লাফান অর্থটি পাই না। সেগুলি অচেতন থাকে। কাব্য এক ধরনের বিপ্রতীপ স্বপ্ন। স্বপ্নে বাস্তব আবেগোদ্দীপকগুলি আংশিক-ভাবে দমিত থাকে এবং মিশ্রিত প্রতিরূপগুলি চেতনায় ভেসে ওঠে। কাব্যে কিন্তু অনুষঙ্গযুক্ত প্রতিরূপগুলি আংশিকভাবে দমিত হয় এবং চেতনার মধ্যে যে মিশ্রিত আবেগোদ্দীপকগুলি আবেগোদ্দীপকগত সংগঠনের রূপে থাকে সেগুলিই চেতনায় ভেসে ওঠে।

কিন্তু পরিস্ফুট অর্থ আদৌ থাকে কেন? সমস্ত প্রতিরূপগুলিই দমিত হয় না কেন? চরম প্রতীকবাদীদের কাব্য কেবল কয়েকটি শব্দের সমষ্টি মাত্র, তার কোনও নির্দিষ্ট অর্থ থাকে না, শব্দগুলি নিজেরাই আবেগোদ্দীপকগত অনুষঙ্গে পূর্ণ। মহৎ কাব্য কেন এই চরম প্রতীকবাদী কবিদের কাব্যের মত নয়? অনুবাদ করা হলে কাব্যের আবেগোদ্দীপকগত মূল্য যেহেতু হারিয়েই যায়,

তাহলে কাব্য কেনই বা কিছু একটা বিবৃত করে, ব্যাখ্যা করে, বর্ণনা করে, ব্যাকরণ মানে, তার বাক্যগঠনরীতি [syntax] থাকে, তার অন্বয় করা যায়?

তার উত্তর এই যে, কারণ কাব্য হল বহির্বাস্তবের সঙ্গে একটা অভিযোজন। তা হল জগতের প্রতি এক আবেগগত প্রতিন্যাস [attitude]। সেটা ভাষা দিয়ে তৈরি এবং ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল অন্যতা [otherness] বোঝানর জন্য, সামাজিকভাবে স্বীকৃত বিষয়গত বাস্তবের অংশগুলিকে সূচিত করার জন্য, সেই একই ভাষার মধ্যে সেটা বৈজ্ঞানিক চিন্তা হিসাবে বিরাজ করে। পরিস্ফুট অর্থ বহির্বাস্তব সম্পর্কে একটা বিবৃতিকে সূচিত করে। পরিস্ফুট অর্থ বহির্বাস্তবের কোনও একটা খণ্ডের প্রতীক—সেটা দৃশ্য, সমস্যা, চিন্তা বা ঘটনা যাই হোক। আর আবেগগত বিষয়বস্তু বাস্তব সম্পর্কে এই বিবৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট; প্রকৃত অভিজ্ঞতায় নয়, কবিতাটিতে। বহির্বাস্তবের খণ্ডটি থেকে আবেগগত বিষয়বস্তু নিঃসৃত হয়। জীবনে বহির্বাস্তবের এই খণ্ডটিতে কোনও আবেগগত সুর থাকে না, কিন্তু অন্য কোনও শব্দ দ্বারা না হয়ে ঐ বিশেষ শব্দ দ্বারা বর্ণিত হওয়ায় তা অকস্মাৎ এবং যাদুগতভাবে আবেগোদ্দীপকগত বর্ণে দীপ্ত হয়ে ওঠে। ঐ আবেগোদ্দীপকগত বর্ণলেপন একটা আবেগগত সংগঠনকে সূচিত করে যা বহির্বাস্তবের সেই খণ্ডটির মুখোমুখি হয়ে (অলীক-কল্পনার মধ্যে বা বাস্তবিকই) কবি নিজে যা অনুভব করেছিলেন তারই সদৃশ। কবি যখন বলেন,

Sleep, that knots up the ravelled sleave of care,

তখন তিনি একটা পরিস্ফুট বিবৃতি করছেন। তার অন্বয় হল:

Slumber, that unties worry, which is like a piece of tangled knitting,

অন্বয়টি পরিস্ফুট অর্থের বেশির ভাগটাই বহন করে, কিন্তু ব্যবহৃত শব্দগুলির অনুষঙ্গের মধ্যে যে আবেগোদ্দীপকগত সুর লুকান ছিল সেটা অদৃশ্য হয়ে যায়। এটা একটা ভোজবাজির মত ব্যাপার। কবি জগতের একটা খণ্ডকে তুলে ধরেন এবং সেটাকে আমরা একটা অদ্ভুৎ আবেগগত শিখায় দীপ্যমান দেখতে পাই। যদি আমরা তাকে "যুক্তিসাপেক্ষতার দিক থেকে" বিশ্লেষণ করি তাহলে আর সেই শিখাটিকে দেখতে পাই না। তা সত্ত্বেও, তারপর থেকে বাস্তবের সেই খণ্ডটির চারপাশে একটা দ্যুতি বরাবর থেকে যায়, আবেগগত জীবনের সুরভি তাতে থেকে যায়। অর্থাৎ, কাব্য আমাদের জন্য বহির্বাস্তবকে সমৃদ্ধ করে তোলে।

কাব্যে ব্যবহৃত আবেগোদ্দীপকগত অনুষঙ্গগুলির নানা রূপ। কখনও তা ধ্বনিগত অনুষঙ্গ, তখন আমরা পংক্তিটিকে বলি "সংগীতময়" ["musical"]—তার ভাষা যে বিশেষভাবে সতান [harmonicus] তা নয়; বিদেশীর কাছে হয়ত তার কোনও বিশেষ শব্দগত সুরই থাকে না:

Thick as autumnal leaves that strow the brooks

In Vallambrosa

ইংরেজি না-জানা মানুষের কানে এই পংক্তিটি সংগীতময় নয়। কিন্তু ইংরেজিভাষীর কানে এটা যে আবেগগত অনুষঙ্গ জাগিয়ে তোলে তা অর্থবোধক যোগসূত্রের থেকে ধ্বনিগত সূত্রেও সাহায্যেই বেশি ঘটে এবং সেই জন্যই আমরা পংক্তিটিকে বলি সংগীতময়। ভার্লেনের [Verlaine] পংক্তিটিও সেইরকম ফরাসী অনুনাসিক ধ্বনির আবেগগত অনুষঙ্গের সঙ্গে পরিচিত কানেই মাত্র সংগীতময়:

Et O ces voix d'enfants chantant dans la coupole,[1]

অথবা সেই পুরানো পরীর গল্পের নামটি "La Belle aux bois dormant"।[2]

বহির্বাস্তবের প্রতীকের সঙ্গে সংস্রবহীন আবেগোদ্দীপক কাব্য থাকা অসম্ভব, কারণ কাব্যের আবেগোদ্দীপকগুলি (যেহেতু তারা কাব্যধর্মী) সামাজিক, এবং ভিন্ন ভিন্ন বিষয়াকে কোনও একটি সাধারণ বিষয় ("বস্তু") দিয়ে ছাড়া অন্য কোনও ভাবে যুক্ত করা অসম্ভব। প্রতীকবাদের তর্কশাস্ত্র সম্মত সিদ্ধান্ত কাব্য নয়, তা হল সংগীত। আপত্তি উঠতে পারে যে সংগীত ধ্বনি দিয়ে গঠিত, যে ধ্বনি কোনও বহির্বাস্তবের উল্লেখ করে না, অথচ সংগীতও একটা শিল্প এবং তার সামাজিক বিষয়বস্তু আছে। ঠিকই ত—কারণ সঙ্গীতে প্রতীকগুলি আর বহির্বাস্তবের "উল্লেখ" করে না এবং সেগুলি নিজেরাই বহির্বাস্তবের অংশ হয়ে উঠেছে এবং তা হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই একটা রূপগত কাঠামো (স্বরগ্রাম, স্বরসংগতির "নিয়মাবলী" ইত্যাদি) গড়ে তুলেছে যা তাদের বহির্বাস্তবের দৃঢ়তা ও সামাজিক মর্যাদা দিয়েছে। সংগীতের স্বরগুলি [notes] নিজেরাই সংগীতের পরিস্ফুট অর্থ এবং সেইজন্য তারা ব্যাকরণের (বিষয়ীগত) নিয়ম মেনে চলে না। তারা ছন্দ-গাণিতিক (বিষয়গত) নিয়ম মেনে চলে। অবশ্যই সেই সব নিয়মের চৌহদ্দির

১। এবং গম্বুজের মধ্যে সেই সব শিশুকণ্ঠের গান।

২। নিদ্রিত কাননের সুন্দরী।

মধ্যে সেগুলি প্রয়োজনমত বিকৃত বা সংগঠিত হয়ে থাকে। একইভাবে শ্বাপত্যও বহির্বাস্তব হয়ে ওঠে এবং উপযোগ-ক্রিয়া [use-function] এর নিয়মের চৌহদ্দির মধ্যে তা বিকৃত বা সংগঠিত হয়ে থাকে।

কবির করণকৌশল হল এই যে: কোনও বিশেষ শব্দের সঙ্গে অনুষঙ্গযুক্ত সমস্ত আবেগোদ্দীপকগুলি চেতনায় ভেসে ওঠে না, কেবলমাত্র যেগুলি প্রয়োজনীয় সেগুলিই ভেসে ওঠে। সেই কাজটি করা হয় শব্দগুলিকে এমনভাবে বিন্যস্ত করে যে তাদের অনুষঙ্গগুচ্ছগুলি পরস্পরের উপর ঘাত প্রতিঘাত ক'রে কোন কোন আবেগোদ্দীপকগত অনুষঙ্গকে উন্নীত [heighten] করে, কোন কোনটিকে আবার অবনমিত করে এবং এইভাবে একটা সংগঠিত আবেগপুঞ্জ করে তোলে। একটি শব্দের আবেগোদ্দীপকগত বর্ণলেপন অন্যান্য শব্দের বর্ণ থেকে প্রতিফলিত ছায়া ও আলোকে গ্রহণ করে। এটা অংশতঃ সে করে শব্দগুলির সান্নিধ্যের মধ্য দিয়ে, বিশেষতঃ সংশ্লেষণধর্মী ভাষার (লাতিন ও গ্রীক) ক্ষেত্রে, অংশতঃ করে ব্যাকরণগত সূত্রে, বিশেষতঃ বিশ্লেষণধর্মী ভাষার ক্ষেত্রে (ইংরেজি, চীনা,), কিন্তু প্রধানতঃ এটি হয় সামগ্রিক "অর্থের" [meaning] মধ্য দিয়ে। পরিস্ফুট অর্থ, আক্ষরিক অর্থ, অন্বয়যোগ্য অর্থ হল এক ধরনের সেতু বা বৈদ্যুতিক পরিবাহী যা প্রত্যেক শব্দের সমস্ত আবেগোদ্দীপকগত প্রবাহকে পরস্পরের সংস্পর্শে নিয়ে আসে। এ যেন এক সুইচবোর্ড। এই বোর্ডে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই কোন কোন আবেগোদ্দীপকগত অনুষঙ্গ মিলিয়ে যায়, অন্য কতকগুলি অন্যান্য শব্দের দিকে প্রবাহিত হয়ে তাদের বর্ণকে বদলিয়ে দেয়; আবার অন্য কতকগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে গিয়ে একটি বিশেষ শব্দকে উন্নীত করে। সমস্তটা মিলে সেই বিশেষ সম্মিলিত দীপ্তি গড়ে তোলে যা হল এই কবিতাটির আবেগোদ্দীপকগত সংগঠন বা তার অর্থের প্রতি আবেগগত প্রতিন্যাস। সেই কারণে একটি কবিতায় কোনও শব্দের যে বর্ণায়ন থাকে অন্য কবিতায় সেই শব্দটিরই তা থেকে ভিন্ন এক আবেগোদ্দীপকগত বর্ণায়ন থাকে আর এই কারণেই কবিতাকে মূর্ত বলা হয়। কবিতা আবেগোদ্দীপকগতভাবে মূর্ত; কোনও কবিতায় প্রতিটি শব্দের একটা বিশেষ আবেগোদ্দীপকগত তাৎপর্য থাকে যা অন্য কবিতায় সেই শব্দটির যে তাৎপর্য তার থেকে ভিন্ন। এইভাবে আবেগগত বিষয়বস্তু মনের মধ্যে তরল অবস্থায় এদিক ওদিক ভেসে বেড়ায় না; অসংখ্য বুনানির সূত্রে তা পরিস্ফুট অর্থের—যা বহির্বাস্তবেরই একটি খণ্ড—সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত থাকে। কোনও কবিতার

বিষয়বস্তু কেবলমাত্র আবেগ নয়, তা হল সংগঠিত আবেগ, বহির্বাস্তবের একটি খণ্ডের প্রতি একটা সংগঠিত আবেগগত প্রতিন্যাস। অন্যান্য আবেগ যতই শক্তিশালী হোক তা অসংগঠিত—ব্যথার অতীত কোনও আকস্মিক দুঃখের উচ্ছ্বাস, অন্ধ ক্রোধের উদ্দাম প্রকাশ, গভীর নিরাশা—এই সব অন্যান্য আবেগের তুলনায় এইখানেই তার মূল্য—এবং তার দুঃসাধ্যতা। ওই ধরনের আবেগগুলি অ-নান্দনিক, কারণ তা অসংগঠিত। সেগুলি সামাজিকভাবে অসংগঠিত কারণ সেগুলি সামাজিকভাবে স্বীকৃত একটা বহির্বাস্তবের সাপেক্ষে সংগঠিত নয়। বাইরের প্রয়োজন সম্পর্কে সেগুলি অচেতন। কাব্যের আবেগগুলি পরিস্ফুট অর্থের অংশ। কবিতাটিতে বহির্বাস্তব যেভাবে দেখা দেয় তার মধ্যেই আবেগগুলি থাকে বলে মনে হয়। বাস্তবের একটি খণ্ডের প্রতি একটা আবেগগত মনোভাব আমরা গ্রহণ করি বলে প্রতীয়মান হয় না, সেটা বাস্তবের মধ্যেই প্রদত্ত: সেটাই হল আবেগগত চিন্তনের [emotional cognition] পথ। কাব্যগত চিন্তনে বিষয়গুলি ইতোমধ্যেই অনুভূতি-বিচারের [feeling-judgements] দ্বারা মুদ্রিত বলে উপস্থাপিত হয়। সেই কারণেই কাব্যের অভিযোজনগত মূল্য সেটা একটা প্রকৃত আবেগগত অভিজ্ঞতার মত।

এটা খুবই স্পষ্ট যে কাব্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিচার করা যায়; পরিস্ফুট অর্থের গুরুত্বের সাহায্যে অথবা আবেগোদ্দীপকগত বর্ণলেপনের সুস্পষ্টতার সাহায্যে। কাব্যের চৌহদ্দির মধ্যে যে কবি পুরাতন বিবর্ণ পরিস্ফুট অর্থ হাজির করেন তার তুলনায় যে কবি বহির্বাস্তবের এক নতুন খণ্ড নিয়ে আসেন তাঁর প্রতি আমরা বেশি কৃতজ্ঞতা বোধ করি। কিন্তু শেষোক্ত কবি তাঁর বাস্তবের খণ্ডটিকে যে আবেগোদ্দীপকগত বর্ণলেপন দিয়ে নিষিক্ত করেন সেটা অকিঞ্চিৎকর হতে পারে। তা সেই পুরাতন বিবর্ণ বর্ণলেপন হতে পারে, অথচ অন্য কবিটি তাঁর চিরাচরিত বাস্তবের খণ্ড সত্ত্বেও একটা নতুন আবেগোদ্দীপকগত সুর আয়ত্ত করে থাকতে পারেন। পুরাতন কবিদের আমরা বিচার করব প্রায় পুরাপুরি তাঁদের আবেগোদ্দীপকগত সুর থেকে; তাদের পরিস্ফুট অর্থ বহুকাল ধরে আমাদের চিন্তাজগতের সামগ্রী হয়ে আসছে। পুরাতন কাব্যের আপাতঃ গতানুগতিকতা এই কারণেই এবং তা হলেও তা এক মহৎ গতানুগতিকতা। নতুন কবিদের কাছে দাবি নতুন পরিস্ফুট অর্থের এবং নতুন আবেগোদ্দীপক-গত বর্ণলেপনের, কারণ নতুন সামাজিক পরিবেশের প্রতি আমাদের নতুন আবেগগত মনোভাব গড়ে তোলাটাই তাঁদের কাজ। যে কবি এই দুটিই

বড়ো মাত্রায় যোগান দিতে পারেন তিনিই উত্তম কবি। যে কবি বিপুল পরিমাণে নতুন বাস্তব তাঁর জালে ধরতে পারেন এবং ব্যাপক আবেগোদ্দীপক গত বর্ণলেপন তাতে যুক্ত করতে পারেন তাঁকেই আমরা বলব মহৎ কবি, যেমন শেকসপীয়ারের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। অতএব মহৎ কবিতাগুলি সর্বদাই দীর্ঘ কবিতা, পরিস্ফুট অর্থ হিসাবে যে পরিমাণ বাস্তবকে তার অন্তর্ভুক্ত করতেই হবে সেই পরিমাণটাই তার কারণ। কিন্তু পরিস্ফুট অর্থটা যাই হোক না কেন, সেটা কবিতার উদ্দেশ্য নয়। পরিস্ফুট অর্থের প্রতি যে বিশেষ আবেগগত সংগঠনকে চালিত করা হয় এবং যে উদ্ধারিত আবেগোদ্দীপকগুলি তাকে গড়ে তোলে সেটাই হল সেই কবিতার উদ্দেশ্য [purpose]। স্বপ্নে যেমন আবেগোদ্দীপকগুলি "সুপ্ত" থাকে, এক্ষেত্রে আবেগোদ্দীপকগুলি সেইরকম "সুপ্ত" থাকে না; সুপ্ত-অর্থ সৃষ্টির জন্য অনুষঙ্গযুক্ত ভাবগুলিকে দমিত করা হয়। যে সহজপ্রবৃত্তিগত মনোভাবের ধারা স্বপ্ন নির্মানের প্রক্রিয়াকে গড়ে তোলে সেটাই যেমন স্বপ্নের চাবিকাঠি সেইরকম কাব্যের চাবিকাঠি হল বহির্বাস্তবের দমিত খণ্ডের পুঞ্জ—জীবনাভিজ্ঞতার এক অস্পষ্ট অচেতন জগৎ।

কাব্য বাস্তবের জগৎকে আবেগোদ্দীপকগত সুর দিয়ে রঞ্জিত করে। এই আবেগোদ্দীপকগত বর্ণগুলি "সুন্দর সুন্দর" নয়, কারণ সেটি প্রয়োজনের সেই বাস্তব জগৎটিই এবং মহৎ কাব্য বাহ্যিক প্রয়োজনের নগ্নতাকে গোপন করেনা, সেটাকে কেবল আগ্রহের দীপ্তি দিয়ে উজ্জ্বল করে তোলে। কাব্য বহির্বাস্তবকে —প্রকৃতি ও সমাজকে আবেগগত তাৎপর্য দিয়ে নিষিক্ত করে। যেহেতু এই তাৎপর্য বহির্বাস্তব সম্পর্কে একটা স্বাভাবিকস্পৃহাগত আগ্রহ জীবকে দেয়, সেই কারণে এই তাৎপর্য আরও দৃঢ়তার সঙ্গে সেটার মোকাবিলা করতে জীবকে সক্ষম করে তোলে, সেটা বাস্তবের জগতেই হোক বা অলীককল্পনার জগতেই হোক। কোন আদিম মানুষ যখন একটা বন্ধ্যা বিমূর্ত ভূমিরাশিকে চাষ করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্লান্তিকর শ্রমের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে তখন সে উৎসাহ পায় যদি মাটিকে 'প্রকৃতি মাতার' আবেগোদ্দীপকগত বর্ণলেপন দিয়ে রঞ্জিত করে তোলা হয়, কারণ এখন কাব্যের যাদুস্পর্শে তা যৌনতা বা সন্তানসুলভ ভালোবাসার স্বাবাভিকস্পৃহাগত বর্ণে দীপ্যমান। এই আবেগোদ্দীপকগত বর্ণগুলি বিজ্ঞানসম্মত নয় বলে যে তারা অবাস্তব তা নয়, কারণ সেগুলি হল জনিরূপের নিজের সহজপ্রবৃত্তির বর্ণ, আর এই সহজপ্রবৃত্তিগুলি মাটি যেরকম বাস্তব সেইরকমই বাস্তব। বহির্বাস্তবের উপর কাব্য যে

তাৎপর্যময় অভিব্যক্তি আরোপ করে তা হল শুধু এই যে তা প্রয়োজনকে নিজের সাদৃশ্য অনুযায়ী রূপ দেওয়ার জন্য [to mould necessity to its own likeness] জনিরূপের সীমাহীন প্রয়াসের এক ভবিষ্যবাণী, যে কাজে সে এক নিরবচ্ছিন্ন ক্রমবর্ধমান সাফল্য লাভ করে। "বস্তু, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কাব্যধর্মী ঐশ্বর্যে পরিবৃত হয়ে, মানুষের সমগ্র সত্তাকে মোহিনী হাস্যে আকৃষ্ট করে বলে প্রতীয়মান হয়"। বস্তুবাদ একপেশে যান্ত্রিক বস্তুবাদ হয়ে ওঠার আগে যখন তা রেনেসাঁস যুগের শিল্পগত ঐশ্বর্যে তখনও মণ্ডিত ছিল সেই সময়কার বস্তুবাদ সম্পর্কে মার্ক্স ও এঙ্গেলস এই কথা বলেছিলেন। কাব্য দেয় সেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঐশ্বর্য: আর বস্তুবাদ, সত্তাকে [self] অনুভব করার ভয়ে ভীত হয়ে, যখন শুষ্ক বিজ্ঞানসম্মত হয়ে উঠল তখন তা একপেশে হয়ে পড়ল এবং বস্তু এক যুক্তিভিত্তিক কিন্তু শূন্য তত্ত্বজগতের মধ্যে লোপ পেয়ে গেল। কাব্য বস্তুর মধ্যে প্রাণ ও মূল্য পুনঃসঞ্চারিত করে এবং যে জগৎ থেকে জনিরূপ নির্বাসিত হয়েছিল সেই জগতে তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে।

৫

স্বপ্নকে আমরা কাব্যের সমতুল্য করলেও আমরা লক্ষ্য করেছি যে তাদের মধ্যে মূলগত পার্থক্যও আছে। কাব্য সৃজনধর্মী; স্বপ্ন তা নয়। কাব্য সৃজনধর্মী, কারণ তা উদ্দেশ্য প্রণোদিত অনুভূতি। স্বপ্নে অনুষঙ্গগুলি "অবাধ"— বাস্তবের প্রতিরূপগুলি জনিরূপের বাসনা অনুযায়ী কৌশলে চালিত হয়, ঠিক যেমন চুম্বকের বলরেখা অনুযায়ী লৌহচূর্ণের কণাগুলি "অবাধে" নিজেদের বিন্যস্ত করে। কাব্যে অবশ্য প্রত্যক্ষগত বাস্তবের সাধারণ জগতে বাস করতে বাধ্য হওয়ায় অনুভূতি একটা সামাজিক রূপ লাভ করে। কাব্য আবেগের বাহ্যিকীকরণ ঘটায়। সত্তা [self] প্রকাশিত হয়—তাকে জোর করে নিষ্কাশিত করা হয়। আবেগকে মুদ্রাঙ্কিত করে তোলা হয়—তাকে প্রচলিত মুদ্রা করে তোলা হয়। অনুভূতিকে সামাজিক মূল্য দেওয়া হয়। কাজ সম্পাদিত হয়। স্বপ্ন-নির্মাণ সঠিকভাবে বলতে গেলে শ্রম নয়, কাব্যের স্বপ্ন-নির্মাণ কিন্তু শ্রম, কারণ তা একটি সামাজিক পণ্য সৃষ্টি করে, অপসৃষ্টি করে না।

এই কারণেই কাব্যের করণকৌশল স্বপ্নের করণকৌশল থেকে পৃথক। স্বপ্নের নীচের স্তরে অচেতন সহজপ্রবৃত্তিগত ইচ্ছা থাকে। সহজপ্রবৃত্তি হল অন্ধ, যতক্ষণ তা অচেতন থাকে ততক্ষণ সে নিজেকে পরিবর্তিত করতে পারে না এবং আত্ম-সাপেক্ষীকরণ [self-conditioning] করতে অপারগ। কারণ তার সংকল্প [will] থাকে না, থাকে কেবল উদ্দীপকের প্রতি স্বয়ংক্রিয় প্রতিক্রিয়া।

এই সহজপ্রবৃত্তিগত ইচ্ছার ছকগুলি [wish-patterns] ব্যক্তির মধ্যে প্রতিরূপের বৃত্তাকে নির্দেশ দেয়, এই প্রতিরূপগুলি আবার পরোক্ষ আবেগোদ্দীপকগত বন্ধনসূত্রে ইচ্ছার ছকগুলির সঙ্গে অনুষঙ্গযুক্ত। কিন্তু স্বপ্নে এই বন্ধনসূত্রগুলিই দমিত হয়। কারণ স্বপ্নদ্রষ্টার নিদ্রা যদি না ভাঙাতে হয় তাহলে যা কিছু আবেগোদ্দীপকগুলিকে ক্রিয়ার জন্য জাগিয়ে তোলে সেগুলিকে অবশ্যই এড়াতে হবে। আবেগোদ্দীপকপূর্ণ প্রতিরূপের বিস্তৃত ক্ষেত্রটি ' নিষিদ্ধ এলাকা"। "ঘুমন্ত আবেগোদ্দীপককে জাগিও না"—এই হল স্বপ্ন-কামনার বাণী। মানুষ যেমন অনায়াসে কোন চিন্তাহীন অভ্যাসগত নড়াচড়া করে সেই রকম অ-ায়াসে অলীককল্পনার দিক থেকে তৃপ্ত হওয়ার কারণেই আবেগোদ্দীপকগুলি দমিত হয়।

কাব্যগত বিভ্রমের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটি বিপরীত। স্বপ্ন অচেতন স্তর থেকে ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠতে থাকে এবং সেইজন্য তা অন্ধ ও অ-সৃজনধর্মী। কবিতা সচেতন স্তর থেকে ক্রমে নীচের দিকে নামতে থাকে এবং সেইজন্য তা অবহিত ও সৃজনধর্মী। স্বপ্ন আবেগের গতিশীল এলাকাটি ভয়ে ভয়ে এড়িয়ে চলে, যাতে নিদ্রিতব্যক্তি ক্রিয়ার উদ্দেশ্যে জেগে না ওঠে; কাব্য সাহসের সঙ্গে সেই এলাকাটি অনুসন্ধান করে, যাতে অভ্যন্তরীণ জগৎকে সে পরিবর্তিত করতে পারে।

স্বপ্নের স্মৃতি প্রতিরূপগুলি অন্ধের মত সহজপ্রবৃত্তির হুকুম তামিল করে। কিন্তু কাব্যের শব্দগুলি একটা উদ্দেশ্যপূর্ণ পথ অনুসরণ করে। তাদের লক্ষ্য হল আবেগোদ্দীপকগুলিকে প্রথমে আলোড়িত করা, তারপর সেগুলিকে পুনঃসংগঠিত করা। স্বপ্নের একমাত্র পরিণতি হল বাস্তব থেকে আহরিত এবং সহজপ্রবৃত্তির তাগিদে পুনর্বিন্যস্ত প্রতিরূপগুলির একটা ক্ষণস্থায়ী ও বিধিবহির্ভূত সামগ্রিক আকার। সহজপ্রবৃত্তি বলে, "জগৎটা ওই রকম নয়, এই রকম"। আর স্বপ্নে সেগুলিকে নতুন করে রূপ দেয়। কিন্তু এক এক সময় সহজপ্রবৃত্তিগুলি এমনভাবে রূপান্তরিত হয় যে তারা পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করে এবং স্বপ্নের বস্তুগুলি আবেগোদ্দীপকের মধ্যে বিস্ফোরিত হয়, এবং আমাদের জাগিয়ে দেয়।

কাব্য অবশ্য এমনভাবে তার শব্দগুলিকে সংগ্রহ করে ও সাজায় যাতে আবেগোদ্দীপকগুলি উদ্দীপ্ত হয় এবং বাস্তবের প্রতি এক নতুন সংগঠন, এক নতুন আবেগগত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। স্বপ্ন বাস্তবকে সহজপ্রবৃত্তি অনুযায়ী রূপ দেয় এবং সেইজন্য স্বপ্নদ্রষ্টাকে বহির্বাস্তব থেকে রক্ষা করা এবং তাকে নিদ্রিত রাখা ছাড়া তার অন্য বিশেষ কিছু উপযোগিতা নেই। কাব্য

সহজপ্রবৃত্তিগুলিকে বাস্তবের ছাঁচে রূপ দেয় এবং সেইজন্য তার উপযোগিতা, কারণ তা পাঠককে বাস্তব থেকে রক্ষা করে না, বরং তার মোকাবিলা করার জন্য সাহস জোগায়। কাব্য হল বিপ্রতীপ স্বপ্ন—গতিমুখ লক্ষ্য ও সেই কারণে করণকৌশলের দিক থেকে বিপ্রতীপ। কাব্য প্রবাহিত হয় বাস্তব থেকে সহজপ্রবৃত্তির দিকে, প্রত্যক্ষের একেবারে শেষ ঘাঁটিতে যেখানে তা সহজ-প্রবৃত্তির মুখোমুখি হয় সেইখানে গিয়ে একেবারে থামে। স্বপ্ন প্রবাহিত হয় সহজপ্রবৃত্তির থেকে বাস্তবের সীমানার দিকে, মনোযোগের প্রান্তিকে, আর সেখানে গিয়ে প্রকৃত ফললাভের ঠিক আগে গিয়ে থামে, কারণ তা ক্রিয়ার ঠিক আগে গিয়ে থামে।

অতএব কাব্য যে সর্বসাধারণের আর স্বপ্ন যে ব্যক্তিগত এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ চেতনা হল একটা সামাজিক নির্মিতি। অতএব যে সচেতন মানসগত বিষয়বস্তুকে একত্র করে ধরে রাখে সেগুলি সামাজিকভাবে সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তু। একথা ঠিক যে সেগুলি একত্রিত অবস্থায় বিরাজ করে, কারণ যে দেহের মধ্যে তারা থাকে সেই দেহটাই হল বস্তুগতভাবে একটি সামগ্রী; কিন্তু যে সবগুলি একত্রিত অবস্থায় বিরাজ করে—নীতি, জ্ঞান, সংস্কৃতি, অভিলাষ, কর্তব্য—সেগুলি সব সামাজিকভাবে সুনির্দিষ্ট। অসামাজিক মানুষ হল বর্বর, অচেতন, সহজপ্রবৃত্তিধর্মী এবং সেইজন্য ইচ্ছাশক্তিহীন। সহজপ্রবৃত্তিধর্মী অচেতন প্রাণীর কোনও ইচ্ছা [will] থাকে না, থাকে কেবল স্বয়ংক্রিয় প্রতিবর্ত [reflex] যা অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উদ্দীপককে সাড়া দেয় মাত্র। তার স্বাধীনতা নেই, কারণ স্বাধীনতার জন্য দরকার ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্ব। ইচ্ছাক্রিয়ার সারধর্ম এই যে, যে কারণগুলি ইচ্ছাক্রিয়ার [willing] নির্বাচনকে অপরিহার্য করে তোলে চেতনা সেই কারণগুলি সম্পর্কে অবহিত থাকে এবং এই অপরিহার্যতাই হল ইচ্ছা [will]। পরিতৃপ্ত ইচ্ছা হল মানসের সেই সচেতন ডায়ালেকটিক যার মধ্যে দেহের সহজপ্রবৃত্তিগুলির সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতির প্রয়োজনের সংঘর্ষটির এমন একটি সচেতন ক্রিয়ার সাহায্যে নিষ্পত্তি ঘটে যার মধ্যে অনুভূতি ও প্রত্যক্ষ দুই-ই আছে। সচেতন অণুবিশ্ব [micro-cosm] অর্থাৎ মানুষ সৃজনধর্মী, যেহেতু সে স্বেচ্ছায় ক্রিয়া সম্পাদন করতে পারে; কারণ শেষ পর্যন্ত সচেতন ক্রিয়া আর সৃজন একই ব্যাপার। আকস্মিক আবির্ভাবের বিপরীতে সৃজন হল অন্ধ প্রয়োজনের তাগিদে দেখা দেওয়ার পরিবর্তে ইচ্ছা কর্তৃক রূপ দান করা। আকস্মিক ঘটনা পাহাড়কে অদ্ভুত অচিন্তিত আকৃতি দেয় কিন্তু ইচ্ছা পাথরকে খোদাই ক'রে কাঙ্ক্ষিত ভাস্কর্যের রূপ দেয়। দুটিই প্রয়োজনের ভিন্ন ভিন্ন দিক।

অতএব কবিকে সর্বোপরি শব্দের অনুষঙ্গ ও আবেগোদ্দীপকগত সুর সম্পর্কে সংবেদনশীল হতে হবে—ব্যক্তিগত সুরগুলি নয়, সমষ্টিগত সুর সম্পর্কে। ব্যক্তিগত আর সমষ্টিগত সুরের মধ্যে কিভাবে তিনি পার্থক্য টানবেন? সচেতনভাবে তিনি পারেন না, আর নিজের কাছে অর্থদ্যোতক কিন্তু অন্য মানুষের কাছে অর্থদ্যোতনাহীন কবিতা রচনার বিপদ কোনও কবিই এড়াতে পারেন না। যা তিনি পারেন তা হল, তিনি তাঁর আবেগোদ্দীপকগত জীবনটি সামাজিকভাবে কাটাতে পারেন, শব্দের মধ্যে বাস করতে পারেন। কারণ বাস্তবিকই শব্দের মধ্যে তিনি কেবল মাত্র সামাজিকভাবেই বাস করতে পারেন। পুস্তকে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানবিষয়ক নিবন্ধে, পত্রিকায়, ভাষণে তিনি তার সাক্ষাৎ পান, কিন্তু জনজীবনে তার সর্বদাই সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। অর্থাৎ, স্মৃতি-প্রতিরূপের পরিবর্তে শব্দের মধ্যে যদি তিনি বাস করেন তাহলে তিনি কাব্যের কলাকৌশলকে সম্যক আয়ত্ত করতে পারবেন, কারণ কাব্য শব্দ দিয়ে লেখা হয়।

শব্দের অনুষঙ্গগুলির উপর কবির অধিকার থেকেই কবি তাঁর সৃজনকর্মের হাতিয়ার পেয়ে থাকেন। তাঁর কাজ হল এই রকম। একটা আবেগগত পুনঃসংগঠনকে জনজীবনের কাছে উপস্থাপিত করতে হবে, শব্দগুলিকে এমন একটা রূপে প্রকাশ করতে হবে যেটা সমষ্টিগতভাবে লভ্য। আমাদের এই আবেগগত পুনঃসংগঠন শব্দটিকে অধিকতর প্রচলিত মনোবিদ্যামূলক রূপ দেওয়া যাক। মনোবিদ্যার সাহায্যে রোগনিরাময়ের কৌশলের ক্ষেত্রে স্বয়ং-শাসিত মনোবিকারের (autonomous complex) ধারণা উদ্ভূত হয়েছে। মনোবিকার বা কমপ্লেক্স হল মানসের মধ্যে বিষয়বস্তুর এমন এক পুঞ্জ যা নিজেদের মধ্যে মানসগত শক্তি সঞ্চয় করে। সেগুলি সংগঠিত ও গতিশীল শক্তিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে এবং সেগুলি মানসের একটা বড় অংশ অধিকার করে থাকে। মানসের অনেক ছোটখাটো কমপ্লেক্স থাকে কিন্তু রোগনিরাময়ের কৌশলগত অর্থে সেগুলি কমপ্লেক্স হয়ে ওঠে কেবল মাত্র তখনই যখন সেগুলি মানসের মুখ্যতঃ সচেতন বিষয়বস্তুর দ্বারা প্রতিহত হয় (অবদমন) এবং "অহং-য়ের" সঙ্গে সেগুলির পরিচয় থাকে না। অর্থাৎ মানসের যে অংশটি সচেতনভাবে চিন্তা করে ও অনুভব করে সেই অংশটির সঙ্গে তাদের পরিচয় থাকে না। যখন তাদের একটা "নিজেদের ইচ্ছাশক্তি" গড়ে ওঠে, যে ক্রিয়াগুলির সঙ্গে সচেতন স্তরের পরিচয় নেই মানসের সেই ক্রিয়াগুলির উপর প্রভাব ফেলে, তখন সেগুলি বিপজ্জনক হয়ে ওঠে এবং স্নায়বিক সংঘাত, সন্দেহ

ও অদ্ভুৎ অদ্ভুত উদ্বেগের জন্ম দেয়। সেই ব্যক্তিটি তখন যেন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে, তার দুটি যোজনা [motive] এবং দুটি ইচ্ছাশক্তি দেখা দেয়। সেই পাভলভের পরীক্ষায় কুকুরদের মধ্যে বৃত্ত ও বর্গের মত দুটি বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার প্রতিবর্ত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যেমন দেখা গিয়েছিল, এক্ষেত্রেও সেই একই রকম লক্ষণ দেখা যায়। এই দুটি আকৃতির মাঝামাঝি আকৃতির কোনও বস্তু যদি এদের সামনে উপস্থিত করা হয় তাহলে তার প্রকাশটা হয় মানবিক দ্বিধারই একটা কুকুর-সুলভ সংস্করণ। আবেগগত পুনঃসংগঠন হল স্বয়ংশাসিত মনোবিকারকে সামাজিকভাবে সচেতন করে তোলার দ্বারা কিছুটা পরিমাণে নিষ্পত্তি ঘটান।

৬

মনোবিকার সাহায্যে রোগনিরাময়ের কৌশলের ধারণাগুলি ব্যাধিবিদ্যা থেকে আহরণ করা হয়েছে। উন্মাদ রোগের সঙ্গে চিন্তার সুস্থ প্রক্রিয়ার সম্পর্কটি না বুঝলে মানুষের মনে ও জীবনে বিভ্রমের সঙ্গে বাস্তবের সম্পর্কটি সম্পূর্ণ বুঝতে পারা অসম্ভব।

আমরা আগেই দেখেছি যে স্বপ্নে কোনও ক্রিয়ার উদ্দীপকটি আবেগোদ্দীপক-গতভাবে স্মরপ্রাপ্ত প্রতিরূপের প্রবাহের মধ্যে অলীককল্পনার দিক থেকে পরিতৃপ্ত হয়, যে প্রবাহে বাস্তবের সম্পর্কে আবেগোদ্দীপক ও প্রতিরূপ দুটিরই বিকৃতি ঘটে। এই বিকৃতি এই জন্যই অনুমোদনীয় যে সংজ্ঞা অনুসারে স্বপ্ন ক্রিয়াতে পরিণত হতে পারে না, যেহেতু তার উদ্দেশ্য হল পরিবেশের সঙ্গে সক্রিয় সম্পর্কে আসা থেকে জীবিত দেহকে রক্ষা করা।

মানুষ যখন তার জাগ্রত জীবনে স্বপ্নকে প্রবিষ্ট করায় তখন সে এক ধাপ অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু এই প্রবিষ্ট করানোটাই অলীককল্পনাতে শারীরবৃত্তগত-ভাবে যা অনুমোদনীয় তার সুযোগকে সঙ্কুচিত করে। অলীককল্পনা যেহেতু এখন ক্রিয়াতে পরিণত হয় সেই জন্য কোনও না কোনও ভাবে তাকে বর্তমান বাস্তবের দিকে চালিত করতেই হবে, কারণ বর্তমান বাস্তব ক্রিয়াকে নির্ধারিত করে।

কিন্তু তাকে বর্তমান বাস্তবের অভিমুখে বিষয়ীগত ও বিষয়গত দুদিকেই চালিত করা যেতে পারে না। কারণ সেটা করলে অলীককল্পনা প্রত্যক্ষের সঙ্গে তুল্যমূল্য হয়ে যায়। বহির্বাস্তব সম্পর্কে মানুষের তাৎক্ষণিক দৃষ্টি এবং সেই বাস্তবের প্রতি তার মনোভাবের সঙ্গে অলীককল্পনা তুল্যমূল্য হয়ে যায়।

সেই কারণে তা মায়ামন্ত্র ও অনুষ্ঠানকে [spell and rites] কেন্দ্র করে

সেই অতীন্দ্রিয় বিভ্রম সৃষ্টি করার জন্য স্থানিক চৌহদ্দির মধ্যে [in space] বিকৃত হয় যে বিভ্রম যাদুর ও শব্দের শক্তিতে সমস্ত বাস্তবকে উপজাতির গণ্ডীর মধ্যে টেনে আনে বলে মনে হয়। কালিক চৌহদ্দির মধ্যে [in time] তা পুরাণ-কাহিনী [myth] বা কাহিনী সৃষ্টি করার জন্য বিকৃত হয়। পুরাণকাহিনী এবং যাদু অথবা ঈশ্বরতত্ত্ব ও অতীন্দ্রিয়বাদ [theology and mysticism], অলীক-কল্পনার এই দুটি রূপ বাস্তবের সঙ্গে মানুষের নমনীয় সম্পর্কের বিবর্তনমূলক ও বর্গীকরণমূলক দিকগুলির অনুযায়ী হয় [correspond]। কিন্তু এখনও তা অন্ধ—বিষয়ীগত বিষয়গুণের সঙ্গে, বিজ্ঞান শিল্পের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে আছে। এখনও তা ধর্ম। বিষয়ীগতকে আরও বেশি শুদ্ধ ও অভ্যন্তরীণ করতে এবং বিষয়গতকে আরও বেশি যথাযথ ও বহির্বিষয়ক করতে, "অন্ধ" দিকটির বিলয় ও সুদক্ষ ব্যবহারের সাহায্যে [dissolution and manipulation] অবশ্যই পৃথক করতে হবে।

অতএব জাগ্রত অবস্থায় অলীককল্পনা একটি দিকে বিকৃত। শিল্প নকল জগতের কৌশলের [device] সাহায্যে অলীককল্পনাকে বহির্বাস্তবের দিকে বিকৃত করে ; বিজ্ঞান তাকে নকল অহংয়ের কৌশলের সাহায্যে বিষয়ীগত বাস্তবের দিকে বিকৃত করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বিকৃতিটা বিকৃত দিকটিতে বিকৃতির জন্য বিকৃতি ঘটান নয় ; "অপর" দিকটিকে আরও বেশি নির্ভুলতায় পৌছানর জন্য বিকৃতি। এই অপর দিকটি আবার অন্য মানুষের চেতনার সঙ্গে অনুষঙ্গের সাহায্যে বর্তমান বাস্তবের সীমাকে অতিক্রম করেই—বর্বর অলীককল্পনার অর্ধ-সচেতন স্তর পার হয়ে মানুষের সচেতন স্তরের দিকে গিয়ে তবেই তা, আরও বেশি যাথাযথতার দিকে পৌছাতে পারে।

সেইজন্য শিল্পের অবিকৃত দিকটি—বিষয়ীগত দিকটি—একটা সামাজিক বিষয়ীধর্মীতা বা সামাজিক অহংয়ের সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়ার দ্বারা বিকশিত হয় ; আর বিজ্ঞানের অবিকৃত দিকটি, বিষয়গত দিকটি, একটা সামাজিক বিষয়-ধর্মীতা বা সামাজিক জগতের সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়ার দ্বারা বিকশিত হয়।

বিজ্ঞান এবং শিল্প হল ব্যক্তিগত অলীককল্পনার মধ্যে বিজ্ঞানমূলক ও শিল্পমূলক উপাদানগুলির একটা বিমূর্ত ও সামাজীকৃত রূপ মাত্র। ব্যক্তির অলীককল্পনাগুলি কিন্তু ব্যাঘাত পেতে পারে। মানুষ উন্মাদ হয়ে যায়। এই ব্যাঘাতগুলিকে পর্যবেক্ষণ করলে অলীককল্পনার প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়।

উন্মাদ হল সেই মানুষ যার অন্ধ বাস্তবের থেকে সংযোগহীন হয়ে গেছে,

সেটা তার কাজকর্ম—তার ক্রিয়া থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায়। এই বাস্তবটি একমাত্র সামাজিক বাস্তবই হতে পারে, যেহেতু সেই একটি বাস্তবই সমাজের কাছে পরিচিত। উন্মাদ মানুষের বাস্তব সম্বন্ধে তত্ত্ব সমাজের বাস্তব সম্বন্ধে তত্ত্ব থেকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক। উন্মাদেরা সামাজিক দিক থেকে ভুলভাবে অভিযোজিত। তাদের মধ্যে একটা সংঘাত থাকে—তাদের সামাজিক অভিজ্ঞতার,—সমাজে তাদের জীবনযাত্রার এবং জীবন সম্বন্ধে তাদের অলীক-কল্পনাত্মক তত্ত্বের মধ্যকার সংঘাত।

মনোরোগবিদ্যায় [psychiatry] আজকাল উন্মাদরোগের দুটি প্রধান বিভাগ স্বীকার করার প্রবণতা দেখা যায়: (ক) খেদোন্মত্ত বাতুলতা [the manic-depressive or cyclothymic disturbances] ও (খ) চিত্তভ্রংশী বাতুলতা [the schizophrenic, catatonic or dementia praecox disturbances]। ক্রেটশমার এই দুটি বিভাগকে দুটি ভিন্ন শারীরিক গঠনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করেছেন, পিকনিক [pyknic] (চওড়া ও মাংসল) এবং অ্যাসথেনিক [asthenic] (পাতলা ও কৃশ)। উন্মাদরোগ বা মানসিক বিকৃতি ছাড়াও মানসিক ক্রিয়ার ব্যাঘাত হতে পারে—মানসিক স্নায়বিক বিকৃতি [psychoneuroses]। হিস্টিরিক নিউরোসিস [hysteric neuroses] ও সাইক্লোথিমিক [cyclothymic] উন্মাদরোগের মধ্যে এবং সাইক্যাসথেনিক ও স্কিজোফ্রেনিক [psychasthenic neuroses and schizophrenic] উন্মাদরোগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকার একটা সাধারণ প্রবণতা দেখা যায়।

ইয়ুঙ যে মনোবিদ্যাগত টাইপের বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন তারও ভিত্তি হল এই অঙ্গীকার যে মানসিক দিক থেকে ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হলে বহির্মুখী টাইপের হিস্টিরিক ও খেদোন্মত্ত বাতুলতার [hysteric and manic-depressive] প্রবণতা দেখা যায়, আর অন্তর্মুখী টাইপের বেশি সম্ভাবনা দেখা যায় সাইক্যাসথেনিক নিউরোসিস ও স্কিজোফ্রেনিয়ার [psychasthenic neuroses and schizophrenia]। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে প্রথম বিভাগটিকে আরোগ্য করা পরেরটির থেকে অপেক্ষাকৃত সহজ।

এখন আমরা ত' দেখেছি যে স্বপ্ন একটা চাপের [tension] বাহন। অলীককল্পনাগত স্তরে বিষয়ী (আবেগোদ্দীপকগত স্তর) এবং বিষয়ের (স্মৃতি-প্রতিরূপ) এক স্থির বিকৃতির সাহায্যে এই চাপের পূর্ণ নিষ্পত্তি ঘটে।

উন্মাদ ব্যক্তিরা তাদের তত্বকে সামাজিক বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে তাদের সংঘাতের সমাধান করে। তারা জাগ্রত অবস্থায় থাকে এবং এই স্বপ্নের ক্ষেত্রে যেরকম বিম্ব স্থানান্তর ঘটে সেই রকম বিম্ব স্থানান্তরের সাহায্যে তাদের সমস্যার সমাধান করতে পারেনা। তাদের অলীককল্পনার একটা মুখ থাকে সামাজিক বাস্তবের দিকে ফেরান।

আমাদের বক্তব্য হল এই যে, বহির্মুখী, খেদোন্মত্ত হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত টাইপটি বাহ্যিক দিক থেকে বাস্তবের দিকে মুখ করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, এটা রোগীকে পরীক্ষা করার দিক থেকে [clinically] সঠিক। এমন কি খেদোন্মত্ত বাতুলও নিজেকে সঠিকভাবে "বিন্যস্ত" ["orient"] করতে পারে, তার পথ দেখতে পায় এবং আশেপাশে কি ঘটছে তা সাধারণভাবে লক্ষ্য করতে পারে।

ম্যাককার্ডি দেখিয়েছেন যে, প্রকৃত উদ্দীপকে এই রোগীর প্রতিক্রিয়া ঘটে। নীচের তলায় চুপিচুপি কথা হচ্ছে সে শুনতে পায় এবং তা থেকে কল্পনা করে যে তাকে খুন করার কথাবার্তা হচ্ছে বুঝি। খুনের চেষ্টা হলে যে ধরনের ভীতি দেখা দেওয়া উচিত সেই রকম ভয় পাওয়ার সমস্ত লক্ষণ তখন তার মধ্যে দেখা-যায়।

বাস্তবের সঙ্গে নিজেকে খাপ-খাওয়ানোর জন্য সে **"নিজের অহংকে সমাজ-নিরপেক্ষ"** করে তুলেছে। ফলে সেটা অচেতন এবং সেই অনুযায়ী সহিংস ও বর্বর হয়ে পড়ে। এটা একদিক থেকে অপর দিকে নিয়ন্ত্রণাতীতভাবে চলাচল করে এবং সামান্য উত্তেজক কারণে এস্পার ওস্পার ভিত্তিতে ফেটে পড়ে। সেই কারণে দ্রষ্টার কাছে খেদোন্মত্ত বাতুলকে বহির্বাস্তব-ভুলে-যাওয়া এক বদ্ধ অতিরাগ সমন্বিত ব্যক্তি বলে মনে হয়। কিন্তু তার নিজের কাছে নিজেকে সে রকম মনে হয় না। কারণ তার অহং অচেতন ও আদিম হয়ে গেছে এবং সেই কারণে তা তার সচেতন ক্ষেত্র থেকে নিক্রান্ত হয়ে গেছে। অবশ্য এতে তার সচেতন ক্ষেত্রের বহির্বাস্তবকে তা বিকল করে দেয়, যার ফলে তা অচেতন শক্তিগুলির দ্বারা সর্বদাই বিকৃত হতে থাকে। সে যদি "চিংড়ি" শব্দটি শোনে সঙ্গে সঙ্গে ধরে নেয় তাকে বুঝি জীবন্ত সিদ্ধ করা হবে। যেহেতু তার অহং অচেতন এবং বিসামাজিকীকৃত হয়ে গেছে [desocialised] সেই কারাণ সে নিজে তার দাস হয়ে পড়ে।

বহির্বাস্তবের সঙ্গে খেদোন্মত্ত বাতুলের বিন্যাস যেরকম হয় চিত্তভ্রংশী বাতুল অবশ্য সেই রকমেরই আবেগগত সুসংলগ্নতা ও সমন্বয়ধর্মিতা দেখায়।

ম্যাককার্ডির মতে স্কিজোফ্রেনিয়ার একটি ক্লিনিক্যাল লক্ষণ হল এই যে উদ্দীপকের অনুপাত অনুযায়ী আবেগোদ্দীপকগত প্রতিক্রিয়া রোগীর মধ্যে দেখা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, সে বলে যে লোকেরা চুপিচুপি তাকে খুন করার কথা বলাবলি করছে সে শুনতে পাচ্ছে, কিন্তু তার জন্য কোনও ভয় তার মধ্যে দেখা যায় না। ক্রমে তার মধ্যে বিন্যাসের [orientation] সম্পূর্ণ অভাব দেখা যায়, এমন কি নিজে নিজে খেতেও সে পারেনা, এবং শেষ পর্যন্ত একটি ব্যক্তিগত বাস্তবের জগতে সে চলে যায়। অন্তর্মুখী হিসাবে, বিষয়ীগত দিকটিতে সর্বাধিক মূল্য সে আরোপ করে, বহির্বাস্তবকে বিসামাজিকীকরণের সাহায্যে সে তার সংঘাতের নিষ্পত্তি ঘটায় যাতে করে এক স্বপ্ন লোকে—এক ব্যক্তিগত জগতে সে বাস করে। এই স্বপ্নলোক তার সচেতন অহংকে প্রতিফলিত করে, যা অবশ্য দ্রষ্টার কাছে বিশেষ স্পষ্ট বলে মনে হয় না। যেহেতু স্বপ্নলোক সেই অহংয়ের গতির এক অপ্রতিহত প্রতিফলন। যেহেতু দ্রষ্টা প্রতিষেধিত [negated] বহির্বাস্তবের একটা অংশ সেই কারণে স্কিজোফ্রেনিকের অহংয়ের সঙ্গে দ্রষ্টার কোনও সংশ্রব থাকে না। চিত্তভ্রংশী ব্যাকুল স্কিজোফ্রেনিকের সচেতন অহং কোনও অতিরাগ বা আবেগের দ্বারা উদ্দীপ্ত হয় না, কারণ স্বপ্নের জগৎ সেটাকে বিরক্ত করে না বরং তার "অনুযায়ী" হয়ে ওঠে ["conforms"]। সেই কারণেই স্কিজোফ্রেনিয়ার মানসিক জগতে বিবেক ও দৃঢ় সামাজিক বিষয়বস্তু দেখা যায়। সেগুলি অবশ্য তার আচরণকে প্রভাবান্বিত করে না, কারণ (প্যারানোইয়ার ক্ষেত্রে যেমন হয়) বহির্জগৎ সবদাই "ভ্রান্ত"। নিজেকে এইসবের অনুযায়ী করে পরিবর্তিত করার দ্বারা এই অহং তার বাসনাগুলিকে সমর্থন করে। এইজন্যই ফ্রয়েড প্যারানোয়িয়াকে নারসিশাসধর্মী বলেছেন, এবং এই থেকে তার দুরারোগ্যতার ও অস্পৃশ্যতার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

এখন আমরা শিল্পের অলীককল্পনাগত কৌশলের সাধারণ কর্মপদ্ধতিটিকে স্কিজোফ্রেনিয়া ও সাইক্যাসথেনিক নিউরোসিসের অন্তর্মুখীকৃত বিকৃতির সদৃশ বলে মনে করি এবং বিজ্ঞানের অলীককল্পনাগত কৌশলের সাধারণ কর্মপদ্ধতিটিকে সাইক্লোথিমিয়া ও হিস্টিরিয়ার বহির্মুখীকৃত বিকৃতির সদৃশ বলে মনে করি।

তার অর্থ কি তাহলে এই যে বিজ্ঞান ও শিল্পকে কোনও অর্থে আমরা ব্যাধিগত ও বিভ্রমাত্মক বলে মনে করি? না, তা নয়; কারণ দুটির ক্ষেত্রেই যদিও একই ধরনের মানসগত কর্মপদ্ধতি কাজ করে তা হলেও চিন্তা যেমন

স্বপ্ন নয় সেই রকম শিল্পও স্নায়বিক রোগ [neurosis] নয়। এবং তাদের মধ্যকার পার্থক্যটি এই যে, বিজ্ঞান ও শিল্পের একটা সামাজিক বিষয়বস্তু থাকে। যে বাস্তবের চারপাশে বহির্মুখীকৃত হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত [cyclothymic] তার তত্ত্বকে বিকৃত করে সেটা ব্যক্তিগত বাস্তব, যে বাস্তব তার চেতনার মধ্যে বাস্তব সম্বন্ধে যে সামাজিক তত্ত্বের অস্তিত্ব তার একটারই বিরোধিতা করে। এই স্বপ্ন বাস্তব সম্বন্ধে সামাজিক তত্ত্বের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সংশ্লেষণ সাধন করার দিকে (বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন হয়) যাওয়ার পরিবর্তে (যা দুটিরই পরিবর্তন সাধন দাবি করে), এমন এক আচরণের দিকে চালিত করে যা বাস্তবের সামাজিক তত্ত্বকেই অস্বীকার করে। সাইক্লোথিমিকের অহং য়ের বিসামাজিকীকরণের ফলে অচেতন স্তর থেকে সহজপ্রবৃত্তিগুলি জেগে বেরিয়ে আসে যা বহির্বাস্তবের সঙ্গে সেই জন্য ব্যক্তির সম্পর্কটিকে এবং সেই জন্য ব্যক্তির সমগ্র ক্রিয়াকে বিকৃত করে। বহির্বাস্তবের সম্পর্কে স্কিজোফ্রেনিকের ধারণার বিসামাজিকীকরণ অহং য়ের কাছে প্রত্যক্ষজ্ঞানের দাসত্বের দিকে নিয়ে যায়, যা তার উপর যে "নিয়ন্ত্রক" থাকে সেটিকে দূর করে দেয় যার ফলে সেই প্রত্যক্ষের জগৎটি স্বপ্নের মত ও অবাস্তব হয়ে ওঠে।

এইভাবে বিজ্ঞানের মানসগত কর্মপদ্ধতিটি, যেহেতু তার বাস্তবটি জনসাধারণের ও সত্য, তত্ত্বের ক্ষেত্রে একটি অহংয়ের সৃষ্টি করে যা সাইক্লোথিমিক বহির্মুখীর অহং থেকে ঠিক বিপরীত—যে অহং থেকে আবেগোদ্দীপক ও গুণ বর্জিত হয়ে গেছে, যা প্রয়োজন সম্পর্কে নিরপেক্ষ, নিষ্ক্রিয় ও অচঞ্চলভাবে সচেতন। যেহেতু এই বাস্তবটি সহজপ্রবৃত্তির গতিশীলতা ও স্পৃহা বর্জিত সেই কারণে এই বাস্তবের পক্ষে সম্পাদিত হওয়ার জন্য শিল্পের আবেগগত বাস্তবের দরকার। অতএব এটা সত্য যে, যে জগৎ কেবলমাত্র বিজ্ঞানের সাহায্যে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করে তা কার্যক্ষেত্রে তার তত্ত্বকে অস্বীকার করে থাকে এবং সাইক্লোথিমিকের স্নায়ুব্যথাকেই প্রকাশ করে, তার কারণ এই নয় যে বিজ্ঞান সাইক্লোথিমিক, তার কারণ এই যে বিজ্ঞান হল মূর্ত জীবনধারণের একটা অংশ মাত্র।

যে বাস্তবের চারদিকে সাইক্যাসথেনিক স্নায়ুরোগী বা স্কিজোফ্রেনিক বহির্জগৎকে বিকৃত করে তা হল এক একান্ত ব্যক্তিগত অহং, তার নিজের একান্ত ব্যক্তিগত বাসনা ও স্পৃহা। তারই চারদিকে সে একটা সমগ্র নকল জগৎকে 'বিকৃত' করে (স্নায়ুরোগীর অনুকর্ষ ক্রিয়া, আবেশিক বায়ু বা আতঙ্ক, অথবা স্কিজোফ্রেনিকের কপোলকল্পনার সম্পূর্ণ যবনিকা)। কিন্তু শিল্পের

মানসগত কর্মপদ্ধতি, যেহেতু তার অহং হল জনসাধারণের এবং মহৎ, তত্ত্বের ক্ষেত্রে একটা জগৎ গড়ে তোলে যা সুন্দর ও মজবুত। এই জগৎটি, যেহেতু তা প্রয়োজন বিবর্জিত, অর্জন করতে হলে বিজ্ঞানের কর্মপদ্ধতি দরকার। যে জগৎ কেবলমাত্র শিল্পের সাহায্যেই বেঁচে থাকে তা তার তত্ত্বকে কার্যক্ষেত্রে অস্বীকার করে এবং এক সুন্দর স্বপ্নের জগতে বেঁচে থাকে, আর তার সমস্ত ক্রিয়াকলাপ কেবলমাত্র দুঃখ কষ্ট ও অসুন্দরের জন্ম দেয়।

৭

বহির্মুখীকৃত মানসিক অসুস্থতার রূপ দুটির মধ্যকার পার্থক্যটি পরীক্ষা করে দেখা যাক। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত ব্যক্তি বহির্বাস্তবের জগৎকে অস্বীকার করে না ("দেহের বাহিরে" এই অর্থে বহিঃস্থ)। সে এটাকে স্বীকার করে নেয়। যে বাস্তবকে সে বিকৃত করে বিসামাজিকীকৃত করে সেটা বিষয়গত দিক থেকে দেখা তার দেহের বাস্তব। সেটা যেন এই রকম যে, তার যে অংশটিতে সমাজ সর্বাপেক্ষা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত সেই অংশটির সামাজিক বাস্তবকে চ্যালেঞ্জ করতে সে সাহস পায় না, এবং সেই জন্য তার দেহকে এমন একটা কিছু হিসাবে সে বেছে নেয় যাতে তার একটা বিশেষ অধিকারগত আগ্রহ আছে, এবং সেইটাকে সে বিকৃত করে। এই জন্যই হিস্টিরিয়া জাতীয় সেই বিখ্যাত অসুস্থতাগুলি (হিস্টিরিয়া সুলভ মূকত্ব, অঙ্গবৈকল্য, অন্ধত্ব, হাইপার এস্থেসিয়া ও অ্যানাস্থেসিয়া) দেখা দেয়, যেগুলি সামাজিকভাবে স্বাপ্নিক এই অর্থে যে সেগুলি কেবলমাত্র ক্রিয়াগত ও অ-দেহযন্ত্রগত [functional and non-organic], কিন্তু তা সত্ত্বেও হিস্টিরিয়াগ্রস্তের কাছে সেগুলি বাস্তব, যেহেতু সংজ্ঞা অনুসারে সে সেগুলির বাস্তব কারণ সম্পর্কে অচেতন।

হিস্টিরিয়াসুলভ প্রক্রিয়ার সাহায্যে সহজপ্রবৃত্তি ও পরিবেশের মধ্যকার দ্বন্দ্বটির সমাধানের প্রখ্যাত উদাহরণ হল হিস্টিরিয়াগ্রস্ত সৈনিক যার মৃত্যুভয় হিস্টিরিয়াজনিত অঙ্গবৈকল্যের রূপ নেয় এবং হিস্টিরিয়াগ্রস্ত নারী, যার অতৃপ্ত প্রেম বা প্রসবভীতি হিস্টিরিয়াসুলভ অসুস্থতার রূপ নেয়। সেইজন্যই হিস্টিরিয়াধর্মী লক্ষণগুলিকে "দেহযন্ত্রের-ভাষা" [organ-language] বলে অভিহিত করা হয়।

কিন্তু যদি এই উপায়ে দ্বন্দ্বটির সমাধান করা না যায় তখন বহির্মুখীর অহং, অচেতন স্তরে প্রবেশ করতে বাধা হওয়ায়, তার দেহের বাহিরের বাস্তব সহ সামাজিক বাস্তবের সমগ্র ক্ষেত্রটিকে চ্যালেঞ্জ করে। তার পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কের দিক থেকে সে উন্মাদ হয়ে যায়। কোথা থেকে যে নানা শক্তি এসে

তার পরিবেশে দেখা দিতে থাকে এবং সেটাকে পুরাপুরি বিকৃত করে তোলে তা সে জানে না। তার অহং তার আত্মার অন্ধকার গভীরে প্রবেশ করতে বাধা হয়ে পরিবেশ থেকে তার দিকে মুখব্যাদন করে, যদিও সে বুঝতে পারে না যে সেটা ওই পরিবেশের মধ্যেই রয়েছে।

সাইকোসথেনিক স্নায়ুরোগী অবশ্য এমন এক ব্যক্তি যে প্রথমে সামাজিক বাস্তবকে চ্যালেঞ্জ করে। সেইজন্য, বহির্মুখীর দ্বন্দ্ব যেমন বহির্বাস্তবের সঙ্গে (অর্থাৎ প্রত্যক্ষীভূত বহির্বাস্তব) দ্বন্দ্ব, যে বহির্বাস্তবটি তার অচেতন অহং-য়ের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন, সেইরকম অন্তর্মুখীর দ্বন্দ্বটি হল একটি অনুভূত অহং-য়ের (নৈতিক ব্যাপারে সচেতন) দ্বন্দ্ব, যা তার অচেতন পরিবেশের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। সেই কারণেই সাইকোসথেনিকের লক্ষণ বহির্বাস্তব সম্পর্কে, জীবন সম্পর্কে অনীহা—জীবনের সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার বা সেগুলি সম্পর্কে কিছু করার অক্ষমতা। নিজের বাসনাগুলির স্বপক্ষে যুক্তি হিসাবে সে শত্রু-মনোভাবাপন্ন মানুষ (প্যারানোইয়া) বা বস্তু (ফোবিয়া) বা প্রক্রিয়ার (অনুকম্পন) মত বহির্বাস্তবের উদ্ভাবন করে। সাইকোসথেনিক স্নায়ুরোগী সামাজিক স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসাবে অন্যান্য অহং-য়ের সংশ্রবযুক্ত অহং হিসাবে অহং-য়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করে না বটে, কিন্তু নিজের অসুবিধাজনক পরিবেশগত পরিস্থিতির কারণে প্রচলিত নিয়মগুলি থেকে অব্যাহতি পাওয়ার দাবি করে। সেই কারণে সাইকোসথেনিক স্নায়ুরোগীর ক্ষেত্রে নিজেকে শহীদ ভাবা এবং আত্মদর্শনের আর বিরাম থাকে না। ফলে এরা মনঃসমীক্ষকের কাছে বেশ বিত্তবান ও প্রায় আরোগ্যাতীত খরিদ্দার হয়ে ওঠে। এই ধরনের স্নায়ুরোগী তার "বিশেষ অসুবিধাগুলির" কারণে সর্বদাই এক বিশেষ "সহজ" জগৎ গড়ে তোলার চেষ্টা করে থাকে। এই রোগী সেই দ্বন্দ্ব দ্বারা সৃষ্ট আবেগের জন্য পরিবেশগত বাস্তবের অন্যান্য খুঁটিনাটির উপর "দোষারোপ" করে তার দ্বন্দ্বের সমাধান করে। যেমন ধরুন কোন যৌন সমস্যার কারণে সৃষ্ট আবেগকে কোনও তুচ্ছ বস্তুর সঙ্গে যুক্ত করে। নিউরোসিসে দেখা যায় ট্রেঞ্চে চাপা পড়ার ফলে বা তার ভয়ে সৃষ্ট আবেগ কোন সৈনিকের আবেগকে সমস্ত কালো বস্তু বা বদ্ধ জায়গার দিকে অতিক্রান্ত করেছে [displaced]।

এইভাবে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত ব্যক্তি যেমন বহির্বাস্তবকে অস্বীকার না করে, শারীরিক রোগে আক্রান্ত একটি বস্তু হিসাবে নিজের শরীরের চৌহদ্দির মধ্যে সেটার উপযোজন করে [adjusts] সেইরকম সাইকোসথেনিক স্নায়ুরোগী সামাজিক অহং হিসাবে নিজের দায়িত্ব অস্বীকার না করে সেগুলিকে নিজের

পরিবেশের সঙ্গে, যে পরিবেশকে বিস্তারিত যৌক্তিকীকরণ [rationalisation] ও উদ্ভাবনের সাহায্যে সে বিকৃত করে সেই পরিবেশের সঙ্গে উপযোজন করে। ক্ষুদ্রতম খুঁটিনাটিকেও সে আঁকড়ে ধরে এবং তাকে যোচড় দেয়। হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত ব্যক্তি এক দেহযন্ত্রগত-ভাষা বলে ; নিউরোটিক বলে অনুভূতিগত ভাষা। একজন সমাজকে বলে সে যেটা দেখে না এমন কোন কিছুকে বিশ্বাস না করতে (এবং তার প্রমাণ বানায়) ; অপরজন বলে সে নিজে যা অনুভব করে না সেরকম কোন কিছুকে বিশ্বাস না করতে-(এবং তার হেতু বানিয়ে তোলে)। এইভাবে হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত ব্যক্তি যেমন তার অঙ্গবৈকল্যের প্রকৃত কারণ সম্পর্কে অচেতন, নিউরোটিক সেইরকম তার "অসুবিধাজনক" পরিস্থিতির কারণ সম্পর্কে অচেতন। যেসব জায়গাগুলিকে এড়িয়ে গিয়ে সে তার ভয়কে এড়িয়ে চলে ; এটা সে উপলব্ধি করতে পারে না যে তার বদ্ধস্থানাতঙ্কের সাহায্যে ট্রেনে যাওয়াটাকেই সে প্রকৃতপক্ষে এড়াতে চাইছে।

কিন্তু এই উপায়ে যদি দ্বন্দ্বটির সমাধান করা না যায় নিউরোটিক তখন সামাজিক বাস্তবকে পুরাপুরি অস্বীকার করে এবং নিজের সত্তা সম্বন্ধে অচেতন হয়ে ওঠে। এটা হল স্কিজোফ্রেনিয়া : তখনও সে বহির্বাস্তব সম্পর্কে সচেতন থাকে। তার উদাহরণ হল করসাকফ সিনড্রোম [Korsakoff Syndrome]। যা কিছু বাইরের ব্যাপার তার উপর ঘটে রোগী সব জানে কিন্তু জানে না যে সেগুলি তার উপরেই ঘটছে। ক্লাপারাদ [Claparede] যাকে বলেছেন "মোয়াযেতে" ["moiete"] সেটার অভাব তার থাকে। ম্যাককার্ডির দেওয়া একটা উদাহরণ নেওয়া যাক : এক রোগিনীর গায়ে চিকিৎসক তাঁর হাতের মধ্যে লুকানো আলপিন ফুটিয়ে দিলেন। পরের বার তিনি যখন সেই রোগিনীকে স্পর্শ করতে গেলেন রোগিনী তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে গেল। কারণ জিজ্ঞাসা করলে রোগিনী অস্পষ্টভাবে বললে : "হাতে কখনও কখনও আলপিন থাকে।" রোগিনীকে এটা বোঝান গেল না যে তাকে, একটি অহং হিসাবে, আলপিন ফোটান হয়েছিল। শুধু এইটুকু মাত্র বোঝান গেল যে তার প্রত্যক্ষগত চেতনার ক্ষেত্রে একটা পিন ফোটানর ঘটনা ঘটেছিল। অলীক-কল্পনা নিয়ে ব্যাপৃত থাকলে এই টাইপটি হল অলীককল্পনামূলক পরিদৃশ্যের [panorama] একটি আধার মাত্র, আর সাইক্লোথিমিক হল এক অলীক-কল্পনাধর্মী নেপোলিয়ন, এক নায়ক, এক প্রকাণ্ড "অহং"।

আমরা ইতোমধ্যেই বহির্মুখীনতার কর্মপদ্ধতির সঙ্গে বিজ্ঞানের কর্মপদ্ধতির তুলনা করেছি। আরেকটু এগিয়ে গিয়ে হিষ্টিরিয়ার কর্মপদ্ধতির সঙ্গে

বর্গীকরণমূলক বিজ্ঞানগুলির কর্মপদ্ধতির এবং সাইক্লোথিমিয়ার কর্মপদ্ধতির সঙ্গে নির্ধারণমূলক বিজ্ঞানগুলির কর্মপদ্ধতির তুলনা করব।

একটি কাঙ্ক্ষিত বাস্তবের অনুযায়ী এক বাস্তব যোগান দেওয়ার তাগিদে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত ব্যক্তি তার দেহকে বিকৃত করে। একইভাবে গণিতবিদ বহির্বাস্তবের সর্বত্র একটা ক্রমবিন্যাসকারী, বর্গীকরণকারী, গণিতক্রিয়াকারী [ordering classifying, operating] অহং-য়ের "কল্পনা করেন"। কিন্তু ঠিক যে কারণে গণিতবিদের কাছে এই বহির্বাস্তব সামাজিক, প্রকৃত এবং সেই কারণে সচেতন, সেইজন্য এই অহং যা এইভাবে গণিতক্রিয়া করে তা হল অচেতন, বিমূর্ত এবং বিকৃতিসাধনকারী বা পরিবর্তনকারী কোনও বিষয়ীভাব বিবর্জিত।

সাইক্লোথিমিক তার "অসুবিধা" অনুযায়ী কোনও উপযোজনে পৌঁছাতে হলে এমন কি তার অহং-য়ের উপর নিয়ন্ত্রণও হারিয়ে ফেলে। ফলে তার প্রত্যক্ষগত ক্ষেত্রে সর্বত্র তার ভ্রান্তিগুলি তার দিকে তাকিয়ে থাকে। একইভাবে জীববিজ্ঞানবিদ্ বা সমাজবিজ্ঞানবিদ্ এক অহং-য়ের কল্পনা করেন যা নির্বাচিত বাস্তবের ক্ষেত্রটিতে সর্বত্র নিষ্ক্রিয়ভাবে পর্যবেক্ষণকারী লক্ষ্যকারী ও অনুভবকারী। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের ক্ষেত্রে যেহেতু এই বহির্বাস্তব হল সামাজিক, প্রকৃত ও সচেতন, যে অহং এইভাবে পর্যবেক্ষণ করে সেটিও বিষয়ীগত বা ব্যক্তিগত পক্ষপাত বর্জিত হয়—সেটি হল মূর্ত বাস্তবের সব কিছু পর্যবেক্ষণকারী নিরপেক্ষ চক্ষু, যা যে গুণটিতে তার আগ্রহ সেটিকে তখনও সর্বত্র প্রসারিত করে রাখে।

একইভাবে, যেহেতু আমরা অন্তর্মুখীনতার কর্মপদ্ধতির সঙ্গে শিল্পের কর্মপদ্ধতির তুলনা করেছি সেইজন্য আরও এগিয়ে গিয়ে সাইক্যাসথেনিক নিউরোসিসের কর্মপদ্ধতির সঙ্গে কাব্যের কর্মপদ্ধতির এবং স্কিজোফ্রেনিয়ার কর্মপদ্ধতির সঙ্গে উপন্যাসের কর্মপদ্ধতির তুলনা করব। নিউরোসিসগ্রস্ত ব্যক্তি সামাজিক পরিবেশের জায়গায় একটা বিশেষ ব্যক্তিগত পরিবেশ স্থাপিত করে যেটি তার বিষয়ীগত অসুবিধাগুলিকে "ব্যাখ্যা করে।" সে তার নিজের বাসনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটা অবাস্তব পরিবেশ গড়ে তোলে। কবি অবশ্য তাঁর আবেগোদ্দীপক ও অভিজ্ঞতার "অহং"-য়ের জায়গায় এক অধিকতর বাস্তব ও সামাজিক "অহং-কে" স্থাপিত করেন। কবি তাঁর নিজের অহংকে সামাজিক অহং-য়ের মধ্যে পুরাপুরি প্রবেশ করানর জন্য জোর করেন এবং এক নকল "উপযোজিত" বাহ্যিক জগৎ গড়ে তোলেন, কিন্তু সেটা বিপরীত কারণে। তার ফলে, আগেই আমরা দেখেছি, সব কাব্যই সামাজিক "অহংকে" কেন্দ্র করে আবর্তিত।

ক্যাটাটোনিক ব্যক্তি অবশ্য তাঁর জগৎকে এমন কি এক নিদারুণ অসুবিধা-

জনক পরিস্থিতিময় বাস্তব জগৎও করে তোলে না। সমাজ থেকে বাস্তব জগৎটাই পুরাপুরি লোপ পেয়ে যায়। এবং ক্যাটাটোনিক ব্যক্তির জগৎ একটি "অহং-সংগঠিত" পরিবেশগত বিষয়বস্তুর জগৎ, এক অহং-সৃষ্ট মূর্ত-প্রত্যক্ষের গুচ্ছের সঙ্গে সমাপতিত [coincident] হয়ে ওঠে। ঔপন্যাসিক কিন্তু তাঁর "অহংকে" কেবলমাত্র একটা সামাজীকৃত মানবিক অহং-য়ের সঙ্গেই যে সমাপতিত করান (একইভাবে কবি তাঁর নিজের "অহংকে" বিশেষ অসুবিধাজনক পরিস্থিতির মধ্যে থাকা এক "অহং" থেকে সমস্ত মানবিক পরিস্থিতির মধ্যে থাকা এক "অহং" পর্যায়ে উন্নীত করেন), তাই নয়, সমাজের স্বতন্ত্রীকরণ দ্বারা বিকশিত মূর্ত "অহংগুলির" সঙ্গেও তাকে সমাপতিত করান। সেইজন্যই কাব্যে যেমন তার সমস্ত বিষয়বস্তু একটি "অহং"-য়ের চারপাশে বিন্যস্ত দেখা হয় উপন্যাসকে সেরকমভাবে দেখা হয় না। উপন্যাস একটা বিষয়গত জগৎ হয়ে ওঠে, যে জগৎটি আপাতঃদৃষ্টিতে বাহিরে থেকে নিরীক্ষণ করা সমাজের একটা নির্বাচিত অংশ, ঠিক যেমন একটা আপাতঃবিষয়গত প্রত্যক্ষের জগৎ করে তোলার জন্য ক্যাটাটোনিক ব্যক্তির "অহংকে" প্রসারিত করা হয় সেই রকম।

আদিম সমাজে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত ও সাইকোথিমিক (নৃতত্ত্ববিদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী) অনেক বেশি সংখ্যায় দেখতে পাওয়া যায় কেন? কারণ তাদের আদিম অপৃথকীকৃত অবস্থায় অহং বা বিষয়ীগত বাস্তবের থেকে পরিবেশ বা বিষয়গত বাস্তব তীব্র মানসিক চাপের কারণ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা এবং "নিরাময়াত্মক" অলীককল্পনার প্রয়োজন অনেক বেশি দেখা দেয়। সরল সামাজিক পরিবেশের চাহিদার সঙ্গে আদিম মানুষ দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে। তাদের বিবেক থাকে পরিষ্কার এবং প্রতিপত্তিসম্পন্ন। মতাদর্শের বিকাশ এবং শ্রেণী বিরোধিতার উদ্ভবের ফলে বিবেকের মধ্যকার ভাঙন [cleavage] থেকে আধুনিক সমাজের ছিন্ন অহং এবং দমিত সত্তার উৎপত্তি হয়। সাইক্যাসথেমিক নিউরোসিস একটা বিশিষ্ট বুর্জোয়া ব্যাধি. রিভার্সের মতে যুদ্ধের সময় সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে হিস্টিরিয়া বেশি দেখা যেত ; অফিসারদের মধ্যে সাইক্যাসথেমিক নিউরোসিসটাই ছিল বেশি। এটা সেই শ্রেণীর অসুখ যে শ্রেণীটি সমাজ বিভক্ত হয়ে যাওয়ার কারণে বহির্বাস্তব থেকে দূরে গিয়ে সচেতনতার দিকে বেশি সরে গেছে। সেইরকম হিস্টিরিয়া হল সেই শ্রেণীর ব্যাধি যে শ্রেণীটি সচেতনতা থেকে দূরে গিয়ে বহির্বাস্তবের উপর গিয়ে পড়েছে। পৃথক হওয়ার দ্বারা চেতনার বিকাশের জন্য শ্রেণীসমাজের বিকাশের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বর্তমানে যা ব্যাধিবিজ্ঞানের দিক থেকে পরস্পরের থেকে

বহুদূরে সরে গেছে—সেই চিন্তা ও সত্তা, তত্ত্ব ও প্রয়োগের সংশ্লেষণের জন্ত শ্রেণীহীন সমাজের পুনরাবির্ভাবেরও প্রয়োজন। স্কিজোফ্রেনিয়া হল দর্শন ও ভাববাদের ব্যাধি।

অর্থাৎ যেহেতু একই ধরনের পথে সামাজিক দ্বন্দ্বের একটা নিষ্পত্তি ঘটেছে সেই কারণে যদিও শিল্পগত ও স্কিজোফ্রেনিয়াগত সমাধানের মধ্যে এবং বিজ্ঞানগত ও সাইক্লোথিমিক কর্মপদ্ধতির মধ্যে একটা তদনুরূপতা আছে, তাহলেও তাদের লক্ষ্যটি প্রকৃতপক্ষে বিপরীত। বর্তমান স্বাভাবিকত্বের তুলনায় উন্মাদের পথটি অধিকতর বিভ্রম, অচেতনতা ও একান্ত ব্যক্তিগত জগতের দিকে নিয়ে যায়, আর বিজ্ঞান বা শিল্পগত পথটি নিয়ে যায় অধিকতর বাস্তবতা, সচেতনতা ও জনসাধারণগত দিকে। সেই কারণে ক্যাটাটোনিয়ার ক্ষেত্রে আবেগোদ্দীপকগুলি অবদমিত হয়, শিল্পের ক্ষেত্রে সেগুলি হয় প্রচুর পরিমাণে সচেতন; সাইক্লোথিমিয়াতে অহং হয় "বস্তু" আর বিজ্ঞানে তা হয় প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন।

কারণ এর যা পরিণতি তা হল: সামাজিক সচেতনতা ও বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতার মধ্যে অভিজ্ঞতার দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়ে মানসিকবিকারগ্রস্ত ব্যক্তি চেতনার মধ্যে যেটা দ্বন্দ্বমূলক সেটাকে বর্জন করে, চেতনাকে অপেক্ষাকৃত স্বল্প মাত্রায় সত্য ও সামাজিক এবং অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রায় একান্ত ব্যক্তিগত ও বিভ্রমাত্মক ক'রে সেই দ্বন্দ্বের সমাধান করতে চায়। অপর দিকে বৈজ্ঞানিক বা শিল্পী বিপরীত পথে, অভিজ্ঞতার মধ্যে নতুন জিনিসটাকে সামাজিক চেতনার দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে, চেতনাকে অধিকতর সত্য ও সামাজিক করে তুলে, অপেক্ষাকৃত অল্পমাত্রায় একান্ত ব্যক্তিগত ও বিভ্রমাত্মক ক'রে তার সমাধান করতে চায়। তারা একই ধরনের বাধার সম্মুখীন হয়, কিন্তু যায় বিপরীত পথে। বিজ্ঞান ও শিল্প এই অর্থে "দৈব উন্মত্ততা"। অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে যে দ্বন্দ্ব উন্মাদ ব্যক্তিকে নিয়ে যায় একান্ত ব্যক্তিগত ভুলের দিকে, বৈজ্ঞানিক ও শিল্পীকে তা নিয়ে যায় সর্বসাধারণের সত্যের দিকে। তারা "মানসিক দিক থেকে সুস্থ" [Sane] মানুষের থেকেও বেশি সুস্থ কারণ সুস্থ মানুষেরা তাদের জীবনে কোনও সংঘাত বা দ্বন্দ্ব উপলব্ধি করে না, সৃজনধর্মীভাবে তার নিষ্পত্তি ঘটাবার কোনও সম্ভাবনার সম্মুখীন হয় না। শিল্পী ও বৈজ্ঞানিকের মধ্যে এক মাত্র যা পার্থক্য তা হল এই যে, একজন চেতনা ও জীবনের বিষয়ীগত দিকটিতে আগ্রহী, আর অপরজন বিষয়গত দিকটিতে। একদিকে কবি ও গণিতবিদ, আর অপরদিকে ঔপন্যাসিক ও বিবর্তনমূলক বিজ্ঞানবিদের মধ্যকার একমাত্র পার্থক্য হল এই যে এক পক্ষ সামান্যীকরণ, সমন্বয়সাধন, মানবিক সারবস্তু ও বিমূর্ত

বাস্তবে আগ্রহী আর অপর পক্ষ বিশেষীকরণ, পৃথকীভবন, মানবিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও মূর্ত বাস্তবে আগ্রহী।

শিল্পী ও বৈজ্ঞানিক তাদের সমস্যার নিষ্পত্তি করতে যদিও উন্মাদ ব্যক্তি যে পথে যায় তার বিপরীত দিকে যায় তাহলেও তার অর্থ এই নয় যে তারাও পুরাপুরি সুস্থ। কারণ যে সমস্যাগুলি সামাজিকভাবে বাস্তব সমস্যা ও সমগ্র সমাজের জন্য যার একটা সাধারণ অর্থ আছে, কেবলমাত্র সেই সমস্যাগুলিরই তারা নিষ্পত্তি করতে পারে। শিল্পীর বিষয়ীগত সমস্যা থাকে, বৈজ্ঞানিকের থাকে বিষয়গত সমস্যা, সেগুলির সামাজিক সমাধান সম্ভব নয়; অন্য মানুষের ক্ষেত্রেও এরকম ঘটে থাকে। আবার বিষয়গত সমস্যার সম্মুখীন শিল্পীও বিষয়ীগত সমস্যার সম্মুখীন বৈজ্ঞানিকেরই মতন, দুজনেই সাধারণ মানুষের মতই অসহায় বোধ করে। একথা বলার অর্থ এই যে, যেহেতু বিজ্ঞান ও শিল্প সামাজিক বাস্তবের বিমূর্ত রূপ, সর্বাধিক সামান্যীকৃত ও সারবস্তুগত রূপ, সেইজন্য যে মূর্ত জীবনযাত্রা থেকে তাদের উদ্ভব তার সঙ্গে তাদের হুবহু মিল হতে পারে না; মূর্ত জীবনযাত্রাকে তারা কেবলমাত্র অবিরাম সমৃদ্ধ ও বিকশিত করতে পারে।

ব্যাধিবিজ্ঞান ও প্রতিভার মনস্তত্ত্বের মধ্যে এবং মানসিক সৃষ্টি ও মানসিক ভ্রান্তির প্রক্রিয়ার মধ্যে কোনও সুস্পষ্ট পার্থক্য টানতে মনঃসমীক্ষণবিদ্যা ও সাধারণভাবে মনোবিদ্যা সক্ষম হয় না, যেহেতু তা সচেতন ও অচেতন অলীক কল্পনার মধ্যে কোন কার্যকারণগত পার্থক্য দেখাতে অক্ষম। এই পার্থক্যটা হল সামাজিক পার্থক্য। কিন্তু মনোবিদ্যা বুর্জোয়া মনোবিদ্যা হওয়ার ফলে তা "নাগরিক সমাজের" একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তির ধারণার উপরে উঠতে পারে না; জৈব পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশকে তা পৃথক করতে এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য টানতে পারে না। আর চেতনা হল সামাজিক পরিবেশের একটা ফল। ফ্রয়েডিয় দর্শনে এ থেকে যেসব অসুবিধার উৎপত্তি হয় আমরা পূর্বেই তার আলোচনা করেছি।

অলীককল্পনাগত টাইপের কাটলটা এই জন্যই হয় যে স্বপ্নে, যখন নিষ্ক্রিয় দেহ মূর্ত জীবনযাত্রা থেকে মুক্ত হয়, বাস্তব থেকে বিকৃতি দুটি স্তরে ঘটতে পারে— অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক। স্বপ্ন যখন জাগ্রত জীবনে প্রবিষ্ট করান হয় তখন সেটা সম্ভব হয় না; এইজন্যই উন্মাদরোগের বিশিষ্ট রূপগুলি দেখা যায়।

সেই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে উন্মাদরোগ একবার যখন দেখা দিয়েছে, তখন, একটা স্বাভাবিক প্রকৃতির নিদ্রায় ফিরে আসার তত্ত্বগত সম্ভাবনা দেখা দেয়; যে নিদ্রার মধ্যে আরও একবার ভিতরে উপযোজন ঘটে, কিন্তু আরও ভেজাতামূলক পথে। প্রকৃতপক্ষে হিতকর বিহ্বলাবস্থার [stupor] উপর ম্যাককার্ডি এবং হক্-এর

কাজ থেকে বাতুলতার [psychoses] ক্ষেত্রে আরোগ্যের প্রাথমিক লক্ষণ হিসাবে একটা বিশেষ, দীর্ঘস্থায়ী, গভীর নিদ্রার (বিহ্বল অবস্থা) ক্লিনিক্যাল গুরুত্ব উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। স্পষ্টতঃই তা হলে যে সব একান্ত ব্যক্তিগত সংঘাত দিনের বেলায় উদ্ভূত হতে থাকে আর রাত্রে একান্ত ব্যক্তিগতভাবে যার "সমাধান" হতে থাকে সেই সব সংঘাতের সমাধানের ক্ষেত্রে নিদ্রা ও স্বপ্ন একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই কারণেই আবার নিদ্রাহীনতার, উন্মাদরোগ দেখা দেওয়ার লক্ষণ হিসাবে যা স্বীকৃত, তাৎপর্য এবং সেই কারণেই আবার ব্রোমাইড ও নিদ্রা-সঞ্চারী ঔষধের আরোগ্যজনক গুরুত্ব।

আমরা যেভাবে "মনোবিদ্যাগত টাইপগুলিকে" আলাদা আলাদা করে চিহ্নিত করেছি স্বাভাবতঃই তাতে এই বিষয়ের উপর ইয়ুঙের বিখ্যাত আলোচনার কথা মনে আসে। আমাদের তৈরি এই শ্রেণীবিভাগ তাঁর তৈরি শ্রেণীবিভাগের সঙ্গে কতটা মেলে?

ইয়ুঙের সর্বপ্রথম শ্রেণীবিভাগটি ছিল বহির্মুখীকৃত টাইপ আর অন্তর্মুখীকৃত টাইপ। মোটের উপর আমাদের তৈরি শ্রেণীবিভাগটি তাঁর শ্রেণীবিভাগের সঙ্গে মেলে—বহির্মুখীনতা বাহ্যিকতা, প্রত্যক্ষ ও বিষয়ের মূল্যায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তা ক্রিয়াতেই হোক বা চেতনাতেই হোক; এবং অন্তর্মুখীনতা, অভ্যন্তরিণতা, অনুভূতি, বিষয়ীর মূল্যায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—চেতনায় বা ক্রিয়ায়।

অবশ্যই তার অর্থ এই নয় যে অন্তর্মুখী মানুষ মূলতঃ সহানুভূতিসম্পন্ন; বরং বিপরীতভাবে অন্যের অনুভূতি নয়, তার নিজের অনুভূতিরই সে মূল্য দেয়। বহির্মুখী মানুষই সহানুভূতিসম্পন্ন, কিন্তু সেই অগভীর অনুভূতির দুর্বলতা তার মধ্যেও থাকে।

ইয়ুঙ এই শ্রেণীবিভাগকে যথেষ্ট মনে করেননি এবং সেইজন্য বিষয়ী বা বিষয়ের মূল্যায়ন-নিরপেক্ষভাবে তিনি চারটি ক্রিয়াকে নির্দিষ্ট করেছিলেন। এই ক্রিয়াগুলির মধ্যে দুটি হল যুক্তিভিত্তিক—অনুভূতি ও চিন্তন, এবং দুটি হল অযুক্তিভিত্তিক ইন্দ্রিয়ানুভব ও স্বজ্ঞানুভব। যে কোন টাইপের একটি প্রধান ক্রিয়া ও ভিন্ন প্রকৃতির একটি গৌণ ক্রিয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, একটা যুক্তিভিত্তিক ক্রিয়াকে কেবলমাত্র একটা অযুক্তিভিত্তিক ক্রিয়াই সাহায্য করতে পারে এবং তার বিপরীতটাও হতে পারে। সমস্ত মানুষের মধ্যে এই চারটি ক্রিয়াই থাকে এবং সেইজন্য স্বতন্ত্রীকরণ হল একটি ক্রিয়াকে খর্ব করে অপর ক্রিয়াটির বিকাশ—এর অর্থ এই যে, যে ক্রিয়াগুলি ব্যবহৃত হয় না সেগুলি অচেতন স্তরের তলায় চলে যায়। এইভাবে একজন চিন্তনকারীর ক্ষেত্রে অনুভূতি ডুবে যায় অচেতন স্তরের নীচে এবং সেই

অনুযায়ী তা বর্বর ও স্থূল হয়ে ওঠে। এইখানে সেটা একটা ক্ষতিপূরক প্রভাব বিস্তার করে এবং কালক্রমে শক্তিলাভ করতে পারে—প্রথমে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে ও পরে সম্পূর্ণভাবে—যে পর্যন্ত না সেটি প্রধান ক্রিয়া হয়ে উঠছে, এবং তখন দেখা দেয় এনানসিওড্রোমিয়া [enantiodromia], ব্যক্তিত্বের এক ধরনের রূপান্তর বা সম্পূর্ণ বিপরীত রূপ গ্রহণ, যেমন নিরুত্তাপ, খৃষ্টানবিদ্বেষী দল যখন পলের মত উৎসাহী শিষ্য হয়ে যান বা যখন গুরুগম্ভীর গনিতবিদ হয়ে যান এক ক্রুদ্ধ খেদোন্মত্ত মানুষ।

এখন ইয়ুঙের প্রচুর অভিজ্ঞতা ও সূক্ষ্ম মন এই শ্রেণীবিভাগকে বিরাট মূল্য ও গুরুত্ব দিয়েছে। চেতনার অর্থ সম্পর্কে ইয়ুঙের জ্ঞানবিদ্যাগত বিভ্রান্তির কারণে এটা অবশ্য অসংবদ্ধ হয়ে গেছে। অনুভূতি ও চিন্তনের মধ্যে ইয়ুঙ যে পার্থক্য টেনেছেন আমি সেটাকে তত্ত্ব ও প্রয়োগের বিচ্ছেদ বলে মনে করি। চিন্তনকারী বহির্মুখী হল তত্ত্বগত বহির্মুখী, চিন্তাজগতের মানুষ; অনুভবকারী বহির্মুখী হল প্রয়োগগত বহির্মুখী, কর্মজগতের মানুষ। অনুভবকারী অন্তর্মুখী হল তত্ত্বগত অন্তর্মুখী এবং চিন্তনকারী অন্তর্মুখী হল প্রয়োগগত অন্তর্মুখী। অবশ্য এটাও ঠিক যে অন্তর্মুখীও বহির্মুখী এবং তত্ত্ব ও প্রয়োগ দুই-ই বিষয় ও বিষয়ী সম্পর্কে তাদের ভিন্ন ভিন্ন মূল্যায়নের দ্বারা সাপেক্ষীভূত—সেই কারণেই তত্ত্ব ও প্রয়োগে ক্রিয়াগুলির আপাতঃ বৈপরীত্য। এবং সেইজন্যই মনোবিদ্যাগত টাইপগুলি নির্ধারণের জন্য অন্তর্মুখিনতা ও বহির্মুখীনতাকে সমগ্র-পর্যাপ্ত [all-sufficient] ধরে নেওয়াটা ইয়ুঙের প্রারম্ভিক ভুল। পরে এই ভুলটি শুধরিয়ে নেওয়া হয়। কিভাবে এই ক্রিয়াগুলির বৈপরীত্য ঘটে তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় অলীককল্পনার দ্বিমুখিনতা (একই ধরনের প্রয়োগের দ্বিমুখিনতা যার সঙ্গে তুলনীয়) সম্পর্কে আমাদের বিশ্লেষণ থেকে।

"ইন্দ্রিয়ানুভব" ও "স্বজ্ঞানুভবে"র ["sensing" and "intuiting"] ব্যাপারে কি বলব? ইয়ুঙের মতে ইন্দ্রিয়ানুভব হল অচেতন উপলব্ধিমূলক ক্রিয়ার সাহায্যে বাহ্যিক প্রতিভাসের গুণগ্রহণ, আর "স্বজ্ঞানুভব" হল অচেতন উপলব্ধি-মূলক ক্রিয়ার সাহায্যে অভ্যন্তরীণ প্রতিভাসের গুণগ্রহণ।

আমার মনে হয় ইয়ুঙ এখানে একটা জ্ঞানবিদ্যাগত বিভ্রান্তির মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন। তাঁর টাইপগুলি বাস্তব কিন্তু তাদের কর্মপদ্ধতিটা ভুলভাবে বোঝা হয়েছে। ইন্দ্রিয়ানুভব ঠিক অযুক্তিভিত্তিক অনুভূতি নয়, কিন্তু তাদের মধ্যকার সম্পর্কটি হল কাব্য ও উপন্যাসের মধ্যকার সম্পর্কটির সমান। ইন্দ্রিয়ানুভব সচেতন কিন্তু কাব্যধর্মী, সেটা হল সামান্যীকৃত অনুভূতি; সাধারণ সহজপ্রবৃত্তিগত

অহং-য়ে পর্যবসিত এই-দিকধর্মিতা [this-sidedness]। অনুভূতি হল সচেতন কিন্তু মূর্ত ; সেটা স্বতন্ত্রায়িত ইন্দ্রিয়ানুভব, যে ইন্দ্রিয়ানুভবকে বিশেষ পৃথিকীভূত অহং-য়ের মর্যদা দেওয়া হয়েছে। এইভাবে ইন্দ্রিয়ানুভব অনুভূতির থেকে বেশি আদিম। অনুরূপভাবে স্বজ্ঞানুভব অ-যুক্তিভিত্তিক চিন্তন নয়, কিন্তু তাদের মধ্যকার সম্পর্কটি গণিত ও জীববিদ্যার মধ্যকার সম্পর্কটির সমান। স্বজ্ঞানুভব হল সচেতন কিন্তু গাণিতিক ; তা হল সাধারণীকৃত চিন্তন, পরিমাণের বিমূর্ত সাধারণধর্মিতায় পর্যবসিত অপর দিকধর্মিতা। চিন্তন হল সচেতন কিন্তু মূর্ত ; তা হল বিশেষীকৃত স্বজ্ঞানুভব, যে সজ্ঞানুভবকে গুণগত ক্ষেত্রের বিষয়বস্তু দেওয়া হয়েছে। এইভাবে সজ্ঞানুভব হল অনুভূতির থেকে বেশি আদিম।

গল্প ও বিবর্তনমূলক বিজ্ঞানগুলির পূর্বেই কেন যে কাব্য ও গণিত আমাদের জাতির [race] ইতিহাসে আবির্ভূত হয়েছিল তার ব্যাখ্যা পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। একইভাবে ইন্দ্রিয়ানুভব ও স্বজ্ঞানুভব হল চিন্তনের প্রাচীনতম রূপ—তা হল আদিম সমাজের নেতা, ভবিষ্যদ্বক্তা, কবি ও আইনপ্রণেতাদের যুক্তি।

অর্থাৎ, বহির্মুখীনতা, যাতে বিষয়কে মূল্য দেওয়া হয়েছে এবং অন্তর্মুখীনতা, যাতে বিষয়ীকে মূল্য দেওয়া হয়েছে—এই দুইয়ের মধ্যে ইয়ুঙ যে পার্থক্য টেনেছেন তার গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা মোটামুটি একমত। তিনি যে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন সেটার সঙ্গেও আমরা একমত। তিনি বলেছেন যে, কোনও একটি টাইপ কোনও কোনও ক্রিয়ার ক্ষেত্র সম্পর্কে অন্তর্মুখীকৃত হতে পারে এবং অন্য-গুলির সম্পর্কে তা বহির্মুখীকৃত হতে পারে, এবং সেই টাইপের জীবন পথে এটার পরিবর্তন ঘটতে পারে। সেই কারণে এমন কি জীবনের প্রতি তার মনোভাবের মধ্যেও একটি টাইপের প্রবহমানতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য থাকে। বুদ্ধির [intelli-gence] মধ্যে দুটি উপাদানের অস্তিত্ব সম্পর্কে স্পিয়ারম্যানের ধারণাটিই ধরা যাক—তিনি একটি উপাদানকে বলেছেন জি [g], সমস্ত ক্ষেত্র সম্পর্কে প্রযোজ্য একটি সাধারণ ভাণ্ডার, আর অপর উপাদানটি হল এস [s], একটি বিশেষ ক্ষমতা, একটি ক্ষেত্রে যা সীমাবদ্ধ—জি-ই যে কেবল তার "প্রতিন্যাস" এবং তার পরিমাণের দিক থেকে পরিবর্তনশীল হতে পারে তাই নয়, বিভিন্ন এস উপাদানগুলিও প্রতিন্যাস ও পরিমাণের দিক থেকে পরিবর্তনশীল [vary] হতে পারে।

ইয়ুঙের সঙ্গে আমাদের বিশ্লেষণের তিন দিক থেকে পার্থক্য :

(১) জীবনের প্রতি তত্ত্বগত ও প্রয়োগগত দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য তিনি স্বীকার করেন নি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষ তত্ত্বধর্মী হয়, কোন কোনটিতে সে প্রয়োগধর্মী হয় এবং অন্য কোন কোন ক্ষেত্রে যে সে এক ভারসাম্যযুক্ত ঐক্য দেখায়

এই পার্থক্য তিনি স্বীকার করেন নি। কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষ যত বেশি বিশুদ্ধ তত্ত্বধর্মী হয়, অন্য কোন কোন ক্ষেত্রে তার বিশুদ্ধ প্রয়োগধর্মী হওয়ার সম্ভাবনা ততবেশি হয় এবং এদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে যাওয়ার ফলে তত্ত্ব ও প্রয়োগ দুই-ই একটা বিশেষ স্থূল আদিমতা প্রকাশ করে যেটা সে দুটি যখন একটি সক্রিয় সমগ্র হয়ে দেখা দেয় তখন যে ধরনের গুণসম্পন্ন মনে হয়, তার থেকে অন্য ধরনের গুণসম্পন্ন বলে দেখাতে পারে। চিন্তনকারী ও স্বজ্ঞানুভবকারী বহির্মুখী এবং অনুভবকারী ও ও ইন্দ্রিয়ানুভবকারী অন্তর্মুখী ব্যক্তিরা হল প্রধানতঃ তত্ত্বধর্মী, যেহেতু তাদের জীবনযাত্রার আচরণ বিষয়ের এমন এক মূল্যায়নকে প্রকাশ করে যেটা তাদের অলীককল্পনাগত মূল্যায়নের বিপরীত এবং একইভাবে অনুভবকারী ও ইন্দ্রিয়ানুভব-কারী বহির্মুখী এবং চিন্তনকারী ও স্বজ্ঞানুভবকারী অন্তর্মুখী ব্যক্তিদের জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীটা প্রধানতঃ প্রয়োগধর্মী।

(২) ইন্দ্রিয়ানুভব ও স্বজ্ঞানুভবকে ইয়ুঙ অনুভব ও চিন্তনের যেন কিছুটা অচেতন রূপ হিসাবে দেখেন, যদিও অ যুক্তিভিত্তিক শব্দটি ইয়ুঙ ব্যবহার করেন। কিন্তু গাণিতিক যুক্তির ভিত্তি যে "স্বজ্ঞানুভবের" উপর সেই স্বজ্ঞানুভবকে অ-যুক্তিভিত্তিক বলা যায় না। অবশ্যই "স্বজ্ঞানুভব" শব্দটি যেটি প্রমাণ করতে হবে সেটাই ধরে নিয়েছেন এবং গণিত সম্বন্ধে পৌয়াকারে পন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গীটি সঠিক এবং পিয়ানো ও রাসেলের সংখ্যাবিদ্যা তত্ত্বটি [logistic theory] ভুল এই ইঙ্গিত অবশ্যই করা হচ্ছে না। স্বজ্ঞানুভব শব্দটি প্লাতনিক অর্থে প্রয়োগ করা হচ্ছে না। যে বিমূর্ত সামান্যীকরণের দৃষ্টিভঙ্গী তর্কশাস্ত্র এবং অপেক্ষাকৃত আদিমতর সমাজের বৈশিষ্ট্য এই শব্দটি দিয়ে কেবল মাত্র সেই ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হচ্ছে— এবং অ-যুক্তিভিত্তিক হওয়া দূরে থাক এটা যুক্তিভিত্তিক এই দিক থেকে যে এটি প্রয়োগের বিপরীতে যুক্তির জয়গানের দিকেই নিয়ে যায় (যেমন—প্লাতনিজম, স্কলাস্টীসিজম ও বৌদ্ধ দর্শনে ঘটেছে)।

(৩) সচেতনতা ও অচেতনতার কোনও যথোপযুক্ত সংজ্ঞা ইয়ুঙ দেননি। তিনি শুধু "মানসগত শক্তি" [Psychic energy] হ্রাসের কথা বলেছেন যা অচেতন বিষয়বস্তুকে প্রারম্ভিক মূল্যের নীচে তলিয়ে দেয়। এই স্থূল ও অনুপযোগী তত্ত্বের জায়গায় আমরা সচেতন বিষয়বস্তুর বিসামাজিকীকরণের ধারণা গ্রহণ করেছি। এই সচেতন বিষয়বস্তু মূর্ত জীবনযাত্রার চাপের কারণে হয় অহং-য়ের সঙ্গে না হয় পরি-বেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই চাপ সেগুলিকে অচেতন এবং সেই অনুযায়ী সুপ্রাচীন-পন্থী ও শিশুসুলভ করে তোলে।

জীবনে আমার চেতনার সঙ্গে যদি প্রকৃত বহির্বাস্তবের সংঘাত ঘটে তাহলে

আমি তাকে সক্রিয়ভাবে ও প্রকৃতপক্ষে পরিবর্তিত করতে পারি। খেতে না পেলে আমি খাদ্য সংগ্রহ করতে পারি; যদি খুব শীত করে তাহলে শীতবস্ত্র পরতে পারি। এই ধরনের সক্রিয় পরিবর্তন বা প্রয়োগ থেকে বিজ্ঞানগত অলীককল্পনার জন্ম, এবং সেটা অন্তর্মুখীনতা হলেও তা হল বহির্মুখীকৃত অন্তর্মুখীনতা—বহির্বাস্তবকে পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে অন্তর্মুখীনতা। এটা তার মূল্য, উদ্দেশ্য এবং সৃজন পদ্ধতিকে পরিবর্তিত করে। যে জীবনাভিজ্ঞতার সঙ্গে বর্তমান বিজ্ঞানগত চেতনার দ্বন্দ্ব ঘটে এবং তার পরিবর্তন দাবী করে তা সর্বদাই পরিবর্তনশীল বিষয়গত বাস্তবের অভিজ্ঞতা। প্রকৃতির পরিবর্তনসাধনের জন্য মানুষের প্রচেষ্টাকে পরিচালিত করার দ্বারা প্রকৃতিকে জানার একটা বিমূর্ত পদ্ধতি হিসাবে বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটে।

কিন্তু জীবনে আমার চেতনার সঙ্গে আমার সামাজিক অহং-য়ের যদি সংঘাত ঘটে, তাহলে আমি নিজেকে সক্রিয়ভাবে এবং প্রকৃতপক্ষে পরিবর্তিত করতে পারি। বিভিন্ন জিনিস আমি চাইতে পারি—আমার বর্তমান জীবনে অন্যান্য যে সব পথ খোলা আছে সেই পথে আমার সহজ প্রবৃত্তিকে তৃপ্ত করতে পারি—যেমন ধরুন বিভিন্ন শিল্পকর্মের সাহায্যে। তখন বিষয় সম্পর্কে আমার একটা আগ্রহ থাকে যেটা হল অন্তর্মুখীকৃত—সেটা হল আমার নিজের অহংকে পরিবর্তিত করার উদ্দেশ্যে বহির্মুখীনতা। অহং-য়ের এই পরিবর্তনই হল শিল্পকর্মের মূল্য, উদ্দেশ্য এবং সৃজনপদ্ধতি। জীবনের যে অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমার বর্তমান অহং-য়ের দ্বন্দ্ব ঘটে এবং তার, অর্থাৎ অহং-য়ের পরিবর্তন দাবি করে তা হল সর্বদাই আমার চাহিদাগুলি পূরণের পথে, অর্থাৎ নিজেকে পরিবর্তনের পথে যে অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হই সেই অভিজ্ঞতা। শিল্প বিকশিত হয় কতকগুলি বিষয়ের একটা মূর্ত সমষ্টি হিসাবে, একটা নকল জগৎ হিসাবে, যার দ্বারা মানুষ নিজেকে পরিবর্তিত করে এবং সেই পরিবর্তনের পথে নিজেকে জানতে পারে। শিল্পের পদ্ধতি [method] হল বিজ্ঞানের পদ্ধতির উল্টাপিঠটা। একটি কর্ম করার জন্য জানে, আরেকটি অনুভব করার জন্য কর্ম করে। একটি পথে মানুষ বহির্বাস্তবকে পরিবর্তিত করার উদ্দেশ্যে নিজেকে পরিবর্তিত করে, অপরটিতে নিজেকে পরিবর্তিত করার উদ্দেশ্যে বহির্বাস্তবকে পরিবর্তিত করে। পরস্পরের কাছে দুটিরই প্রয়োজন, কারণ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দুটি পরিবর্তনের সীমাই প্রয়োজনের দ্বারা স্থাপিত। বর্তমান চেতনাকে নিয়ে কাজ ক'রে মানুষ বাস্তবকে পরিবর্তিত ক'রে নতুন রূপ দেয়। বর্তমান রূপকে নিয়ে কাজ ক'রে মানুষ চেতনাকে পরিবর্তিত ক'রে। প্রথমটি হল বিজ্ঞানের সৃজনশীল প্রয়োগের রূপ, দ্বিতীয়টি হল শিল্পের সৃজনশীল প্রয়োগের। ভূমিকাগুলিকে বিপরীত করে দিলে আমরা পাই বিজ্ঞানের সৃজনশীল তত্ত্বের রূপ, এবং শিল্পের সৃজনশীল তত্ত্বের রূপ।

তত্ত্বের সঙ্গে প্রয়োগের সম্পর্কটিকে এইভাবে না বোঝার ফলে অন্তর্মুখীনতার এক সংজ্ঞা থেকে অন্য সংজ্ঞায় ইয়ুঙ যে চলে যাচ্ছেন তা তিনি উপলব্ধি করতে পারেন না।

অন্তর্মুখীনতার ক্ষেত্রে, অর্থাৎ তত্ত্বের ক্ষেত্রে চিন্তন ও স্বজ্ঞানুভব হল প্রয়োগ-গত ক্রিয়া—যে ক্রিয়া চিন্তাকে বহির্জগতের চারদিকে বিন্যস্ত করে। প্রয়োগের ক্ষেত্রে, বহির্মুখীনতার ক্ষেত্রে সেগুলি হল জগৎ-পরিবর্তনকারী কর্ম, [action] প্রত্যক্ষলব্ধ বাস্তবকে পরিবর্তনকারী কর্ম। অন্তর্মুখীনতার ক্ষেত্রে, অর্থাৎ তত্ত্বের ক্ষেত্রে অনুভব ও ইন্দ্রিয়ানুভব হল তত্ত্বগত ক্রিয়া [theoretical functions] —যে ক্রিয়া চিন্তাকে অহং-য়ের চারদিকে বিন্যস্ত করে। প্রয়োগের ক্ষেত্রে, বহির্মুখীনতার ক্ষেত্রে সেগুলি হল আত্ম-পরিবর্তনকারী অর্থাৎ আত্ম-সন্তোষ-বিধানকারী বা আত্মপ্রকাশকারী কর্ম [actions], যে কর্ম অহংকে তৃপ্ত করে। এই জটিল সম্পর্কই টাইপের জটিলতা সৃষ্টি করে। কারণ কোনও মানুষই একভাবে জীবন ধারণ করে না, অলীককল্পনা ও কর্মের মধ্যকার সম্পর্ক কোন মানুষেরই একই রকম থাকে না। সেই কারণে ইয়ুঙের চিন্তনকারী ও স্বজ্ঞানুভবকারী বহির্মুখীরা "তত্ত্বের" লোক, বিজ্ঞানের জগতের লোক, যখন তাঁর চিন্তনকারী ও স্বজ্ঞানুভব-কারী অন্তর্মুখীরা হল কর্মের জগতের লোক, রহস্যজনকভাবে প্রয়োগের ক্ষেত্রের লোক। তাঁর বহির্মুখীকৃত ইন্দ্রিয়ানুভবকারী ও অনুভবকারী লোকেরা হল প্রয়োগের ক্ষেত্রের লোক, স্পৃহাধর্মী বা ইন্দ্রিয়পরায়ণ-লোক, এবং তাঁর অনুভব-কারী ও ইন্দ্রিয়ানুভবকারী অন্তর্মুখীরা হল তত্ত্বের ক্ষেত্রের লোক, অতীন্দ্রিয়তাবাদী ভবিষ্যদ্বক্তা বা কবি।

অচেতন স্তরের "ক্ষতিপূরক" ভূমিকা সম্পর্কে ইয়ুঙের বিভ্রান্তির উৎসও একই। একটা ক্রিয়া অচেতন হয়ে যায় একথা বলার অর্থ সেটি বিসামাজিকীকৃত হয়ে যায় বলা। সচেতন বিষয়বস্তুর দ্বারা অবদমিত বা প্রতিহত হয়ে ইয়ুঙের ক্রিয়াগুলির "অচেতন স্তরের মধ্যে তলিয়ে যাওয়াটা" মানুষের নিজের মধ্যে সামাজিক অহং বা সামাজিক বাস্তবের পরস্পরের সঙ্গে সংঘাতগুলির অংশগুলিকে খুঁজে পাওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। নিজের জীবনাভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উপলব্ধ নিজের সম্পর্কে মানুষের সচেতনতার সঙ্গে বহির্জগৎ সম্পর্কে তার চেতনার সংঘাত বাধে। আমরা আগেই দেখেছি যে অলীককল্পনার মধ্যে সে নিজেকে দুভাগে উপযোজিত করতে পারে—বহির্জগৎ সম্পর্কে চেতনাকে নিজের অহং-য়ের চারদিকে বিন্যস্ত করে অথবা বহির্জগতের চারদিকে নিজের অহংকে বিন্যস্ত করে।

বহির্জগৎটি যদি তার কাছে প্রধান হয় (চিন্তনকারী, স্বজ্ঞানুভবকারী বহির্মুখীর

কাছে) তাহলে সেই ব্যক্তি তার অহংকে বিসামাজিকীকৃত করবে এবং তাকে বহির্বাস্তবের চারদিকে উপযোজিত করবে যাতে সেটা বিষয়ীগতভাবে বিকৃত হয়ে ওঠে ; যাতে করে সেটি সম্পর্কে তার সমগ্র ধারণাটি এবং সেই সম্পর্কে তার মূল্যায়নটি মিথ্যা হয়ে ওঠে। অন্যভাবে বলতে গেলে, অনুভবকারী দিকটি বা ইন্দ্রিয়ানুভবকারী দিকটি একটি অচেতন ও সুপ্রাচীনপন্থী ক্রিয়া(archaic function) হয়ে উঠবে ;সেটা বিসামাজিকীকৃত এবং সেই কারণে সহজপ্রবৃত্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠবে। বিষয়গত কর্মের মধ্যে যখন সেটা উদ্ভূত হবে অহংটাকে তখন আমাদের কাছে স্ফীত ও অনুভূতিতে পূর্ণ বলে মনে হবে। কিন্তু যেহেতু সেটি এই রকম বন্য সহজপ্রবৃত্তিগত ভাবে কর্মের মধ্যে উদ্ভূত হবে, সেই কারণে অহং-য়ের বিষয়ীগত বিষয়বস্তুটি হবে খুবই অল্প। বাতুল [maniac] গভীরভাবে অনুভব করে না ; কিন্তু সে একটা পরাক্রমশালী অতিরাগের বশবর্তী মানুষের মত কাজ করে। যেহেতু তার মধ্যে আত্ম সম্পর্কে সেই সচেতনতা যা বাস্তবের প্রতি মানুষের প্রতিক্রিয়াকে পরিমিত করে, জটিল করে এবং স্থায়িত্ব দান করে, তার অভাব থাকে। তার প্রতিক্রিয়াটা হল "হয় পুরাপুরি না হয় আদৌ নয়" ধরনের। ইয়ুঙের ক্ষতিপূরক অচেতন হল প্রকৃতপক্ষে অহং-য়ের বিসামাজিকীকরণের দ্বারা অলীককল্পনাতে বহির্মুখীর বাস্তবের সঙ্গে জীবনের উপযোজন এবং বিষয়ীগত অনুভূতি সম্পর্কে একটা অচেতনতা, কর্মের ক্ষেত্রে যার জুড়ি হিসাবে দেখা যায় এক অধিকতর অতিরাগযুক্ত আচরণ, এক folie de grandeur বা অহং-এর এক বন্য স্ফীতি।

এই টাইপটির সঠিক প্রতিক্রিয়াটা হল বিজ্ঞানসম্মত—পরিবেশকে পরিবর্তিত করা এবং ফলে চেতনার মধ্যে বেশি মাত্রায় পরিবেশগত বাস্তবকে প্রবিষ্ট করা। প্রথম পথটি হল বিভ্রমের পথ উন্মাদরোগের পথ, একটা অ-সামাজিক ও অচেতন অহং দিয়ে পরিবেশ সম্পর্কে একটা মিথ্যা সচেতন প্রত্যক্ষে পৌছানর এবং সেই কারণে এক ধ্বংসাত্মক আচরণের পথ। দ্বিতীয়টি হল বিজ্ঞানের পথ বাস্তবের পথ, অহং-য়ের সকৌশল পরিচালনার দ্বারা পরিবেশ সম্পর্কে এক অধিকতর সত্য সচেতন প্রত্যক্ষ সৃষ্টি করার এবং সেই কারণে এক অধিকতর উপযোগী আচরণের পথ। দুটি ক্ষেত্রেই বহির্মুখিনতা ও অন্তর্মুখিনতার চলন জড়িত থাকে।

কিন্তু এক্ষেত্রে "চিকিৎসক মহাশয়, আগে নিজেকে আরোগ্য করুন" এই উপদেশটি খাটে না। নিজের বিশেষ চাপের ফলে সমাজের প্রতি বৈজ্ঞানিকের অবদানটি হল পরিবেশগত বাস্তব সম্পর্কে এক গভীরতর সচেতনতা, নিজের ঐকদেশিকতার আরোগ্যের জন্য এ থেকে তাঁর যেটা প্রয়োজন তা তিনি নিজে

দিতে পারেন না, শিল্পী সেটা দিতে পারেন—সেটা হল বিষয়ীগত সচেতনতা এবং অভ্যান্তরীণ বাস্তব।

একইভাবে অনুভবকারী ও ইন্দ্রিয়ানুভবকারী অন্তর্মুখীর ক্ষেত্রে চেতনা ও বাস্তবের মধ্যকার সংঘাত স্বভাবতঃই অহংকে অধিক মূল্য দেওয়ার ফলে সচেতন প্রত্যক্ষের একটা বিকৃতির রূপ নেয়। তার পরিণতি হল সাইক্যাসথেনিক নিউরোটিক। এই রোগীর মধ্যে থাকে আবেগের অধিকতর সচেতনতা এবং নিজের পরিবেশ সম্পর্কে এক কাল্পনিক স্বাধীনতা, যা বিষয়গত সর্তটিকে অস্বীকার করার ফলে "অসুবিধাজনক পরিস্থিতির" রূপে তার পরিবেশের দাসত্বের দিকে তাকে নিয়ে যায়। তার অহং নয়, প্রকৃতিই তখন হয়ে ওঠে আদিম এবং অনিয়ন্ত্রণযোগ্য, কারণ তা অচেতন হয়ে ওঠে।

এই ধরনের অন্তর্মুখী শিল্পগত উৎপাদনের দিকে চালিত হয়—নিজেকে পরিবর্তিত করার জন্য বহির্বাস্তব সম্পর্কে তার চেতনাকে খর্ব করে নয় বরং সামাজিক চেতনার মধ্যে তার অহং-য়ের অভিজ্ঞতাকে প্রবিষ্ট করিয়ে সে নিজের এই পরিবর্তন ঘটায়। কিন্তু সমাজ সম্পর্কে এই সৃজনশীল কাজটি ব্যক্তিত্বের ঐকদেশিকতায় [Onesidedness] পর্যবসিত হতে পারে; বিজ্ঞান থেকে আহৃত বহির্বাস্তব সম্পর্কে আরোগ্যজনক চেতনার দ্বারাই কেবল মাত্র ব্যক্তিত্বের এই ঐকদেশিক হয়ে পড়াকে সংশোধিত করা যায়।

ভুলভাবে উপযোজিত অন্তর্মুখী বিষয় থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার দ্বারা "প্রকৃতির" সঙ্গে তার যে সংঘাত তা থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে; কিন্তু বিষয় সম্পর্কে তার অচেতনতা তাকে বিষয়ের অন্ধ ক্রীতদাসে পরিণত করে। ভুলভাবে উপযোজিত বহির্মুখী বিষয় থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করে; কিন্তু নিজের সম্পর্কে তার অচেতনাতা তাকে তার নিজের সহজ প্রবৃত্তিরই অন্ধ ক্রীতদাস করে তোলে। এইভাবে এরা নিজেদের শরীরের দ্বারাই প্রমাণ করে যে স্বাধীনতা হল প্রয়োজন সম্বন্ধে সচেতনতা। তত্ত্বের দিক থেকে তারা অহংকে বা জগৎকে অস্বীকার করে, আর প্রয়োগের দিক থেকে তারা এক বন্য বর্বরভাবে সেটাকেই সপ্রমাণ করে—তাদের মধ্যে তত্ত্ব ও প্রয়োগের এই বিচ্ছেদটিতেই তাদের উন্মাদরোগ নিহিত। এইভাবে শিল্প হিস্টিরিয়াগ্রস্তের আরোগ্যের পথ দেখায়, বিজ্ঞান দেখায় নিউরোটিকের। চেতনার সম্পর্কে বিজ্ঞান ও শিল্প হল রোগনিরাময়ের কৌশলমূলক—বিজ্ঞান হল অন্তর্মুখীর, শিল্প হল বহির্মুখীর চিকিৎসার। প্রয়োগগত জীবনের সম্পর্কে তারা হল বাস্তবকে পরিবর্তনকারী; বিজ্ঞান জগতকে পরিবর্তিত করে, শিল্প মানুষকে।

এই দুর্বলতাগুলি বাদ দিলে ইয়ুঙের গবেষণা বাস্তবের অংশ হিসাবে মানব মানসের এক জ্ঞানগর্ভ বিশ্বকোষ, তা হল মূর্ত জীবনযাত্রার মধ্যে মানুষ কি ভাবে তার স্বাধীনতার বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয় বা অক্ষম হয় সেই সম্পর্কে গবেষণা। যে বিশ্বদৃষ্টি সভ্য সমাজে বসবাসকারী একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তির ধারণার স্তরকে ছাড়িয়ে উঠতে পারেনি তার পক্ষে মানস সম্বন্ধে যতখানি গভীর গবেষণা করা সম্ভব ইয়ুঙের গবেষণা তাকেই সূচিত করে।

বিজ্ঞান ও শিল্প হল সমাজের মারফৎ এক ধরনের অলীককল্পনাগত উপযোজনের পথ যাকে কর্মের বাস্তবতা থেকে পৃথক করা সম্ভব নয়, যা সেই উপযোজনের পক্ষের সর্বাধিক বিমূর্ত ও সামান্যীকৃত রূপ। প্রকৃতিকে এবং সেইজন্য নিজেকে পরিবর্তন করার মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ জীবন ধারণ করার মধ্য দিয়ে এই দুটিরই সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞান ও শিল্প আমাদের প্রত্যেককে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের সমস্ত দিক থেকে একটা আশু নেতৃত্ব দেয়—একটা নৈতিকতা ও বোধ [understanding] দুই-ই দেয়। একটা তাগিদ ও একটা উপকরণ দেয় যা কেবল মাত্র সাধারণই নয় বরং আমাদের মূর্ত সম্পর্কগুলির প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমাদের প্রত্যেককে পরিচালিত করে, প্রকৃতিকে এবং আমাদের নিজেদের যে সব কাজের দ্বারা আমরা পরিবর্তিত করি সেই সব কাজের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই যা দিকদর্শকের মত কাজ দেয়। তা না করলে বিজ্ঞান ও শিল্পের কোনও মূল্যই থাকে না। এই তত্ত্ব যা আমাদের প্রতিটি কাজকে পরিচালিত ও প্রণোদিত করে তা যদি প্রতিটি কর্ম থেকে নতুন তত্ত্ব অহরণ করে বিকাশমান একটা জিনিসের মত বেড়ে না উঠতে থাকে তাহলে আমাদের জীবনটা ভুলভাবে চলে। মানুষের কার্যকলাপ হল বিষয়ের মধ্য দিয়ে কার্যকলাপ। "প্রয়োগমূলক, সর্ববিচার-বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপ" থেকে বিজ্ঞান ও শিল্পকে বিচ্ছিন্ন করার অর্থ হল জীবন থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন কর। আর সেটাই হল আধুনিক সভ্যতার ক্রমবর্ধমান প্রবণতা।

আধুনিক সংস্কৃতি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে বেশ ভালভাবেই শিখেছে। এর উত্থানের প্রথম দিকে এ চেষ্টা করেছিল নিজেকে বিষয়ী থেকে বিচ্ছিন্ন করতে, বিষয়ের মধ্যে নিজেক পুরাপুরি নিক্ষেপ করতে। ফলে দেখা গিয়েছিল এলিজাবেথীয় বুর্জোয়া যুগের বস্তু সাইক্লোথিমিক শক্তি। এখন সেটা গিয়ে দাঁড়িয়েছে বিপরীত মেরুতে, হিস্টিরিয়া থেকে সাইক্যাসাথেনিয়াতে এবং যে বিষয়কে সে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না সেই বিষয় থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করতে গিয়ে তা হয়ে উঠেছে প্রয়োজনের ক্রীতদাস। এই দোলাচলতা হল যান্ত্রিক বস্তুবাদ থেকে ভাববাদ এবং সেখান থেকে প্রত্যক্ষবাদ বা পজিটিভিজমের অসহায় সারসংগ্রহবাদে [eclecticism] গিয়ে পৌছান বা আবার বিষয়ী ও বিষয় দুটি থেকেই নিজেকে

বিচ্ছিন্ন করে দুটির উপরেই প্রাধান্য বিস্তার করার চেষ্টা করার ফলে উভয়েরই ক্রীতদাস, কেবল-মাত্র অবভাসেরই [appearence] অসহায় বন্দি হয়ে পড়েছে।

প্রত্যক্ষবাদ কাব্যে স্যুররিয়ালিজমের দিকে আমাদের নিয়ে যায়। কাব্যের স্বপ্ন-নির্মাণ পরিত্যক্ত হয়েছে, বিষয়ী ও বিষয় উভয় থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে—দুটি সম্পর্কেই অচেতন হয়ে এবং সেই জন্য দুটিরই ক্রীতদাস হয়ে,-মানুষ শূন্যে ভাসছে। "অবাধ" অনুষঙ্গ হল অনুকর্মী স্বপ্ন। কাব্যের মধ্যে স্বপ্ন নির্মাণ আর থাকে না, সেটা হয়ে ওঠে স্বপ্ন ; কবি প্রবেশ করে এক হিতকর বিহ্বলতার মধ্যে। হিতকর কারণ আরাগঁ আমাদের বলেছেন যে কবি এই অবস্থায় বিশ্রাম করতে বা পূর্ববর্তী অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করতে পারেন না, আরোগ্যলাভ একমাত্র সম্ভব যদি জয়ী হয়ে সেই জগতে তিনি প্রবেশ করতে পারেন যে জগতে বিষয়ী ও বিষয় আবার হয়ে ওঠে সামাজিক এবং সেই কারণে সচেতন এবং জীবনের সঙ্গে কবির সম্পর্ক আবার হয়ে ওঠে স্বাধীন, বিপ্লবী ও শ্রমশীল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

শিল্পকলার সংগঠন

কাব্য বহির্বাস্তবের একটি খণ্ডকে গ্রহণ করে, তাকে আবেগোদ্দীপকগত সুরে রঞ্জিত করে এবং তা থেকে এমন এক নতুন আবেগগত প্রতিন্যাস পরিস্রুত করে যেটি চিরস্থায়ী নয়, বরং কবিতাটি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটিরও সমাপ্তি ঘটে। কাব্য তার সারধর্মের দিক থেকে এক ক্ষণস্থায়ী ও পরীক্ষামূলক বিভ্রম, কিন্তু মানসের তার উপর প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী। একই ভাষার মধ্যে তা বিজ্ঞানের সঙ্গে অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম। বিজ্ঞানের সারধর্ম হল বিষয়গত বাস্তবের প্রকাশ। কারণ প্রকৃতপক্ষে বহির্বাস্তবের কোনও প্রতিরূপ হল দুটি নির্ণয়বাক্যেরই পূর্ণব্যাপক হেতু [distributed middle]। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্ত্য বাচ্যটি [term] হল বহির্বাস্তব, কাব্যের ক্ষেত্রে তা হল জনিরূপ [genotype]। কাব্যের ক্ষেত্রেই যে এটা বিশেষ ভাবে ঘটে তা নয়, সমস্ত রকম শিল্পেরও এটি সামান্য [general] ধর্ম। কাব্যের যেটা বৈশিষ্ট্য তা হল তার করণকৌশল এবং এই করণকৌশল যে বিশেষ ধরনের আবেগগত সংগঠন সুনিশ্চিত করে সেইটি। যাই হোক কাব্যের বিশ্লেষণ অন্যান্য শিল্পের করণকৌশলের উপরেও আলোকপাত করতে পারে।

শব্দের সাহায্যে অপর যে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পসম্মত সংগঠন সৃষ্টি করা যায় তা হল গল্প। কাব্যের করণকৌশলের সঙ্গে গল্পের করণকৌশলের তুলনা কিভাবে করা যায়?

কোন কবিতায় আবেগোদ্দীপকগুলি শব্দের অনুষঙ্গগুলির সঙ্গে সরাসরি সংলগ্ন হয়ে থাকে। পাঠকের মন যাতে শব্দের আবেগোদ্দীপকগুলি গ্রহণ করার আগে সেই শব্দের অন্তরালে বহির্বাস্তবের যে বর্ণনা থাকে সেইগুলিতে গিয়ে না পৌঁছায় কবিকে সেজন্য সাবধান হতে হয়। গল্পের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি অন্যরকম। গল্প পাঠককে গল্পে বর্ণিত জগতের মধ্যে নিজেকে প্রক্ষেপ করায় [project]; পাঠক সেই দৃশ্যটি দেখতে পান, চরিত্রগুলির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে এবং তাদের দেরি করার, ভুল করার এবং ট্র্যাজেডির অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেন।

গল্প যে অপেক্ষাকৃত ব্যস্ততাহীন চরিত্রের, তার ব্যাখ্যাও পাওয়া যায় এই করণ-কৌশলগত পার্থক্যের মধ্যে। পাঠক কবির সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে ফেলেন। দুজনের কাছেই শব্দগুলি ইতোমধ্যেই আবেগোদ্দীপকে নিষিক্ত হয়ে, বহির্বাস্তবের একটি খণ্ডকে ধারণ করে দেখা দেয়। কিন্তু উপন্যাস বাস্তবের এক নৈর্ব্যক্তিক বর্ণনা।

মাত্র হিসাবেই প্রথমে দেখা দেয়। ঔপন্যাসিক ও পাঠক তার বাইরে থাকে না। কি কি ঘটছে তাঁরা লক্ষ্য করেন। চরিত্রগুলির প্রতি তাঁরা সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠেন। যে সমস্ত পরিচিত দৃশ্য তাঁদের আবেগ উদ্রেক করে সেই সব দৃশ্যের মধ্যেই চরিত্রগুলি ঘোরাফেরা করতে থাকে। মনে হয় তাঁরা যেন একটা জগতের মধ্যে প্রবেশ করে ঘোরাফেরা করছেন এবং তাঁদের নিজেদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করছেন, আর কবি যে জগৎকে উপস্থাপিত করেন সেটা ইতোমধ্যেই আবেগোদ্দীপক-গত বর্ণে নিষিক্ত। কাব্যের পাঠক যেমন কবির সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে ফেলেন, উপন্যাসের পাঠক সেইরকম ঔপন্যাসিকের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ নিজেকে একাত্ম করে ফেলেন না। কবিতার পাঠক যেন মনে হয় কবি যা বলছেন তাই বলছেন, তাঁরই আবেগগুলি অনুভব করছেন। কিন্তু গল্পের পাঠক সেটি লিখছেন বলে মনে করেন না; তিনি যেন তার মধ্য দিয়ে চলেছেন, তার মধ্যেই বাস করছেন বলে মনে হয়। গল্পে সেই কারণে বহির্বাস্তবের অনুষঙ্গগুলির সঙ্গে আবেগোদ্দীপকগত সুর জড়িয়ে থাকে। যে ধ্বনি বহির্বাস্তবের প্রতিরূপ ও আবেগোদ্দীপকগত অনুরণন জাগিয়ে তোলে কবিতা এবং গল্প দুই-ই সেই ধ্বনিকে ব্যবহার করে, কিন্তু কবিতায় ভাষার গঠনের [structure] সাহায্যে আবেগোদ্দীপকগত অনুরণনগুলি সংগঠিত হয়, আর উপন্যাসে সেগুলি সংগঠিত হয় বর্ণিত বহির্বাস্তবের গঠনের সাহায্যে।

সংগীতের ক্ষেত্রে ধ্বনিগুলি কোনও বিষয়ের উল্লেখ করে না। সেগুলি নিজেই বোধের [sense] বিষয়। সেই কারণে আবেগোদ্দীপকগত অনুরণনগুলি সেগুলির সঙ্গে সরাসরি জড়িত থাকে। কবিতার আবেগোদ্দীপকগত অনুরণন যদিও ভাষার গঠনের দ্বারা সংগঠিত হয়, এই গঠনটি নিজে কিন্তু "অর্থের" উপর—অর্থাৎ, উল্লেখিত বহির্বাস্তবের উপর নির্ভর করে। সংগীতের গঠনটি কিন্তু স্বয়ম্ভর; সেটা একটা তর্কশাস্ত্রসম্মত পথে বহির্বাস্তবের উল্লেখ করে না। সেই কারণে সংগীতের গঠনের নিজেরই একটা রীতিমত রূপগত ও ছন্দ-গণিতসম্মত উপাদান থাকে। বাহ্যিক অর্থের তর্কশাস্ত্রগত কঠোরতার জায়গায় দেখা যায় এর স্বরগ্রাম ও স্বরসংগতির [scale and chord] ছন্দ-তর্কশাস্ত্রসম্মত কঠোরতা। এইভাবে সংগীত, কবিতা ও উপন্যাস ধ্বনি-প্রতীকের তিনটি বিভিন্ন ধরনের ভূমিকা [function] দেখা যায়; উপন্যাসে সেটা বহির্বাস্তবের মধ্যকার একটা বিষয়কে বোঝায়; কবিতায় বোঝায় আবেগোদ্দীপকগত অনুরণন ও স্মৃতি-প্রতিরূপসমন্বিত শব্দজাত এক মানস-গত কমপ্লেক্সকে; সঙ্গীতে বোঝায় ছন্দ-বহির্বাস্তবের একটি খণ্ডকে।

বহির্জগতের বিকৃতির সাহায্যে সামাজিক অহং বা বিষয়ীগত জগৎকে শিল্পগত অলীককল্পনার মধ্যে উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু একটা জগৎকে আবেগোদ্দীপকগত

গঠনে বিকৃত করে তুলতে হলে সেই জগতের এমন একটি গঠন থাকা চাই যেটা আবেগোদ্দীপকগত (বিষয়ীগত) হবে না, হবে তর্কশাস্ত্রসম্মত (বিষয়গত)। সেই কারণে দেখা যায় সংগীতের নিয়মগুলি ছন্দ-যুক্তিসম্মত নিয়ম হলেও সেগুলি সামাজিকভাবে স্বীকৃত। ভাষার নিয়মগুলির সঙ্গে এই নিয়মগুলির সাযুজ্য থাকে। ভাষার নিয়মগুলিও সামাজিকভাবে স্বীকৃত, ছন্দ-বিষয়গত এবং কাব্যের দ্বারা বিকৃত হয়। কিন্তু উপন্যাসের দ্বারা ভাষার নিয়মগুলি বিকৃত হয় না। উপন্যাস বিষয়গত বাস্তবের স্থান ও কালকে বিকৃত করে।

তর্কশাস্ত্রসম্মত কোন বহির্জগতের অস্তিত্ব কেবলমাত্র স্থান ও কালের মধ্যেই সম্ভব। সেই কারণে স্থান ও কালের সীমার মধ্যেই সাংগীতিক জগৎ অস্তিত্বশীল। স্থানটি হল স্বরগ্রামের চলন, সুতরাং সুর বা মেলডি স্থানের মধ্যে যেমন একটা বক্র-রেখা বর্ণনা করে সেইরকম কালের মধ্যেও তা স্থায়ী হয়। একটা মেলডি কালের মধ্যে প্রসারিত হলেও, স্থানিকভাবেও তা সংগঠিত। একটা গাণিতিক যুক্তি যেমন কালের মধ্যে "চলমান" [follow on]" হলেও তা স্থির ও পরিমাণগত, সেই রকম একটা মেলডিও কাল-সীমাহীন এবং সর্বজনীনভাবে যুক্তিসিদ্ধ। এটা একটা সামান্যীকরণ, বিজ্ঞানের বর্গীকরণমূলক বিষয়বস্তুর সঙ্গে যা সাযুজ্য সূচিত করে। মূলগতভাবে এ হল বর্ণহীন ও গুণহীন। এটি নিজের যুক্তির সীমানার মধ্য থেকেও অহং থেকে এক সর্বজনীন আবেগগত প্রতিন্যাস আহরণ করে।

হার্মনি সংগীতের মধ্যে একটা কালগত উপাদান নিয়ে আসে। স্থানকে যেমন কালের পরিভাষায় (কতকগুলি পদক্ষেপের এক পরম্পরা) কেবলমাত্র বর্ণনা করা যায়, সেইরকম কালকেও কেবলমাত্র স্থানের পরিভাষায় বর্ণনা করা যায় (একটা পরিদৃশ্যের মত কালের একটা পরিসর বা স্পেস, যেন যুগপৎ বর্তমান, এই রকম কল্পনা করে নিয়ে)। কাল হল গুণের উদ্ভব। অতএব, দুটি গুণ যুগপৎ ধ্বনিত হয়ে কালকে স্থানের পরিভাষায় বর্ণনা করে। বিবর্তনমূলক বিজ্ঞানগুলি যেমন বহির্বাস্তব থেকে জায়মান গুণাবলীর সমগ্র ক্ষেত্রের একটা পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে আসে (তাহলেও এক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই পুরাপুরি বিকশিত হয়েছে এই রকম একটা চোখ যেন সব কিছু দেখতে পাচ্ছে), সেই রকম হার্মনি সংগীতের মধ্যে কালগত সমৃদ্ধি ও জটিলতার এক সমগ্র সমৃদ্ধ ক্ষেত্রকে নিয়ে আসে। সংগীতে এটা স্বতন্ত্রীকরণ ঘটায় এবং অবিরাম নতুন নতুন গুণাবলী সৃষ্টি করে। সংগীতে হার্মনির সমৃদ্ধতম বিকাশ যে শিল্পবিপ্লবের, বিবর্তনমূলক বিজ্ঞানগুলির ও জীবন সম্পর্কে ডায়ালেকটিক বা দ্বন্দ্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশের সঙ্গে একই কালে ঘটেছে এটা কোন আপতিক ঘটনা নয়, বরং তা হল বুর্জোয়া "যে উপায়ে তার নিজের ভিত্তিকেই অবিরাম বিপ্লবায়িত করে

থাকে" তারই ফল। গল্প ও সিম্ফনির ক্ষেত্রে এরই সমান্তরাল এক কালগত চলন দেখা দেয়। যে করণকৌশলগত বিকাশের ফলে একদিকে বুর্জোয়া অর্কেস্ট্রার আকারগত সমৃদ্ধি ঘটে এবং অপরদিকে তার ভাবের আদানপ্রদানের বৃদ্ধির কারণে মানুষের জীবন ও অভিজ্ঞতাকে সিমফনির মত পরস্পরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও কাউন্টার-পয়েন্টধর্মী করে তুলেছে সেই করণকৌশলগত বিকাশের সঙ্গে এই সাংগীতিক বিকাশ যে একই কালে ঘটেছে এটাও কোন আপতিক ঘটনা নয়।

কাব্যে যেরকম হয়ে থাকে ঠিক সেইরকম সুরের জগতেও অপৃথকীভূত মানুষ এক সর্বজনীন প্রকৃতি বা স্থির সমাজের সম্মুখীন হয়। উপন্যাসে ও হার্মনির জগতে এক পরিবর্তনশীল ও বিকাশশীল জগতে বহু মানুষের আভ্যন্তরীণ সমৃদ্ধ ও জটিল চলনের কথা মানুষ চিন্তা করে।

নৃতাত্ত্বিক গবেষণার নির্দেশ মানতে হলে মেলডি অথবা হার্মনি দুইয়েরই আগে ছন্দ দেখা দিয়েছিল এবং আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে ছন্দোময় নৃত্য ও চীৎকার কাব্যেরও জনক। সংগীতের বাহ্যিক জগতের যে অস্তিত্ব আছে সেটা জগৎকে চিত্রিত করার জন্য নয়, জনিরূপকে চিত্রিত করার জন্যই সেটা বর্তমান। সেই কারণে জগৎকে টেনে আনতে হয় বিষয়ীর মধ্যে; বিষয়ীকে নিষ্পিষ্ট করে বিষয়ের মধ্যে নিয়ে এলে চলবে না। যেহেতু ছন্দ দেহের গোপন প্রাণের মূক প্রক্রিয়াগুলিকে স্পষ্ট করে তোলে এবং বহির্বিশ্বের উদাসীন ঘটনাবলীকে প্রতিষেধ করে [negates], সেই কারণে ছন্দ শ্রোতাকে একটা শারীরবৃত্তগত অন্তর্মুখিনতার মধ্য দিয়ে তার নিজের গভীরে নিমজ্জিত করে। সেইকারণেই সংগীতের তর্কশাস্ত্রগত নিয়মগুলি, তাদের বাহ্যিকতা ও বস্তুত্ব সত্ত্বেও, সব থেকে আগে ছন্দকে মেনে চলে, ছন্দের দ্বারা তাদের বিকৃত হতে হয়; শ্বাসপ্রশ্বাস, নাড়ির স্পন্দন ও দেহের আকার, পুষ্টি ও বৃদ্ধিগত জীবনের চারপাশে সেগুলিকে বিন্যস্ত হতে হয়। ধ্বনির অনাবৃত জগৎকে, তার সমস্ত নৈর্ব্যক্তিকতায়, ছন্দ এক মানবিক ও রক্ত মাংসের জগৎ করে তোলে। মেলডি ও হার্মনি তার উপর একটা আরও বেশি পৃথকীভূত এবং আরও বেশি পরিশীলিত মানবতার ছাপ এঁকে দেয়; কিন্তু একজন বড় সংগীত পরিচালককে সব থেকে নিশ্চিতভাবে চেনা যায় তাঁর তাল লয় [time] থেকে। সর্বাধিক বিস্তারিত অর্কেস্ট্রাকে পরিচালকের পরিচালনদণ্ডটি বলে: "ধ্বনির এই যে জটিল ও স্বাগতাধর্মী তুফান শুনতে পাচ্ছ তা মানবদেহের অভ্যন্তরেই ঘটছে।" পরিচালক হলেন অর্কেস্ট্রার মধ্যে দৃশ্যতঃ বর্তমান সাধারণ অহং।

মানুষ যখন ছন্দ উদ্ভাবন করেছিল, তখন সেটা ছিল তার নবজাত আত্মসচেতনতার প্রকাশ, যে আত্মসচেতনতা প্রকৃতি থেকে ইতোপূর্বে নিজেকে পৃথক

করেছিল। যেমনভি এই আত্মনকে শরীরের থেকে বেশি একটা কিছু হিসাবে প্রকাশ করেছিল, প্রকৃতির বিশ্বজনীন অন্যতার বিরুদ্ধে দাঁড়ান কোন যৌথ উপজাতির একটি সদস্যের আত্মন হিসাবে প্রকাশ করেছিল। ছন্দ হল একটি মানুষের অনুভূতি, যেমনভি হল মানবের অনুভূতি। হার্মনি হল বহু মানুষের অনুভূতি। তা হল যে সমাজে পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত মানুষেরা ক্রমবর্ধমান ও বিকাশমান প্রকৃতির এক ঐকতানিক সুরসত্তার প্রতিফলিত করে—সেই রকম এক জগতে বসবাসকারী একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসাবে নিজের সম্পর্কে সচেতন একজন মানুষের অনুভূতি।

সংগীতের ছন্দ যেমন শারীরবৃত্তগত এবং তা বিষয়কে নিজের ছক অনুযায়ী এমনভাবে বিকৃত করে যাতে তাকে শরীরের মধ্যে টেনে আনতে পারে, ঠিক সেই রকম পর্যাবৃত্তি ও শৃঙ্খলাবিন্যাস, যা গণিতের সারধর্ম, তা হল 'স্বাভাবিক' ও তর্কশাস্ত্র সম্মত এবং তা অহংকে শরীর থেকে নিষ্পেষিত ক'রে বস্তুর মধ্যে সঞ্চারিত করে, যাতে করে তা বহিঃপ্রকৃতির স্বধর্মকে অনুসরণ করে।

উপজাতির যৌথ সদস্যরা তাদের গড়পড়তা বাসনার ক্ষেত্রে সংঘর্ষে আসে না এবং প্রত্যেকের জন্য স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করার কারণে পারস্পরিক আত্ম-প্রতিযোজনের প্রয়োজন তাদের থাকে না। কারণ স্বাধীনতার বড় রকমের অসাম্যের সম্ভাবনার প্রশ্নই সেখানে ওঠে না। প্রকৃত উদ্বৃত্ত স্বাধীনতা কিছু থাকে না। আদিম মানুষের জীবন প্রায় অল্প প্রয়োজনের সামিল। প্রান্তিক উদ্বৃত্ত এতই কম যে তাকে সেই স্বাধীনতার বেশ খানিকটা থেকে বঞ্চিত করা মানে তাকে জীবন থেকেই বঞ্চিত করা। অতএব, সামগ্রিক হিসাবে সেই স্বাধীনতা এতই স্বল্প যে সকলেই তা সমানভাবে ভোগ করে এবং অন্য কোনও মানুষ নয়, প্রকৃতিই হল ব্যক্তির প্রধান শত্রু। কিন্তু শ্রমবিভাজনের ফলে সৃষ্ট স্বতন্ত্রীকরণ এবং তদনুপাতিক উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি বস্তুরত বিভিন্ন চরিত্রগুলির এই পারস্পরিক ঘাতপ্রতিঘাতকে এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায় উন্নীত করে। ট্র্যাজেডির স্থির ও তর্কশাস্ত্রসম্মত সরলতা হিসাবে প্রথমে যা দেখা দেয় তা বুর্জোয়া সভ্যতায় আরও নমনীয় ও পরিবর্তনশীল করণকৌশলযুক্ত উপন্যাস হিসাবে বিকশিত হয়। স্বাধীনতার পথ হিসাবে সংগীতের ক্ষেত্রে ঐকতান সৃষ্টির বিকাশের তাৎপর্যও একই রকমের।

বুর্জোয়া অর্থনীতির অবনতির কারণে শিল্পের অবক্ষয় সঙ্গীতের মধ্যে প্রতিফলিত। উপন্যাস যেমন সর্বহারার দুঃখকষ্ট থেকে বিশেষ এক ধরনের পলায়নমুখিনতার জন্ম দেয়—"পলায়নমুখী" সাহিত্য, পুঁজিবাদের ধর্ম—ঠিক সেই রকম সংগীত গড়ে তোলে জ্যাজ সংগীতের আবেগোদ্দীপকগত কম্বুয়ন বা, যে

ট্র্যাজিক দ্বন্দ্বগুলিকে উপস্থাপিত করা বা সমাধান করার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতাকে অর্জন করা যায় সেটা না করে, সহজপ্রবৃত্তিগুলিকে তৃপ্ত করে মাত্র। দুটিই মনে করে যে প্রয়োজনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকলেই তাকে এড়ানো যায় এবং সেইজন্য সামাজিক সম্পর্কগুলি সম্বন্ধে সচেতনতার বিরুদ্ধে বুর্জোয়ার বিদ্রোহের আর এক নতুন রূপ সৃষ্টি করে। বুর্জোয়া সাহিত্যে সর্বহারার দুঃখকষ্ট থেকে পলায়নের বিপরীতে এখন দেখা দেয় পেটি-বুর্জোয়ার দুঃখকষ্টের প্রকাশ। এই বিশিষ্ট প্রকাশটা হল নৈরাজ্যবাদী বুর্জোয়া বিদ্রোহ বা স্যুররিয়্যালিজম, যা সমস্ত প্রথাকে অস্বীকার করে, সামাজিক সহধর্মিতা থেকে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দুটি জগৎ মুক্ত করে এবং সেই কারণে শিল্পকে স্বপ্নের যাদুময় জগতে "উদ্ধারিত ক'রে" [releasing] নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে। একইভাবে, পেটি-বুর্জোয়া সংগীত অ-সুরধর্মিতার [atonality] মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়ে হয়ে দাঁড়ায় এক মুমূর্ষু শ্রেণীর যন্ত্রণার এক নৈরাজ্যবাদী প্রকাশ। নিদ্রামগ্ন সর্বহারা শ্রেণীর আফিম মিশে যায় নিষ্ফল বিদ্রোহী বুর্জোয়ার নিম্নতর স্তরের অলীককল্পনামূলক আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে।

সংগীতের জগৎ যেহেতু তার যুক্তিভিত্তিক গঠনসহ, গণিতের যুক্তিভিত্তিক বিষয়বস্তুর মত, ছদ্ম-বাহ্যিক এবং অনিরূপ থেকে নিষ্কাশিত, সেইজন্য দুটি ক্ষেত্রেই "শিশু প্রতিভা" দেখা দেওয়া সম্ভব। উপন্যাসের এবং বিবর্তনমূলক বিজ্ঞানগুলির পূর্ণ বিকাশের জন্য এমন কি প্রতিভাবান ব্যক্তির ক্ষেত্রেও মূর্ত অভিজ্ঞতার পরিপক্কতার প্রয়োজন। সংগীতের বহির্বাস্তব যেহেতু স্বল্প, সেই কারণে মনে হয় সংগীত যেন মানুষের আবেগগুলিকে সরাসরি কৌশলে চালনা করে।

ভাষা বহির্বাস্তব ও অভ্যন্তরীণ বাস্তব—তথ্য ও অনুভূতি—উভয়কেই প্রকাশ করে। ভাষা এই কাজ করে প্রতীকের সাহায্যে। মানসের মধ্যে একটি স্মৃতি-প্রতিরূপকে, যা বহির্বাস্তবের একটি খণ্ডের মানসগত প্রক্ষেপ—তাকে, "উস্কিয়ে দিয়ে" এবং একটি অনুভূতিকে, যা একটি সহজপ্রবৃত্তির মানসগত প্রক্ষেপ, তাকে "উস্কিয়ে দিয়ে" ভাষা এই কাজ করে। কিন্তু ভাষা প্রতীকের এক অগোছালো গুচ্ছ নয়। সেটা সংগঠিত হওয়া চাই। প্রতীকগুলির বিন্যাসের মধ্যে এই সংগঠনটি সুনির্দিষ্ট। কিন্তু প্রতীকগুলির সাহায্যে এই সংগঠনটিকে প্রতীকায়িত করা যায় না। এই তত্ত্বটির জন্য আমরা ভিটগেনস্টাইনের [Wittgenstein] কাছে ঋণী। প্রতীক ও বহির্বাস্তবের মধ্যে একটা প্রক্ষেপগত অনুরূপতা [correspondence] হিসাবে তিনি এটিকে দেখেছেন। কিন্তু প্রতীক ও অভ্যন্তরীণ বাস্তবের মধ্যেও একটা প্রক্ষেপগত অনুরূপতা থাকে এবং চূড়ান্তরূপ অথবা সামগ্রিক আকারটি হয় দুটি

সংগঠনকারী শক্তির মধ্যকার চাপ বা দ্বন্দ্বের পরিণতি। প্রক্ষেপিত সামগ্রীটি হয় বিন্যাসশৃঙ্খলারই সাধারণ অংশীদার। এটা যদি বহির্বাস্তবের একটা অংশ হয় ত'হলে আমরা বলতে পারি যে প্রতীক এবং প্রতীকায়িত সামগ্রী দুই-ই বাস্তব জগতের অংশীদার ; আর এটা যদি অভ্যন্তরীণ বাস্তবের একটা প্রক্ষেপ হয় তাহলে তারা একই আবেগোদ্দীপকগত ম্যানিফোল্ডের বা সামাজিক অহংয়ের অংশীদার। পৃথক পৃথক ভাবে বিবেচনা করলে এই বিন্যাসশৃঙ্খলাগুলি বিমূর্তন মাত্র। মূর্ত ভাষায় তাদের পৃথক করা যায় না। মূর্ত ভাষায় কেবলমাত্র তাদের চাপযুক্ত পারস্পরিক সম্পর্কটাই প্রতিফলিত হয় এবং সেটাই হল বিষয়ী-বিষয় সম্পর্ক— প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সক্রিয় সংগ্রাম।

কাব্যে সাধারণতঃ অহংয়ের আবেগোদ্দীপকগত শক্তিগুলির দ্বারা বিকৃত বা সংগঠিত ম্যানিফোল্ডটা হল শব্দগুলির নিজেদেরই বিন্যাসের মধ্যে ও বাক্যগঠন-রীতিমূলক সংগঠনের মধ্যে নিহিত যুক্তিভিত্তিক বা ব্যাকরণভিত্তিক ম্যানিফোল্ড। অবশ্যই "বাইরের" প্রতীকায়িত বহির্বাস্তবের মধ্যে একটা সদৃশ তর্কশাস্ত্রসম্মত বিন্যাসের সঙ্গে এর সাযুজ্য থাকে। এটা তার অনুরূপ, কিন্তু ঠিক একই জিনিস নয়, এবং সেইজন্যই উপন্যাসে যেখানে সাধারণ অহংয়ের দ্বারা সংগঠিত যুক্তিভিত্তিক ম্যানিফোল্ডটি "বাইরের" প্রতীকায়িত বহির্বাস্তবের মধ্যে থাকে, কাব্যে সেখানে উপন্যাসের থেকে আরও সরাসরি, "ভাষাগত" ও আদিম এক আবেগোদ্দীপকগত সংগঠন সম্ভবপর হয়। সেইজন্যই উপন্যাসের তুলনায় কাব্য আরও বেশি সহজ-প্রবৃত্তিমূলক, বর্বর ও আদিম। কাব্য সেই যুগের সামগ্রী যে যুগে শব্দ একটা নতুন সামগ্রী এবং তার এক রহস্যময় জগৎস্রজনকারী শক্তি থাকে। এটা আবির্ভূত হয় মনের এক অভ্যাস থেকে যা নামকে, মায়ামন্ত্রকে, সূত্রাবলীকে এবং তন্ত্র চিহ্নগুলিকে একটা যাদুধর্ম দান করে। এটা ভাষার মধ্যকার সেই "স্বীকার করে নেওয়া" জ্ঞানের অন্তর্গত যা আমরা যখন সচেতনভাবে আবিষ্কার করি—তর্কশাস্ত্রের নিয়মের ক্ষেত্রে যেমন হয়—তখন আমাদের কাছে এক নতুন, অ-মানবিক ও পরাক্রমশালী বাস্তব বলে মনে হয়। কাব্যে ব্যবহৃত শব্দ হল লোগোস [Logos], যে শব্দ রক্তমাংসে গড়া : সক্রিয় ইচ্ছা যেখানে আদর্শভাবে বিন্যাস গড়ে তুলছে ; আর উপন্যাসের শব্দ হল প্রতীক, উল্লেখ, কথোপকথনের দিক থেকে নির্দেশদানকারী ভঙ্গী।

সংগীতে যুক্তিভিত্তিক ম্যানিফোল্ডটি হল সংগীতের রূপগত বা গঠনগত উপাদান, ভাষার ক্ষেত্রে যেমন ব্যাকরণগত বা বাক্যগঠনরীতিগত উপাদানটি। এর অন্তর্ভুক্ত হল সারবত্তা [stuff-ness], প্রথা, নিয়ম, স্বরগ্রাম, অনুমোদিত কর্ড ও সাংগীতিক

অস্থের উপকরণগত সীমাবদ্ধতাগুলি। এটি হল সংগীতের নৈর্ব্যক্তিক ও বাহ্যিক উপাদান। ছন্দ, সুর ও হার্মনির সাহায্যে এটি স্থান ও কালের চৌহদ্দির মধ্যে আবেগোদ্দীপকগতভাবে বিকৃত হয়। Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen ("যে বিষয় সম্বন্ধে কেউ ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না, সে বিষয়ে তার চুপ করে থাকা উচিত"), এই কথা বলে ভিটগেনস্টাইন তাঁর বক্তব্য শেষ করেছেন। রহস্যপূর্ণভাবে তিনি যেটা বোঝাতে চেয়েছেন তা এই যে, ভাষা যেহেতু তথ্যকে অনুসরণ করে অতএব তা অ-তথ্যগত বিষয়ের কথা প্রকাশ করতে পারে না, রহস্যময় স্বজ্ঞার আশ্রয় নিতে হয় তাকে। এই বক্তব্য সঠিক নয়। ভাষার ক্রিয়াকে বিধিবহির্ভূতভাবে সীমিত করার দ্বারা ভিটগেনস্টাইন ভাষাকে তার এতকাল ধরে সাফল্যের সঙ্গে দখল করে রাখা এলাকার বাইরে রেখেছেন। যুক্তিভিত্তিক ম্যানিফোল্ডের মধ্যে মানুষ যে বিষয় সম্বন্ধে প্রকাশ করতে পারে না, শিল্প—সংগীত, কাব্য ও উপন্যাস—ঠিক সেটাকেই আবেগোদ্দীপকগত ম্যানিফোল্ডের মধ্যে প্রকাশ করে।

বহির্জগতে পরিলক্ষিত কালপরম্পরার অসমতার বিপরীতে ছন্দোবদ্ধ কালের সম-স্পন্দন। সেই কারণে অল্পসংখ্যক যে প্রাকৃতিক পর্যাবৃত্তি—যেমন দিন ও রাত্রি, মাস ও বৎসর—দেখা যায় মানুষ স্বাভাবিকভাবেই সেগুলির আশ্রয় নেয়। সুতরাং বিন্যাসশৃঙ্খলার এবং সেইকারণে সংখ্যার ধারণা আমরা পাই শারীরবৃত্তগতভাবে এবং গাণিতিক হিসাব [calculation] বলতে বোঝায় ভিন্ন ভিন্ন পর্যাবৃত্তি গোষ্ঠীর [groups] ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ। প্রথমে দেখা দেয় সংখ্যাগত প্রতীক, পরে পৃথক পৃথক লিখিত অক্ষর। বহির্বাস্তবকে বিন্যাসশৃঙ্খলায় আনার জন্য অহংকে বহির্বাস্তবের উপর প্রক্ষেপ করা হয়। বিষয়ীগত আবেগোদ্দীপকমূলক পর্যাবৃত্তি হল সংখ্যার জনক। গণিতে সেই কারণে বহির্বাস্তবে যে বিন্যাসশৃঙ্খলাগুলি দেখা যায় তার দ্বারা আবেগোদ্দীপকগত কালের বিকৃতি ঘটাতে হবেই। বাহ্যিক ম্যানিফোল্ড হল প্রধান সংগঠনী শক্তি। সংগীতে সহজপ্রবৃত্তিগত অহংকে অনুসরণ করার জন্য বহিঃস্থ পর্যাবৃত্তিকে আবেগোদ্দীপকগতভাবে বিকৃত করতে হয়। এক্ষেত্রে আবেগোদ্দীপকগত ম্যানিফোল্ডটাই হল সংগঠনী শক্তি। সংগীতবিদ হলেন এক অন্তর্মুখীকৃত গণিতবিদ। "বিদ্যুৎগতি হিসাবকারী" হলেন এক বহির্মুখীকৃত সংগীত পরিচালক।

সংক্ষেপে বলতে গেলে ঃ

বিষয়ীগত উৎস থেকে আহরিত পর্যাবৃত্তির স্থানিক বিন্যাসকে গণিত ব্যবহার

করে। এমনভাবে এই পর্যাবৃত্তিগুলিকে বিকৃত করা হয় যাতে বহির্বাস্তবের সঙ্গে তার মিল পাওয়া যায়।

বিষয়গত উৎস থেকে আহরিত পর্যাবৃত্তির আবেগোদ্দীপকগত বিন্যাসকে সংগীত ব্যবহার করে। অভ্যন্তরীণ বাস্তবের সঙ্গে যাতে মিল পাওয়া যায় এমনভাবে এই পর্যাবৃত্তিগুলিকে বিকৃত করা হয়।

কাব্যে আবেগোদ্দীপকগত ছন্দ হল যুক্তি-স্থানিক, আবেগোদ্দীপক-কালিক নয়। চিন্তনমূলক সামগ্রীর দ্বারা তা বিকৃত নয়—গণিতের মূলগত ছন্দের সঙ্গে তার বৈসাদৃশ্য। পরিবেশের লয়ের [tempo] বিপরীতে শরীরের লয়কে এটি প্রধান করে তোলে। "তাল" দিয়ে এবং বস্তুকে নিজের মধ্যে টেনে এনে মাত্রা [metre], বহিঃস্থ কালকে, পরিবর্তনশীল বাস্তবের উদাসীন প্রবাহকে অস্বীকার করে।

সংগীত, ভাষা, গণিত এগুলি সবই ধ্বনি মাত্র। তা সত্ত্বেও তারা সমগ্র বিশ্বকে প্রতীকায়িত করতে এবং অভ্যন্তরীণ বাস্তব ও বহির্বাস্তবের সক্রিয় সম্পর্ককে প্রকাশ করতে সক্ষম। ধ্বনি, যা একটা সহজ ভৌত তরঙ্গব্যবস্থা [wave system], সমস্ত মূর্ততাসহ জীবনকে প্রতীকায়িত করার পক্ষে এত উপযুক্ত একটা মাধ্যম হয়ে উঠল কেন?

প্রাণীদের জীবনে তিনটি দূরত্ব-গ্রাহকের সাহায্যে বহির্বাস্তবের আবিষ্কার ঘটেছে। শেরিংটন দেখিয়েছেন এই তিনটি দূরত্ব-গ্রাহককে কেন্দ্র করে মস্তিষ্কের উদ্ভব ঘটেছে। এগুলি হল ভৌত-রসায়নগত গন্ধ, ধ্বনি ও দৃষ্টি। এই উদ্দেশ্যে আলোক তরঙ্গ গ্রহণই মোটের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ করেছে এবং সেই কারণে আন্তর-প্রজাতি ভাববিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ধ্বনি বিশেষীকৃত হয়ে উঠেছে। বাতাসে বা গাছের উপর ভারসাম্য বজায় রাখার চাহিদায় পাখি ও শাখামৃগদের মধ্যে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ব্যস্ত থাকায় এইটা ঘটাই স্বাভাবিক। আমরা যাদের থেকে উদ্ভূত হয়েছি সেই উষ্ণরক্ত প্রাণীদের মধ্যে চীৎকার—বা ধ্বনি মাত্র—দীর্ঘকাল ধরে সহজপ্রবৃত্তির সহজ ভাষা থেকেছে। সহজ সরল ধ্বনিতে আবেগোদ্দীপকগত অনুষঙ্গ মিশিয়ে সাড়া দিতে আমাদের কান দীর্ঘকাল ধরে সেই সুরে অভ্যস্ত হয়েছে। পাখিদের বিপাক ক্রিয়া দ্রুত এবং তারা প্রাণীদের মধ্যে সব থেকে আবেগপ্রবণ। বার বার একই সুরে অবিরাম ধ্বনির সাহায্যে পাখিরা তাদের সহজপ্রবৃত্তির সহজ সরল সামগ্রিক আকার প্রকাশ করে থাকে। কিন্তু মানুষ আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছে পাখিদের সতর্কতাসূচক চীৎকারের পথে। অর্থনৈতিক সহযোগিতার তাগিদ—সম্ভবতঃ শিকারের জন্য—বহির্বাস্তবে সহজ-

প্রবৃত্তির দিক থেকে সাড়া দেয় না এমন ধরনের বস্তু ও প্রক্রিয়াকে সূচিত করাকে অবশ্য-প্রয়োজনীয় করে তোলে। হয়ত অঙ্গভঙ্গীও দেখা দিল এবং বহির্বাস্তবের কোনও খণ্ডকে ঠোঁট ও জিভের সাহায্যে চিত্ররূপগত অনুকরণের সাহায্যে মানুষ একটা সহজপ্রবৃত্তিগত ধ্বনিকে, একটা অনুভূতি-প্রতীককে, বহির্বাস্তবের একটি খণ্ডের প্রতীক হিসাবে সেটি যাতে কাজ করতে পারে সেইভাবে রূপান্তরিত করল। এইভাবে ভাষার সৃষ্টি হল। অনুভূতি থেকে, আদিম সহানুভূতি থেকে, অঙ্গভঙ্গী থেকে, প্রত্যয় উৎপাদন থেকে জাত মানুষের সহজ সরল চীৎকারগুলি নমনীয় [plastic] হয়ে উঠল। সেই একই চীৎকার এখন বহির্বাস্তবের একটি অপরিবর্তনীয় খণ্ডকে এবং সেটি সম্পর্কে একটি অপরিবর্তনীয় বিচারকেও সূচিত করতে থাকল। এমন একটা জিনিস জন্ম নিল যা ছিল একাধারে সংগীত, কাব্য, বিজ্ঞান ও গণিত, কিন্তু যা কালের সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং যে অর্থ নৈতিক ক্রিয়া তার ভিত্তি, তার বিকাশ যত ঘটতে থাকল ততই সংগীত ও গণিত এই দুই মেরুর মধ্যে ভাষা ও অলীককল্পনার সমস্ত রকমের গতিশীলতার জন্ম দিল।

সংগীত আবেগগুলির যে বিন্যাস ঘটায় তা কিছু খেয়ালখুশি মাফিক নয়। তা এমন একটা জিনিসকে প্রকাশ করে যা বাস্তবের বহিঃস্থ ম্যানিফোল্ডকে অনুসরণ করার উপযোগী করে গঠিত কোনও বিজ্ঞানসম্মত ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। জিনিরূপের ম্যানিফোল্ডকে এ প্রক্ষেপ করে। এ এমন একটা কিছু বলে যা অন্য কোনও ভাবে আমরা জানতে পারি না; এর থেকে আমরা আমাদের নিজেদের সম্পর্কে জানতে পারি। এর মেঘমেদুর বুনানির মধ্যে যে প্রচণ্ড সত্যগুলি ভেসে বেড়ায় বলে আমরা অনুভব করি তা বিভ্রম নয়। সেই সত্যগুলি আমাদের নিজেদের বিষয়ে সত্য। স্থিতিশীল দিক থেকে আমরা যা তার সত্য নয়; যা হয়ে ওঠার জন্য আমরা সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করি, সেই আমাদের বিষয়ে সত্য।

২

ধ্বনি-প্রতীক শিল্পগুলি ছাড়াও রয়েছে দৃশ্য বা নমনীয় শিল্পগুলি—যেমন, চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য। আমাদের বিশ্লেষণের সঙ্গে এগুলি আরও সহজে খাপ খায়। দর্শনেন্দ্রিয়বোধ—সমস্ত প্রাণীর মধ্যে যা স্পর্শবোধের দ্বারা সংশোধিত—হল সেই বোধ যা বহির্বাস্তবের অনুসন্ধানে সব থেকে বেশি সুসংগতভাবে ব্যবহৃত। আর শ্রবণেন্দ্রিয়ের ব্যবহার হল বহির্বাস্তবের যে বিশেষ অংশটিতে অন্যান্য জনিরূপ বর্তমান সেই অংশটিতে অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে। ধ্বনি মধ্যস্থতা করে বিভিন্ন জনিরূপের মধ্যে আহ্বান প্রদানের ক্ষেত্রে—প্রাণীরা তাদের শত্রু বা সাথীর

ডাক শোনে। আবার আবেগ জনিরূপ এবং বহির্বাস্তবের অ-জনিরূপগত অংশের মধ্যে মধ্যস্থতা করে।

ফলে, আমরা যখন বহির্বাস্তবের একটা দৃশ্যগত প্রতীক গড়ে তুলি, যেমন একটা অঙ্কিত নক্সা [diagram] বা একটা অঙ্কন [drawing], তখন স্বভাবত:ই গোটা বহির্বাস্তবের প্রক্ষেপক হয়ে ওঠে; কেবলমাত্র প্রতীক সেটা হয় না। অনুকার-ধ্বনি বা ওনোমেটোপেয়িয়ার ক্ষেত্রটি বাদ দিলে শব্দগুলি আলাদা ভাবে আলোক-চিত্রের মত বস্তুর কোনও যান্ত্রিক প্রক্ষেপ নয়, সেগুলি কেবলমাত্র প্রতীক এবং সেই কারণেই তা "প্রথাসম্মত"। একটা ড্রয়িং অবশ্য বাস্তবের সরাসরি প্রক্ষেপ এবং সেটা ছন্দ-ব্যাকরণগত নিয়ম বা প্রথার মধ্যস্থতার অবশ্যপ্রয়োজনীয়তা ছাড়াই। অঙ্কন আর আলোকচিত্রের মধ্যকার সাদৃশ্য থেকেই সেটা দেখা যায়।

অঙ্কন ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে বহির্বাস্তবের অংশগুলিকে প্রক্ষেপ করে একটা নকল জগৎ গড়ে তোলা হয়, যেমন হয় একটা ফুলের ড্রয়িং বা একটা অশ্বের ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে। যে বহির্বাস্তব থেকে সেটা আঁকা হয় তার সঙ্গে এই চিত্রের একটা কোথাও মিল থাকে যেটা তার নিজের পরিভাষায় বর্ণনা করা যায় না। অর্থাৎ বাস্তব বা যুক্তিভিত্তিক ম্যানিফোল্ড বা আরও সোজা ভাষায়, "সাদৃশ্য"।

কিন্তু রেখা ও বর্ণের স্বীয় অধিকার বলেই আবেগোদ্দীপকগত অনুষঙ্গ থাকে। সেই নকল জগতের প্রতি, যে "জিনিসটি" প্রক্ষেপ করা হচ্ছে তার প্রতি, একটা প্রতিন্যাস নিয়ে অবশ্যই এইগুলিকে সংগঠিত করতে হয়। এটাকে একটা আবেগোদ্দীপকগত প্রতিন্যাস হতেই হবে, আর সেটাই হল সেই চিত্র বা ভাস্কর্যের সঙ্গে সেই জনিরূপের বা আবেগোদ্দীপকগত ম্যানিফোল্ডের মধ্যকার সাধারণ সামগ্রী, এবং সেটাকে আলাদা করে অঙ্কনের সাহায্যে প্রতীকায়িত করা যায় না। কারণ সেটা ওই অঙ্কনটির মধ্যেই নিহিত থাকে। অদীক্ষিত দ্রষ্টার চোখে সেটা অঙ্কনের মধ্যে একটা বিকৃতি বলে, বহির্বাস্তবের অ-সাদৃশ্য বলে মনে হয়। কিন্তু অবশ্যই সেটা প্রকৃতপক্ষে একটা সাদৃশ্য, জনিরূপের আবেগোদ্দীপকগত জগতের একটা সাদৃশ্য।

এই সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের মধ্যে যে একমাত্র পার্থক্য টানা প্রয়োজন তা হল এই যে, একটি হল ত্রিমাত্রিক আর অপরটি দ্বিমাত্রিক। অর্থাৎ, চিত্রকলায় বহির্বাস্তবের তিনটি মাত্রার মধ্যে দুটিকে গ্রহণ করা হয়—বা সঠিকভাবে বলতে গেলে, চারটি মাত্রার মধ্যে মাত্র দুটিকে এ বেছে নয়। কারণ, সংগীত, কাব্য ও গল্পের মত না হয়ে, নমনীয় শিল্পের ক্ষেত্রে চতুর্থ মাত্রা, কাল, অবর্তমান। কোন একটা সময়ে আরম্ভ হয়ে অন্য একটা সময়ে গিয়ে তা থামে

না। চিত্র স্থির ; সেখানে পরিবর্তন ঘটে না। সমস্ত শিল্পকেই বহির্বাস্তব থেকে কোন না কোন ভাবে নির্বাচন করে নিতে হয় ; না হলে অহং-সংগঠনের প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় স্থিতিস্থাপকতা তাতে থাকে না। অন্ততঃ একটি মাত্রার স্বাধীনতা তাতে থাকা চাই।

প্রকৃত বস্তুকে যা প্রতীকায়িত করে সেই রেখা-ও বর্ণপ্রক্ষেপিত অহং বাস্তব দ্বারা সংগঠিত। ফলে বাস্তবের একটি খণ্ডের প্রতি এক নতুন আবেগগত প্রতিন্যাস দেখা দেয়। রেমব্রাণ্ট বা সেজানের আঁকা কোনও চিত্র দেখার পর আমরা বহি-র্জগৎকে ভিন্নভাবে দেখি। সেই একই বহির্বাস্তবকে তখনও আমরা দেখি বটে কিন্তু তখন তা নতুন আবেগোদ্দীপকগত সুরে সিক্ত এবং এক উজ্জ্বল আবেগগত বর্ণে তা দীপ্ত। সেটি তখন হয়ে ওঠে আরও "স্পৃহা-উদ্রেককারী" এক জগৎ, কারণ স্বাভাবিক স্পৃহাগত সহজপ্রবৃত্তিগুলিই নান্দনিক আবেগোদ্দীপক যোগায়।

ভাষার জন্য আমরা যে বিনির্ণায়কগুলি ইতোমধ্যেই নির্দিষ্ট করেছি সেগুলি স্পষ্টতঃই এক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য। পিকাসোর আঁকা একটি ছবির থেকে মিকেলাঞ্জেলোর আঁকা কোন ছবি বা কোন ডাচ শিল্পীর আঁকা প্রতিকৃতিতে বহির্বাস্তবের পরিমাণ আরও বেশি বর্তমান, ঠিক যেমন কোন গল্পে তা কবিতার থেকে বেশি পরিমাণে বর্তমান। কিন্তু দৃশ্য জগতের ক্ষেত্রে এটি যে আবেগগত পুনঃসংগঠন করে তার ব্যাপ্তি ও মাত্রা কতটা? প্রধানতঃ এই বিষয়ের উপরেই চিত্রকলায় মহত্ত্ব পরিমাপের ভিন্নতার ভিত্তি। সংগীতের বা কাব্যের ক্ষেত্রে যেমন হয় ঠিক সেইরকমই চিত্রকলাতেও বাস্তবের সহজ সমাধান বা অগভীর বোধ অনুন্নত শিল্পের পরিচয়।

চিত্রকলার সঙ্গে কাব্যের সাদৃশ্য এইটুকু যে আবেগোদ্দীপকগুলি এখানে বিভিন্ন সামগ্রীর অনুষঙ্গের মধ্যে নিহিত নয় ; যে রেখা, রূপ ও বর্ণ দিয়ে সেগুলি গঠিত তার মধ্যেই তা নিহিত। কোন দৃশ্যের—ধরা যাক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া—নিজেরই আবেগোদ্দীপকগত অনুষঙ্গ থাকে। কিন্তু চিত্রকলা যে আবেগো-দ্দীপকগত অনুষঙ্গগুলিকে ব্যবহার করে সেগুলি ঘটনা হিসাবে ঐ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত নয়। তা জড়িত রয়েছে ধূসর বর্ণের অশ্বাকৃতি মূর্তির দ্বারা চালিত প্রান্তের দিকে বৃত্তযুক্ত একটি বড় স্বচ্ছ বাক্সের মধ্যকার এক ধূসর বর্ণের আয়ত-ক্ষেত্রের সঙ্গে। শোকের ধারণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আবেগোদ্দীপকগত অনুষঙ্গগুলি গল্পে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করা যায় এবং ঔপন্যাসিক ন্যায়সঙ্গতভাবেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বর্ণনা নিয়ে আসতে পারেন যাতে করে তার আবেগোদ্দীপকগত অনুষঙ্গগুলিকে তিনি তাঁর সামগ্রিক আকার বা প্যাটার্ণের মধ্যে সদ্ব্যবহার করতে

পারেন। আবার শব্দ হিসাবে কেবল মাত্র "সমাধি" এই শব্দটির মধ্যেই অনেক আবেগোদ্দীপকগত অনুষঙ্গ রয়েছে যা কাব্যে ব্যবহার করা যেতে পারে—"আমার আশার সমাধি"। কিন্তু এটা যদি সম্যক বুঝতে পারা যায় যে এই ধরনের ভাষাগত অনুষঙ্গের সমগ্র গুচ্ছটিকেই কবিতার মধ্যে নিয়ে আসা যায় এবং হয় সেগুলিকে ব্যবহার করতে হবে না হয়ত দমিত [inhibit] করতে হবে, তবেই তা করা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ—অন্ধকার, রক্তিম, কৃত্রিম সম্ভ্রান্ততা, মিছিল বা জাঁকজমক ও অনুষ্ঠান, গভীর কূপ (ইংরেজি well শব্দের সঙ্গে ধ্বনিগত অনুষঙ্গে ফাঁসেল, ও তার সঙ্গে যুক্ত grave বা কবর) ইত্যাদির ইঙ্গিত। চিত্রকলায় যে আবেগোদ্দীপকগত অনুষঙ্গগুলির ব্যবহার হয় তা কেবলমাত্র বর্ণ, রেখা এবং বর্ণ ও রেখার সমন্বয়ের অনুষঙ্গ; কিন্তু সেগুলি অর্থকে সংগঠিত করার কাজে—প্রকৃত বস্তুরই প্রতিনিধিত্ব করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

অতএব যে স্থির নমনীয় শিল্পগুলি প্রতিনিধিত্বমূলক সেগুলি কাব্য ও গণিতের স্বগোত্র—বর্গীকরণমূলক বিজ্ঞানগুলির ও সর্বজনীন শিল্পগুলির স্বগোত্র। কবিতায় যেমন পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা কবিতাটির "অহংয়ের" মধ্যে প্রবেশ করি সেইরকম চিত্রকরের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেও আমরা তৎক্ষণাৎ প্রবেশ করি। কবি এবং চিত্রকর দুজনেই যে স্থানটি থেকে জগৎকে দেখছেন আমরাও জগৎকে সেই স্থানটি থেকেই দেখি।

এই দৃষ্টিভঙ্গী কেন যে জীবনধারণের ক্ষেত্রে একটা "উপজাতীয়" আদিম প্রতিন্যাসে গিয়ে পৌছায়, কেন যে তা স্থির প্রকৃতির বিরুদ্ধে এক স্থির সর্বজনীন মানব-মূলধর্মের উপলব্ধিতে গিয়ে পৌছায় এবং সেই কারণেই এক সর্বজনীন তীব্র আবেগ বা অন্তর্দৃষ্টিকে প্রকাশ করার পক্ষে সেটি সব থেকে উপযুক্ত মাধ্যম, একথা আমরা ইতোপূর্বেই ব্যাখ্যা করেছি। কাব্য ও চিত্রকলা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রকাশের সব থেকে উপযুক্ত মাধ্যম—অবশ্য সেটা কেবলমাত্র কবির স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ। এটা একটা আপাতঃবিরোধী সত্য যা প্রকৃতপক্ষে আপাতঃবিরোধী নয়, কিন্তু স্বতন্ত্রীকরণের প্রকৃতির মধ্যেই সেটা নিহিত। চিত্রকলা, কাব্য ও সুর [মেলডি] সব কিছুর মধ্যেই এই সাধারণ গুণটি দেখা যায়—কয়েকটি ব্যক্তি মানবের একটি গোষ্ঠীর চিত্তাকর্ষক অবজটিলতার [Sub-complications] থেকে বরং মানব জাতির [genus] এই কালসীমাহীন সর্বজনীন গুণটিই বেশি দেখা যায়। সেই কারণে সভ্যতার ইতিহাসের প্রাথমিক স্তরেও—সেই প্রাচীন প্রস্তরযুগের মানুষের স্তরেও চিত্রকলার বিকাশ আমরা দেখতে পাই।

প্রথম আবির্ভাবের সময় চিত্রকলা ছিল প্রকৃতির মধ্যে আবেগোদ্দীপক গুণ সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা। সেই কারণে প্রাচীন প্রস্তরযুগের শিল্পে প্রথম দিকে আঁকা প্রাকৃতিক বিষয়বস্তুর চিত্রে আমরা তার "জীবন-সদৃশ" চরিত্র দেখতে পাই। কিন্তু যখন শিকারী ও খাদ্যসংগ্রহকারী একটা গোষ্ঠী থেকে শস্যউৎপাদনকারী ও গোপালনকারী এক উপজাতিতে মানুষের বিকাশ ঘটল তখন মানুষ প্রকৃতিকে উপজাতির অন্তর্ভুক্ত করে এবং তাকে পোষ মানিয়ে প্রকৃতির মধ্যে আপন ইচ্ছার সন্ধান ক'রে প্রকৃতিকে যৌথভাবে লক্ষ্য করার স্তর থেকে প্রকৃতির উপর এক যৌথশক্তির স্তরে গিয়ে পৌঁছায়। সেই কারণে এখন সে বাস্তবের উপর সামাজিক রূপের, যা এখন প্রত্যক্ষগত রূপলাভে "প্রথা" হয়ে উঠেছে সেই সামাজিক রূপের শক্তির ব্যাপারে আগ্রহী। সেই কারণে প্রকৃতিবাদী প্রত্নপ্রস্তরযুগের শিল্প নব্যপ্রস্তর যুগে প্রথাগত, বিধিবহির্ভূত ও প্রতীকধর্মী—অলংকরণমূলক হয়ে ওঠে। এর ফলে যে লিখনের আবির্ভাবের পথই তৈরি হয়ে ওঠে তাই নয়, ছন্দ থেকে যেমন কবিতায় ও সুরে বা মেলডিতে পৌঁছান ঘটেছিল সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেইরকম একটা মানসগত পরিবর্তনকেও তা প্রকাশ করে।

গণ বা উপজাতি থেকে শ্রেণীসমাজে উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে আরও বেশি পৃথকীভবন দেখা দিল যা "প্রকৃতিবাদে" প্রত্যাবর্তনের রূপ নিল। কিন্তু মানুষ এখন প্রকৃতিতে উপজাতির নিটোল আবেগোদ্দীপকগত গুণগুলির সন্ধান করে না। শাসক শ্রেণীর উন্নীত ও বিশেষীকৃত গুণগুলির সে সন্ধান করে। শ্রমবিভাগ ও তার ফলে যে অধিকতর করণকৌশলগত ক্ষমতা ও প্রকৃতিকে ভোগ করা সম্ভব হল তার দ্বারা এগুলি বিস্তারিত হল। কোনও শ্রেণী যখন সক্রিয় বাস্তবের সঙ্গে তার সজীব সংযোগ হারিয়ে ফেলে তখন এই প্রকৃতিবাদ "প্রথাবদ্ধতায়" আবদ্ধ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং তার আগেকার আবিষ্কারগুলি শুষ্ক আবরণে শিলীভূত হয়ে পড়ে। প্রকৃতিবাদ হয়ে পড়ে পাণ্ডিত্যবাদ ও অ্যাকাডেমিজম। সর্বাধিক প্রকৃতিবাদী চিত্রশিল্প হল বুর্জোয়া শিল্প। বুর্জোয়া সমাজের অধিকতর উৎপাদন ক্ষমতা ও পৃথকীভবন ও অধিকতর সুস্পষ্ট শ্রমবিভাগ অনুযায়ী তা হয়। সেই কারণে বুর্জোয়া শিল্পে প্রকৃতিবাদের উত্থান এবং তার বিপ্লবী আত্মবিকাশ সেই একই যুগে সংগীতের ক্ষেত্রে হার্মনির ও সাধারণভাবে বিবর্তনমূলক বিজ্ঞানগুলির উত্থানের সঙ্গে যুক্ত। প্রকৃতিবাদকে বাস্তববাদের সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে চলবে না—উদাহরণস্বরূপ, বুর্জোয়া ফ্লেমিশ চিত্রকলার বাস্তববাদ। এই বাস্তববাদও প্রথাবদ্ধ হতে পারে। যেহেতু চিত্রকলা কাব্যের মত, উপন্যাসের মত নয়, সেইজন্য যে গুরুত্বপূর্ণ অহং-সংগঠন প্রকৃতিবাদের

ভিত্তি তা যে বাস্তব জগৎকে চিত্রিত করা হয় সেখানে ঘটে না। স্মৃতিপ্রতিরূপ এবং রেখা ও বর্ণ যে আবেগোদ্দীপকগত অনুরণন জাগিয়ে তোলে তার কমপ্লেক্স থেকে তা প্রবাহিত হয় এবং "অর্থ" দ্বারা, সেই চিত্রের প্রক্ষেপগত বৈশিষ্ট্যগুলি দ্বারা সংগঠিত হয়।

পরবর্তী বুর্জোয়া সংস্কৃতিতে অর্থনৈতিক পৃথকীভবন স্বাধীনতার স্বতন্ত্রীকরণের পথ না হয়ে, হয়ে পড়ে পঙ্গুকারী ও দমনমূলক [coercive]। বিষয়বস্তুর বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় যা যতক্ষণ তা বুর্জোয়া বিধেয়গুলির চৌহদ্দির মধ্যে থাকে ততক্ষণ "পণ্যের উপর অন্ধভক্তি" রূপে দেখা দেয়। যে সামাজিক রূপগুলি বিষয়বস্তুকে বাজারযোগ্য করে তোলে এবং তাকে একটা বিনিময় মূল্য দান করে সেই সামাজিক রূপগুলি-ই যেন চরম লক্ষ্য এই ধরনের এক স্তরে উন্নীত হয়। সেই কারণে কিউবিজম, ফিউচারিজম এবং তথাকথিত "বিমূর্ত" শিল্পের বিভিন্ন রূপগুলি দেখা দেয়।

শেষ পর্যন্ত সামাজিক রূপগুলির দাসে সে পরিণত হয়েছে এবং সেই কারণে তখনও "বাজারের সঙ্গে আবদ্ধ" হিসাবে বুর্জোয়া বিদ্রোহী নিজেকে দেখতে পায়। সে তখন এমন কি সামাজিক অহং থেকেও নিজেকে মুক্ত করতে এবং সেই পথে এক স্বপ্নের জগতে পলায়ন করার প্রয়াস পায় যে স্বপ্নের জগতে অহং এবং বহির্জগৎ দুই-ই ব্যক্তিগত ও অচেতন। এই হল সুররিয়ালিজম, যেখানে আপাতঃদৃষ্টিতে এক বাস্তবের প্রত্যাগমন ঘটেছে বলে মনে হয়। এই বাস্তব অবশ্য কাল্পনিক। কারণ সেটা বাস্তব অর্থাৎ সামাজিক বহির্জগতের প্রত্যাগমন নয়, তা হল অচেতন ব্যক্তিগত জগতের প্রত্যাগমন। সুররিয়ালিজম কেন যে চূড়ান্ত বুর্জোয়া অবস্থানকে প্রকাশ করে তা আমরা ইতোমধ্যেই ব্যাখ্যা করেছি।

৩

নমনীয় শিল্পগুলি স্থির। কালের মধ্য দিয়ে গতিশীল দৃশ্যগত শিল্প দেখা যায় নৃত্যে, নাটকে এবং (শেষ পর্যন্ত) চলচ্চিত্রে। নৃত্য হল আদিম গল্প—ছন্দের গর্ভ থেকে গুণ যেখানে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করছে। নৃত্যে ছন্দ ক্রমে ক্রমে আর শারীরবৃত্তগত থাকছে না এবং কালের মধ্যে উদ্‌ঘাটিত হতে এবং যে বাস্তবে সব কিছু ঘটছে সেই বাস্তবের গুণগত চলনের শরিক হয়ে উঠতে সুরু করে।

কাব্যের মত চিত্রকলার গুণও এই যে প্রতীকের প্রক্ষেপগত গঠন দ্বারা সংগঠিত আবেগোদ্দীপক তাতে বর্তমান। (একটা কালো আয়তক্ষেত্র, একটা কঠিন মন্ত্র)। কিন্তু দৃশ্যগত শিল্প যেই কালের মধ্যে চলতে থাকে তখন আর

এই স্থানিক বা ছন্দ-ব্যাকরণগত সংগঠন সম্ভব হয় না এবং সেই কারণে কাহিনীর বস্তু একে ঘটতে হয়। আবেগোদ্দীপকগত সংগঠন হল দৃশ্যগত প্রতিনিধিত্বের দ্বারা প্রতীকায়িত প্রকৃত বস্তুর এক সংগঠন। (বাস্তব কফিনটি)। নৃত্যের মধ্যে প্রেমনিবেদন, মঞ্চের উপর হত্যা, চলচ্চিত্রে দাঙ্গা হল এমন উপাদান যা আবেগো-দ্দীপকগতভাবে সংগঠিত ; একটা প্রক্ষেপগত গঠন হিসাবে যুক্ত রূপগুলি, পড়ে থাকা মানুষটি বা ছড়িয়ে পড়া জনতা নয়। একটা স্থির মূকাভিনয় হিসাবে সেগুলিকে যদি জমাট করে ফেলা যেত তাহলে যেরকম হত সেইরকম নয়। স্থির শিল্পের প্রক্ষেপগত সংগঠন আর কালিক শিল্পের বাস্তব সংগঠনের মধ্যে এই গুলিয়ে ফেলার কারণেই নাটক সম্বন্ধে যত রকমের বিশেষ অভিব্যক্তিধর্মী [expressio-nist] ও দৃশ্যধর্মী [scenic] তত্ত্বের উদ্ভব—উদাহরণস্বরূপ, এডওয়ার্ড গর্ডন ক্রেইগের তত্ত্ব। ব্যালে, নাটক ও চলচ্চিত্রের বিকাশ হার্মনির বিকাশের, ব্যক্তির কাউন্টারপয়েন্টের বিকাশের সমগোত্র। ব্যক্তির জীবনাভিজ্ঞতাগুলি পরিবর্তনশীল প্রকৃতির পটভূমিতে নানা জালবুনানির সৃষ্টি করে। কারণ যৌথ উপজাতির স্ফটিকের অভ্যন্তরে শ্রমবিভাজনের ফলে একই ধরনের পৃথকীভবন ও স্বতন্ত্রীভবনের উদ্ভব ঘটিয়েছে। গ্রীক গণগুলি থেকে গ্রীক শ্রেণীগুলির দ্রুত বিবর্তনের মধ্যে ট্র্যাজেডির আবির্ভাব এবং এলিজাবেথীয় মঞ্চে নাটকের ক্ষেত্রে বুর্জোয়া উৎপাদিকা শক্তির উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে আবার তাতে নবকিশলয় দেখা দেয়। উভয় ক্ষেত্রেই কাব্য তখনও তাতে নিষিক্ত হয়, কারণ শ্রেণীবিভক্ত সমাজে নাটক একটা উৎ-ক্রান্তিমূলক স্তর। তা হল এমন এক সমাজের সৃষ্টি যে সমাজ যৌথ থেকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্তরে গিয়ে পৌছাচ্ছে।

ভাষা ও সংগীতের আবেগোদ্দীপকগত সংগঠনের তুলনায় নৃত্য, নাটক ও ও চলচ্চিত্রের করণকৌশল হল মিশ্র বা কাউন্টারপয়েন্টযুক্ত। সংগীতের ধ্বনিগুলি যেমন বহির্বাস্তবের বস্তু এবং তা সেই বস্তুর প্রতীক নয় সেইরকম নৃত্যরত বা অভিনয়রত মানুষটি বা তার চারপাশের দৃশ্যটিই হল প্রকৃত বস্তু। নৃত্যরত বা অভিনয়রত মানুষটি অন্য বস্তুরও উল্লেখ করছে (প্রেমনিবেদনরত বা মৃত্যুমুখে পতিত যে মানুষের সে অভিনয় করছে) একথা স্বীকার্য। কিন্তু সে নিজেই বহির্বাস্তবের একটা বস্তুও বটে—সাবলীলভাবে—বা আকর্ষণীয়ভাবে—বিচরণশীল একটি মানুষও বটে। সুতরাং অভিনয় ও নৃত্যের একটা সংগীতগত "অ-প্রতীকধর্মী উপাদান" থাকে, কিন্তু এদের অন্য উপাদানটিও রয়েছে, বহির্বাস্তবের বস্তুকে উল্লেখ করার বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। একটা দ্বিত্ব সংগঠন দেখা যায়—যে বিষয়টির অভিনয় করা হচ্ছে এবং যে ব্যক্তি অভিনয় করছে। এই দ্বিত্ব সংগঠনের একটা

বিপদ আছে, এবং অভিনেতা ও লেখকের মধ্যে, বিভিন্ন ভূমিকাগুলি এবং প্রযোজকের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে, যে বিবাদ বর্তমান কালে কেবলমাত্র চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেই অতিক্রম করা যায়। চলচ্চিত্রে ভাল প্রযোজকের হাতে ক্যামেরার যান্ত্রিক নমনীয়তা ভূমিকাগুলিকে নমনীয় করে তোলে। বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের যুগে অবশ্য চলচ্চিত্রের এই বৈশিষ্ট্যটি পুরাপুরি কাজে লাগান যায় না। সোভিয়েত রাশিয়া ভিন্ন অন্যত্র চলচ্চিত্র "তারকাধর্মী" মাধ্যমই রয়ে গেছে।

নর্তক বা অভিনেতা স্বয়ং হিসাবে [as himself], চিন্তার সামগ্রী হিসাবে কাব্যের জগতের মত স্থির। যে বাস্তব প্রতীকায়িত হচ্ছে তা কাহিনীর সামগ্রীগুলির বাস্তবতার মতই—গতিশীল অবস্থায় থাকে। সেই কারণে কোনও নাটকে বা চলচ্চিত্রে স্থির ক্লোজ-আপ বা অভিনেতার মুহূর্তটির এবং গতিশীল কর্ম বা লেখকের সংগঠনের মধ্যে একটা চাপ থাকে। মহাকাব্যের ক্ষেত্রে কাব্যময় মুহূর্ত এবং আখ্যানমূলক গতির মধ্যকার চাপের সঙ্গে এর সাদৃশ্য।

মহাকাব্য বা নাটকের যে বিশেষ বিশেষ অংশগুলিকে আমরা বিশেষভাবে কাব্যগুণসম্পন্ন বা নাট্যগুণসম্পন্ন বলে মনে করি—হোমারের নক্ষত্রখচিত আকাশের বর্ণনা বা ডুজের [Duse] কোনও মহান মুহূর্ত—সেগুলি অনেকটা সংগীতের মত : আবেগোদ্দীপকগুলি শব্দের সঙ্গে বা কর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং কেবলমাত্র অর্থের সাহায্যেই সেগুলি উদ্‌ঘাটিত হয়, যেন একটা বাঁধ ভেঙে গেল। নাটক বা মহাকাব্য মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়ায়। একটা কাব্যগুণসম্পন্ন মুহূর্ত দেখা দেয় এবং কাল লোপ পাওয়া মাত্র স্থান আবির্ভূত হয়; দিগন্ত প্রসারিত হয়ে অসীম হয়ে ওঠে। শিল্প নিজেকে স্থিরভাবে প্রকাশ করে। যে বিষয়গুলি বর্ণিত হচ্ছে সেগুলির নিজ নিজ আবেগোদ্দীপক থাকে। সেগুলি আবার কালের চৌহদ্দির মধ্যে ধৃত কাহিনীর বা নাটকের কর্মের বা অ্যাকশনের দ্বারা সংগঠিত। এই কারণেই ইলিয়াড এবং ওডেসিকে আমরা বস্তুসম্পন্ন ও বিস্তীর্ণ জগৎ বলে মনে করি, পিছনের দিকে যত দূর তাকাই ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত বলে মনে হয়। শেকসপীয়রের মহান নাটকগুলিতে এই স্থির সংগঠন আমরা অনুভব করি; সেখানে এক বিপুল মেঘমেদুর তাৎপর্যের জগৎ কেবল যে অ্যাকশনের আড়াল থেকে ফুটে উঠছে তাই নয়, কাব্যধর্মী পংক্তিগুলিতে নীচে থেকে প্রকৃতই একটা আলো এসে তার উপর পড়ছে যাতে করে অ্যাকশনটা নিজেই সূক্ষ্মভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে এবং অপ্রত্যাশিত দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে উঠছে। এই কারণেই কাব্যধর্মী নাটকের [poetic plays] অভিনয় এত শক্ত। অ্যাকশন এবং কাব্য হাতে হাত ধরে চলে, কারণ সেগুলি ভিন্ন ভিন্ন গঠনের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু কাব্য এবং অভিনয়—কবির "অহং" এবং

অভিনেতার "অহং" একই গঠনের অন্তর্ভুক্ত এবং পরস্পরকে অস্পষ্ট করে তোলে। আরভিংয়ের "হ্যামলেট", না শেকসপীয়রের হ্যামলেট—আমাদের বেছে নিতে হয়। যে নাটক পঠিত হওয়ার উদ্দেশ্যে রচিত তাতে কাব্য অভিনয়ের স্থান নিতে পারে, সেই কারণেই শেকসপীয়রের নাটক পাঠ করার তৃপ্তির সঙ্গে ইবসেনের নাটক পাঠের তৃপ্তির তুলনা চলে না। শেকসপীয়রের যুগে অভিনেতার প্রাধান্য অবশ্যই অপেক্ষাকৃত কম ছিল, ছোট ছেলেদের স্ত্রীভূমিকা গ্রহণ করা থেকেই সেটা দেখা যায়।

নৃত্য ও নাটকের মধ্যে প্রকৃত ও প্রতীকায়িত বিষয়ের যে একই বৈশিষ্ট্য ও উত্তম সংমিশ্রণ দেখা যায় সেটাকে সংগীতের মধ্যে কখনও কখনও যে একই সংমিশ্রণ দেখা যায় তা থেকে পৃথক করে দেখতে হবে। যে সংকর জাতীয় সঙ্গীতে বুলবুল গান করে, মঠের ঘন্টা বাজে বা রেলগাড়ির ইঞ্জিনের বাঁশি বাজে তা থেকে একে পৃথক করে দেখতে হবে। ধ্বনির সাহায্যে অনুকৃত বা প্রতীকায়িত এই বাস্তব সামগ্রীগুলি সঙ্গীতের জগতের যুক্তিভিত্তিক স্বয়ং-সুসমঞ্জস গঠনকে ব্যাহত করে এবং সেইজন্যই এই ক্ষেত্রে তা অনুমোদনযোগ্য নয়।

প্রত্নপ্রস্তরযুগের শিল্পে ব্যক্তি কেবলমাত্র আত্ম-সচেতন এবং তখনও তা বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ফলে যথাযথভাবে চিত্রিত, অ-সংগঠিত প্রত্যক্ষ-সামগ্রীর এক পরমাণুগত প্রকৃতিবাদের [atomic naturalism] উদ্ভব ঘটে। সেইজন্য আদিম মৃগয়াজীবির নৃত্যে প্রাকৃতিক বিষয়ের—পশুর—অপরিবর্তিতভাবে অনুকরণ করা হয়, কারণ মানুষ কেবলমাত্র তার সন্ধান করে, তার পরিবর্তন ঘটায় না। সঠিক প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বিষয় মানুষের মধ্য থেকে অহংকে বার করে নিয়ে আসে। যৌথকর্মের সাহায্যে এই বিষয়কে লাভ করা যায় এবং সেইজন্য তা সচেতন হয়ে ওঠে। এটা এমন এক ঘটনা যা বর্বর প্রত্যক্ষে এর যে গুণগুলি থাকে তা থেকে এর গুণগুলি যে পৃথক তা চিহ্নিত করে। কিন্তু এই বিষয়টির সন্ধান করা হয়, তাকে সৃষ্টি করা হয় না।

নব্যপ্রস্তরযুগের শিল্পে, মৃগয়াজীবি বা ফলআহরণকারী মানুষ থেকে যখন সে শস্যউৎপাদনকারী বা গোপালনকারী উপজাতি হয়ে ওঠে, বিষয়কে সমাজ তখন কেবল-মাত্র সন্ধান করে না, তাকে পরিবর্তিত করে। প্রত্যক্ষের মধ্যে মানুষ তখন নিজেকে সামাজিক মানুষ হিসাবে, ভাব আদান প্রদানের মাধ্যমের মধ্যে নিহিত প্রথা ও রূপ অনুযায়ী বিষয়কে পরিবর্তনকারী উপজাতি হিসাবে উপলব্ধি করে। নৃত্য হয়ে ওঠে কোয়াদের এবং অস্ট্রোলোপিথেকাস ট্র্যাজেডির প্রথাবদ্ধধর্মীয় গতি। মৃগয়াজীবি বা খাদ্য-আহরণকারী আদিম মানুষের নৃত্য প্রচণ্ডভাবে প্রকৃতিবাদী ও অনুকরণধর্মী; খাদ্য-

উৎপাদনকারী বা পশুপালনকারী মানুষের নৃত্যে দেখা যায় ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রথা-বদ্ধতা বা কর্মালিটি এবং প্রকৃতির উপর উপজাতির আত্মার ছাপকে তা প্রকাশ করে। অঙ্গভঙ্গীর যাদুধর্মী ও বিবর্তনী শক্তির উপর সে বিশেষ জোর দেয়। ঘূর্ণায়মান সূর্য ঘূর্ণায়মান নর্তককে মেনে চলে; যুবকদের লাফিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শস্য বেড়ে উঠতে থাকে; গতি যতই বেড়ে ওঠে জীবনও ততই স্পন্দিত হয়ে ওঠে। প্রকৃতিকে উপজাতি টেনে নেয় আপন বুকের মধ্যে।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজের ব্যাপকতালাভের ফলে নৃত্য হয়ে ওঠে একটা কাহিনী, একটা নাটক। কোরাসের সূক্ষ্ম জটিলতা যথেষ্ট পরিমাণে শিথিল হয়ে স্বতন্ত্র অভিনেতার আবির্ভাবের জন্য পথ করে দেয়। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রমবিভাজনের ফলে জাত স্বতন্ত্রীকরণ ট্র্যাজেডিতে প্রতিফলিত হয়। দেবতা, নায়ক, পুরোহিত-রাজা, জনগণ, মহৎ ব্যক্তি—এরা কোরাস থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়ে এসে মঞ্চে হাজির হয়, ফলে একই সঙ্গে দেখা দেয় স্থির অভিনয় এবং গতিশীল অ্যাকশন যা নৃত্যরত কোরাসে ছিল অবিচ্ছিন্নভাবে এক, ঠিক যেমন ধর্মীয় মন্ত্র-আবৃত্তিতে স্থির কাব্য এবং গতিশীল কাহিনী ছিল এক এবং শব্দ যেখানে কাব্যগতভাবে একটা জগৎ গড়ে তোলে, আবার এক উপকথামূলক কাহিনীও বর্ণনা করে।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অবক্ষয় ও অনমনীয়তা অবশ্য যে কোনও মুহূর্তেই "চরিত্রগুলির" অনমনীয় হয়ে ওঠার এবং টাইপ হয়ে ওঠার মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। স্বতন্ত্রীকরণের মূলটি শ্রেণীর মধ্যে নিহিত নয়, শ্রমবিভাজনের মধ্যে তা নিহিত। শ্রেণীবিভক্ততা প্রথমে এই বিভাজনকে সম্ভব করে বটে, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময়ে এসে তার আরও বিকাশ ঘটতে দিতে চায় না এবং এখন সেটা একটা বাধা হয়ে ওঠে; পণ্ডিতসুলভ শিলীভবনের উৎস হয়ে ওঠে। আর সমাজকে এই বাধা ভাঙতেই হবে, না হলে গতিরুদ্ধ হতে হবে।

আমরা বলেছি যে ক্যাথিড্রালগুলি সামন্ততান্ত্রিক ছিল না। সেগুলি ছিল বুর্জোয়া। সেগুলি ইতোমধ্যেই হয়ে উঠেছিল ক্যাথলিকবাদের অভ্যন্তরে প্রোটেস্ট্যান্টদের বিরুদ্ধ মতবাদ; সামন্ততান্ত্রিক গ্রামাঞ্চলে বুর্জোয়া শহরের বিকাশ। সেই কারণেই ক্যাথিড্রালগুলিতে বুর্জোয়া অলৌকিক নাটক হিসাবে নাটকের সূত্রপাত। গির্জার কর্তৃপক্ষরা এই অলৌকিক নাটকগুলিকে ভাল চোখে দেখতেন না। রাজতন্ত্র যখন বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে মৈত্রী গড়ে তুলল মিস্ট্রি নাটক তখন গিয়ে পৌছাল রাজসভায় এবং হয়ে উঠল এলিজাবেথীয় ট্র্যাজেডি। এখানে এসে যুবরাজ হিসাবে, নায়কের অবাধ বাসনার মধ্যে সামাজিক ইচ্ছার প্রতিমূর্তি হয়ে ব্যক্তিকে আরও একবার প্রকৃতিবাদী দিক থেকে উপলব্ধি করা গেল।

বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিশেষ বিকাশের কারণে, শেকসপীয়রের পরে

অনুকরণধর্মী অ্যাকশান স্থির অভিনেতার শিকার হয়ে পড়ল। গ্রীক ট্র্যাজেডিতে অভিনেতা কাঠের জুতো আর মুখোশের সাজপোষাকের বাঁধনে বদ্ধ; কাব্য ও অ্যাকশানের বিশুদ্ধ বাহন সে। এলিজাবেথীয় নাটকে অভিনেতার ব্যক্তিত্ব তখনও রুদ্ধগতি, এবং অভিনেতা যেহেতু তখনও অনুকরণধর্মী অ্যাকশানের অধীন রয়েছে সেই কারণে নাটক তখনও কাব্যধর্মী। আমাদের কালে অভিনেতার মুহূর্তের সঙ্গে কবির মুহূর্তের সংঘাত ঘটে; শেকসপীয়রের নাটকে সামন্ততান্ত্রিক রাজসভার যৌথ প্রতিনিধিত্বে সীমাবদ্ধ বালকবেশী নারী-চরিত্র তখনও একটা ফাঁপা জিনিস, যার ফলে ক্লিওপাত্রার কাব্য এগিয়ে আসায় এবং প্রসারিত হওবার সুযোগ রয়েছে। মঞ্চে মহিলাদের আবির্ভাবের ফলে নাটকে অভিনয়ের উত্থান এবং আখ্যানভাগ ও কাব্যের মৃত্যু সূচিত হল। স্বতন্ত্র অভিনেতা বা অভিনেত্রী ব্যক্তিগতভাবে মুখ্য হয়ে উঠল; অন্তের সঙ্গে বা সামাজিক অহংয়ের সঙ্গে তার সামাজিক সম্পর্কগুলি —যা দিয়ে নাটকের কাহিনী বা কাব্য গঠিত—তা হয়ে উঠল গৌণ। নাটকের করণকৌশলের ভিত্তি হল যৌথ। সেইকারণে বুর্জোয়া সংস্কৃতির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দ্বারা নাটক ক্ষতিগ্রস্ত হল।

চিত্রকলার মত নাটকও আরও বেশি বেশি করে বাস্তবধর্মী হয়ে উঠতে থাকল এবং পরে তা পণ্যের উপর অন্তভক্তিতে গিয়ে দাঁড়াল—হয়ে উঠল অভিব্যক্তিবাদের বিমূর্ত গঠন, যার মধ্যে প্রথা বা সামাজিক রূপগুলি স্বতন্ত্র সত্তাবং কল্পিত হতে থাকল এবং বিষয়বস্তু বা "কাহিনী" তা থেকে বহিষ্কৃত হল, যাতে করে নাটকের মধ্যে তার বিশুদ্ধ সামাজিক অহং হয়ে ওঠার অসম্ভব আকাঙ্ক্ষা দেখা দিল। আর শেষ অবধি স্যুর-রিয়ালিস্ট স্বপ্ন-নির্মাণের কর্ম-প্রণালী অনুযায়ী সামাজিক অহং এবং বহির্বাস্তব দুটি থেকেই নাটক নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে উঠে পড়ে লাগল।

কাব্যের ক্ষেত্রে আমরা ইতোমধ্যেই যে বিশ্লেষণ করেছি এই মূলগত চলনটিও তা ছাড়া আর কিছু নয়। মৃগয়াজীবি আদিম মানুষের নৃত্যে চিৎকার প্রামাণিক প্রতিরূপকে (পাখির ডাক বা পশুর গর্জন) প্রকাশ করত। শস্য-উৎপাদনকারী বা পশুপালনকারী সমাজ তার নীচের অপৃথকীভূত অভ্যন্তরে প্রকৃতিকে টেনে নিয়েছে। সেই সমাজে এই চিৎকার হয়ে উঠল বিস্তারিত মন্ত্র-আবৃত্তি [choral hymn] যার মধ্যে রয়েছে স্ট্রফি, অ্যান্টিস্ট্রফি ও এপোড [Strophe anti-strophe and epode]। শ্রমবিভাজনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা শ্রেণীসমাজ ও তার স্বতন্ত্রীকরণের উত্থানের প্রতিফলন দেখা যায় চারণকবির আবির্ভাবের মধ্যে। চারণকবি নিয়ে এলেন মহাকাব্য, দেখা দিল বীরদের কার্যকলাপের জয়গান, দেখা দিল কাহিনী, যেখানে কবি নিজের কথা বলছেন না, বলছেন এক সাধারণ শ্রেণীর

পন্ন হয়ে। আর সেইজন্যই তাঁর নিজের ব্যক্তিগত মুহূর্তের সঙ্গে কাব্যগত মুহূর্তের সংঘাত ঘটছে না, বীরদের কার্যকলাপের মধ্যেই কেবল সেই মুহূর্তটি ঘটছে। কিন্তু শ্রমবিভাজন আরও বেশি হওয়ার ফলে সমাজে আরও বেশি স্বতন্ত্রীকরণ ঘটায় কবির আবির্ভাব ঘটল; তিনি নিয়ে এলেন গীতিধর্মী কাব্য [Lyrical verse] —প্রেমধর্মী [amatory], পত্রধর্মী [epistolary] ও ব্যক্তিগত [personal] কাব্য—যার মধ্যে কাব্যগত মুহূর্ত ব্যক্তিগত মুহূর্তের সঙ্গে সমাপতিত হল, যার মধ্যে বোধ "অহং" (আগে যা ছিল সাধারণ ও বীরত্বপূর্ণ) ব্যক্তিগত ও স্বতন্ত্র হয়ে উঠল। এর সঙ্গে এক ধরনের প্রকৃতিবাদ এবং "বেদনা" [pathos] দেখা দিল যার জন্য ইউরিপিদিসকে তাঁর সমসাময়িকেরা ভর্ৎসনা করেছিলেন এবং বুর্জোয়া সংস্কৃতির চোখে খুব মর্মস্পর্শী ও সঠিক বলে মনে হয়।

বুর্জোয়া কাব্যের মধ্যে কবি নিজের পূর্ণ স্বতন্ত্রীকরণ খুঁজে পান। বুর্জোয়া কাব্যে সুর করে গাওয়া গীতিকাব্য হয়ে ওঠে লিখিত পাঠ্যকাব্য এবং কাব্যের সামাজিক অহংকে স্বাধীন ব্যক্তির সঙ্গে এক করে ফেলা হয়। বুর্জোয়া কাব্যের প্রকৃতিবাদের মধ্য দিয়ে বহির্জগৎ থেকে পলায়নের (প্রতীকবাদ) এবং সামাজিক অহং থেকেও পলায়নের (সুররিয়ালিজম) চলন দেখা যায়।

(৪)

শ্রুত জগতের ক্ষেত্রে সংগীতের ভূমিকা যে ধরনের, দৃশ্য জগতের ক্ষেত্রে স্থাপত্যকলা এবং "ফলিত" শিল্পগুলির, (মৃৎশিল্প, বয়ন, বস্ত্র, আসবাব যন্ত্র, গাড়ি, ছাপানো হরফ ইত্যাদির ডিজাইন) ভূমিকাও সেই ধরনের এই অর্থে যে "সামগ্রীগুলি" এক্ষেত্রেও বহির্বাস্তবের অংশ এবং আবেগোদ্দীপকের সাহায্যে সেগুলি সরাসরি "বিকৃত" বা সংগঠিত হয়। কিন্তু স্থাপত্যকলা ও অন্যান্য শিল্প বিপ্রতীপ [inverted] সংগীতের মত। সংগীতের ক্ষেত্রে "সামাজিক" উপাদান যেমন একটা রূপগত আদর্শ "গঠন" এবং তার ছন্দ-তর্কশাস্ত্রসম্মত নিয়ম থাকে এক্ষেত্রে তা হয় না। স্থাপত্যের ক্ষেত্রে একটা মানবিক ও সামাজিক ভূমিকা থাকে। একটা বাড়ির বা একটা আধারের [vase] বহির্বাস্তব হল তার ব্যবহার—তার আবরণধর্মিতা বা তার আধারধর্মিতা। প্রাকৃতিক বহির্বাস্তবের (যেমন একটা কার্পেট, একটা আধার বা একটা বাড়ি যখন স্থাপত্য বা অলংকরণের সাহায্যে আবৃত হয়) প্রতীকায়ণের সাহায্যে অথবা তাকে যখন স্থানের চৌহদ্দির মধ্যে একটা আকৃতি, তারল্য, হার্মনি, ডৌল এবং চলন দেওয়া হয় তখন এই ব্যবহারগত রূপটি আবেগোদ্দীপকের দিক থেকে সংগঠিত বা বিকৃত হয়। এই

সংগঠন হল কাব্যধর্মী, আর ব্যবহারগত ভূমিকাকে যে "অহং" সংগঠিত করে তা হল স্থির ও যৌথ। যে সমাজে সামাজিক "অহং" এবং ব্যক্তিগত "অহংয়ের" মধ্যে সংঘাত ঘটে না, বরং তারা পরস্পরের পরিপূর্তি করে সেই সমাজের গর্ভে মহান স্থাপত্য জন্ম নেয়।

মৃগয়াজীবি মানুষ ব্যবহারগত মূল্যকে বাস্তবসম্মতভাবে প্রকাশ করে। প্রকৃতির মধ্যে সে তার ব্যবহারের অনুরূপতা দেখতে পায়। তার বাড়ি হল একটা গুহা, তার আধার হল একটা লাউ; তার অস্ত্র একটা পাথরের টুকরা; তার গাত্রাবরণ একখণ্ড পশুচর্ম। এই অর্থে তার ফলিত শিল্প তার চিত্রের মতই বাস্তবধর্মী।

শস্যউৎপাদনকারী বা পশুপালনকারী মানুষ তার বস্তুগত রূপপ্রাপ্ত ব্যবহার-মূল্যের উপর একটা প্রথাগত ও বিকৃতিমূলক অলংকরণ আরোপ করে। প্রকৃতিকে সে উপজাতির অন্তরের মধ্যে নিয়ে যায় এবং তার নিজের পছন্দ অনুযায়ী তাকে নমনীয়ভাবে ছাঁচ দেয়। ব্যবহার-মূল্যকে একটা সামাজিক রূপ দেওয়া হয়—সেটার উপর মুদ্রাঙ্কন করে দেওয়া হয়, পাথরের যন্ত্রপাতিগুলিকে পালিশ দেওয়া হয়। গুহার সন্ধান না ক'রে সে কোনও সুবিধামত জায়গায় একটা কাজ চলার মত কুঁড়ে তৈরি করে। এখন সে আর পশুচর্ম পরিধান করে না, তার গাত্রাবরণ এখন বোনা হল। লাউয়ের বদলে সে এখন মৃৎপাত্র ব্যবহার করে। সেই মৃৎ-পাত্রকে একটা বিশিষ্ট আকৃতি দিয়ে তার উপর সে অলংকরণ করল।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজের আবির্ভাবের ফলে প্রাসাদ ও মন্দির দেখা দিল যাতে শাসকশ্রেণীর পদমর্যাদা ও পবিত্রতা প্রকাশের জন্ত "আবরণধর্মিতা" আবেগোদ্দীপক-গতভাবে সংগঠিত হল। শ্রমবিভাজন এবং সম্পত্তির বিচ্ছিন্নতার [alienation] মধ্য দিয়ে এই পদমর্যাদা ও পবিত্রতা সঞ্চিত হল যার দ্বারা বর্ধিত সামাজিক ক্ষমতা শাসকশ্রেণীর মেরুতে জড়ো হল আর সেই সঙ্গে দাস শ্রেণীর মেরুতে জমা হল বশ্যতা আর অধঃপতন। এথেন্স ও রোমের বণিকশ্রেণীর ক্ষেত্রে পৌরভবনগুলিতেও এর প্রতিফলন দেখা যায়। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে গড় ও দরবার কক্ষ [castles and basilicas] সামাজিক ক্ষমতার আবেগোদ্দীপকগত সংগঠনকে প্রকাশ করে। মধ্যযুগের নাগরিক জীবনের ক্যাথিড্রাল ও ওতেল দ্য ভিইয়ে ইতোমধ্যেই বুর্জোয়া শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান ক্ষমতাকে প্রতিফলিত করে এবং সেগুলি বিদ্রোহী। বুর্জোয়া শ্রেণী তখনও যৌথ—স্বয়ংশাসিত ও স্বয়ং-অস্ত্রসজ্জিত কমিউনে তা সমবেত—সামন্ততন্ত্রের প্রবাহের মধ্যে সেগুলি উপজাতির দ্বীপ। তাদের সামাজিক প্রসার দেখা দেয় বুর্জোয়াদের প্রাসাদে ও ক্যাথিড্রালে, যেগুলি কিছুকালের জন্য অন্যান্য সামন্ততান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে বুর্জোয়াদের ক্ষমতাকে পরিচালিত করে। তারপর তা

অভিজাতদের হর্ম্য [villas] ও রাষ্ট্রসংস্থার হাতে চলে যায়; শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোকদের আবাসস্থলরূপে তা দেখা দেয়। প্রথম দিকে এটা একটা প্রকৃতিবাদী চলন থাকে। বাড়িগুলি হয়ে ওঠে আরও কম "আনুষ্ঠানিকরূপগত" [formal] এবং আরও বেশি ব্যবহারযোগ্য ও বসবাসযোগ্য। এই চলনটাও ক্রমশঃ বিমূর্ততায় গিয়ে পৌঁছায়। চিত্রকলায় যা বিমূর্ততা, স্থাপত্যে তা ক্রিয়াসর্বস্বতাবাদ [functionalism]। শেষ পর্যন্ত এমন কি সামাজিক অহংও প্রতিবেষিত হয়ে যায় এবং ক্রিয়ার প্রয়োজন-নিরপেক্ষ একটা খামখেয়ালিপনা ও ব্যক্তিগত খেয়াল স্থাপত্যের সর্বত্র দেখা দেয়। মৃৎশিল্প, বয়নশিল্প এবং অন্যান্য ফলিত শিল্পেও অবশ্য একই চলন ঘটতে দেখা যায়। অন্যান্য শিল্পগুলির ক্ষেত্রে শাসকশ্রেণীর লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষার যে বিপুল বিশদীকরণ ও নান্দনিক আদর্শায়ণ দেখা যায় এই ক্ষেত্রেও শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সৃষ্টিগুলিতে সাধারণভাবে সেইটাই দেখা যায়।

(৫)

বিভিন্ন শিল্পের সংগঠনকে ছকে ফেলে এইভাবে দেখান যায়:

শিল্প	বহির্বাস্তব
১॥ ধ্বনিমূলক:	
সংগীত	সাংগীতিক গঠনের ছন্দ-যুক্তিভিত্তিক নিয়মাবলী
কাব্য	ভাষার বাক্যগঠনরীতিগত ও ব্যাকরণগত নিয়মাবলী
গল্প	বর্ণিত প্রকৃত বাহ্যিক জগৎ
২॥ দৃশ্যমূলক:	
চিত্রকলা ও ভাস্কর্য	গঠনগত প্রস্থাপনের প্রক্ষেপগত নিয়মাবলী
নৃত্য, নাটক ও চলচ্চিত্র	প্রকৃত মানুষের দ্বারা অনুকৃত প্রকৃত অ্যাকশান
স্থাপত্য, মৃৎশিল্প বা সেরামিকস, বয়নশিল্প, আসবাব ইত্যাদি,	ব্যবহারোপযোগিতা

স্পষ্টতঃই বিভিন্ন শিল্পকে ইতিহাসের দিক থেকেও সাজানো যায়—খাদ্যসংগ্রহকারী ও মৃগয়াজীবি মানুষের সমাজে তার অবিভক্ত আবির্ভাব থেকে শুরু করে যন্ত্রীকরণ সম্ভবপর এমন শ্রেণীবিভক্ত সমাজে তার জটিল বিকাশ পর্যন্ত।

বিকাশের এই সাধারণ ধারা সম্পর্কে আমরা ইতোমধ্যেই আলোচনা করেছি। প্রতিবেম্বিত হওয়া সত্বেও সংশ্লেষণের একটি আংশিক উপাদান হিসাবে প্রধান তিনটি যুগের সবগুলিই আধুনিক শিল্পের বিবর্তীগত সংগঠনের পদ্ধতির মধ্যে রক্ষিত ও উন্নীত হয়েছে [sublated]। সেই কারণে প্রকৃতির মধ্যে আত্মসন্ধানরত মানুষের চেতনা, উপজাতির সামাজিক কিন্তু অপৃথকীকৃত "অহংয়ের" মধ্যে প্রকৃতিকে নিয়ে-আসা-মানুষের চেতনা এবং শেষ স্তরে সামাজিক "অহংকে" বিভক্ত করে জীবিত ব্যক্তিত্বে পরিণত করছে এবং একই কালে প্রকৃতিকে জায়মান এক পৃথকীকৃত শিখে পরিণত করছে এমন মানুষের চেতনা—এ সবই এই পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত।

যদি প্রশ্ন করা হয় শিল্পের উদ্দেশ্য কি ?—তাহলে আমরা জবাবে বলতে পারি—তার যথার্থ প্রকৃতি নির্ভর করে তার উদ্দেশ্য বলতে আমরা কি বুঝি তার উপর। শিল্প তার "অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছে"; যে সংস্কৃতিতে শিল্প ছিল তা শিল্প-বিহীন সংস্কৃতির থেকে বেশিদিন টিঁকে থেকেছে এবং শিল্পবিহীন সংস্কৃতিকে অপসারিত করে নিজের আসন করে নিয়েছে। কারণ শিল্প মানসকে পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজিত করে এবং সেই কারণে তা সমাজের বিকাশের একটি শর্ত। কিন্তু আমরা যদি প্রশ্ন করি শিল্প কিভাবে তার কর্তব্য পালন করে, তাহলে আমরা অন্য একটা উত্তর পাই। কারণ এই কর্তব্য পালন করার জন্য পরিবেশের একটি অংশকে তা গ্রহণ করে, তাকে বিকৃতি করে এবং তাতে বহির্বাস্তবের একটা অ-সাদৃশ্য দান করে যা আবার জনিরূপেরও একটা সাদৃশ্য। শিল্প বহির্বাস্তবকে জনিরূপের সহজপ্রবৃত্তির সাদৃশ্যের কাছাকাছি একটা নতুন রূপ দেয়, কিন্তু সহজপ্রবৃত্তিগত জনিরূপ যেহেতু এক অচেতন ও গতিশীল বাসনা ছাড়া আর কিছুই নয় সেই কারণে তা বহির্বাস্তবকে অন্তরের বাসনার কাছাকাছি একটা নতুন রূপ দেয়। জীবনের বেদনা, পতন, অন্ধ প্রয়োজনীয়তা, এবং সেই সঙ্গে আনন্দ ও সুখকে উপকরণ হিসাবে ব্যবহার ক'রে এই নতুন রূপ দান করাটা যতই সার্বিক ও বাস্তবের প্রকৃতির প্রতি বিশ্বস্ত হয়, শিল্পও ততই আরও বেশি বেশি করে সামাজিক ও জৈবিক দিক থেকে মূল্যবান হয়ে ওঠে এবং মহান শিল্প হয়ে ওঠে। যে জীব মনে করে যে জীবন কেবলমাত্র "সম্ভবপর সর্বোৎকৃষ্ট জগতে সর্বোত্তমের জন্যই" সেই জীবের উদ্বর্তন মূল্য [survival value] অল্পই। মহান ট্র্যাজেডি সেই কারণে মহান শিল্প হতে পারে, কারণ সেখানে বাস্তব যত তিক্তই হোক না কেন—মৃত্যু, হতাশা, চির ব্যর্থতা থাক না কেন—সেই বাস্তবকে একটা সংগঠন, একটা আকৃতি, একটা আবেগোদ্দীপকগত বিন্যাসও দেওয়া হয়েছে যা ভাগ্য [fate] সম্পর্কে আরও গভীর, আরও সামাজিক এক দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রকাশ করে।

বহির্বাস্তবকে অন্তর থেকে আহরণ করা এক আবেগোদ্দীপকগত সংগঠন দেওয়ার ফলে অনিরূপ সমগ্র বাস্তবকে, এমন কি মৃত্যুকেও আরও বেশি আগ্রহজনক করে তোলে, কারণ তাকে আরও সত্য করে তোলে। জগৎ আরও আগ্রহে জলজল করতে থাকে। আমাদের হৃদয় আগ্রহের সঙ্গে তার মুখোমুখি হওয়ার জন্ত, সেই জগতে বাস করার জন্ত, তার সঙ্গে বোঝাবুঝি করার জন্ত তার দিকে ছুটে যায়। আমাদের নিজেদের জীবনটাকে যে ভাবে আমরা হয়ে উঠতে দেখতে চাই একটা মহান উপন্তাস হল সেইটাই ; তুচ্ছ নয়, বিষাদ নয়, আমরা চাই সেটা হয়ে উঠুক মহান তাৎপর্যপূর্ণ [full of great issues], এমন কি মৃত্যুকেও তা যেন এক মহান ধ্বনিতে পরিণত করতে পারে :

> মহান ও ট্র্যাজিক আমাদের জীবন
> টাইর‍্যান্টের মুখোসের মত
> কোনও দুঃসাহসিক ও বাস্তুভিত্তিক নাটক
> কোনও গতানুগতিক বর্ণনা
> আমাদের করুণ প্রেমকে আঁকতে পারে না।

যেভাবে জগৎটা আমাদের কাছে প্রতীয়মান হোক বলে আমরা চাই, অর্থাৎ উজ্জলতর, আবেগোদ্দীপকগতবর্ণে পূর্ণ একটা সামগ্রী হিসাবে প্রতীয়মান হোক বলে আমরা চাই, একটি মহান চিত্র হল সেই জিনিসটাই। মহান সংগীত হল সেই জিনিস যেভাবে আমরা চাই আমাদের আবেগগুলি প্রবাহিত হোক, সেগুলি দুঃসাধ্য উদ্দেশ্যে ও গভীর লক্ষ্যে পূর্ণ হয়ে উঠুক। এবং যেহেতু এক মুহূর্তের জন্ত আমরা দেখতে পেয়েছি সেটা কেমন হতে পারত, পুনর্গঠিত বিষয়গুলি আমাদের হাতে মুহূর্তের জন্ত পেয়েছিলাম, সেই কারণে তারপর থেকে আমরা কেবলই চাই আমাদের জীবন যাতে আরও কম তুচ্ছ হয়, আরও বেশি যাতে দেখতে পাই সেই-ভাবে আমাদের চারপাশে তাকাতে চেষ্টা করি। চেষ্টা করি আরও নিবিড়ভাবে ও দুঃসাধ্যভাবে অনুভব করতে।

যদি প্রশ্ন করি শিল্প কেন পরিবেশকে অনিরূপের প্রকাশভঙ্গী পরিধান করিয়ে তার এই ঘনিষ্ঠতা ও তাৎপর্য নিয়ে আমাদের কাছে হাজির হয় তাহলে শিল্পের সারধর্ম সম্পর্কে আরও কিছু বলতে হয়। বহির্বাস্তবকে আমাদের প্রকাশভঙ্গীর আলোয় উদ্ভাসিত ক'রে শিল্প আমাদের নিজেদের কথাই আমাদের কাছে আরও বেশি উদ্ঘাটিত করে। কোন মানুষই সরাসরি নিজের দিকে তাকাতে পারে না, কিন্তু শিল্প বিশ্বজগৎকে একটা দর্পণ করে তোলে যার মধ্যে আমরা নিজেদের কিছু কিছু দেখতে পাই। আমরা নিজেরা যে রকম ঠিক সেই রূপটাই যে দেখতে

পাই তা নয়, বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কে সমাজের মধ্য দিয়ে আমাদের হয়ে ওঠার সক্রিয় সম্ভাবনায় আমাদের যে রূপ সেই রূপটা দেখতে পাই। যে অনিরূপটি তখন আমরা দেখতে পাই সেই অনিরূপের উপর মানবজাতির সমস্ত সম্ভাবনা ও ঐশ্বর্যের ছাপ দেওয়া—এই বিশদীকরণটি আবার বাস্তবের বাকি অংশ থেকে সমাজই নিবারণ করে। শিল্প জীবনের অন্তরের অন্তঃস্থলের সুপ্রচুর পরিচয় তুলে ধরে, আর সেইটাই তার তাৎপর্য, যে তাৎপর্য তার উদ্দেশ্য থেকে পৃথক, অথচ সেই উদ্দেশ্য থেকেই তার উদ্ভব। এটা ম্যাজিক লণ্ঠনের মত একটা ব্যাপার, যে ম্যাজিক লণ্ঠন আমাদের বিশ্বের উপর আমাদের প্রকৃত সত্তাকে প্রক্ষেপ করে এবং আমাদের এই প্রতিশ্রুতিই দেয় যে, ইচ্ছা করলে, বিশ্বকে আমরা পরিবর্তিত করতে পারি, আমাদের প্রয়োজনের মাপ অনুযায়ী তাকে পরিবর্তিত করতে পারি। কিন্তু তা করতে হলে আমাদের বাস্তব প্রয়োজনগুলিকে আমাদের আরও গভীর ভাবে চিনতে হবে, নিজেদের সম্পর্কে নিজেদেরকেই আরও বেশি সচেতন করে তুলতে হবে। বহির্বাস্তবকে যতই আমরা আয়ত্বে আনতে পারি আমাদের শিল্পও তত বেশি বিকশিত হয়, তত বেশি বেশি করে তা সূক্ষ্ম হয়ে ওঠে, এই ম্যাজিক লণ্ঠনের খেলা আরও বেশি বেশি সূক্ষ্মতা ও নতুন নতুন সমৃদ্ধি লাভ করে। বিজ্ঞান আমাদের যে কথা জানাতে পারে না এবং ধর্ম যা কেবল জানানোর ভান করে, শিল্প আমাদের সেইটাই জানায়। আমরা কি এবং কেন আমরা এই রকম, কেন আমরা আশা করি, কষ্ট পাই, ভালোবাসি এবং মৃত্যুকে আলিঙ্গন করি—শিল্প আমাদের সেইটাই জানায়। শিল্প এসব কথা বিজ্ঞানের ভাষায় প্রকাশ করে না। ঈশ্বরতত্ত্ব ও অনুশাসন বাক্য যে ভাষায় বলার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না, যে একমাত্র ভাষায় এই সত্যগুলি প্রকাশ করা যায় সেই ভাষাতেই মাত্র শিল্প একে প্রকাশ করে। সে ভাষা হল অভ্যন্তরীণ বাস্তবের ভাষা, আবেগোদ্দীপক ও আবেগের ভাষা। আর প্রকৃতির সঙ্গে সক্রিয় সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, সেই সংগ্রামের সারমর্ম উপলব্ধি করার জন্য আমাদের প্রয়াসের সাহায্যে, যে সংগ্রামকে বলে জীবন তারই মধ্য দিয়ে এই ভাষার বাণী সৃষ্ট হয়।

এই সব কিছুই হল বিজ্ঞান যা করে তার বিপ্রতীপ চিত্র। বিজ্ঞানেরও একটা উদ্বর্তন মূল্য এবং একটা উদ্দেশ্য আছে। আর শিল্প যেমন অনিরূপকে বহির্বাস্তবের সঙ্গে অভিযোজিত করে ঠিক সেই রকম বিজ্ঞানও সেই উদ্দেশ্য সাধন করে বহির্বাস্তবকে অনিরূপের সঙ্গে অভিযোজিত ক'রে। শিল্প যেমন অনিরূপের অভ্যন্তরীণ বাসনাগুলিকে বহির্বাস্তবের উপর প্রক্ষেপ ক'রে এই অভিযোজনমূলক উদ্দেশ্য সাধন করে বিজ্ঞানও সেই রকম বহির্বাস্তবের বিন্যাসশৃঙ্খলাকে মনের

মধ্যে গ্রহণ ক'রে, বৈজ্ঞানিক মতাদর্শের অলীককল্পনামূলক দর্পণ-জগতের মধ্যে গ্রহণ ক'রে তার লক্ষ্যে পৌঁছায়। মানসের মধ্যে প্রক্ষেপিত হয়ে প্রয়োজনীয়তা হয়ে ওঠে সচেতন এবং বহির্বাস্তবকে মানুষ তার ইচ্ছা মত রূপ দিতে পারে। জনিরূপকে অভিযোজিত ক'রে এবং তার বৈশিষ্ট্যগুলিকে বহির্বাস্তবের মধ্যে প্রক্ষেপ ক'রে শিল্প যেমন জনিরূপটা যে কি তা আমাদের জানিয়ে দেয়, সেই রকম বহির্বাস্তবের প্রতিফলনকে মানসের মধ্যে গ্রহণ ক'রে বহির্বাস্তবটা যে কি বিজ্ঞান আমাদের তা জানিয়ে দেয়। আমরা যা কিছু, তার তাৎপর্য ও অর্থ শিল্প যেমন অনুভূতির ভাষায় আমাদের জানিয়ে দেয়, সেই রকম আমরা যা কিছু দেখি বিজ্ঞান জ্ঞানের (cognition) ভাষায় তার তাৎপর্য আমাদের জানিয়ে দেয়। একটা হল কালিক, পরিবর্তনধর্মী ; আর একটা হল স্থানিক এবং আপাতদৃষ্টিতে স্থির। এদের যে কোনও একটি সমগ্র বিশ্বের কোন অলীককল্পনামূলক প্রক্ষেপ সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু দুটিতে একত্রে, পরস্পরবিরোধী হওয়ার কারণে, দ্বন্দ্বমূলক এবং স্থান-কালগত, ঐতিহাসিক বিশ্বকে গড়ে তোলে। এরা নিজে নিজেই যে সেটা পারে তা নয়, সেটা পারে প্রয়োগের সাহায্যে ; মূর্ত জীবনযাত্রার সাহায্যে, যে জীবনযাত্রা থেকেই তাদের উদ্ভব। যে বিশ্ব গড়ে ওঠে তা হল বিস্ফোরণাত্মক, পরস্পরবিরোধী, গতিশীলভাবে পরস্পরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, এমন এক বিশ্ব। কারণ এগুলি হল বাস্তবের যে চলন থেকে তার সৃষ্টি, মানব জীবনের চলন, তারই বৈশিষ্ট্য।

তত্ত্বের ক্ষেত্রে শিল্প ও বিজ্ঞান পরস্পরবিরোধী, কিন্তু তা সত্ত্বেও পরস্পরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক ভূমিকা পালন করে। চিন্তনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান শিল্পকে বহির্বাস্তব থেকে নির্বাচিত অংশের একটা প্রক্ষেপ দেয় যেটাকে শিল্প সংগঠিত করে এবং আবেগোদ্দীপকভাবে চিত্তাকর্ষক করে। ফলে জনিরূপের কর্মশক্তি সেই বহির্বাস্তবের উপর তার ইচ্ছাকে আরোপ করার দিকে পরিচালিত হয়। এইভাবে মনোযোগ, কর্ম থেকে অন্তরের মধ্যে প্রবেশ ক'রে, শিল্পের মধ্যে দিয়ে আবার বহির্মুখে কর্মের দিকে নির্গত হয়। বহির্জগতের পরিবর্তনের প্রতি মনোযোগের ফলে চিন্তনের অভ্যন্তরমুখী চলনের উদ্ভব হয়। অভ্যন্তরভাগের পরিবর্তনের প্রতি মনোযোগের ফলে কর্মের বহির্মুখী চলনের উদ্ভব হয়। বহির্মুখী চলনের কর্মশক্তি যাতে নিজ লক্ষ্যকে প্রভাবিত করতে পারে সেই জন্য আবার বিজ্ঞানকে তার প্রয়োজন, এবং মূল প্রবৃত্তি-প্রতিরূপগুলিকে, যেগুলি এখন আবেগোদ্দীপকভাবে রূপান্তরিত, তাদের অভ্যন্তরীণ সম্পর্কগুলিকে আয়ত্ত করার জন্য পুনরায় বিশ্লেষণ করতেই হবে যাতে করে জনিরূপের বাসনাগুলিকে প্রভাবিত করা যেতে পারে।

চিত্তবের মধ্যকার বিজ্ঞান এখন কর্মের মধ্যকার বিজ্ঞান হয়ে ওঠে। যে যুক্তি-প্রতিরূপগুলি বর্তমান সেগুলির সাহায্যে ঐ বাসনাগুলিকে প্রভাবিত করার দ্বারা বহির্বাস্তবের প্রকৃত বিন্যাসশৃঙ্খলা সম্পর্কে আরও জ্ঞানলাভ করা যায়। অভীষ্ট লক্ষ্য লব্ধ হওয়ার মনোযোগ তার সম্পদের ভাণ্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করার জন্ম নতুন নতুন অভিজ্ঞতামূলক [empirical] অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে আসে। এই সমৃদ্ধতর বিবরণ জনিরূপের সাহায্যে আবেগোদ্দীপকগত দিক থেকে আবার সংগঠিত হয় এবং একটা লক্ষ্য মুখে পরিচালিত কর্মশক্তি হিসাবে আবার বহির্মুখে প্রবাহিত হয়। কর্মশক্তি সমাজের পরিবেশের দিকে সর্বদাই বহির্মুখে প্রবাহিত হচ্ছে এবং সেখান থেকে নতুন প্রত্যক্ষ সর্বদাই অন্তর্মুখে প্রবাহিত হচ্ছে। আমরা নিজেরা পরিবর্তিত হয়ে জগৎকে পরিবর্তিত করি। জগৎকে পরিবর্তিত ক'রে জগৎ সম্পর্কে আরও বেশি করে আমরা জ্ঞান লাভ করি। জগৎ সম্পর্কে বেশি জ্ঞানলাভ করে, আমরা নিজেদের পরিবর্তিত করি। নিজেদের পরিবর্তিত করে আমরা নিজেদের সম্পর্কে আরও বেশি করে জ্ঞানলাভ করি। আমরা যে কী সে বিষয়ে যত বেশি আমরা জ্ঞানলাভ করি ততই আমরা যে কি চাই সেটা আরও স্পষ্ট করে জানতে পারি। এই হল মূর্ত জীবনের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া বা ডায়ালেকটিক, যে মূর্ত জীবনে সংঘবদ্ধ মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে রত। তত্ত্বের ক্ষেত্রে জনিরূপ এবং বহির্বাস্তব পৃথক পৃথক ভাবে বর্তমান, কিন্তু সেটা একটা বিমূর্ত বিচ্ছেদ। এই বিচ্ছেদ যত বেশি হয়, এদের প্রত্যেকেরই অসচেতনতাও তত বেশি হয়। সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটলে আমরা এক দিকে পাই মানুষের বস্তুগত দেহ, আর এক দিকে পাই অজ্ঞাত পরিবেশ। পারস্পরিক ক্রিয়ার বিন্দু, অর্থাৎ মানস থেকে বিস্তারিত হয়ে আলোকের দুটি বিরাট গোলক যুগপৎ বাইরের দিকে বর্ধিত হতে থাকে। বহির্বাস্তব সম্পর্কে জ্ঞান—বিজ্ঞান; নিজেদের সম্বন্ধে জ্ঞান—শিল্প। এই গোলক দুটি যত প্রসারিত হতে থাকে, ততই যে বস্তুর উপর তাদের প্রাধান্য, পরস্পরের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা সেগুলিকে তারা পরিবর্তিত করতে থাকে। বহির্বাস্তবের জ্ঞাত ক্ষেত্র থেকে বর্ণ আহরণ করে জনিরূপের সচেতন ক্ষেত্রটি রঞ্জিত হয়ে উঠে এবং এর বিপরীতটাও ঘটে। এই পরিবর্তন—হৃদয়ের পরিবর্তন, পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই পরিবর্তন—কেবলমাত্র যে ঐ দুটি বৃত্তের প্রসারণের পরিণতি তা নয়। দুটি পরিবর্তনকে নিয়েই এই পরিবর্তন, ঠিক যেমন এক ঝলক আলো হল এক জোড় বিদ্যুৎ-চৌম্বকের তরঙ্গ। মানুষ যত বেশি বেশি করে স্বাধীন হয়ে উঠতে থাকে এবং সেই কারণে প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আরও বেশি মাত্রায় সচেতন হয়ে উঠে সে আরও বেশি বেশি করে স্বাধীন হয়ে উঠতে

থাকে, সেই রকম প্রয়োজনীয়তাও যতই আরও বেশি বেশি করে জনিরূপের সচেতন আয়ত্তের মধ্যে আসতে থাকে, ততই তা আরও বেশি বেশি শৃঙ্খলাযুক্ত ও "নিয়মানুবর্তী" হয়ে উঠতে থাকে এবং আরও বেশি করে সেইটাই হয়ে উঠতে থাকে।

অতএব শিল্প হল সবটাই সক্রিয় চিন্তন এবং বিজ্ঞান হল সবটাই চিন্তনমূলক ক্রিয়া [cognitive action]। ধ্যানের মধ্যে শিল্প হল সবটাই চিন্তনের বিষয়ীর সক্রিয় সংগঠন এবং ক্রিয়ার [action] মধ্যে শিল্প হল সবটাই চিন্তনের বিষয়ের সক্রিয় সংগঠন। ধ্যানের মধ্যে বিজ্ঞান হল সবটাই ক্রিয়ার বিষয়ীর চিন্তনমূলক সংগঠন এবং ক্রিয়ার মধ্যে তা হল সবটাই ক্রিয়ার বিষয়ের চিন্তনমূলক সংগঠন। বিজ্ঞান ও শিল্পের মধ্যকার যোগসূত্রটি, যে যুক্তিতে তারা একই ভাবার মধ্যে বিরাজ করে তা হল এই : ক্রিয়ার বিষয়ী আর চিন্তনের বিষয়ী—অর্থাৎ জনিরূপ, দুই-ই এক। ক্রিয়ার বিষয় আর চিন্তনের বিষয়—অর্থাৎ বহির্বাস্তব, দুই-ই এক। যেহেতু জনিরূপ বাস্তবের একটি অংশ, যদিও সেটা সেই বাস্তবেরই অপর একটি অংশের বিরুদ্ধে স্থাপিত তথাপি এই দুটিই পরস্পরের উপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে ; ফলে বিকাশ ঘটে ; মানুষের চিন্তা ও মানুষের সমাজ দুটিরই ইতিহাস থাকে।

শিল্প হল অনুভূতির বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হল জ্ঞানের শিল্প। কিছু করতে হলে আমাদের জানতেই হবে, কিন্তু কি করতে হবে সেটা আমাদের অনুভব করতেও হবে।

শিল্প সংগ্রামের মধ্য থেকে জন্ম নেয় ; কারণ সমাজের মধ্যে অলীককল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে একটা সংঘাত থাকে। এটা স্নায়ুরোগীর সংঘাত নয়, কারণ এটা একটা সামাজিক সমস্যা এবং সমাজের হয়ে শিল্পী তার সমাধান করেন। কবি একটা সামাজিক ভূমিকা পালন করেন এটা মনঃসমীক্ষকরা দেখেন না। তাঁরা কবিকে মনে করেন তিনি যেন এক স্নায়ুরোগী যিনি জনসাধারণের দৌলতে [at the expense of] তাঁর কমপ্লেক্সগুলিকে ধীরে ধীরে কমিয়ে ফেলেন। কোন শিল্পকর্মের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মনঃসমীক্ষক সেই কারণে সেই প্রতীকগুলিরই সন্ধান করেন যেগুলি বিশিষ্টভাবে ব্যক্তিগত, অর্থাৎ নিউরোটিক, এবং সেই কারণে শিল্পের মনঃসমীক্ষণমূলক সমালোচনা সর্বদাই তার উদাহরণ এবং উপাদান খুঁজে পায় হয় তৃতীয় শ্রেণীর শিল্পকর্মের মধ্যে, না হয় উত্তম শিল্পকর্মের আকস্মিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। হ্যামলেট নাটকে তাঁরা দেখেন ইডিপাস-কমপ্লেক্স। কিন্তু এটা তাঁরা দেখতে পান না যে তা দিয়ে এই নাটকের মহান উক্তিগুলির বিশ্বব্যাপী শক্তির ব্যাখ্যা করা যায় না, অথবা অ্যান্টনি এণ্ড ক্লিওপাট্রা নাটকের একই পর্যায়ের মহত্ত্বকে বিশ্লেষণ করে ইডিপাস কমপ্লেক্সে পৌছান যায় না।

নিউরোটিক ব্যক্তি অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে নিজেকে আরোগ্য করতে পারে না। মনঃসমীক্ষক কখনও কখনও সেই নিউরোটিক ব্যক্তিকে আরোগ্য করেন। তার কারণ এই যে মনঃসমীক্ষক নিজে নিউরোটিক ব্যক্তির মানসের বাইরে থেকে একটা শক্তি বা চাড় দিয়ে খোলার বিন্দু সরবরাহ করেন। তিনি সমাজের একজন সদস্য এবং সেই কারণে বাহিরে থেকে অভ্যন্তরের দিকে, সামাজিকভাবে সৃষ্ট সচেতন মানসের অভ্যন্তরে, নিউরোটিক ব্যক্তির "উত্তম সত্তার" ["better self"] মধ্যে কাজ করতে পারেন এবং ফলে অচেতনকে, তার "নিকৃষ্ট সত্তাকে" ["worse self"] আক্রমণ করতে পারেন। উত্তম সত্তা বা সচেতন মানস বা বিবেক হল সমাজের সৃষ্টি, আর নিকৃষ্ট সত্তা হল জনিরূপগত, আমাদের মধ্যে যে পশু আছে সেইটা।

মনঃসমীক্ষক একজন মানুষ মাত্র এবং একটা নিকৃষ্ট সত্তার অধিকারীও বটে। তাঁর এই নিকৃষ্ট সত্তাটি তাঁর নিজের এবং রোগীর মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। মনঃসমীক্ষক হলেন এক বিলাসের সামগ্রী। একমাত্র ধনী ব্যক্তিরাই এই বিলাসের খরচ যোগাতে পারে। শিল্পের মধ্যে সমস্ত সমাজটা, সামাজিক সৃষ্টিতে যুক্ত সমস্ত সচেতন মানসের সমষ্টিটা, মানুষের "উত্তম সত্তার" সঙ্গে কথা বলে। সমাজের যাঁরা সেরা সেরা মানুষ ছিলেন, জীবনের সমস্যাগুলির সঙ্গে যাঁরা অবিরাম মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং তার সমাধান করেছিলেন, জাতির শিল্পগত সংস্কৃতির পিছনে সারি বেঁধে তাঁরা শক্তি যোগান। তাঁরা দেবতা ছিলেন না, মানুষ ছিলেন। তাঁরাও তারই মত কষ্ট পেয়েছিলেন, লড়াই করেছিলেন। কিন্তু যখন তাঁরা মারা গেলেন পিছনে রেখে গেলেন তাঁদের ক্ষণস্থায়ী জীবনের চিরস্থায়ী সারবস্তু। এই কারণেই সান্ত্বনা দেওয়ার, আরোগ্য করার এবং উদ্দীপনা যোগানর শক্তি শিল্পের থাকে।

বাস্তবের প্রতি নিউরোটিক বা সাইকোটিক ব্যক্তির আবেগগত মনোভাব হল স্থায়ী। সৃজন কর্মে নিমগ্ন শিল্পীর বা পাঠরত পাঠকের এই আবেগগত মনোভাব হল ক্ষণিক। প্রকৃত বিভ্রমের সারধর্ম হল এই যে তা অ-প্রতীকধর্মী এবং নমনীয়। নিউরোটিক ব্যক্তি বিভ্রান্ত হয়, তার কারণ কমপ্লেক্সটি তার অচেতনের মধ্যে বিদ্যমান; সে অ-স্বাধীন। শিল্পী কেবল মায়ামুক্ত হন, কারণ কমপ্লেক্সটা তাঁর চেতনার মধ্যে বিদ্যমান, তিনি স্বাধীন। আমরা যখন একটা কবিতা পড়ি তখন কবিতার প্রকাশিত মনোভাবটা আমরা গ্রহণ করি এবং কবিতার আবেগগুলির অভিজ্ঞতা লাভ করি [experience] এবং তারপর কবিতাটির অভিজ্ঞতালাভ করা হয়ে গেলে এই মনোভাবটিকে পরিত্যাগ করি। সচেতন আবেগের সাহায্যে

মনোভাবটি মুক্ত হয়েছিল ; যেমন কমপ্লেক্সটা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলে নিউরোটিক মনোভাবটি শিথিল [unfrozen] হতে পারে ; যেমন উদ্দীপকটি যদি ইঙ্গিত ক্রিয়া [wiked-action] দাবি করে তবে নিদ্রিত ব্যক্তি জেগে ওঠে। শিল্পকর্মের মধ্যে শিল্পী বংশপালিত কমপ্লেক্সকে মুক্ত করেন এবং সে যে নতুন করে সৃষ্টি করতে চলেছে, চিরপরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে জনিরূপের যে চির-অভিযোজন চলছে তাকে নিয়ে আবার পরীক্ষানিরীক্ষা করতে চলেছে সেটা সে 'ভুলে যায়'। কাব্য যদি ধর্ম হয়ে ওঠে, অপ্রতীকধর্মীকে যদি প্রতীকধর্মী মনে করা হয়, তাহলে আবেগগত মনোভাবটি নিউরোটিক মনোভাবের মত জমাট হয়ে যায় [frozen]। অর্থাৎ, ধর্মের সঙ্গে তুলনায়, বিরেচন [catharsis] ঘটানর পক্ষে কাব্যের বিভ্রমগুলির মূল্য এই যে সেগুলি বিভ্রম বলেই জানা থাকে এবং স্বপ্নের সঙ্গে তুলনায় সেগুলির মূল্য এই যে সেগুলি সামাজিক বলেই জানা থাকে।

কাব্যের আবেগগত মনোভাব যদি ক্ষণস্থায়ীই হয় তাহলে তার মূল্য কি ? মূল্য হল এই যে, অভিজ্ঞতা স্মৃতির উপর একটা ছাপ রেখে যায়। জীব সেটা সঞ্চয় করে রাখে এবং নিজের ক্রিয়াকে তার দ্বারা রূপান্তরিত করে। আজকের বিশ্ব দশ লক্ষ বছর আগে বিশ্বটা যা ছিল সেরকম নয়। কারণ সেই পরিমাণে তা আরও অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ, আরও ঐতিহাসিক। দু' হাজার বছর আগে সমাজ যা ছিল আজ আর তা নয়। কারণ তার সংস্কৃতি অনেক কিছুর মধ্য দিয়ে এসেছে, অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। সেইরকম একজন জ্ঞানী ব্যক্তিও তাঁর জীবনের পথে অনেক কিছু সহ্য করেন এবং অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তিনি যে কেবল বহির্বাস্তবের জ্ঞানই আহরণ করেছেন তাই শুধু নয়। কারণ সেরকম ব্যক্তিকে আমরা কেবলমাত্র "পণ্ডিত ব্যক্তি" এই আখ্যাই দিই এবং তাঁর পাণ্ডিত্যকে একটা নিস্ফলা, নীরস জিনিস মনে করি। জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের সম্পর্কেও জ্ঞানলাভ করেছেন। তাঁর আবেগগত অভিজ্ঞতালাভ ঘটে। এই দ্বিবিধ অভিজ্ঞতার জন্যই আমরা তাঁকে আখ্যা দিই জ্ঞানীব্যক্তি, তাঁর গোটা ইতিহাস তাঁকে একটা পরিপক্বতা, একটা ভারসাম্য, একটা প্রজ্ঞা দিয়েছে। অবশ্যই বিজ্ঞান বা শিল্প কোনটাই মূর্ত জীবনযাত্রার স্থান নিতে পারে না ; এরা তার পথনির্দেশক মাত্র।

কোনও সংস্কৃতির যে জ্ঞান অর্থাৎ আমাদের সামাজিক ঐতিহ্য, তা তার বিজ্ঞান এবং শিল্প দুইয়ের মধ্যেই নিহিত থাকে। এদের যে কোন একটি থেকে একপেশে জ্ঞানই পাওয়া যায় কিন্তু দু'টি একত্রে বহির্বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আত্মপ্রত্যয়পূর্ণ জীবকে দেয় পরিপক্ক প্রজ্ঞা, তেজ ও প্রশান্তি।

শিল্পের বিভ্রমটা তাহলে কি ? কিসের মধ্যে সেটা থাকে ? আবেগোদ্দীপক-

খণ্ড উপাদানের মধ্যে থাকে না। কারণ শিল্পগত আবেগ সচেতনভাবে অভিজ্ঞতা-লব্ধ হয় এবং সেই কারণে তা বাস্তব ও সত্য। আবেগের ক্ষেত্রে বাস্তব ও সত্য কথা দু'টি প্রয়োগ করলে তা দিয়ে শুধু এইটাই বোঝায় যে: বাস্তবে কি তার অস্তিত্ব ছিল?—মানসের মধ্যে কি সেটা উপস্থিত ছিল? কাব্যের আবেগ এই অর্থে অবশ্যই বাস্তব। আবেগ বহির্বাস্তবের যে খণ্ডটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—কাব্যে অর্থের সঙ্গে, উপন্যাসে কাহিনীর সঙ্গে—তার মধ্যেই তা হলে কাব্যের বিভ্রমটি নিহিত। বহির্বাস্তবের এই খণ্ডটির উদ্দেশ্য ছিল আবেগোদ্দীপককে একটা উপলক্ষ্য [subject] সরবরাহ করা, কারণ আবেগোদ্দীপক একটা সচেতন সিদ্ধান্ত [judgement] এবং সেই কারণে সেটা কোনও একটা কিছুর সম্পর্কে সিদ্ধান্ত। সুতরাং শিল্প হল বাহির্বাস্তবের নির্বাচিত খণ্ডগুলিকে নিয়ে আবেগো-দ্দীপকগত পরীক্ষানিরীক্ষা করা। পরিস্থিতিটা বিজ্ঞানের পরীক্ষানিরীক্ষার সমতুল। এই ক্ষেত্রে বহির্বাস্তবের একটি নির্বাচিত খণ্ডকে পরীক্ষাগারে স্থাপন করা হয়। এটা একটা নকল জগৎ, বহির্বাস্তবের যে অংশটিতে পরীক্ষকের আগ্রহ সেই অংশটির একটি অনুকরণ। সেটা কোনও শারীরবৃত্তধর্মী লবণদ্রবনে ডোবান একটা প্রাণীর হৃৎপিণ্ড হতে পারে, দু'টি পাত-এর মাঝখানে তড়িৎশক্তিসম্পন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার ধারা হতে পারে, অথবা একটা বায়ুপ্রবাহের মধ্যে একটা উড়োজাহাজের পাখা হতে পারে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই জগতের একটা "কৃত্রিম" [fake] খণ্ড এমন ভাবে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া হচ্ছে যাতে তাকে সুবিধামত ব্যবহার করা যায় এবং ততটাই মাত্র বিভ্রমাত্মক যে বাস্তব জীবনে আমরা সেটাকে যেমন দেখি প্রকৃতপক্ষে সেটা সেরকম নয়। সেটি আমাদের নিজেদের উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিন্যস্ত বহির্বাস্তবের একটি নির্বাচিত অংশ মাত্র। এটা হল "যেন সেইটা"। একইভাবে বৈজ্ঞানিক যুক্তিক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রতীকায়িত বহির্বাস্তব কখনই সমস্ত বহির্বাস্তব বা তারই একটা সরল খণ্ডমাত্র নয়, সেটা তা থেকে নির্বাচিত একটি অংশ। শিল্পের ক্ষেত্রে বাস্তবের খণ্ড আর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাস্তবের খণ্ডের মধ্যে পার্থক্য এই যে, সেই নির্বাচিত খণ্ডটি যে জগৎ থেকে আহরিত সেই জগতের সঙ্গে এই খণ্ডটির সম্পর্ক কি, বিজ্ঞানের আগ্রহ কেবলমাত্র সেটাতেই। অপরপক্ষে, শিল্পের আগ্রহ হল অনিরূপ এবং বাস্তবের নির্বাচিত খণ্ডটির যথাকার সম্পর্ক কি সেটাতেএবং সেইজন্যই সেই খণ্ডটির পিছনে যে সমগ্র জগৎ বিরাজ করছে সেটাকে তা হিসাবের মধ্যে আনে না। যদি "নকল জগৎ" এই শব্দের দ্বারা আমরা বহির্বাস্তবের বিভ্রমাত্মক খণ্ডটিকে, কাব্য ও বিজ্ঞান দুটিরই প্রতীকধর্মী অংশটিকে বোঝাই, তাহলে আমরা নীচের সম্পর্কটি দেখতে পাই:

বহির্বাস্তব নকল-জগৎ সামাজিক অহং

বিজ্ঞান শিল্প

অর্থাৎ, শিল্প ও বিজ্ঞান দুটিরই মধ্যে যেটি বর্তমান তা হল "বিভ্রম"। বিজ্ঞানের বিশিষ্ট [distinctive] আলোচ্য এলাকা হল বহির্বাস্তবের জগৎ, আর শিল্প ব্যাপৃত থাকে অভ্যন্তরীণ বাস্তবের এলাকা নিয়ে। যে বিন্যাসশৃঙ্খলা বা তর্কশাস্ত্রসম্মত ম্যানিফোল্ড বিজ্ঞানের ভাষার বৈশিষ্ট্য সেটা হল বহির্বাস্তবের সম্পর্কগুলি থেকে তার নকল জগতে প্রক্ষেপিত সেই অভ্যন্তরীণ গঠনটি। যে বিন্যাসশৃঙ্খলা বা আবেগোদ্দীপকগত ম্যানিফোল্ড শিল্পের ভাষার বৈশিষ্ট্য তা হল অভ্যন্তরীণ বাস্তবের থেকে তার নকল জগতে প্রক্ষেপিত সেই অভ্যন্তরীণ গঠনটি। অতএব আর একটা দিক থেকে ছকে ফেলে দেখান যেতে পারে :
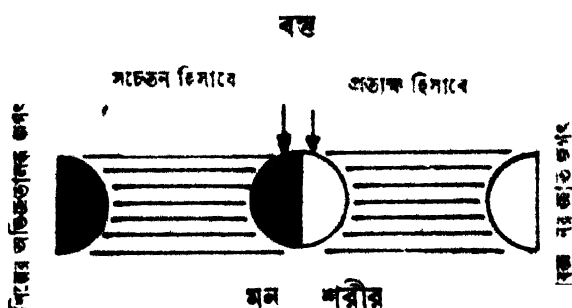
কিন্তু জনিরূপ যেহেতু নিজেই বহির্বাস্তবের একটা অংশ সেই কারণে আমরা এইভাবেও তাকে দেখতে পারি :

সুতরাং বিজ্ঞান ও শিল্প একত্রে একটা সম্পূর্ণ বিশ্বকে প্রতীকায়িত করতে সক্ষম যে বিশ্বের মধ্যে জনিরূপ নিজেও অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেকটি এককভাবে আংশিক কিন্তু দুটি অর্ধাংশ একত্রে একটা সমগ্রকে গড়ে তোলে; দুটি জোড়ালাগানো অংশের হিসাবে নয়, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রামে তারা মূর্ত জীবনযাত্রার প্রক্রিয়ার মধ্যে যেভাবে পরস্পরকে ভেদ করে সেই হিসাবে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কাব্যের ভবিষ্যৎ

ভবিষ্যৎ বলতে এক সময়ে এমন একটা জায়গা বোঝাত যেখানে মানুষ তার আশা আকাঙ্ক্ষাকে নির্বাসন দিত। অর্থাৎ এমন একটা জায়গা যেখানে বর্তমানের সংকীর্ণ বিধেয়গুলির সামনে জগতের আগামী সমৃদ্ধিকে তুলে ধরে মানুষ জগতের নির্দয়তার প্রতিশোধ গ্রহণ করত।

ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মানুষ কেবলমাত্র স্বপ্ন দেখতেই পারে—বেশি বা কম সাফল্যের সঙ্গে। তা সত্ত্বেও স্বপ্ন দেখার অর্থ "অবাধে" অদ্ভুতত্ব গড়ে তোলা নয়। তার অর্থ হল কিছু অলীককল্পনাকে পাওয়া, বর্তমান বাস্তবে কিছু প্রকৃত কারণের জন্য অতীত বাস্তবের স্মৃতি-প্রতিরূপগুলির এক ধরনের মিশ্র ও নতুন ধরনে সংগঠিত বিন্যাসকে পাওয়া। এমন কি স্বপ্নও নির্বিচ্ছিন্ন এবং স্বপ্নের মধ্যে কোনও চলন সম্ভবতঃ বর্তমানে স্বীকৃত নয় এমন কোনও বস্তুগত প্রক্রিয়ার স্পষ্ট হয়ে ওঠার এক বাস্তব চলনকে প্রতিফলিত করে। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সঠিকভাবে স্বপ্ন দেখা এই কারণেই সম্ভবপর হয়—বা অন্যভাবে বলতে গেলে, বিজ্ঞানসম্মতভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভবপর হয়। এই হল স্বপ্নের ভবিষ্যৎ বলার ও জগৎ সৃষ্টি করে তোলার ক্ষমতা। স্বপ্ন হওয়ার কারণেই যে তার এই জগৎ সৃষ্টি করে তোলার ক্ষমতা থাকে তা নয়—উন্মাদের অলীককল্পনা থেকে এই ক্ষমতা সৃষ্ট হয় না—স্বপ্ন এই ক্ষমতা লাভ করে এই কারণেই যে চিন্তার ক্ষেত্রে তা এমন এক চলনকে প্রতিফলিত করে যাতে, স্বপ্নের সাহায্যে কর্মের মধ্যে পুরোপুরি বাস্তবরূপ দেওয়া যায়। ফসল তোলার উৎসবের কাব্যের মত কর্মের পথনির্দেশক ও উদ্দীপক হিসাবে তার মূল্য থেকে এ তার সৃজনক্ষমতা আহরণ করে। এ হল সেই স্বপ্ন যা ইতোমধ্যেই স্বপ্নের ক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে এসে সমাজবিপ্লবের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। যে কোন একজন ব্যক্তির স্বপ্ন এটা নয়, এ হল সেই মানুষের স্বপ্ন যে মানুষ তার নিজের ব্যক্তিগত চেতনার মধ্যে একটা সমগ্র শ্রেণীর সৃজনশীল ভূমিকাকে প্রতিফলিত করে, যার চলন সমাজের বস্তুগত সর্তগুলির মধ্যেই প্রদত্ত।

সমাজের একটা জৈব অংশ হিসাবে, ইতিহাসের দিক থেকে—অর্থাৎ চলনের মধ্যে—কাব্য পাঠের গুরুত্বের উপর আমরা বার বার জোর দিয়েছি। কিন্তু চলনকে সম্পূর্ণভাবে সুস্পষ্ট করতে হলে সেই চলন কোথা থেকে কোথায় গিয়ে পৌঁছায় সেটার উল্লেখ আমাদের করতে হয়। তার অতীতের পর্যালোচনা করল

আমরা করছিলাম তখন আমরা ইতোমধ্যেই তার ভবিষ্যতের মধ্যে—আমাদের বর্তমানের মধ্যে দাঁড়িয়েছিলাম—কিন্তু এখন, তার বর্তমানকে বুঝতে হলে, আমাদের নিজেদেরকে ভবিষ্যতের মধ্যে নিয়ে চিন্তা করতে হবে। এ কাজ আমরা কেবল মোটামুটিভাবেই করতে পারি। সব থেকে মৌলিক ও প্রাথমিক শক্তিগুলি দ্বারা স্পষ্ট একটা পরিমাণগত চলন সম্পর্কেই মাত্র আমরা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি। প্রকৃত বিজ্ঞান হিসাবে সমাজবিদ্যা এখনও তার শৈশবাবস্থাতেই রয়েছে, কারণ বিজ্ঞান নিছক চিন্তা মাত্র নয়; বাস্তবের সঙ্গে সক্রিয় সংগ্রামের থেকে এর উদ্ভব, যে সংগ্রামের পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনগুলিকে একটা বিজ্ঞান-ভিত্তিক নিয়মের মধ্যে সাধারণীকৃত করা হয়। সুতরাং, সমাজবিদ্যার বিজ্ঞান বিপ্লবী কার্যকলাপের একটা ফল, কারণ এ সেই কার্যকলাপ যা সামাজিক বাস্তবকে পরিবর্তিত করে। নিজেকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে মানুষ এখনও শেখেনি।

আমাদের নিজেদের চেতনার মধ্যে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে এই চলনের উদ্ভব ঘটবে এবং এই চলনই হবে সেই শক্তি যা আমাদের চেতনাগুলিকে বর্ধিত ও রূপান্তরিত করবে। এইভাবে বুদ্ধির সম্পূর্ণ নতুন এক জগৎ জন্মলাভ করবে যাকে গুণের পরিভাষায় আমরা আর বর্ণনা করতে পারি না, যেমন কোন মানুষ উপর থেকে নীচের দিকে তাকিয়ে নিজেকে দেখতে পারে না।

প্রথম সীমাবদ্ধতাটি খুব বেশি যথাযথ ও বিশদ কোনও ভবিষ্যদ্বাণী করার ব্যাপারে আমাদের সাবধান করে দেয়—সামান্য একটুকু পরিবর্তন অনেক সময় একটি গুণকে তার বিপরীত গুণে রূপান্তরিত করে দিতে পারে। অপর সীমাবদ্ধতাটি ভবিষ্যতের নতুনত্বকে বর্তমানের বস্তাপচা পরিভাষায় খাটো করে তোলার বিরুদ্ধে আমাদের সজাগ করে দেয়।

পুঁজিবাদ যে উৎপাদিকা শক্তিগুলিকে অবারিত করেছিল এখন সেগুলি এমন এক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে যেখানে যে সীমাবদ্ধতাগুলি তাদের উদ্ভব ঘটিয়েছিল সেগুলির সঙ্গে আর তা সংগতি রাখতে পারছে না। এই সীমাবদ্ধতাগুলিকে এখন ভাঙা হচ্ছে এবং সেগুলি কম বেশি দ্রুত বেগে রূপান্তরিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনগুলি "স্বয়ংক্রিয়ভাবে" ঘটে না, কারণ ইতিহাস সৃষ্ট হয় মানুষের ক্রিয়ার দ্বারা, যদিও তাদের ক্রিয়াগুলি যে ফল-লাভের উদ্দেশ্যে করা হয় সব সময়ই যে সেগুলি পাওয়া যায় তা নয়। ইতিহাসের ফলগুলি হল মানুষ যে ক্রিয়াগুলি নিজের ইচ্ছায় করে তার

দ্বন্দ্বগুলির যোগফল, কিন্তু ইতিহাসের ফলগুলি কোনও মানুষের ইচ্ছানুযায়ী যে ঘটে তা নয়।

আজকের দিনে সমস্ত বুর্জোয়া সংস্কৃতি তার অন্তিম সংকটের নাভিশ্বাসের মধ্যে সংগ্রাম করছে। যে দ্বন্দ্বগুলির চাপ সমাজের উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশকে সর্বপ্রথম চালিত করেছিল সেই দ্বন্দ্বগুলি সেগুলিকে এখন ধ্বংস করছে এবং সামাজিক সম্পর্কগুলির এক নতুন ব্যবস্থা—সাম্যবাদের ব্যবস্থা [system] ইতোমধ্যেই পুরাতনের গর্ভ থেকে জন্ম নিচ্ছে। সাম্যবাদ একটা আদর্শ নয়, তা হল পুঁজিবাদের মধ্যকার পরিপক্ক হয়ে ওঠা দ্বন্দ্বগুলির অপরিহার্য সমাধান। একদিকে ফ্যাক্টরিগুলিতে সংগঠন বেড়ে ওঠে, অপরদিকে ফ্যাক্টরিগুলির পরস্পরের মধ্যে নিজস্ব লাভের জন্য প্রতিযোগিতা বেড়ে ওঠে। একদিকে উৎপাদিকা শক্তিগুলির অতুলনীয় বিকাশ; অপরদিকে একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যা ক্রমাগত সংকট সৃষ্টি ক'রে চলে যার ফলে উৎপাদনে সীমাবদ্ধতা দেখা দেয়। একদিকে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের বৃদ্ধি, চেতনার ঐক্য এবং উৎপাদনের পারস্পরিক সংযোগ, অপরদিকে, এক ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবাদ ও বৈরিতা। একদিকে ক্রমবর্ধমান শান্তির আকাঙ্ক্ষা; অপরদিকে ক্রমবর্ধমান যুদ্ধপ্রস্তুতি। নিষ্ক্রিয় পুঁজি মরীয়া হয়ে বিদেশে মুনাফার সন্ধান করছে; নিজের দেশে বেকার মানুষ বৃথাই কর্মের সন্ধান করছেন। সমাজের এক প্রান্তে ক্রমেই সংখ্যায় কমে যাওয়া ধনিক তন্ত্রীদের [plutocrat] জন্য যাদের হাতে এত বিপুল পরিমাণে বেড়ে ওঠা আয়, ক্ষমতা ও ক্রয়ক্ষমতা যা আগেকার সমাজের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল; অপর প্রান্তে বিপুল সংখ্যক এক জনসমষ্টি যারা এমন বিপুল মাত্রায় সম্পদহীন, কর্মহীন, আশাহীন যা আগেকার কোন সভ্যতা কখনও দেখেনি। একদিকে করণকৌশলের নতুন বিপুল সম্ভারে সমৃদ্ধ বিজ্ঞান ও শিল্পকলার দ্যুতি; অপরদিকে এগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রের সৃষ্টি, যাদের বিযুক্তি ও দ্বন্দ্ব জ্ঞানকে টেনে নামিয়েছে বিশৃঙ্খলায় আর মানুষকে টেনে এনেছে আত্মিক হতাশায়।

এই ধরনের আরও অনেক দ্বন্দ্বের উল্লেখ করা যেতে পারে, কারণ এগুলি সামাজিক সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে মৌলিক বুর্জোয়া দ্বন্দ্বগুলির রূপায়ণকে [working-out] সূচিত করে—স্বাধীনতাকে সূচিত করে সামাজিক সম্পর্কগুলি সম্পর্কে নৈরাজ্যমূলক অজ্ঞতা হিসাবে। এই অজ্ঞতা এটাই মাত্র বোঝায় যে স্বাধীনতা হল একটি শ্রেণীর ভ্রম, যে শ্রেণীর অস্তিত্ব নির্ভর করে তার নিজের

ভিত্তিকে নিজেই অবিরাম বিপ্লবাত্মক ক'রে তোলার উপর এবং সেই কারণে তার নিজের বিনাশের শর্তগুলিকেই অবিরাম গড়ে তোলার উপর। 'অবাধ' বাজার—অর্থাৎ, নৈরাজ্যের নিয়মগুলি যে অন্ধ নিয়মহীনতার সাহায্যে বীভৎসভাবে নিজেদের জাহির করে—চার শতাব্দী ধরে বুর্জোয়া মনকে যা দখল করে এসেছে। চার শতাব্দী ধরে এই একমাত্র স্বাধীনতাকে আদর্শায়িত করে এসেছে যে,যে সামাজিক বিধিনিষেধের সাহায্যে বুর্জোয়া শ্রেণী বেঁচে থাকে সেটি ছাড়া, অর্থাৎ উৎপাদনের উপায়গুলিকে বুর্জোয়া শ্রেণীর নিজের হাতে রাখার বিধিনিষেধটি ছাড়া—অন্য সমস্ত সামাজিক বিধিনিষেধের আওতা থেকে স্বাধীনতা। এই সূত্রটির অর্থ হল স্বাধীনতাকে আরও বেশি বেশি করে একটা অস্পষ্ট আদর্শের স্তরে উন্নীত করতেই হবে, কারণ বুর্জোয়া স্বাধীনতাকে বস্তুগতভাবে ব্যাখ্যা করার অর্থই হল উৎপাদনের উপায়গুলি একটি শ্রেণীর একচেটিয়া করে তোলার দাবিকে প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করা। স্বাধীনতার শর্ত হল সামাজিক উৎপন্ন, আর সেটাকে একচেটিয়া করার অর্থ হল সমাজ যে স্বাধীনতা সৃষ্টি করেছে সেই স্বাধীনতাকে একচেটিয়া করা। স্বাধীনতার এই বুর্জোয়া সূত্রটির সমস্ত আবরণ বাদ দিয়ে যে সারবস্তুটি সেটি খুবই সত্য—তা হল বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্য স্বাধীনতা। সমস্ত আবরণ বাদ দিলে এই সূত্রটির প্রকৃত তাৎপর্য উদঘাটিত হয়ে পড়ে। এইটাই দেখা যাবে যে মানব আত্মার সমান অধিকারের জন্য, ব্যক্তির স্বাধীনতার জন্য, ব্যক্তিগত গুণপনাকে সার্থক করার জন্য, সমস্ত বুর্জোয়া দাবিগুলি একটি ব্যাপারের সামনে এসেই থেমে যায়। সেই ব্যাপারটি হল সেই জিনিস যা এই দাবিগুলিকে শোষিত অধিকাংশ মানুষের জন্য বাস্তবায়িত করে তুলতে পারে। অল্পসংখ্যকের ব্যক্তিগত সম্পত্তির কথা উঠলেই এই দাবিগুলি থেমে যায়। অল্পসংখ্যকের ব্যক্তিগত সম্পত্তির শর্ত হল বহুসংখ্যকের সম্পত্তির বিলোপসাধন। অল্প-সংখ্যকের হাতে উদ্বৃত্ত সামাজিক উৎপাদন একচেটিয়া হয়ে ওঠার উপর আঘাত করার কথা উঠলেই এই দাবিগুলি থেমে যায়। অল্পসংখ্যকের হাতে উদ্বৃত্ত সামাজিক উৎপাদন একচেটিয়া হয়ে ওঠার শর্ত হল প্রয়োজনের কাছে বহুসংখ্যকের দাসত্ব। বুর্জোয়ারা অবশ্য এতে লজ্জা পেয়ে তাদের দাবিগুলি প্রত্যাহার করে নেয় না এবং স্বাধীনতা ও ব্যক্তির গুণপনার কথা বলা একেবারে বন্ধ করে দেয় না। বরং বিপরীতভাবে, তার সূত্রটির সারমর্ম যাদের স্বাধীনতা নেই তারা বুঝতে পারার ফলে বুর্জোয়ারা এই সূত্রটিকে বস্তুগত বাস্তব থেকে আরও বিচ্ছিন্ন করে তাকে পুরাপুরি একটা আদর্শলোকে উন্নীত

করতে বাধ্য হয়। এই আদর্শলোকে বুর্জোয়ার প্রবৃত্তি বিনা বাধায় মঞ্জুরিত হয়ে এবং প্রচারিত হয়ে আদর্শ স্বাধীনতার এক বিভ্রান্তীপ জগৎ সৃষ্টি করে যা একই সঙ্গে বাস্তব দুঃখকষ্টের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ, আবার বাস্তব দুঃখকষ্টের এক প্রকাশও—তা হল এক পুরাপুরি বুর্জোয়া অলীককল্পনা, ভাববাদীদের স্বর্গ। সমাজে মানুষের স্বাধীনতার পরিমাণ যত কমতে থাকে স্বাধীনতার ও ব্যক্তিগত কল্পনার এই অলীক আদর্শলোক ঠিক ততই তার সব থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিকাশে গিয়ে পৌঁছায়।

একটা শ্রেণী আছে যার স্বাধীনতাহীনতা বুর্জোয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর নির্ভরশীল। তার স্বাধীনতালাভের পথ হল বুর্জোয়া অধিকারের ধ্বংসসাধন এবং সেই কারণে সেই অধিকারের উপর যে শ্রেণীর ক্রমাগত অস্তিত্ব নির্ভর করে সেই শ্রেণীর ধ্বংসসাধন। এই স্বাধীনতাহীন শ্রেণী দীর্ঘকাল ধরে সর্বহারা শ্রেণী নামে খ্যাত। এই শ্রেণী যে আধুনিক সমাজের অদ্বিতীয় সর্বাধিক দুঃখকষ্টভোগকারী শ্রেণী, তা নয়। এই শ্রেণী সম্পর্কে বুর্জোয়াদের সেটাই ধারণা, আর ধারণাটিও বিশেষভাবে বুর্জোয়াদেরই। বুর্জোয়ারা কিন্তু এই শ্রেণীর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি দেখতে পায় না। শ্রেণীর অস্তিত্ব যেদিন দেখা দিয়েছে তখন থেকে আজ পর্যন্ত ইতিহাসে সর্বদাই সব থেকে বেশি দুঃখকষ্টভোগকারী একটি শ্রেণী দেখা দিয়েছে। প্রাচীন সমাজে ক্রীতদাস, মধ্যযুগের সমাজে ভূমিদাস ও কৃষক, আধুনিক সমাজে মজুরি দাস—অর্থনৈতিক উৎপাদন যেদিন এমন স্তরে উঠেছে যখন মানুষ তার অস্তিত্বটুকু বজায় রাখার থেকে বেশি উৎপাদন করতে পেরেছে এবং অন্য মানুষকে শোষণ করা যেদিন থেকে লাভজনক হয়ে উঠেছে সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত সমাজের বিবেকের দিক থেকে তাদের দুঃখকষ্ট আপাতদৃষ্টিতে দুরপনেয় হয়েই থেকেছে। "দরিদ্ররা সর্বদাই তোমার সংগে আছে"। ইহলোকের জীবনে ভাগ্যের একটা প্রয়োজনীয় অংশ হিসাবে মানব জাতির বেশির ভাগ অংশের দুঃখভোগ করাকে বুদ্ধ, খৃষ্ট ও পুরাণ স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং শান্তিশৃঙ্খলা ঠিক রাখার জন্য, দুঃখভোগীকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এবং সেই কারণে উৎপীড়িত মানুষের বিদ্রোহকে রোধ করার জন্য একটা মোটা অলীক পরলোকের আমদানি করেছিলেন।[1]

১। খৃষ্ট দরিদ্রদের জন্য এক স্বর্গরাজ্যের কথা প্রচার করেছিলেন যা নির্বাণের মধ্য দিয়ে বা পরলোকে নয়, যা এই পৃথিবীতেই স্থাপন করা যেতে পারে। সেই হিসাবে খৃষ্টের শিক্ষার একটা বিপ্লবী বিষয়বস্তু ছিল। বৈদিক

কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থনীতির চরম যে ভাবে তার মৃত্যুঘণ্টাবাদনকারী শ্রেণীর জন্ম দেয় তাতে সে তার ধ্বংসের ভিত গড়ে তোলে। সর্বহারাকে বড় বড় ফ্যাক্টরিতে সংগঠিত করে তোলার ফলে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এ এক ছায়া-প্রতিরাষ্ট্রের শর্তগুলির জন্ম দেয়; অবশ্য ক্ষমতার জন্য বুর্জোয়ারা প্রথমদিকের সংগ্রামগুলিতে শোষিত মানুষদের ব্যবহার করেছিল। সেই ব্যবহার করাটা সর্বহারাকে রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করে তোলে; নিজের শ্রমের উদ্বৃত্ত মূল্যের একটা অংশের জন্য তার সংগ্রামে নিজেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সর্বহারা শ্রেণীর নিজের সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজন তার রাজনৈতিক শিক্ষাকে এক উচ্চ স্তরে উন্নীত করে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির জন্য যে উন্নততর যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সর্বজনীন শিক্ষা প্রয়োজন হয় তা একে ঘনসংবদ্ধ করে তোলে। চিরস্থায়ী সংকট দৃঢ়মূল হওয়ার ফলে শাসন ব্যাপারে বুর্জোয়া তার চূড়ান্ত অযোগ্যতার প্রমাণ দেয়। এই সংকটে সে তার শাসিতদের তাদের দাসত্বের শর্তগুলির মধ্যে আবদ্ধ রাখতে অক্ষম হয়ে পড়ে, এবং তাদের দিয়ে নিজের খাদ্য যোগানর পরিবর্তে তাদেরই খাদ্য যোগাতে বাধ্য হয়, তাদের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বোঝাই করতে বা যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাতে বাধ্য হয়। চিরস্থায়ী বেকারির উত্থান একটা যুগের সর্বনাশকেই ডেকে আনে। সমাজের প্রাগৈতিহাসিক বা শ্রেণী-যুগের সমাপ্তি হতে চলেছে এই ঘোষণা ক'রে শ্রেণীবিভক্ত যুগে মানুষের কর্ম ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু যে ইতিহাস তারা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল সেটা ছিল ভিন্ন এক ইতিহাস।

পুঁজিবাদী প্রতিযোগিতার নিষ্করুণ বিধানে লাভের হার পড়ে যাওয়ার প্রবণতাকে ভারসাম্য দেওয়ার জন্য যা কিছুই করা হোক না তাকে তার পতনকেই ত্বরান্বিত করে। এই বিধান একচেটিয়া কারবারীদের উত্থানকেই বাড়িয়ে তোলে। এই একচেটিয়া কারবারীদের নিজেদের মধ্যে আরও তীব্র প্রতিযোগিতা দেখা দেয় এবং ফ্যাক্টরির মধ্যকার সামাজিক সংগঠন এবং

করা হয়েছিল তা থেকে এর ভাল প্রমাণ পাওয়া যায়। যাই হোক, এই স্বর্গরাজ্য যেহেতু অ-প্রতিরোধের সাহায্যে, স্বর্গীয় শক্তিগুলির দ্বারা এবং এক সাধারণ হৃদয়-পরিবর্তনের দ্বারা অর্জন করতে হয়, সেই কারণে এটা নিছক সংস্কারবাদ হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য এবং রোমক সাম্রাজ্যের নিপীড়িত মানুষদের কনস্তানটিনের সিংহাসনের পদে বেঁধে রাখার যন্ত্রে পরিণত হতে বাধ্য। আদিম খৃষ্টধর্ম যদি আদিম সাম্যবাদ হয় তাহলে রোমক সাম্রাজ্যের খৃষ্টধর্ম হল সোশ্যাল ডেমোক্রেসি।

ক্যাপিটালের ব্যক্তিগত মালিকানার ব্যবস্থার দ্বন্দ্ব চরম মাত্রায় ওঠা পর্যন্ত তা চলতে থাকে।

জনগণের অধিকাংশ তখন দেখতে পান তাঁদের সামনে উৎপাদনের উপায়গুলিকে যারা একচেটিয়া করেছে সেই অল্প সংখ্যক ব্যক্তি পথরোধ করে দাঁড়িয়ে। এই কেন্দ্রীভবন সমাজতন্ত্রের পথকে সুগম করা দূরে থাক, তাকে আরও বেশি যন্ত্রণাময় ও বিঘ্নসংকুল করে তোলে, কারণ যে বিশেষ সুযোগ-সুবিধাগুলি ভোগ করার উপর দাঁড়িয়ে সমস্ত পুঁজিবাদী অর্থনীতির চাকাটা ঘুরছে তার ক্রমবর্ধমান অযৌক্তিকতা তাকে টিঁকিয়ে রাখার জন্য আরও বেশি বেশি করে হিংস্র, ষড়যন্ত্রমূলক ও স্বৈরাচারী পদ্ধতি গ্রহণ করতে বুর্জোয়াকে বাধ্য করে। একটি মানুষের জন্ম দিতে মানুষের পক্ষে যে যন্ত্রণা তীব্রতম তা ভোগ করতে হয়, আর রাশিয়া জার্মানী ও স্পেনের ঘটনাবলী কমিউনিস্টদের সেই সাবধানবাণীর সঠিকতাকেই সপ্রমাণ করে যে যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই মাত্র নতুন সমাজের জন্ম হয়। এই নতুন সমাজ জন্মগ্রহণ করার পথে যারা সব রকমে বাধা দেবে, সব রকমের হিংসাত্মক আঘাত হানবে তারা জানে যে সেই আগামী জগতে তাদের স্বাধীনতাহীনতার ভিত্তির উপরেই গড়ে উঠবে অধিকাংশের স্বাধীনতা। তাদের হিংস্র আঘাতে জর্জরিত যন্ত্রণার মধ্য দিয়েই মাত্র নতুন সমাজের জন্ম হবে।

যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষের এই বিদ্রোহ, যা ইতোমধ্যেই রাশিয়াতে ঘটেছে, অধিকাংশের কাছেই তা একটি সাধারণ লক্ষ্যে পৌঁছানর কোনও সুস্পষ্ট পথ নয়। পুঁজিবাদের চূড়ান্ত বিস্ফোরণের ফলে আহত সমস্ত শ্রেণী— শ্রমিক, কৃষক, ছোট জোতদার, ব্যবসায়ী, কারিগর, মিস্ত্রী, শিল্পী, বিশেষজ্ঞ—এই সমস্ত শ্রেণীগুলিকে নিয়ে সেই বিদ্রোহী জনতা গড়ে ওঠে: অবস্থাটা যে অসহ্য হয়ে উঠেছে সে বিষয়ে সকলেই এক মত। কিন্তু পুরাতন ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলে নতুন একটা ব্যবস্থা গড়ার জন্য কেবল মাত্র একটি শ্রেণীই তার জীবনযাত্রার সর্তগুলির কারণে সংগঠিত। অন্যান্য শ্রেণীগুলি এই ব্যবস্থার—পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের—অংশ হিসাবেই মাত্র সংগঠিত এবং ঐ ব্যবস্থাকে ভাঙার অর্থই হল তাদের সংগঠনের যে একটি মাত্র উপায় আছে সেটাকে বিলোপ করা। একমাত্র শিল্প-শ্রমিকরাই তাদের ট্রেড ইউনিয়ন, কো-অপারেটিভ ও রাজনৈতিক পার্টিগুলির মাধ্যমে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগঠিত, এবং সেইজন্যই তাঁরা একটা কাঠামো দিতে পারেন যা আকস্মিকভাবে সমাজকে উলটিয়ে দিতে পারে এবং নীচের দিকটাকে উপরের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

এই বিশেষ গুণটি থাকার জন্যই শিল্প-শ্রমিকরা শ্রেণীসংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। তাদের বিপুল সংখ্যা ও সংগঠন ছাড়া যাবতীয় অন্য বাধা তাদের বিপক্ষে। পুরাতন ব্যবস্থায় বুর্জোয়ারা কর্তৃত্ব করে এবং সর্বস্ব বিচারব্যবস্থা, পুলিশ, সৈন্যবাহিনী, সিভিল সার্ভিস, মুদ্রানীতি ও ব্যবসায় বাণিজ্যের চাবিকাঠিগুলি নিজের একচেটিয়া অধিকারে রাখে। বুর্জোয়া অর্থনীতির অভ্যন্তরে বাস করার ফলে সমস্ত মানুষের মনই বুর্জোয়া পূর্বসিদ্ধান্ত দ্বারা বিকৃত হয়ে থাকে। কিন্তু বস্তুগত শর্তগুলির চাপ সর্বহারাকে তাদের আগে ক্রীতদাসেরা ও কৃষকরা যেমন বিদ্রোহ করেছিল সেইরকম কেবল যে বিদ্রোহ করার দিকেই নিয়ে যায় তাই নয়, সাফল্যের উপায়গুলি—তার নিজস্ব সংগঠন ও পুঁজিবাদের ঘনীভবন—তার হাতে তুলে দেয়। এটা আগেকার বিদ্রোহগুলির থেকে ভিন্ন ধরনের ঘটনা। সর্বহারার সংগঠন, যা এই প্রথম যুগের বিদ্রোহে কার্যতঃ তার হাতে নেতৃত্ব তুলে দেয় তা এই যুগের সাফল্যের পর সর্বহারার একনায়কত্বের মধ্যে প্রকাশ পায়। মার্ক্সীয় বিশ্লেষণের বিষয়গুলির মধ্যে এটিকে সব থেকে বেশি নিন্দা করা হয়েছে এবং সব থেকে কম বোঝা হয়েছে, কারণ এটা সেই শ্রেণীরই সৃজনশীল ভূমিকাটিকে প্রকাশ করে যে শ্রেণীকে বুর্জোয়া কখনও কখনও "সব থেকে বেশি দুঃখকষ্টভোগকারী" বলে গণ্য করলেও তাকে "সব থেকে বেশি অগ্রসর" বলে কখনই স্বীকার করতে পারে না।

দুঃখকষ্টভোগকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ পুরাতন ব্যবস্থার ধ্বংস দাবি করছেন, কিন্তু তাঁদের সকলেই এটা বোঝেন না যে এই দাবির অর্থ হল একটা নতুন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। পেটি-বুর্জোয়ার কাছে সর্বদাই মনে হয় যে ইতিহাস পিছনের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় এবং সেই যুগে ফিরে যাওয়া যায় যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি শোষণের একটা উপায় মাত্র ছিল না। কারণ যন্ত্রপাতিগুলি তখন যথেষ্ট অনুন্নত ছিল এবং যথেষ্ট ইতস্ততঃ ছড়ানো ছিল যার ফলে সেগুলি নিয়ে যে ব্যক্তি কাজ করত সেগুলির মালিক সে হতে পারত না। মালিক ও উৎপাদনকারী ছিল একই ব্যক্তি। সর্বহারা জানে যে যন্ত্রপাতির ব্যক্তিগত মালিক যেমনভাবে হওয়া যায় সেইভাবে ফ্যাক্টরিগুলির ব্যক্তিগত মালিকানা লাভ করা যায় না। সর্বহারার তাতে কোন আক্ষেপ নেই, বরং সে বোঝে যে পুঁজিবাদী অর্থনীতির সমগ্র বিকাশ, যেহেতু তা ফ্যাক্টরিতে সংগঠনের এবং শ্রমের সামাজিকীকরণের উদ্ভব ঘটিয়েছে, সেই কারণে সমাজের উৎপাদিকা শক্তিগুলিকে এমন এক স্তরে উন্নীত করেছে যেখানে মুষ্টিমেয়ের স্বাধীনতা এখন আর বহুর স্বাধীনতাহীনতার উপর নির্ভর করে না।

সকলের জন্য স্বাধীনতা যোগাবার পক্ষে সামাজিক উৎপাদন এখন যথেষ্ট। সর্বহারা বিপ্লবের পর যে সামাজিক উৎপাদিকা শক্তি দেখা যায় তার ক্রমকে দ্রুত করা সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বের বিশেষ কর্তব্য। তার মধ্যে অতীত শ্রেণীগুলি ধ্বংসের মধ্য দিয়ে এই শিক্ষাই পায় যে ইতিহাসকে পিছনের দিকে ফেরান যায় না। এখন একটা স্তর, নতুন স্তরে পৌঁছতে হবে। আর যখন এটা তারা বুঝতে পারে তখন জনগণ সাধারণভাবে হয়ে ওঠে সমাজতান্ত্রিক, এবং সর্বহারার একনায়কত্বও লোপ পেতে শুরু করে। নতুন সোভিয়েত সংবিধানের জন্মের মধ্য দিয়ে ইতোমধ্যেই তার পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে। এই নতুন সংবিধান সকলের জন্য সমান অধিকার দিয়েছে, সাম্যবাদের সর্বোচ্চ স্তর হিসাবে নয়, সাম্যবাদের দিকে নতুন অগ্রসরতার সূত্রপাত হিসাবে। সাম্যবাদ যখন গড়ে উঠবে একমাত্র তখনই রাষ্ট্রের কাঠামো থেকে সমান "অধিকারের" ধারণা দূর হয়ে যাবে এবং রাষ্ট্রও লোপ পেয়ে যাবে। অন্তরের সঙ্গে সংবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মানুষের এই "অধিকারই" বুর্জোয়াদের সমান অধিকারের ধারণাকে, যা ছিল তাদের আকাঙ্ক্ষিত শ্রেষ্ঠ নীতিশাস্ত্র, বুর্জোয়ার সমান অধিকারের সেই ধারণাকে নাকচ করে দেয়। বুর্জোয়া সংস্কৃতিতে সাধারণ মানুষ ছিল বাজারে শ্রমশক্তির সমান হয়ে থাকার একটা প্রতিফলন। "প্রত্যেকে, তার ক্ষমতানুযায়ী থেকে প্রত্যেকে, তার প্রয়োজন অনুযায়ী"। বিভিন্ন মানুষের অন্তর্নিহিত যোগ্যতা এবং বাসনার যখন তারতম্য দেখা যায় সাম্যবাদের মত একটা মতবাদের তখন সমান অধিকারের সঙ্গে কি করে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সম্ভব? অধিকারের মধ্যে অন্যের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার মত একটা কিছু অন্তর্নিহিত থাকে, আর সাম্যবাদ হল সমাজের একটা অবস্থা যেখানে বস্তুগত সর্তগুলি আর এখন মানুষকে মানুষের শত্রু হতে বাধ্য করে না।

বিত্তবান ও বিত্তহীনের মধ্যে সংঘর্ষকে, যে সংঘর্ষ সমাজকে বিকলাঙ্গ করে তুলতে পারত সেই সংঘর্ষকে, নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের উদ্ভব। একান্ত সংঘর্ষ থেমে গেলেই অসাম্যের প্রতিকার হয় না, কারণ এই কালে এই অসাম্য শ্রমের বর্ধিত উৎপাদনশক্তির স্তরে পৌঁছানোর সর্ত। শ্রমবিভাজন বিত্তবান ও বিত্তহীনের মধ্যকার বিভেদ ঘটিয়েছে। সমাজের ভরাডুবি না ঘটিয়ে রাষ্ট্র এই অসাম্যের ক্রমিক অস্তিত্বকে সম্ভব করে। বিত্তবান ও বিত্তহীনদের স্বার্থ যেহেতু পরস্পরের বিরোধী সেই কারণে অসাম্যের এই ক্রমিক অস্তিত্বকে রাষ্ট্র বজায় রাখতে পারে একমাত্র দমন করে। রাষ্ট্র হল সেই দমনমূলক যন্ত্র যার

দ্বারা শাসকশ্রেণীর শোষণের শর্তগুলি বলপূর্বক বজায় রাখা হয়। সম্পত্তির অধিকার এবং সমাজের বস্তুগত শর্তগুলির দ্বারা মানুষ যতদিন পরস্পরের বিপরীত স্বার্থে গোপন যুদ্ধে রত শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে থাকবে, ততদিন উভয় শ্রেণীরই আপাতঃ ঊর্ধ্বে এক দমনমূলক শক্তির আবির্ভাবের সাহায্যেই তার সাময়িক যুদ্ধবিরতির অবস্থা বজায় রাখা যেতে পারে। এই শক্তি হল রাষ্ট্র।

বুর্জোয়া শ্রেণীর সম্পত্তি বুর্জোয়াকে তার স্বাধীনতা দিয়েছিল। এই সম্পত্তি হল সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বাধীনতাহীনতার শর্ত। এই সংখ্যাগরিষ্ঠরা যখন বুর্জোয়াকে সম্পত্তি থেকে অধিকারচ্যুত ক'রে নিজের পাল্টা স্বাধীনতা অর্জন করে তখন বুর্জোয়ার স্বাধীনতাহীনতা হয় তাদের নিজেদের স্বাধীনতার শর্ত। কিন্তু অন্যান্য শাসক শ্রেণীর মত বুর্জোয়াদের নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য একটা শোষিত স্বাধীনতাহীন শ্রেণীর প্রয়োজন হয়। সর্বহারার কিন্তু তার নিজের স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য বুর্জোয়াকে টিঁকিয়ে রাখার প্রয়োজন হয় না। এইভাবে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সমাপ্তির শর্তগুলি গড়ে ওঠে।

বুর্জোয়া এবং তার সহযাত্রীরা যতদিন কোন জাতির অভ্যন্তরে অথবা বাহিরে থাকে সর্বহারার জন্য স্বাধীনতার শর্তগুলিকে বজায় রাখার উদ্দেশ্যে দমনমূলক যন্ত্র হিসাবে সর্বহারার রাষ্ট্রের অস্তিত্বও ততদিন অবশ্যই থাকবে। বুর্জোয়া শিক্ষার জের এবং তাদের বিশেষ সুবিধাভোগী জীবন থেকে পাওয়া বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা সম্পত্তিচ্যুত বুর্জোয়াকে বিপজ্জনক শত্রু করে তোলে। তাদের স্বাধীনতার আদর্শের বস্তুগত ভিত্তিকে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে সমাজকে হিংসার মধ্যে ডুবিয়ে দিতে যে কোন সময় তারা বলপ্রয়োগ করতে প্রস্তুত থাকে। কিন্তু তাদের অস্তিত্বের শর্তগুলি অর্থনীতিতে প্রোথিত থাকে না—শোষণের উপায়গুলি ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। একের পর এক রাষ্ট্রে বুর্জোয়ারা লোপ পেতে থাকে এবং বুর্জোয়া যত লোপ পেতে থাকে রাষ্ট্রও তত লোপ পেতে থাকে। কারণ রাষ্ট্র হল সমাজে শ্রেণীবিভাজনের প্রকাশ, যার মূল থাকে অর্থনীতির বস্তুগত শর্তগুলির মধ্যে এবং মানুষের চেতনাকে তা প্রভাবিত করে। যখন সমস্ত মানুষের চেতনা উৎপাদনের বুর্জোয়া শর্তগুলি যারা কখনও ভোগ করেনি সেই সব মানুষের চেতনা হয়ে ওঠে, তখন রাষ্ট্রের আর সমাজ থেকে পৃথক একটা কিছু এবং রাষ্ট্রের উপর ক্ষমতা-বিস্তারকারী কিছু হয়ে থাকার প্রয়োজন থাকে না। আপাতঃ অন্তহীন যুদ্ধ বা কখনও শান্ত কখনও প্রকাশ্য কিন্তু সর্বদাই ট্র্যাজিক ও হিংস্র, এখন তা বন্ধ হতে পারে। কারণ অবশেষে দুঃখকষ্টভোগকারী এক শ্রেণীর আশাআকাঙ্খা আর ঈশ্বরের বিরুদ্ধে

বা শত্রুজাতের বিরুদ্ধে বা ইহুদীদের বিরুদ্ধে বা অজ্ঞাত দেশে বিদেশের অধোগত শ্রেণীভুক্ত মানুষের বিরুদ্ধে বা মনের অন্য কোনও কাল্পনিক উৎসের বিরুদ্ধে মোড় ফিরিয়ে দেওয়া হয় না, বরং তার মোড় ফিরিয়ে দেওয়া হয় সেই বস্তুগত শর্তগুলির বিরুদ্ধে যা শ্রেণী হিসাবে তাদের জ্বালাযন্ত্রণার সৃষ্টি করেছিল। একবার যদি সেটি তার সঠিক উৎসের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় তাহলে এই ঘৃণা, এই যন্ত্রণার অবসান ঘটে। এই অবসান শান্তিপূর্ণভাবে ঘটে না, কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠরা দেখতে পায় যে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আছে সেই শ্রেণী যার সুখের ভিত্তি হল ঠিক সেই শর্তগুলিই যেগুলির অবসান সংখ্যাগরিষ্ঠরা ঘটাতে চায় এবং সেই কারণেই সেই শর্তগুলিকে হিংসার দ্বারা রক্ষা করতে তারা প্রস্তুত।

কিন্তু এই যুদ্ধ হল শেষ যুদ্ধ। এই প্রচণ্ড বিপ্লবে সর্বহারা পার্টির ভূমিকা হল সেই শ্রেণীর অগ্রবর্তী বাহিনী হওয়া যে শ্রেণীর বিষয়গত শর্তগুলিই তাকে এই সমগ্র উৎক্রান্তির নেতা করে তুলেছে। অগ্রবর্তী বাহিনী হওয়ার অর্থ হল নেতৃত্ব দেওয়া, ঘটনার স্রোতে ভেসে যাওয়া নয়; তার অর্থ এটাও যে, এটি যে শ্রেণীর সংগঠিত মোর্চা সেই শ্রেণীর সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রাখতে হবে, সেই শ্রেণীর পথপ্রদর্শক তত্ত্ব ও আকৃতিনির্ধারক ইচ্ছার সক্রিয় প্রকাশ হতে হবে।

পার্টি এই ভূমিকা তাহলে কি করে পালন করতে পারে?—সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বকে প্রকাশ করার জন্য, দমন করা যাতে আর সম্ভবপর না হয় সেই কারণে দমনের শেষ ব্যবহারের জন্য সম্পত্তিচ্যুত শ্রেণী সম্পর্কে আজকের রাশিয়ায় পার্টি যা হয়েছে তা না হয়ে আর কি হতে পারে? পার্টি সেখানে এইরকম হয়েছে যাতে সে মুক্তিপ্রাপ্ত সংখ্যাগরিষ্ঠের নেতা হয় সেইজন্য; কোনও দমনমূলক অধিকারের কারণে হয়নি। বরং যেহেতু তা পরিচালিতদের লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষাকে স্পষ্ট ও পূর্ণভাবে প্রকাশ করে সেই কারণেই তা হয়েছে সেইজন্যই আমরা এই বিশেষ দৃশ্য দেখতে পাই যে একটা পার্টি যা রাষ্ট্রের মধ্যে সংখ্যালঘু, এবং পার্টি হিসাবে যার কোনও অধিকার বা ক্ষমতা নেই সেই পার্টিই—সমকালীন সোভিয়েত সমাজের সমস্ত যন্ত্রগুলিতে এই পার্টির সদস্যরাই যে অভিভাবকত্ব প্রয়োগ করে তার দ্বারা—যে শ্রেণীর অভিজ্ঞতাকে সে সর্বদাই সংক্ষিপ্ত আকার দিয়ে প্রকাশ করে, সেই শ্রেণীর কার্যকলাপকে সর্বত্র পথনির্দেশ দেয়। কিন্তু ভিন্ন একটা সংগঠন হিসাবে সমাজের নেতৃত্ব-দানকারী সদস্যদের সংগঠন যতই দমনমূলক হোক না কেন, সামাজিক উৎপাদন এখনও অসম্পূর্ণ হয়ে থাকার কারণে সমাজে স্বাধীনতাহীনতার একটা সূত্র

অবশেষ যে রয়ে গেছে তা সূচিত হয়। সামাজিক উৎপাদনকে যখন এমন পর্যায়ে উন্নীত করা যাবে যখন সমাজের সমস্ত সদস্যই তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাতন্ত্র্যকে পূর্ণভাবে বাস্তব রূপ দিতে সক্ষম হবে, একমাত্র তখনই সমাজতন্ত্রের যুগ শেষ হতে পারে এবং সাম্যবাদের যুগ সুরু হতে পারে। তখন পার্টিও লোপ পেয়ে যাবে, কারণ তখন তা এমন এক স্তরে প্রসারিত হয়েছে যেখানে সকলকেই তা অন্তর্ভুক্ত করে, এবং সেই কারণে তখন তা আর একটা পার্টি থাকবে না। একমাত্র তখনই মানুষ প্রয়োজনের জগৎ থেকে স্বাধীনতার জগতে পুরাপুরি প্রবেশ করবে; প্রয়োজনকে অস্বীকার করে নয়, বরং ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রয়োজন সম্পর্কে পুরাপুরি সচেতন হয়ে উঠে মানুষ সেই স্বাধীনতার জগতে পুরাপুরি প্রবেশ করবে। অতীতে মানুষ বস্তুগত পরিবেশের প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতনতা অর্জন করেছিল কিন্তু সমাজ সম্পর্কে করেনি, এবং সেইজন্ত সেই সমাজের কংগুলির, যেমন যন্ত্র, ফসল তোলা, এবং সেইগুলি যে সম্পর্কাবলী সৃষ্টি করেছিল তার দাসত্ব তাকে করতে হয়েছিল। পরিবেশের প্রয়োজন সম্পর্কে সে যেভাবে সচেতন হয়ে উঠেছিল—তাকে পরিবর্তিত করার অভিজ্ঞতা দ্বারা—সেইভাবে ছাড়া অন্য কিভাবে মানুষ সমাজের প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে পারে? এইভাবে মানুষ স্বাধীনতার সাধারণ ও বিমূর্ত সত্যগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে এবং মূর্তভাবে যে কি করে বাস্তব রূপ দিয়েছিল তা নীচে দেওয়া গেল:

প্রকৃতির সঙ্গে তার সংগ্রামে (অর্থাৎ, স্বাধীনতার জন্ত তাদের সংগ্রামে) মানুষ পরস্পরের সঙ্গে কিছু সম্পর্ক স্থাপন করে যাতে করে সেই স্বাধীনতা সে জয় করতে পারে যে স্বাধীনতা অর্থনৈতিক উৎপাদনের জন্ত সংবদ্ধ মানুষ প্রকৃতিতে যে পরিবর্তন ঘটায় তা থেকে সৃষ্ট সামাজিক উৎপাদনের দ্বারা গঠিত। কিন্তু মানুষ নিজেকে পরিবর্তিত না করে প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করতে পারে না। মানুষ ও প্রকৃতি পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করে অথবা তাদের মধ্যে একটা প্রতিবর্তমূলক চলন ঘটে। প্রয়োজনীয় ও বিকাশমান সম্পর্কগুলি, যারই নাম হল সমাজ, তার মধ্যস্থতা করে। এই ব্যাপারটি সম্পূর্ণ বুঝতে পারাই হল প্রয়োজনের স্বীকৃতি এবং সেই প্রয়োজন কেবলমাত্র প্রকৃতির মধ্যকারই নয়, আমাদের নিজেদের মধ্যকারও এবং সেই কারণে সমাজের মধ্যকার প্রয়োজনও। বিষয়গতভাবে দেখলে এই সক্রিয় বিষয়ী-বিষয়গত সম্পর্কটি হল বিজ্ঞান, বিষয়ীগতভাবে দেখলে তা হল শিল্প; কিন্তু প্রয়োগের সঙ্গে সক্রিয় মিলনের মধ্য দিয়ে উদ্ভূত চেতনা হিসাবে তা হল সহজ

কথায় মূর্ত জীবনযাত্রা—ব্যক্তি ও প্রকৃতি দুই-ই যে জগতে বর্তমান সেই একই জগতে একমন বস্তু মানুষের যত কাজ করায়, অনুভব করায়, চিন্তা করায় ও আচরণের সমগ্র প্রক্রিয়া।

যে ধরনের বিশ্লেষণ এইমাত্র আমরা সম্পূর্ণ করলাম, আমাদের সমাজের চলনের এক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করলাম, কাব্য আলোচনায় সেটাকে একটা ভিন্ন ক্ষেত্রের কথা বলেই সাধারণভাবে গণ্য করা হবে। কিন্তু এতদূর অবধি যাঁরা ধৈর্য ধরে আমাদের যুক্তি অনুধাবন করেছেন তাঁরা সমকালীন শিল্পের সঙ্গে এর প্রাসঙ্গিকতা এবং সমাজের যে ভিত্তি সর্বত্র শিল্প ও শিল্পীকে প্রভাবিত করছে সেই ভিত্তির বিপ্লবাত্মক রূপান্তরকে বাস্তব রূপদান করার গুরুত্বকে লক্ষ্য না করে পারবেন না।

২

এই প্রচণ্ড বিপ্লবাত্মক উৎক্রান্তি, যাতে সমগ্র উপরিকাঠামো "কম বেশি দ্রুতবেগে পরিবর্তিত" হয়, তা মতাদর্শের ক্ষেত্রে একটি সরল তাৎক্ষণিক চলনের দ্বারা সংঘটিত হয় না। এই উৎক্রান্তি, একটা বস্তুগত উৎক্রান্তি, উৎপাদিকা শক্তিগুলির এবং সামাজিক সম্পর্কগুলির সমগ্র ব্যবস্থার একটা পরিবর্তন এবং এই বস্তুগত চলনগুলি মানুষের চেতনায় প্রতিফলিত হয়, যে চেতনায় সমস্ত সংগ্রামগুলির নিষ্পত্তি হওয়া পর্যন্ত লড়াই চলে। এই উৎক্রান্তি সবে শুরু হয়েছে, কিন্তু ইতোমধ্যেই শিল্পের ক্ষেত্র জুড়ে তার প্রভাব অনুভূত হচ্ছে। এই সংগ্রামের সমস্ত বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধ বিকাশের মধ্যে তার প্রভাব অনুভূত হচ্ছে। কেবলমাত্র বিপ্লবের প্রকৃতিই নয়, যে ভবিষ্যৎ সমাজের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চাপ চেতনার স্তরের নীচে যে বিস্ফোরণ ঘটছে তা থেকে প্রতিটি উৎক্ষিপ্ত খণ্ডের গতিপথের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে, সেই ভবিষ্যৎ সমাজের প্রকৃতিকেও কিছুটা বুঝতে না পারলে আধুনিক শিল্পকে বোঝা অসম্ভব।

আমরা সর্বহারা শ্রেণীর শিল্পের কথা বলি। এটা এমন একটা শিল্প যা সর্বহারা শ্রেণীর নিজের চলনকেই প্রকাশ করে, আর এই চলন হল সমগ্র সমাজের সঙ্গে সমাপতিত হয়ে ওঠার দ্বারা শ্রেণী হিসাবে নিজের অস্তিত্বের বিলোপসাধন। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের ভূমিকা ছিল সমস্ত চেতনাকে একটি কেন্দ্রে নিয়ে জড়ো করা এবং ফলে বিজ্ঞান ও শিল্পের বিকাশকে সম্ভব করা। তাহলে সর্বহারা সমাজ নিজের বৈশিষ্ট্যসূচক চেতনাকে বিকশিত করার আগে বুর্জোয়া শিল্পের থেকে একটা ভিন্ন রূপ হিসাবে সর্বহারা শ্রেণীর শিল্পের অস্তিত্ব কি করে সম্ভব? আর এটা পূর্ণ মাত্রায় ঘটতে পারে কেবলমাত্র তখনই যখন

সর্বহারা শ্রেণীর স্বাধীনতা বুর্জোয়া স্বাধীনতাকে অতিক্রম করে গেছে—কারণ চেতনা হল বস্তাবর্গের মধ্যে সেই সামাজিক উৎপাদনের প্রতিফলন যে সামাজিক উৎপাদন সেই সর্বহারার অস্তিত্বকেই সুনিশ্চিত করে। শিল্পও একটা উৎপাদনগত সমস্তা।

সর্বহারা শ্রেণীর চেতনা, যখন তা বুর্জোয়া চেতনার সমান স্তরেরও হয় তখনও, উন্নততর গুণসম্পন্ন হবে। তার কারণ এই যে, বুর্জোয়া স্বাধীনতা ও চেতনা ছিল সমাজের একটি শ্রেণীর একচেটিয়া এবং তা কেবলমাত্র সেই শ্রেণীটির আকাঙ্ক্ষা ও অভীষ্টকে প্রকাশ করত। বুর্জোয়া শিল্প এই কারণেই একজন মানুষের শিল্প, যার জীবদেহের অর্ধেকটা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। বুর্জোয়া শ্রেণী একটা শ্রেণী নয় বা একটা সংখ্যালঘু গোষ্ঠী নয় এই অর্থে যে এটি কম বেশি এলোমেলোভাবে বেছে নেওয়া মানুষের একটি গোষ্ঠী: এই ধরনের লোকেরা যে কোন ক্ষেত্রে বাস্তবের একটি সম্পূর্ণ ও নিটোল চেতনা চমৎকারভাবে প্রকাশ করতে পারে—যে কোনও সমাজে শিল্পী বা বৈজ্ঞানিকরা এই ধরনের একটি সংখ্যালঘু গোষ্ঠী হবে। কিন্তু বুর্জোয়া শ্রেণী হল একটা অর্থ নৈতিক শ্রেণী—এই শ্রেণী তার সমগ্র বস্তুগত পারিপার্শ্বিক ও জীবনযাত্রা প্রণালীর পার্থক্যের দ্বারা সূচিত একটি শ্রেণী; এ একটা শ্রেণী, একটা স্বতন্ত্র সমাজ নয়। সুতরাং এই শ্রেণী সমাজের মূর্ত জীবনযাত্রার অংশ মাত্র। জীবনের বাকি অংশটির চলন অপর শ্রেণীর চিররাত্রির অন্ধকারের মধ্যে বিলীন হয়ে যায় এবং সেখান থেকে চেতনার দিবালোকে বেরিয়ে আসে রূপান্তরিত হয়ে—কী ভাবে যে এটা ঘটে কোনও বুর্জোয়া তা জানে না। কীভাবে সেটা ঘটে তা জানার অর্থই হল আর বুর্জোয়া না থাকা। সেই কারণেই বুর্জোয়া দৃষ্টির চূড়ান্ত অসম্পূর্ণতা এবং বস্তুগত দ্বন্দ্ব, যা হল শ্রেণী বিচ্ছেদের কারণ, যা যতই বাড়তে থাকে চিন্তন এবং কর্মের মধ্যকার ব্যবধানও ততই বাড়তে থাকে। অস্থি থেকে মাংস বিচ্ছিন্ন হওয়ার মত সামাজিক চেতনা সামাজিক কর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আধুনিক চেতনাতে যে অ.ঘাত ক্ষতের চিহ্ন দেখা যায় তা এইটাই প্রমাণ করে যে মানুষ এই টানাহেঁচড়া সহ্য করতে পারে না।

শাসক শ্রেণীর মেরুতে আটকিয়ে থাকা চেতনা সংকুচিত ও আড়ষ্ট হয়ে যায়, কারণ সেটা তার কেন্দ্রকেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তা হয়ে ওঠে পণ্ডিতম্মন্য, প্রতিক্রিয়াশীল ও ফ্যাসিবাদী এবং তা জীবন্ত হয়ে শিলীভূত হয়ে পড়ে। শিল্পগত চেতনার বড় অংশটি এই বিচ্ছেদকে কাটিয়ে উঠতে পারে

না। একটা অংশ—তার মধ্যকার অন্তর্গত অন্তর ও সহজপ্রবৃত্তির তাগিদে—শোষিত শ্রেণীর মেরুর দিকে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু তার ফল হল চেতনার সমগ্র ক্ষেত্রটিকে ফাটিয়ে টুকরো টুকরো করে দেওয়া। এক বিশৃঙ্খল ও নেশাগ্রস্ত বিভ্রান্তি এবং দিশাহারা যন্ত্রণার আবর্তে নিষ্ঠাবান সমস্ত আধুনিক বুর্জোয়া শিল্পের পচে গলে পাক খেয়ে ঘোরার মধ্যে এই অসহনীয় চাপের প্রমাণ। আধুনিক বুদ্ধিজীবিদের চেতনার যন্ত্রণা থেকে মুক্তির দাবিতে লরেন্স ও তাঁর অনুগামীদের আর্ত চীৎকারের মধ্যে এবং বুর্জোয়া অভিজ্ঞতার গোটা ভূতের নৃত্যকে নিন্দা করে জয়েসের স্কিজোফ্রেনিয়া রোগীসুলভ দুরদৃষ্টির মধ্যে এর প্রকাশ দেখা যায়।

সহজপ্রবৃত্তি ও মূক অভিজ্ঞতা যারা বিপরীত মেরুর দিকে আকৃষ্ট হ'য়ে, সেখানে রক্ষিত হ'য়ে এবং সর্বহারার জীবনের সংগঠনী শক্তির দ্বারা স্পষ্ট হ'য়ে উঠে বুর্জোয়া শিল্পগত চেতনার কিছুটা অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং শোষিত ও বিপ্লবী শ্রেণীর মেরুতে তা লয় হয়ে থাকে। সেখানে এটা এমন এক চেতনার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে ওঠে যা ইতোমধ্যেই তাদের বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রক্রিয়াটি যখন থেকে উঠছিল তখনই সৃষ্ট হয়েছিল: ইতোমধ্যেই সৃষ্ট এই চেতনা শিল্পধর্মী হওয়ার থেকে বরং বিজ্ঞানধর্মী; আবেগধর্মী ও প্রকাশধর্মী হওয়ার থেকে বরং যুক্তিবুদ্ধিগত ও সক্রিয়।

এই নতুন চেতনা ক্রমে ক্রমে পুরাতন যুগের সমস্ত ছড়িয়ে পড়া উপাদানগুলিকে আকৃষ্ট করে। পুরাতন চেতনার সামগ্রিক আকার প্রায় লোপ পেয়ে যায়। বুর্জোয়া বিধেয়গুলির "বলয়রেখা" বরাবর সংগঠিত হয়ে ওঠে, পুরাতন উপাদানগুলি নতুনতর একটা সামগ্রিক আকারে প্রবেশ করতে পারার আগেই যাতে একে সম্পূর্ণভাবে চূর্ণ করা যায় সেটা প্রয়োজন। এই সামগ্রিক আকার সমাজের একটা সীমিত অংশের সৃষ্টি নয়। এই সামগ্রিক আকার এমন একটা শ্রেণীর সৃষ্টি হয়ে ওঠে, যে শ্রেণী সমগ্র মূর্ত জীবনযাত্রাকে অন্তর্ভুক্ত করার মত প্রসারিত হয়েছে। এই প্রসারণের প্রমাণ পাওয়া যাবে নতুন চেতনার পূর্ণতর বিষয়বস্তুর মধ্যে। এই বিষয়বস্তু এমন মানবগত বাস্তবের সমগ্র প্রক্রিয়া দ্বারা পুষ্ট হবে এবং তা ফুলের মত স্বৈবভাবে ফুটে উঠতে পারবে; যেমনটি ঘটেছিল উপজাতীয় সমাজে, কিন্তু তখন থেকে আজ পর্যন্ত যত করণকৌশলগত বিশদীকরণ উদ্ভূত হয়েছে তার সব কিছুই তাতে থাকবে। সর্বহারা শ্রেণীর শিল্প নিজেকে বাস্তব রূপ দান করার মত হয়ে উঠবে সাম্যবাদী শিল্প।

বস্তুগত অর্থনীতির ক্ষেত্রে যা ঘটবে মতাদর্শের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াটি তারই

সমাজবাদ। বুর্জোয়া অর্থনীতির বিষয়গুলির বিকাশের দ্বারা দুই শ্রেণীগুলির দুটি মেরুর মধ্যকার বিবর্তনধর্মী চলনের ফলে এক্ষেত্রে বুর্জোয়া উৎপাদনের উপাদানগুলি, উৎপাদিকা শক্তিগুলি কেটে বিশৃঙ্খল হয়ে যাচ্ছে। এগুলি যখন দ্রবীভূত হয়ে যাবে কেবলমাত্র তখনই উপাদানগুলিকে সমাজতন্ত্রের অধিকতর ফলপ্রসূ সংগঠনে বিন্যস্ত করা যাবে। কিন্তু এই অবকাশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির রূপগুলির প্রথম স্পষ্ট হয়ে ওঠা রূপরেখাটি ইতোমধ্যেই ট্রেড-ইউনিয়নের স্তর থেকে শ্রমিকদের শক্তির সোভিয়েত স্তরে বিকশিত হয়ে সর্বহারা শ্রেণীর মেরুতে একটি সংগঠক শক্তি হিসাবে দেখা দিয়েছে।

নানা মানুষের চেতনার মধ্যে এ সব কিছুর নিষ্পত্তি ঘটাতে হয়। শিল্পের ক্ষেত্রে এটা সর্বহারার সঙ্গে বুর্জোয়া শিল্পীদের ক্ষণস্থায়ী বা বিভ্রান্ত মৈত্রী হিসাবে এবং সর্বহারা শ্রেণীর শিল্পীদের আবির্ভাব (প্রথমে বুর্জোয়া কলা-কৌশলের সীমাবদ্ধতার মধ্যে তা দেখা দেয়) হিসাবে দেখা দেয়।

সর্বহারার সঙ্গে সম্পর্কে বুর্জোয়া শিল্পীর তিনটি সম্ভাব্য ভূমিকা আছে—বিরোধিতা, মৈত্রী বা সাঙ্গীকরণ। বিরোধিতার অর্থ হল প্রতিষেধিত বিষয়গুলিতে প্রত্যাবর্তন: বিগত দিনের প্রতিষেধিত রূপগুলিতে ফিরে যাওয়া আর সম্ভব নয়; সেগুলি নিজেদের বিলোপসাধন ঘটিয়েছে। তা করতে হলে "পিছু ফিরে যেতে" হয় এবং প্রায় পৌরাণিক কাহিনীমূলক বিষয়বস্তুতে ফিরে যেতে হয়, রক্তের টান এবং অবচেতন স্তরের ভাষায় জগৎকে ব্যাখ্যা করতে হয়। তাহলে প্রয়োজন হয় অহং এবং বহির্জগৎ দুটিকেই বর্বর করে তোলা, যাতে করে তার বিরোধীপক্ষের অনুকূলে একটা সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায় যেটা একমাত্র প্রতিক্রিয়ার সুবিধাভোগী শক্তিগুলির সঙ্গে মৈত্রী-ই হতে পারে। ইতিহাসের চাকাকে পিছনের দিকে ফেরানর এই প্রয়াস থেকে আমরা পাই স্পেংলারপন্থী, "আর্যপন্থী" ও ফ্যাসিবাদী শিল্প।

বেশির ভাগ বুর্জোয়া শিল্পীই বর্তমানে মৈত্রীর পথে চলেছেন—ফ্রান্সে জিদ; ইংলণ্ডে ডে লিউইস, অডেন ও স্পেণ্ডার—এবং সুররিয়ালিস্টদের অনেকেই একই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দিয়েছেন। এই ধরনের মৈত্রী কেবলমাত্র একটা "নৈরাজ্যবাদী" মৈত্রীই হতে পারে। বুর্জোয়া শ্রেণী যে সংগঠনের জন্ম দিয়েছে তার থেকে উন্নততর কোন সংগঠনের জন্ম দিতে পারে না—সে পারে জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের সংগঠনের জন্ম দিতে, যার চরম রূপ হল ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র। অতএব কোনও শিল্পী যদি এই সংগঠনকে বর্জন করে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন তাহলে সর্বহারা শ্রেণীর সৃষ্ট উন্নততর রূপগুলির মধ্যেই কেবলমাত্র তাঁরা

সংগঠিত হতে পারেন। কিন্তু এ পথ ত সাধীকরণের পথ, আর আমরা এখন আলোচনা করছি—যে বুর্জোয়া শিল্পীরা বৈরাগ্যাপন্ন করেন তাঁদের কথা, যার অর্থ হল তাঁরা সর্বহারার সংগঠনের মধ্যে প্রবেশ করেন না, "সহযাত্রী" হিসাবে তাঁরা সেই সংগঠনের কর্মীদের বাইরে থাকেন। বর্তমান সমাজের প্রতি তাঁদের মনোভাব সেইকারণে কেবলমাত্র ধ্বংসাত্মকই হতে পারে—সে মনোভাব হল নৈরাজ্যবাদী, শূন্যবাদী ও সুররিয়ালিস্ট। তাঁরা প্রায়ই বিপ্লবের জয়গান করেন যেন সেটা একটা বিরাট বিস্ফোরণ, যে বিস্ফোরণ তাঁরা যা কিছু তাঁদের পথের বাধা বলে মনে করেন তাকেই যেন চূর্ণ করবে। কিন্তু তাঁদের কোন গঠনমূলক তত্ত্ব থাকেনা—অর্থাৎ শিল্পী হিসাবে। অর্থনীতিবিদ হিসাবে তাঁরা সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক বিধেয়গুলিকে হয়ত স্বীকার করে নিতে পারেন, কিন্তু শিল্পী হিসাবে, যে শিল্প বুর্জোয়া শিল্পকে সরিয়ে সেই স্থান অধিকার করবে, সেই শিল্পের নতুন রূপ ও বিষয়বস্তু দেখতে পান না।

একথা তাঁরা জানেন যে বিপ্লবের এই বিরাট আতসবাজি প্রদর্শনীর পরে "একটা কিছু আসতেই হবে"। কিন্তু এই নতুন মূর্ত জীবনযাত্রার বিশিষ্ট সৌন্দর্য তাঁরা শিল্পীসুলভ স্বচ্ছ মন দিয়ে অনুভব করতে পারেন না। কারণ এই যে তার বাস্তব রূপ দিতে হবে সংগঠনকেই এবং সেইকারণে কেবলমাত্র যে সংগঠন নিজের অভ্যন্তরে ভবিষ্যতের নবজাত রূপরেখাকে ধারণ করে সেই সংগঠন থেকেই তাঁরা, সংজ্ঞা অনুসারে, বিচ্ছিন্ন। "একটা কিছুকে" সেই ভবিষ্যতে তাঁদের স্থাপন করতেই হবে এবং সেইজন্য বুর্জোয়া স্বাধীনতা ও বুর্জোয়া সাম্যের জন্য তাঁদের অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষাগুলিকে সেই জায়গায় স্থাপন করার প্রবণতা তাঁদের মধ্যে দেখা যায়। নিজেদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী তাঁরা সেই ভবিষ্যতের নতুন জগতের ছবি গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। সাম্যবাদকে ঘৃণা করে যে ফ্যাসিস্টরা, যারা নিজেদের আকাঙ্ক্ষার মাপে নতুন জগৎকে কেটে ছেঁটে ছোট করে নিয়ে তার বাধা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে আপাতঃ দৃষ্টিতে এটা তার থেকে খুব একটা ভিন্ন কিছু নয়। দুটি ক্ষেত্রেই ভবিষ্যতের একটা নকশা-চিত্র তুলে ধরা হয় যেটা আশ্চর্যজনকভাবে ব্যক্তিগত এবং আত্মিক দিক থেকে হিটলারী এবং। কিন্তু একটি ক্ষেত্রে সেটা পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে গড়ে উঠেছে, আর একটি ক্ষেত্রে সেটা সদুদ্দেশ্য ও অন্ধ পূর্বজ্ঞানে পূর্ণ।

সমকালীন বুর্জোয়া শিল্পীদের এই নৈরাজ্যবাদী অবস্থানটি অবশ্যই বুর্জোয়া বিদ্রোহের সেই পুরাতন ট্রাজেডিরই রকমফের মাত্র। প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বুর্জোয়া বিদ্রোহের প্রত্যেক স্তরেই পরস্পরবিরোধী বিষয়গুলির উপর

বুর্জোয়ারা জোর দেয়, যার ফলে যে জিনিসগুলিকে তারা ঘৃণা করে সেইগুলির অগ্রগতিকেই তারা ত্বরান্বিত করে। কিন্তু এটা সেই ট্র্যাজেডির এক নতুন রকমফের। এই শেষ পর্যায়ে বুর্জোয়া অর্থনীতির বিকাশকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করা হল সেটাকে ধ্বংস করতেই সাহায্য করা। সেই কারণে সর্বহারা শ্রেণীর এই মিত্ররা প্রকৃত বিপ্লবীই এবং তাঁদের কার্যকলাপের মধ্যে যে ধ্বংসাত্মক উপাদানটি থাকে সেটি নকল নয়, সেটি বাস্তব এবং সম্পূর্ণ। বিপ্লবের প্রতি গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী থাকার অসম্ভাব্যতা থেকেই তাঁদের বিচ্ছেদের সৃষ্টি।

তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীতে এই ট্রটস্কিসুলভ উপাদানটি নানাভাবে নিজেকে প্রকাশ করে। অপেক্ষাকৃত তরুণরা রোমান্টিক বিপ্লবী: বিপ্লবের বন্য ও ধ্বংসাত্মক অংশটা তাঁদের কাছে সব থেকে বেশি চমকপ্রদ মনে হয়: এবং অনেক ক্ষেত্রেই এটা সুস্পষ্ট যে হিংসাত্মক কার্যবিহীন বিপ্লব তাঁদের কাছে একটা মনের মত ব্যাপার হবে না। ১৮৪৮এ তাঁর ব্যারিকেডে লড়াইয়ের উল্লেখ করে বদলেয়র যখন বলেন, "আমি যখন রিপাবলিকপন্থী হতে রাজি হই তখন আমি জেনে শুনেই অন্যায়টা করি···আমি বলি: বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক! ঠিক যেমন আমি বলতে পারতাম: ধ্বংস দীর্ঘজীবি হোক! মৃত্যু দীর্ঘজীবি হোক!"—তখন তিনি এই বিপ্লবাত্মক মনোভাবকেই, যা আসলে চূড়ান্ত মাত্রায় নৈরাজ্যবাদী সেটাকেই প্রকাশ করেন।

এটা তাঁদের শিল্পের বিপ্লবী উপাদানটিকেও একটা ফ্যাসিস্ট ছাপ দেয়, কারণ তাঁরাও সেই একই উৎস থেকে তাঁদের ঘৃণা সংগ্রহ করেন, অর্থাৎ বুর্জোয়া বিকাশের ফলে পেটি-বুর্জোয়া দুঃখকষ্ট থেকে। যাই হোক, তাঁদের ক্ষেত্রে এই ঘৃণা তার প্রকৃত উৎসের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ পুঁজিবাদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত। আর ফ্যাসিস্টদের ক্ষেত্রে এই ঘৃণা পুরাণকাহিনীমূলক উৎসের বিরুদ্ধে—মার্ক্সবাদী, ইহুদী ও অন্যান্য জাতির বিরুদ্ধে পরিচালিত। (প্রকৃত সর্বহারা শিল্পের মধ্যকার ধ্বংসাত্মক উপাদান সর্বহারা শ্রেণীর দুঃখকষ্ট থেকে উদ্ভূত, সে দুঃখকষ্ট অন্য ধরনের)।

গঠনমূলক দিকে তাঁদের কাজের আবেগোদ্দীপকগত প্রসঙ্গ প্রায়ই অস্পষ্ট, অবিন্যস্ত ও বিভ্রান্ত: "আমার জন্য স্বাধীনতা" বা "সামাজিক বিধিনিষেধ থেকে স্বাধীনতার" একটা দাবি কোনও না কোন রূপে তার মধ্যে লুকিয়ে থাকে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নিয়ে একটা সামান্য উৎকণ্ঠিত দুর্ভাবনা তাতে থাকে আর থাকে পেটি-বুর্জোয়া সীমাবদ্ধতা ও আদর্শ থেকে তাঁদের সন্দেহজনক বিচ্যুতির কারণে সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লবী তত্ত্বের আশ্বাসবাণী বা সংশোধনের জন্য এদিক ওদিক ছটফট করে বেড়ান।

তাঁদের শিল্পের বিভ্রান্তির এটা একটা উৎস, যা প্রায়ই সেটাকে বিশৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে যায় বা তাঁদের নীরব করিয়ে দিতেও পারে। এটা অবশ্যই বুঝতে হবে যে সর্বহারা শ্রেণীর সংগঠনের মধ্যে সাঙ্গীভূত হতে এই "অস্বীকার করলেই" যে তাঁরা সম্পূর্ণভাবে সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী কর্মীদের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন তা অবশ্যই বোঝায় না। সর্বহারা শ্রেণীর সর্বাধিনায়কত্বে সর্বহারা বিপ্লব ঘটে; তার অর্থ এই যে, তাঁরা যদি সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তার অন্তরালে নিজেদের আবদ্ধ রাখতে না চান, যা আজকাল তাঁদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই করেন, তাহলে সর্বহারা শ্রেণীর সেনাপতিদের দেওয়া যুদ্ধযাত্রার নির্দেশ কিছুটা পরিমাণে এই শিল্পীদের অবশ্যই মেনে নিতে হবে। যেভাবে হোক সর্বহারা শ্রেণীর সঙ্গে তাঁদের কাজ করতেই হবে, এবং তার অবশ্যম্বীকার্য অর্থ হল ঐক্যবদ্ধ কাজের দায়িত্ব তাঁদের মেনে নেওয়া। এটা শিক্ষামূলক এবং উদাহরণস্বরূপ বলা যায় স্পেণ্ডার ও ডে লিউসের উপর তার যথেষ্ট প্রভাব পড়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে সর্বহারা শ্রেণীর পার্টিতে—কমিউনিস্ট পার্টিতে—তাঁদের যোগদান করা পর্যন্তও ব্যাপারটা প্রসারিত হতে পারে—কিন্তু এই শিল্পীদের বেশির ভাগেরই এই পদক্ষেপগ্রহণে চরম অনিচ্ছাটা হল লক্ষণসূচক। যাই হোক না কেন, তাঁরা যদি পার্টিতে যোগদানও করেন, তাঁদের মৈত্রীতে এই নৈরাজ্যবাদী গুণটি একটি বৈশিষ্টপূর্ণ রূপ নেয়। সর্বহারা শ্রেণীর সঙ্গে মিশে যাওয়ার জন্য, তার তত্ত্ব ও সংগঠনকে স্বীকার করে নেওয়ার জন্য মূর্ত জীবনযাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁরা প্রস্তুত একথা তাঁরা ঘোষণা করেন—কেবলমাত্র শিল্পের ক্ষেত্রেই নয়। সাধারণ একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই আপত্তির কোনও গুরুত্ব নেই—কিন্তু একজন শিল্পীর পক্ষে এটা পুরাপুরি ধ্বংসাত্মক, তার কারণ এই যে শিল্পী হয়ে ওঠাটাই হল তাঁর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়া। এর ফলে তাঁর জীবনযাত্রা এবং তাঁর শিল্পের মধ্যে ক্রমে ক্রমে একটা বিচ্ছেদ গড়ে ওঠে—বুর্জোয়া হিসাবে তাঁর শিল্প থেকে সর্বহারা হিসাবে তাঁর জীবনযাত্রা আরও বেশি বেশি করে ভিন্নমুখী হয়ে ওঠে। তাঁর সমস্ত সর্বহারা সুলভ আকাঙ্ক্ষাগুলি একটা মেরুতে জড়ো হয়, অন্য মেরুটিতে জড়ো হয় তাঁর সমস্ত বুর্জোয়াসুলভ শিল্প। একটা পারস্পরিক বিকৃতি ঘটানো ছাড়া এই বিচ্ছেদ অবশ্যই ঘটতে পারে না। তাঁর সর্বহারাসুলভ জীবনযাত্রা মার্কসবাদী বাক্যাবলীর এবং সর্বহারা শ্রেণীর জীবন্ত তত্ত্বের যান্ত্রিক প্রয়োগের স্থূল ও বিকট টুকরোর আকারে তাঁর শিল্পের মধ্যে ফেটে পড়ে। বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে সব থেকে বেশি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত তিন জন ইংরেজ কবির মধ্যে এটা খুব স্পষ্টভাবে দেখা যায়। তাঁর বুর্জোয়াসুলভ শিল্প বুর্জোয়া "স্বাধীনতা" ও অনিয়মানুবর্তিতা অথবা পার্টির বিপ্লবী

তত্ত্বের নেহাতই আপাতঃ বুর্জোয়া বিকৃতির অসাধারণ এবং সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় বিস্ফোরণ হিসাবে তাঁর সর্বহারাসুলভ জীবনযাত্রার মধ্যে ফেটে পড়ে। ফলে তাঁর শিল্পে একটা অচেতন অসাধুতা দেখা দেয়—বিপ্লবকে নিজের স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগানো। মানুষের অসাধুতার মত একটা অসাধুতা। এটা এই কারণেই ঘটে যে, বিপ্লবকে বুর্জোয়া স্বর্গলোকে পৌছানর একটা পথ হিসাবে তিনি দেখেন এবং তিনি জানেন যে তাঁর সঙ্গী বিপ্লবীরা ভিন্ন ধারণা পোষণ করেন। যাই হোক, বর্তমান ব্যবস্থার অবসান ঘটানর জন্য তিনি সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। এটা কেবলমাত্র অসাধুতা, কারণ এটা অচেতন—যদি প্রকাশ্য হ'ত তাহলে কাজ চলার মত উপযুক্ত একটা মৈত্রী হ'ত, একটা স্বীকৃত চুক্তি হ'ত যেমন সেইরকম চুক্তি গণফ্রন্টের [Peoples Front] বিভিন্ন দলগুলিকে রাজনীতির দিক থেকে ঐক্যবদ্ধ করে।

যেহেতু এই আপত্তি প্রধানতঃ শিল্পের ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়, সেই কারণে বিপ্লব নিয়ে এই শিল্পীর প্রধান দুর্ভাবনা হল বিপ্লবের পর শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁর স্বাধীনতার গ্যারান্টিকে কি করে সুনিশ্চিত করা যায়। অন্যান্য বেশির ভাগ লোকের কাছে যেটা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়—মূর্ত জীবনযাত্রায় ব্যক্তির স্বাধীনতা—সেটা সম্বন্ধে তাঁর আদৌ কোনও ভাবনা নেই। তিনি বোঝেন যে তাঁর অন্যান্য কাযকলাপ তখন আরও বেশি স্বাধীন হবে, কারণ এই অন্যান্য ব্যাপারে ইতো-মধ্যেই তাঁর একটা সর্বহারাসুলভ দৃষ্টিভঙ্গী হয়েছে। তাঁর চিন্তা হল এই যে শিল্প স্বাধীন হবে কি না, শিল্পের উপর কোন "সেন্সর ব্যবস্থা" থাকবে কি না। স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর সমস্ত কিছু ধারণা একটি শব্দের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে সমষ্টিকৃত—সে শব্দটি হল "সেন্সরব্যবস্থা"। তিনি রাশিয়া ভ্রমণে যান সেখানে লোকেরা স্বাধীন কিনা এটা দেখতে ততটা নয় যতটা শিল্পীদের উপর কর্তৃপক্ষ সেখানে "হস্তক্ষেপ করছেন" কিনা সেইটা দেখতে। আর তার ফলে মানুষ হিসাবে শিল্পী কি রকম হবে সেই সম্পর্কে তিনি এক সবিশেষ বুর্জোয়া ধারণায় গিয়ে পৌছান। বুর্জোয়া ধারণায় তাঁর ভূমিকা হল নিঃসঙ্গ নেকড়ে হয়ে ওঠা, তিনি এমন একজন মানুষ সমাজের জন্য যিনি সৌন্দর্যকে বাস্তব রূপ দেন কেবল মাত্র এই কারণেই যে সমকালীন সামাজিক বিধিনিষেধের আওতা থেকে তিনি মুক্ত। আর এই ধারণাকে তিনি সর্বহারা শ্রেণীর তত্ত্বের সঙ্গে জোড়াতালি দিয়ে লাগাবার চেষ্টা করেন।

এটা যে কেবল শিল্পীদের ক্ষেত্রেই বিশেষভাবে ঘটে অবশ্যই তা নয়, যেমন ধরুন বৈজ্ঞানিকরাও একইভাবে সর্বহারার সঙ্গে একটা মৈত্রী গড়ে তুলবেন; তাঁরা আপত্তি জানান শুধু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। তাঁরা রাশিয়া যান

সব রকমের "ত্যাগ স্বীকারে" প্রস্তুত হয়ে, যদি অবশ্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে কোনও হস্তক্ষেপ করা না হয়। বৈজ্ঞানিক যেন এক "নিঃসঙ্গ নেকড়ে" এই সবিশেষ বুর্জোয়া ধারণা তাঁরা গড়ে তোলেন। প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য—শিক্ষক, কৃষক, শাসনকার্যনির্বাহক, ঐতিহাসিক, অভিনেতা, অর্থনীতিবিদ, সৈন্য ও ফ্যাক্টরি-ম্যানেজার—যাঁরা সকলেই সর্বহারাশ্রেণীর সঙ্গে মৈত্রীস্থাপনের প্রয়োজন দেখতে পান, স্বেচ্ছায় এবং সচেতনভাবে সেটা বেছে নেন, এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সর্বহারার নেতৃত্ব স্বীকার করতে প্রস্তুত কেবল একটি ক্ষেত্র ছাড়া যেটি তাঁদের নিজেদের কাছে মূল্যবান এবং যেক্ষেত্রে বুর্জোয়া বিধেয়গুলি টিঁকিয়ে রাখা হোক এই দাবি তাঁরা করেন। এই সমস্ত বিভিন্ন পেটি-বুর্জোয়া দাবিগুলি যদি মঞ্জুর করা হয়, তাহলে সেগুলি যে একত্রিত হলে যে কোন সর্বহারা সমাজকেই প্রতিবিম্বিত করে দেয় এবং সেটা যে যে বর্তমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁরা বিদ্রোহ করছেনসেটাকেই টিঁকিয়ে রাখা হয় এই সত্যটা যে ব্যক্তিরা এই দাবি করছেন তাঁদের উপর অবশ্য প্রভাব ফেলে না, কারণ তাঁরা জীবনের সামগ্রিক ক্ষেত্র থেকে তাঁদের আগ্রহের বিশেষ ক্ষেত্রটিকে সযত্নে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছেন। এবং বৈজ্ঞানিক যে সর্বহারা হয়ে উঠছেন এটা দেখে ধরুন শিল্পী বেশ খুশি একথা বলা যায়। ঠিক এই কারণের জন্যই পেটি-বুর্জোয়া যত বেশি বিপ্লবী হয়ে ওঠে ততই তার নিজের সংগঠনগুলির ভিতর অন্যান্য বুর্জোয়া বিপ্লবীদের সঙ্গে সে আরও কম কাজ করতে পারে, আর তত বেশি করে সে সর্বহারা শ্রেণীর অধিনায়কত্বের অধীনে এক জন স্বতন্ত্র ব্যক্তি হয়ে ওঠে।

জীবন ও সর্বাধিক মূল্যবান ক্রিয়াটির মধ্যবর্তী এই দ্বৈতরাজ্য কেবলমাত্র এই কারণেই সম্ভব যে বুর্জোয়া সংস্কৃতির বিকাশের ফলে সমস্ত মতাদর্শ টুকরা টুকরা হয়ে শিল্প, দর্শন, পদার্থবিদ্যা, মনোবিদ্যা, ইতিহাস, জীববিদ্যা, অর্থনীতি, সংগীত, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এই ক্ষেত্রগুলির অভ্যন্তরীণ সংগঠন ও সাফল্য যত বাড়তে থাকে ততই পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এবং সাধারণ বিভ্রান্তিকে বাড়িয়ে তোলে। যে ভাবে ফ্যাক্টরির অভ্যন্তরের সংগঠন ফ্যাক্টরিগুলির মধ্যকার সংগঠনহীনতাকে বাড়িয়ে তুলেছে চিন্তার ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটি নিছক তারই সমতুল। এটা হল উৎপাদন সম্পর্কগুলির সঙ্গে উৎপাদিকা শক্তিগুলির সংগ্রাম, এটা হল বুর্জোয়া বিধেয়গুলির সঙ্গে বাস্তব উপাদানগুলির বিবাদ; এটা হল পুঁজিবাদের মৌলিক দ্বন্দ্বের একটা অংশ। অর্থনৈতিক বিভ্রান্তিকে সমন্বয়িত করা এবং তাকে উৎপাদনের এক নতুন স্তরে তোলা যেমন সর্বহারা শ্রেণীর কর্তব্য তেমনই এই মতাদর্শগত বিভ্রান্তিকে সমন্বয়িত করা এবং তাকে চেতনার এক নতুন স্তরে

উন্নীত করাটাও তার কর্তব্য। একটি কর্তব্য অপরটির পরিপূরক এবং এই দুটিরই একটি সাধারণ লক্ষ্য থাকে—সেটা হল মানবজাতির জন্য আরও স্বাধীনতা অর্জন করা।

এই সমস্ত বুর্জোয়া বিপ্লবীদের একই ভাষায় সম্বোধন ক'রে সচেতন সর্বহারা বলে :

"স্বাধীনতা সম্পর্কে আপনার ধারণার মূল যেহেতু সমাজের একটি অংশের মধ্যে নিহিত সেইকারণে তা আংশিকও বটে। সমস্ত চেতনাই যে সমাজ তাকে সৃষ্টি করে তার দ্বারা নির্ধারিত, কিন্তু যেহেতু আপনি নির্ধারণের এই পদ্ধতি সম্পর্কে খোঁজ রাখেন না, তাই মনে করেন যে আপনার চেতনা স্বাধীন এবং তা আপনার অভিজ্ঞতা ও ইতিহাস দ্বারা নির্ধারিত নয়। এই যে বিভ্রমটি আপনি এত গর্ব করে সবাইকে দেখিয়ে থাকেন সেটা আপনি যে অতীতের দাস তারই চিহ্ন, কারণ যে কারণগুলি আপনার চিন্তাকে নির্ধারিত করে সেগুলি আপনি যদি দেখতে পেতেন তাহলে আপনিও আমাদেরই মত হতেন, স্বাধীনতার পথের পথিক হতেন। সমাজের মধ্যকার প্রয়োজনকে স্বীকৃতি দেওয়াটাই হল সামাজিক স্বাধীনতায় পৌঁছানর একমাত্র পথ।

"কিন্তু আমরা যখন বলি, যে সমাজ চেতনাকে সৃষ্টি করে সেই সমাজই চেতনাকে নির্ধারিত করে তখন আমরা এইটাই বোঝাই যে চিন্তা শেষ পর্যন্ত মূর্ত জীবনযাত্রা থেকে, প্রয়োগ থেকে অবিচ্ছেদ্য। প্রত্যেকটিই অপরের স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করে এবং বিকশিত করে। আপনি মনে করেন যে তত্ত্বকে প্রয়োগ থেকে পৃথক ক'রে —এবং প্রয়োগের সঙ্গে জড়িত সামাজিক দায়িত্ব ও রূপগুলি থেকে তত্ত্বকে পৃথক ক'রে—আপনি চিন্তাকে "সেন্সর ব্যবস্থা" থেকে মুক্ত করছেন। আপনি আশা করেন চিন্তাকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করবেন এবং সেইজন্য এইটি ছাড়া অন্য সব কিছুকে সমর্পণ ক'রে মানুষের স্বাধীনতার একটি অংশকে যা হোক করে টিঁকিয়ে রাখবেন—সেই যেমন একটি লোক তার মুদ্রাটিকে বাজারে না খাটিয়ে গামছা জড়িয়ে তুলে রেখে দিয়েছিল তার মত। যাইহোক, স্বাধীনতা এমন একটা সামগ্রী নয় যা টিঁকিয়ে রাখতে হবে এবং পৃথক করে রাখতে হবে ; এটা হল জীবনযাত্রার মূর্ত সমস্যাগুলির সঙ্গে একটা সক্রিয় সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জাত এক শক্তি। অচেতন বুর্জোয়া বিধেয়গুলির শাসকের হাতে আপনি চিন্তাকে ছেড়ে দিচ্ছেন ; প্রয়োগ থেকে তার আত্মাকে আপনি কেড়ে নিচ্ছেন।

"বিধেয়গুলির থেকে অথবা নির্ধারক কারণগুলি থেকে মুক্ত কোন নিরপেক্ষ শিল্পের জগৎ নেই। শিল্প একটা সামাজিক কার্যকলাপ। আপনার স্বাধীনতা হল

স্বপ্নের যুযুক্তিপূর্ণ স্বাধীনতা বা চেতনার বাইরের শক্তিগুলির দ্বারা কঠোরভাবে নির্ধারিত হলেও নিজেকে স্বতঃস্ফূর্ত ব'লে মনে করে। শ্রেণীভিত্তিক শিল্প তার কার্যকারণতা সম্পর্কে অচেতন এবং সেই কারণে তা সেই পরিমাণে মিথ্যা ও স্বাধীনতাহীন, সর্বহারা শ্রেণীর শিল্প তার কার্যকারণতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে এবং সেইজন্য তা সাম্যবাদের প্রকৃত স্বাধীন শিল্প হিসাবে উদ্ভূত হবে। আপনাকে এই দুটির মধ্যে বেছে নিতেই হবে। সাম্যবাদী শিল্প ছাড়া আর কোনও শ্রেণীহীন শিল্প নেই, আর সেটা এখনও জন্মগ্রহণ করেনি; আর আজকের দিনে শ্রেণীভিত্তিক শিল্প, যদি তা সর্বহারাপন্থী না হয়, তাহলে তা একমাত্র মৃত্যুপথযাত্রী শ্রেণীর শিল্পই হতে পারে।

"আপনাদের শিল্পের বুর্জোয়া বিষয়বস্তুকে আমরা সমালোচনা করতেই থাকব। আপনারা এই "অর্থনৈতিক" বিধেয়গুলিকে স্পর্ধা করে পরিত্যাগ করেন, তার কারণ এই নয় যে সেগুলি সঠিক নয়, তার কারণ এই যে সেগুলি অর্থনৈতিক। কিন্তু সঠিক অর্থনৈতিক বিধেয়গুলি মূর্ত জীবনযাত্রা থেকে আহরিত বিধেয়গুলি ছাড়া কি অন্য কিছু? আমাদের শুধু এইটুকু দাবি যে জীবনের সঙ্গে শিল্পকে এবং শিল্পের সঙ্গে জীবনকে আপসহীন করতে হবে আপনাকে, শিল্পকে জীবন্ত করতে হবে আপনাকে। আপনি কি এটা দেখতে পাননা যে মন্দ এবং বুর্জোয়া বলতে যা বোঝায় তা হল এদের বিচ্ছেদটাই—আপনি কি বুঝতে পারেন না যে এই একটি ব্যাপারে আপনি আমাদের শত্রুদের পক্ষে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন—আপনি আমাদের মিত্র—আর সেই কারণেই এই বিষয়টি নিয়ে আমরা আপনার তত্ত্বের বিরুদ্ধে এত তীব্র লড়াই করি?

"আপনার শিল্প সর্বহারার শিল্প হওয়া উচিত বলে আমরা যে দাবি করি সেটা এই দাবি নয় যে আপনি শিল্পে বিচারবিযুক্ত বিধেয়গুলি এবং মার্কসবাদী বাক্যাংশ প্রয়োগ করুন। সেটা করা বুর্জোয়াসুলভ হত। আমরা চাই যে নতুন জগতে আপনি প্রকৃতই জীবনযাপন করুন, অতীতের মধ্যে আপনার আত্মাকে ফেলে আসবেন না। আপনার আত্মা শিল্পীর আত্মা, সেই কারণেই আমরা আপনাকে মূল্য দিই; আপনার শিল্প যদি বুর্জোয়াধর্মী হয় আপনার আত্মা তাহলে নতুন জগতে কি করে থাকতে পারে? আপনার শিল্প যখন জীবন্ত হয়ে উঠবে তখন আমরা জানব যে উৎক্রান্তি ঘটেছে; তখন তা হয়ে উঠবে সর্বহারার শিল্প। তখন তাকে প্রাণহীন বলে আমরা আর সমালোচনা করব না।

"আমাদের দাবি এই নয় যে আপনি যাকে সর্বহারার একনায়কতন্ত্র বলেন শিল্পের ক্ষেত্রে আপনি সেটাই স্বীকার করে নেবেন। বরং বিপরীতভাবে, যতক্ষণ

আপনি নিজের উপর একটা সর্বহারার একনায়কতন্ত্র জোর করে চাপিয়ে দেবেন এবং শিল্পের উপর যান্ত্রিকভাবে সেগুলিকে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে সর্বহারার মতাদর্শের অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে নানা সূত্রাকারে প্রকাশিত সামগ্রী আমদানি করবেন ততদিন পর্যন্ত আমরা বলব যে আপনি এখনও বুর্জোয়া রয়ে গেছেন। আমাদের দাবি—এই যে, আপনি, একজন শিল্পী, শিল্পের ক্ষেত্রে একজন সর্বহারা-শ্রেণীর নেতা হয়ে উঠুন ; দাবি এই যে, বুর্জোয়া শিল্পের বস্তাপচা বিষয়গুলিকে যান্ত্রিকভাবে এদিক ওদিক করে সাজানো বা অন্যান্য সর্বহারাধর্মী ক্ষেত্র থেকে বিষয়গুলিকে যান্ত্রিকভাবে আমদানি করা—এই দুটিসহজ পথের কোনওটিই আপনি গ্রহণ করবেন না। ঐ দুটি পথ মূলতঃ একই। সৃজনশীলতার কঠিন পথটাই আপনাকে নিতে হবে—সে পথ হল, শিল্পের বিষয়গুলিকে এবং করণকৌশলকে এমনভাবে নতুন রূপ দিতে হবে যে, যে নতুন জগৎ গড়ে উঠতে চলেছে তাকে সেটা প্রকাশ করবে এবং সেই নতুন জগৎ গড়ে ওঠারই সেটা একটা অংশ হয়ে উঠবে। তখন আমরা বলব যে আপনার শিল্প সর্বহারাধর্মী এবং জীবন্ত ; তখন বলব, আপনার আত্মা অতীতকে ফেলে এসেছে—অতীতকে তা টেনে নিয়ে এসে দাঁড় করিয়েছে বর্তমানের মধ্যে এবং ভবিষ্যতকে বাস্তব রূপ দিতে বাধ্য করেছে। আপনি এখন আর "শুধু একজন শিল্পী" (যার প্রকৃত অর্থ হল একজন বুর্জোয়া শিল্পী) নন ; আপনি এখন সর্বহারার শিল্পী হয়ে উঠেছেন।"

বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়ার, ফ্যাক্টরি-ম্যানেজার, ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিবিদকে সম্বোধন করে সর্বহারা মূলতঃ একই কথা বলে। কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তার কথা কেউ বোঝে না ; তার বাণীকে আনুষ্ঠানিক বা এমনকি নিষ্ঠাহীনও মনে করে। তর্কের মধ্য দিয়ে এই বিতর্কের সমাধান করা যায় না, কারণ এই মতভেদের মূল কথা হল এই যে বিবদমান পক্ষ দুটি দুই ভিন্ন জগতে বাস করে—একজন বাস করে বুর্জোয়া বিষয়ের জগতে, অপরজন সর্বহারা বিষয়ের জগতে। এর সমাধান অবশ্য প্রয়োগের জগতে সম্ভব, কারণ দুজনে সেখানে একই বাস্তব জগতে বাস করে। সেইজন্য সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অগ্রগতি তার বুর্জোয়া মিত্রদের সাক্ষী-করণকে ত্বরান্বিত করে। তখনও বুর্জোয়া বিপ্লবীরা বুর্জোয়া চেতনার জের টেনে চলে এবং ফলে কোন কোন চরিত্রের মধ্যে এক নৈরাশ্যজনক ফাটল সৃষ্টি হয় যা বিপ্লবের কোন কোন নেতার মধ্যে অধঃপতন ঘটানকে বিপ্লবের একটা নিয়ম করে তোলে। এটা যে কি ভাবে পুরাপুরি বিশ্বাসঘাতকতায় পরিণত হতে পারে তার উদাহরণ ট্রটস্কি, জিনোভিয়েভ এবং কামেনেভের ঘটনায় মিলবে। আর এক দিকে শিল্পীকে পূর্ণ বিকশিত হতে এই "পিছুটান" বাধা দিতে পারে ; বিপ্লবের পর বুর্জোয়া

শিল্পের বিধেয়গুলিকে সৃজনশীলভাবে পুনর্বিন্যাস করার এই অক্ষমতা যে সংঘাতের জন্ম দেয় ইয়েসেনিন, মায়াকভস্কি, পিলনিক ও যুবি ওলেশা-দের জীবন ও শিল্পকর্ম তার উদাহরণ। এই অবকাশে, সর্বহারার ক্ষেত্রে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিকাশের দ্বারা সাঙ্গীকরণের সমগ্র প্রক্রিয়াটি ত্বরান্বিত হয়।

একদিকে, সর্বহারার জীবন যাপন করেন এমন মানুষরা বর্তমান বুর্জোয়া বিধেয়গুলির পরিভাষায় এইগুলিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন, অর্থাৎ, তাঁরা বর্তমান বুর্জোয়া শিল্পের ইতোপূর্বেই অস্তিত্বশীল করণকৌশলকে ব্যবহার করেন। স্বভাবতঃই প্রথম দিকে একটা অনিশ্চয়তার চিহ্ন তাতে থাকায় সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী বিধেয়গুলিকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে একটা দৈন্য তাতে থাকায় এই প্রচেষ্টা থেকে সেই জিনিসের সৃষ্টি হয় যাকে মূলতঃ সর্বহারার শিল্প বলে কখনও কখনও মনে করা হয়, যদিও তা প্রকৃতপক্ষে একটা উৎক্রান্তিকালীন শিল্প। এই শিল্পের বিষয়বস্তুর একটা সরলতা ও খোলাখুলি ভাব থাকে যা করণকৌশল ব্যবহারের স্বাভাবিকতা ও সাবলীলতার অভাবের সঙ্গে জড়িত ; প্রশাসনের যে ভূমিকায় এতদিন বুর্জোয়াদের বিশেষ অগ্রাধিকার ছিল সেই ভূমিকা যখন কোনও সর্বহারা সর্বপ্রথম পালন করতে যান তখন যেরকম ঘটে অনেকটা সেই রকম। তাহলেও এই উপায়েই বুর্জোয়া করণকৌশল এবং বুর্জোয়া প্রশাসন অনেক পরিশ্রম করে নতুন করে গড়ে তোলার ফলে এক নতুন স্তরে উন্নীত হবে, আর সেই কাজে প্রথম দিকে কেবল মারাত্মক ভুলগুলি ছাড়া সব রকমের ভুলই ঘটবে।

অপরদিকে, বুর্জোয়া-চেতনাসম্পন্ন শিল্পীরা সর্বহারার জীবনকে প্রকাশ করার জন্য এইগুলিকে নতুন করে গড়ে তোলার চেষ্টা করে। এক দল চেষ্টা করে সর্বহারা জীবনযাত্রাকে (প্রয়োগকে) বুর্জোয়া চেতনার (তত্ত্ব) মধ্যে প্রবেশ করাতে ; আর এক দল চেষ্টা করে বুর্জোয়া চেতনাকে সর্বহারা জীবনযাত্রার মধ্যে প্রবেশ করাতে। দুটি কাজের জন্যই প্রয়োজন চেতনার সম্পূর্ণ নতুন পুনর্বিন্যাস এবং কোনওটিই এককভাবে এই কাজে সাফল্যলাভ করতে পারে না। বুর্জোয়া প্রচেষ্টার ফলে সৃষ্ট হয় এক বিশিষ্ট শিল্প যাকে উৎক্রান্তিকালীন বুর্জোয়া শিল্প হিসাবে গণ্য না ক'রে প্রকৃতই সর্বহারা শিল্প বলেও কখন কখন গণ্য করা হয়। বুর্জোয়া শিল্পের সমৃদ্ধ কিন্তু অস্পষ্ট, অনিশ্চিয়তাপূর্ণ ও বিশৃঙ্খল উপাদানগুলি এই শিল্পে বৃহৎ, মূর্ত, সর্বহারার বাস্তবে অসম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত হয়।

মহান সর্বহারা শিল্প গড়ে উঠতে পারে কেবলমাত্র এই দুটির সংশ্লেষণ থেকে, সর্বহারার পুরাতন চেতনা ভেঙে পড়ার পর সম্পূর্ণ সাঙ্গীকরণ থেকে, যে সাঙ্গীকরণ

সেই চেতনাকে একটা নতুন স্তরে, কমিউনিস্ট চেতনার স্তরে উন্নীত করে, সেই সাম্যীকরণ থেকেই।

যেহেতু সর্বহারা তখন সমগ্র সমাজের সঙ্গে সমাপতিত হয়ে গেছে এই চেতনা আর তখন আংশিক এবং হাড় থেকে মাংস আলাদা হয়ে যাওয়ার মত জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া চেতনা নয়। সমাজ এবং মানুষের মধ্যে তার প্রতিফলন এখন আর ছিন্নবিচ্ছিন্ন ও ক্ষতবিক্ষত নয়। শিল্প জীবনের কাছে ফিরে আসে এবং সমস্ত মানুষের কাছে একটা বাস্তব ব্যাপার হয়ে ওঠে।

(৩)

শব্দের সাহায্যে প্রতীকায়িত বহির্বাস্তবের উপাদানগুলির সঙ্গে অহংয়ের গতিশীল সম্পর্ককে কাব্য এক সামান্যীকৃত ও বিমূর্তভাবে প্রকাশ করে। কাব্য যে মানুষের মধ্যকার সহজপ্রবৃত্তিগত ও আবেগগত উপাদানটিকে—সামাজিক অহংয়ের শারীরবৃত্তগত উপাদানকে—অভিনব শক্তিতে প্রকাশ করতে সক্ষম এই সামান্যীকরণটি হল তার উৎস।

আমাদের মনে আছে কাব্য সুরু হয়েছিল আদিম মৃগয়াজীবি ও খাদ্যসংগ্রহকারীদের চিৎকার হিসাবে যার মধ্য দিয়ে মানুষ নিজেকে পরিবর্তিত করে প্রকৃতিকে জয় করার প্রয়াসের মধ্য দিয়ে—প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে নিক্ষেপ করার সাহায্যে, যাতে আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের সঙ্গে তার সংবদ্ধ জীবন সেই অনুযায়ী হয়, ঠিক যেমন শিল্পের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত তার সামাজিক প্রত্যক্ষ পশুর চলাচলের পথ, পশুর বিশেষ চেহারা, তার হিংস্রতা ও দুর্বলতার অনুযায়ী হয়। প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে এই প্রবেশ করানটা সচেতন, কারণ তা সামাজিক। এমন কি এই প্রাথমিক পর্যায়েও মানুষ কেবল মাত্র সহযোগিতার মধ্য দিয়েই শিকার করতে ও খাদ্য-সংগ্রহ করতে সফল হত। এ হল সেই কাব্য যা মানুষের বুকের মধ্য থেকে প্রকৃতির অনুকরণকে জাগিয়ে তোলে, যা নিছক প্রতিফলন মাত্র নয়। এই প্রকৃতি হল সমবেত প্রয়াসের মধ্য দিয়ে যে প্রকৃতিকে মানুষ ভোগ করে তারই নানা টুকরার থেকে গড়ে তোলা মানুষের আকাঙ্ক্ষিত এক প্রকৃতি। এই পর্যায়ের শিল্পকে ঘিরে একটা তীব্র নিরাভরণতা থাকে।

এটা কাব্যে প্রবেশ করে পুরাণকাহিনী ও আচার অনুষ্ঠান হিসাবে, কোরাস অথবা সুর করে আবৃত্তি হিসাবে, যেখানে পশুমুখ এবং পশু আকারে প্রকৃতিকে সমাজের হৃদয়ের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। মানুষ, প্রকৃতির রূপরেখার সঙ্গে মাপসই করার উদ্দেশ্যে নিজেদের সংবদ্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও কর্মকে পরিবর্তিত করার পরিবর্তে

নিজেদের প্রত্যক্ষজ্ঞান ও কর্মের সঙ্গে খাপসই করার উদ্দেশ্যে প্রকৃতির রূপরেখাকে পরিবর্তিত করে। মানুষের খেয়ালখুশির উপযুক্ত করে জগৎপ্রক্রিয়াকে [World Process] বিপুলভাবে বিকৃত করা হয়। তা সত্ত্বেও প্রকৃতিকে টেনে আনা হয়েছে যে সমাজের মধ্যে সেই সমাজ তখনও অপৃথকীভূত ও যৌথ থাকে। গর্ভবতী নারীর মত সমাজ নিষ্ক্রিয় থেকেও সৃজনশীল থাকে। এক ধরনের সংবৃত আত্মতৃপ্তি তার থাকে। জীবন এখন তার অভ্যন্তরে—বাইরে নয়।

পরবর্তী পর্যায়ে সমাজের মধ্যে প্রকৃতির প্রবেশের ফলে সমাজটাই পরস্পর-বিরোধী অংশ বা শ্রেণীতে ভাগ হয়ে যেতে থাকল। শ্রমবিভাজন সমাজবিভাজনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। কৃষিভিত্তিক ও গোচারণভিত্তিক সভ্যতার বিকাশের ফলে শাসক শ্রেণীর সৃষ্টি হল। এই শাসক শ্রেণী আবার শিলীভূত হয়ে গেল এবং তার পরিপূরক অংশ হিসাবে দেখা দিল ভূমিদাস ও ক্রীতদাসের শ্রেণী। প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম মানুষদের পরস্পরের সঙ্গে সংগ্রামে রূপান্তরিত হল। শাসক শ্রেণীর প্রথম উদ্ভব দেখা দিল পৌরাণিক কাহিনী থেকে মহাকাব্য এবং কাহিনীতে রূপান্তর এবং আচার-অনুষ্ঠান থেকে বিবর্তিত হয়ে নাটকের আবির্ভাব হিসাবে। সমাজের সংঘাত প্রতিফলিত হল যখন একদিকে দেখা গেল গুরুগম্ভীর এবং নীতি-উপদেশের ভারে আচ্ছন্ন—কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল এই প্রশ্নে আচ্ছন্ন কাব্য; আর অন্যদিকে ভারসাম্য বজায় রাখতে দেখা দিল এক কাব্যআনন্দের সঙ্গে যা যুক্ত—প্রেম ও সুখকে নিয়ে যার কারবার। সন্দেহ, বিষাদ, মহত্ত্ব, প্রশান্তি, ভীতি এবং এক সচেতন সৌন্দর্য এসব কিছু দেখা দিল এই কাব্যের ক্ষেত্রে। এবং শ্রেণী-গুলির বিকাশ, ক্রিয়ার পৃথকীভবনকে সম্ভব করে তোলায়, ব্যক্তিসত্তাকে আরও বেশি স্বাধীনতা দিয়েছে। কোনো মানুষ এই প্রথম ব্যক্তি হিসাবে কথা বলল। গীতিকবিতার জন্ম হল।

বুর্জোয়া শ্রেণী শাসন করতে এল—এ এমন একটা শ্রেণী যার অস্তিত্বের শর্তই হল তার নিজের ভিত্তিতে ক্রমাগত বিপ্লব ঘটান। কাব্য হয়ে উঠল মদোন্মত্ত [dizzy], ট্র্যাজিক এবং দ্বন্দ্ববহুল। তার করণকৌশলগুলিতে দ্রুত রূপান্তর ঘটতে থাকে। এর গড়ে ওঠার নিয়মই হল এই যে, তার অস্তিত্বের শর্তগুলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে যে পদক্ষেপই সে গ্রহণ করে সেই পদক্ষেপটাই ঐ শর্ত-গুলিকেই পরিপক্ব করে তোলার উপর এবং তার নিজের পতনের উপর জোর দেয়। মূর্ত বুর্জোয়া অস্তিত্বের ফলে কাব্যের ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতিষেধের বিরুদ্ধে কবিদের অবিরাম বিদ্রোহ কাব্যের এমন এক জগৎই মাত্র গড়ে তোলে যা মূর্ত বুর্জোয়া অস্তিত্বের শর্তগুলিকে পূরণ করে। মূর্ত জীবনযাত্রা যত বেশি করে

ব্যক্তিগত যোগ্যতার বাস্তবায়নকে খাসরুদ্ধ করতে থাকে ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর জোর দেওয়া এবং মূর্ত জীবনযাত্রাকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করাটাও সেই অনুপাতে এই কাব্যে বাড়তে থাকে। এই অপসারণটি নিজেই বাস্তব থেকে বুর্জোয়া শ্রেণীর সরে যাওয়া, বুর্জোয়া চেতনা ও সর্বহারার বাস্তবের মধ্যকার দ্বন্দ্বের বিকাশ, সমাজের উৎপাদিকাশক্তিগুলি এবং পুঁজিপতি শ্রেণীর অস্তিত্বের সামাজিক সর্ত-গুলির মধ্যকার দ্বন্দ্বের বিকাশকেই প্রতিফলিত করে।

করণকৌশলের দিক থেকে কাব্য এক অভূতপূর্ব যোগ্যতায় পৌছাল; বাস্তবের জগৎ থেকে আরও বেশি বেশি করে দূরে সরে গেল; জীবন সম্পর্কে ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং ব্যক্তিগত অনুভূতিকে ক্রমবর্ধমান সাফল্যের সঙ্গে জোর দিতে দিতে এমন অবস্থায় পৌছাল যখন তা এত বিসামাজিকীকৃত হয়ে পড়েছে যে প্রথমে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের এবং পরে অনুভূতির আর আদৌ অস্তিত্ব থাকল না। বেশির ভাগ মানুষ আর কাব্য পাঠ করে না। কাব্যপাঠের প্রয়োজন অনুভব করে না, কাব্য বুঝতেই পারে না, কারণ কাব্য তার করণকৌশলের বিকাশের ফলে মূর্ত জীবন-যাত্রা থেকে দূরে সরে গেছে এবং এই দূরে সরে যাওয়াটা সমগ্র সমাজের অনুরূপ দূরে সরে যাওয়ারই পরিপূরক মাত্র।

এই ভাবে কবি জীবনের দ্বারা—অর্থাৎ তার অভিজ্ঞতার দ্বারা সেই সেই শব্দ-গুলির এবং সংগঠনী মূল্যের উপর মনোযোগকে কেন্দ্রীভূত করতে বাধ্য হন যেগুলি সামগ্রিকভাবে মানুষের কাছে ক্রমান্বয়ে কম অর্থবহ হতে হতে এমন অবস্থায় পৌছিয়েছে যখন কাব্য সমস্ত সমাজের একটা অবশ্যপ্রয়োজনীয় ক্রিয়া থেকে (যেমন আদিম উপজাতির মধ্যে) কয়েকজন বাছাই করা মানুষের বিলাসের সামগ্রী হয়ে পড়েছে।

বুর্জোয়া সংস্কৃতি থেকে সাম্যবাদী সমাজের দিকে অগ্রগতি আদিম সাম্যবাদের সামাজিক সংহতির দিকে পশ্চাদগতিও বটে। কিন্তু এই চলনের মধ্যে অন্তর্বর্তী-কালের যাবতীয় বিকাশ, যা কিছু শ্রমের বিভাগ, স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বতন্ত্রীকরণ ও চেতনার বৃদ্ধিকে সম্ভবপর করে তুলেছে তা অন্তর্ভুক্ত ও সঞ্চিত। এই চলন হল সেই সমাজে ফিরে যাওয়া যেখানে দমনবিহীন যৌথধর্ম ও অখণ্ডতা, যে সমাজে চেতনা ও স্বাধীনতা সকলেই সমানভাবে ভোগ করে।

আদিম স্তরে এই সমাজে যে অখণ্ডতা ছিল তা স্থূল ও রিক্ত, আর চেতনা ও স্বাধীনতার পরিমাণ এত অল্প ছিল যে যদিও সকলেই তা ভোগ করত কিন্তু প্রত্যেকের অংশের পরিমাণ ছিল খুবই অল্প। সামাজিক শ্রমের কোলে যে সব উৎপাদিকাশক্তিগুলি ঘুমিয়ে ছিল মানুষ তাকে বিকশিত করার জন্য স্বাধীনতা ও

চেতনার একচেটিয়া হওয়ার প্রয়োজন ছিল ; শাসকশ্রেণীর ক্ষেত্রে তা কিছুকালের জন্ম অন্যো হওয়ার প্রয়োজন ছিল। আর এ থেকে যখন এক দ্বন্দ্বের উদ্ভব হল যার সমাধান একমাত্র সাম্যবাদের দ্বারাই সম্ভব, শ্রমবিভাগ ও শ্রম সংগঠনের ভিত্তিতে উৎপাদিকাশক্তিগুলি বিকশিত হয়ে এমন এক পর্যায়ে পৌছাল যেখানে একটি সমাজের অখণ্ডতার অভ্যন্তরে ব্যক্তিগত পৃথকীভবন অবাধে ঘটতে পারে, যেখানে স্বাধীনতা ও চেতনা সকলের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার পক্ষে পর্যাপ্ত অথচ স্বাধিকারে সমৃদ্ধ, যে সমাজে স্বাধীনতা ও চেতনা, সর্বসাধারণের হওয়ার কারণে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের থেকে উচ্চতর স্তরের। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে তা চিরকাল পঙ্গু ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এখন এক নতুন ও উন্নততরে পৌছাল।

এর অর্থ হল কবির পাঠক সমাজ বিপুলভাবে প্রসারিত হয়েছে। স্বাধীনতা ও চেতনা যেহেতু সকলের অধিকার হয়ে উঠেছে এবং একটি শ্রেণীর বিশেষ অধিকারের সামগ্রী থাকছে না, সেই কারণে কবির পাঠক সমাজ ক্রমে ক্রমে সমাজের সঙ্গে সমাপতিত হয়ে উঠেছে এবং কাব্য আরও একবার সেই কর্ম আরম্ভ করে যা আদিম উপজাতির কাব্যে ঘটেছিল, কিন্তু এই পার্থক্য তার সঙ্গে থাকে যে— উৎপাদিকাশক্তিগুলির প্রচণ্ড অগ্রগতি কাব্যকে অন্যান্য শিল্পের থেকে, শিল্পকে বিজ্ঞান থেকে, পৃথকীকৃত করেছে এবং কাব্যকেও এক উপজাতির কাব্য থেকে এক স্বতন্ত্রব্যক্তির কাব্যে পরিবর্তিত করেছে। অতএব, সাম্যবাদের যুগে কাব্য যৌথধর্মী হয়ে ওঠার জন্ম কম স্বতন্ত্র হবে না, বরং বেশি স্বতন্ত্র হবে। এই স্বতন্ত্রীকরণ— সামাজিক অহংয়ের পরিবর্তন দ্বারা সংঘটিত হবে—সামাজিক অহং অচেতন স্তরে নেমে যাওয়ার দ্বারা সংঘটিত হয়ে শিল্পসম্মত হবে ; ব্যক্তিগত ও স্বপ্নের মত হবে না।

কবির পাঠক সমাজ যে কত বেড়ে গেছে তা সোভিয়েত ইউনিয়নে ইতো-মধ্যেই দেখা যাচ্ছে। সেখানে কবিদের পাঠকসংখ্যা কুড়ি বা ত্রিশ লক্ষ, কবিতার বই যে পরিমাণ বিক্রী হয় পৃথিবীর ইতিহাসে আগে কখনও তত হয়নি।

কবির শব্দভাণ্ডারেও একই পরিবর্তনের প্রতিফলন দেখা যায়। বুর্জোয়া কবির শব্দভাণ্ডার হয়ে পড়ে শুষ্ক ও সীমাবদ্ধ। শব্দের সংখ্যার সীমাবদ্ধতার অর্থে নয়, শব্দের ব্যবহারযোগ্য স্বীকৃত মূল্যের সীমাবদ্ধতা। প্রকৃতপক্ষে বুর্জোয়া কবিদের ব্যবহারযোগ্য শব্দের সংখ্যা ও টাইপ বেড়েছিল, করণকৌশলের অবিরাম বিপ্লবের পাশাপাশি তা বেড়েছিল এবং পুঁজিবাদী যুগের শেষ পর্যন্ত তা চলতে থাকে, কারণ পুঁজিবাদী অস্তিত্বের শর্তই হল সেটা। কিন্তু করণকৌশলের এই

বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির সমান্তরালভাবে কবিদের ব্যবহারের উপযুক্ত শব্দগুলির সামাজিক অনুষঙ্গের হ্রাস ও ক্ষীণতাপ্রাপ্তি ঘটে।

একের পর এক এই অনুষঙ্গগুলি হয়ে পড়ল অমার্জিত, সাধারণ, প্রথাবদ্ধ, নিষ্ঠাহীন, গতানুগতিক, জরাজীর্ণ বা ব্যবসায়ভিত্তিক। কারণ যে জীবন থেকে সেগুলি তাদের প্রাণরস আহরণ করে সেইগুলিই এই রকম হয়ে যাচ্ছিল। সেই কারণে আধুনিক কাব্য প্রাণের দিক থেকে প্রকৃত সামাজিক বিষয়বস্তুর দিক থেকে রিক্ত থেকে রিক্ততর হয়ে পড়ে এবং কাব্যে মাত্র যে শব্দ-মূল্যগুলি ব্যবহারযোগ্য সেগুলি আরও বেশি মাত্রায় ব্যক্তিগত হয়ে উঠে এবং শেষ অবধি কাব্য পুরাপুরি গুহ্য ও একান্ত হয়ে পড়ে। এই কারণের জন্যই বুর্জোয়া সভ্যতার সর্তগুলির মধ্যে নিমগ্ন বেশির ভাগ লোকের কাছে কাব্য আর গ্রহণযোগ্য রইল না। মূর্ত জীবনযাত্রা সম্পর্কে তা ছিল বড় বেশি বিদ্রোহাত্মক, বড় বেশি খোলাখুলি সমালোচনামূলক। তা ছিল বিদ্রোহাত্মক, বিপ্লবাত্মক নয়, কিন্তু তাই বলে তা মাদকতাসঞ্চারীও ছিল না। এই কাব্য তাদের অমার্জিত মূল্য ও ধর্ষিত সহজপ্রবৃত্তিকে নিয়ে ছুটিকেই ধর্ম, জ্যাজনৃত্য বা ডিটেকটিভ উপন্যাসের মত এক আদর্শ ইচ্ছাপূরণের জগতে নিয়ে গিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিলে না। এ চুপচাপ এই সমস্ত অমার্জিত মূল্যগুলিকে বাদ দিয়ে দিল কিন্তু সেটা করার ফলে এ ধাপে ধাপে মূর্ত জীবনযাত্রাকে আরও বেশি বেশি করে বাদ দিয়ে দিল। আর এই প্রক্রিয়ার ফলেই দেখা দিল শিল্পের জন্য শিল্পের জগৎ, অস্পষ্টতা ও বিভ্রমের জগৎ, স্বপ্নের সুউচ্চ স্বর্গ—যা শেষ পর্যন্ত হয়ে পড়ল পুরাপুরি ব্যক্তিগত এবং দুঃস্বপ্নের ও সমুদ্রের নীচের প্রদোষালোকের পাতালপুরী।

মূর্ত জীবনযাত্রার অন্তঃস্থলে স্থাপিত হওয়ার ফলে এবং সব থেকে ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতাগুলিকে তাৎপর্যপূর্ণ উপায়ে প্রকাশ করার ক্ষমতা থাকার ফলে যে রূপরেখের সরলতার, যে ঐশ্বর্য এবং সম্মানী মহিমা কাব্যে দেখা দিয়েছিল সেটা সে এইভাবে হারিয়ে ফেলল।

বিদ্রোহাত্মক হলেও এই কাব্য বিপ্লবী ছিল না, কারণ বিপ্লব থাকে বস্তুগত বাস্তবের ক্ষেত্রের অভ্যন্তরে এবং মানুষের সাধারণ মূল্য ও ধর্ষিত সহজপ্রবৃত্তিগুলিকে নিয়ে তা কাজ করে। এক অলীককল্পনাপ্রসূত স্বর্গে নিয়ে গিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিপ্লব সেগুলিকে সংগঠিত করে না, বরং তাদের ঘৃণা ও আশা আকাঙ্ক্ষাগুলিকে, তা সে যত সীমাবদ্ধই হোক, তাদের দুঃখকষ্টের প্রকৃত কারণকে এই মূর্ত জীবনের ক্ষেত্রেই দূর করার কাজে লাগানর মত করে মোড় ফেরায়। কবি বিপ্লবের নেতা হতে পারেন না (যদিও একটা পর্যায়ে তিনি বিপ্লবের গায়ক বা উৎসাহদাতা হতে পারেন), কারণ সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী মূল্যের চাপে তাঁর জগৎ

বাস্তব জগতের এক অতি ক্ষুদ্র অংশ হয়ে পড়েছে, আর বিপ্লবের কর্তব্যের একটা অংশ হল তাকে বাড়িয়ে তোলা।

সাম্যবাদের যুগে যে মূল্য-পরিবর্তন, জীবনের অমার্জিতভাব-দূরীকরণ, যৌথ স্বাধীনতার বৃদ্ধি ও ব্যক্তিগত চেতনার মুক্তি ঘটে তার অর্থ হল এই সামাজিক মূল্যগুলি নতুন জন্মলাভ ক'রে ও মহত্বলাভ করে শিল্পীর রক্তের পাত্রে ফিরে আসা। শব্দের সংখ্যার দিক থেকে তার শব্দভাণ্ডার প্রথম দিকে এমন কি সরলীকৃতও হতে পারে। কাব্যের জন্য ঐ শব্দগুলি বাস্তবের যে জগৎকে অবারিত করে সেটা জটিল ও সমৃদ্ধ হওয়ার কারণেই তা ঘটে। এখন সেই পুরাতন মহানভাবে সে কথা বলতে পারবে। ভাষার অন্তরালে মূল্যের যে জগৎ থাকে কাব্যের জন্য তা প্রসারিত হবে, এলিজাবেথীয় যুগে যেভাবে তা বেড়ে গিয়েছিল সেইভাবে বাড়বে। এলিজাবেথীয় যুগে মূল্যের এক বিরাট জগৎ উদ্ঘাটিত হল, ফলে যে জগৎ আগে ছিল কবির ব্যক্তিগত এই প্রথম তা হয়ে উঠল সামাজিক; আর এখন কাব্যে প্রবেশ করান হচ্ছে শুদ্ধীকৃত সামাজিক মূল্যের এক বিশাল জগৎ এই প্রথম যা কবির কাছে ব্যক্তিগত হয়ে উঠেছে। শিল্প যেভাবে জীবন থেকে দূরে সরে গিয়ে আবার সেই জীবনের মধ্যেই ফিরে আসে এবং সেই বিচ্ছেদের ফলে যা কিছু বিকাশ ঘটেছে সেই সব কিছু সঙ্গে নিয়ে আসে, কাব্যের করণকৌশলের এই পরিবর্তন তারই প্রতিফলন।

বুর্জোয়া অর্থনীতি যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশ ঘটিয়েছিল তা নৈরাজ্যবাদী হয়ে উঠেছিল এবং নিজেকে রুদ্ধগতি করেছিল। সেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সাম্যবাদের বিশেষগুলির দ্বারা আরও বিশদীকৃত হয় এবং একই কালে তা সমন্বয়িত হয়, একটা যৌথ সমগ্রতা ও মানসিক সুস্থতা লাভ করে। এটা দুভাবে হওয়ার সম্ভাবনা। একদিকে বেতার প্রচারের বিকাশ কাব্যকে এক নতুন যৌথ অবভাস দেবে, আর একদিকে অভিনেতার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে কাব্যগত মুহূর্তের আর সংঘাত ঘটবে না এবং কাব্য আবার নাটকে ফিরে আসতে পারবে, তাকে আরও বেশি যৌথ ও বাস্তব করে তুলবে। এ কথাও মনে হয় (যদিও তা নিছকই কল্পনা) যে চলচ্চিত্র কেবল সাম্যবাদের যুগেই স্বকীয়তা অর্জন করবে, কারণ চলচ্চিত্র আরও যৌথ আরও সমৃদ্ধভাবে শক্তিশালী এবং আরও নমনীয় এক রূপের মাধ্যমে বুর্জোয়া মঞ্চের সর্বোচ্চ সম্ভাবনাগুলিকে রূপ দেবে।

অর্কেস্ট্রায় যেমন পরিচালক, চলচ্চিত্রে সেইরকম প্রযোজক হল সেই অহংয়ের প্রতিমূর্তি যার মধ্য দিয়ে কাহিনীটা ঘটে, কিন্তু তার ক্ষমতা পরিচালকের ক্ষমতার থেকে অনেক অনেক বেশি। এটা মনে করবেন না যে সাম্যবাদ অভিনেতা,

"চিত্রতারকা" বা লেখককে রক্তগতি করে। বরং তার বিপরীত। তখনই তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আরও বেশি বিশদ ও গভীরতর এক অর্থ লাভ করে, কারণ সেটা হবে একটা যৌথ অর্থ। বুর্জোয়া সংস্কৃতির শেষ অধ্যায়, যা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে চরম, মাত্রায় উন্নীত করেছিল, তা কোনও "নায়ক" সৃষ্টি করেনি, কোনও মহান লেখক, শিল্পী, অভিনেতা বা কবি সৃষ্টি করেনি। এটা কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়। একজন মহান ব্যক্তি কেবল এক ব্যক্তিসত্তা মাত্র নয়, তিনি হলেন এমন এক ব্যক্তিসত্তা যাতে একটা যৌথ শরীর ও তাৎপর্য দেওয়া হয়েছে। ছায়াটা যে এত বড় মাপের হয় তার কারণ সমগ্র সমাজের উপর সেটা পড়ে। বুর্জোয়া সংস্কৃতি সর্বহারাকে বিদ্রূপ করে। কারণ তার প্রথম দিকের সংগ্রামে সে মার্ক্স, লেনিন ও স্তালিন সৃষ্টি করেছিল, অথচ বুর্জোয়া সংস্কৃতির মতে সাম্যবাদ "মহান ব্যক্তিতে বিশ্বাস করে না" বা "ব্যক্তিতে" বিশ্বাস করে না, অতএব এক্ষেত্রে তার নিজের কথারই বিরোধিতা করছে। এই বিদ্রূপের মধ্যে দিয়ে বুর্জোয়া সংস্কৃতি সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের বিষয়ে তার নিজের ধারণা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যুক্তি-প্রয়োগের ত্রুটিকেই উদ্ঘাটিত করে।

এটা দেখা যাবে যে আদিম সাম্যবাদের সঙ্গে সমাজের শেষ পর্যায়ের চলনের এই সাদৃশ্য রয়েছে যে মানুষ আরও একবার বাইরের দিকে অহং থেকে বাস্তবের দিকে মোড় ফেরে, এবং সুস্থিরভাবে জগতের মুখোমুখি হয়। কিন্তু জগৎটা এখন অল্প কয়েকটি পশু, কিছু শস্য ও একটি পরিক্রমারত সূর্য দিয়ে গড়া জগৎ মাত্র নয়, এ জগৎ হল শ্রেণী গড়ে ওঠার যুগে সমাজের মধ্যে প্রকৃতিকে গ্রহণ করার ফলে সমৃদ্ধ এক জগৎ। প্রকৃতি ও মানুষ পরস্পরকে ভেদ করার ফলে বহু শতাব্দী ধরে এই বাস্তব বিশদ হয়ে উঠেছিল, সমাজে শ্রমবিভাজনের মধ্যে তার প্রমাণ। এবং প্রকৃতির পরিবর্তনের জন্য মানুষের প্রয়াসের মধ্য দিয়ে এই বাস্তব বিশদ হয়ে উঠেছিল। এই চলন অবশ্যম্ভাবীভাবে যে বিপুল সামাজিক সম্পর্করাশি গড়ে তোলে তার দিকে নজর না দিয়ে প্রকৃতিকে নিজের মধ্যে টেনে আনার কারণেই মাত্র প্রথমে এই ব্যাপারটি ঘটেছিল।

এই অধ্যায় যখন শেষ হবে তখন সমৃদ্ধ ও জটিল জটিল মূল্যসমন্বিত সমাজ-সম্পর্কের এই বিপুল সম্ভারের দিকে মানুষ ধীরস্থিরভাবে তাকাতে পারবে। আগে মানুষ একে দেখত তার চিন্তালব্ধ জগতের বিকৃতির সাহায্যে, গোপন অস্তিত্ব বা শক্তি বা ঈশ্বর হিসাবে, একটা নিছকবিমূর্ত সামগ্রী হিসাবে—মানুষ, "সামাজিক সারবস্তু" সভ্য সমাজ হিসাবে। জীবনের এই মূর্ত জগৎ বা মানুষ ও প্রকৃতি পরস্পরবিচ্ছিন্ন এবং সরলতর এক বিমূর্ত জগৎকে আপনার মধ্যেই এক

নিটোল, বিকাশমান সমগ্র হিসাবে সজ্জিত করতে থাকে তা হলো সাম্যবাদী কবির বিবেচ্য বিষয়। সেই কবি তার নিজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে আগ্রহী—কেবলমাত্র নিজের মধ্যে এবং নিজের জন্য নয়। সেই ধারণা যে, বদ্ধ বুর্জোয়া সমাজকে ধ্বংস করেছিল তাকে গোপন করে রাখে। কবি এখন আগ্রহী তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অন্যান্যদের ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে তার সম্পর্ককে বিকশিত করে তোলে এমন এক ভাববিনিময়কারী জগতে, যা নিছক একটা তরল আকারহীন সমুদ্র নয়, যার নিজস্ব অনমনীয়তা ও বাস্তবতা বর্তমান। বাস্তব জীবনে মানুষে মানুষে সম্পর্কের মধ্যে যত মূল্য আছে তাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য সাম্যবাদী কবি এমন বিপুল মাত্রায় আগ্রহী যা আগে কখনও দেখা যায়নি।

শিল্পের প্রতিটি পর্যায়ে, সংস্কৃতির প্রতিটি স্তরে তার একটা চালন-নীতি থাকে যেটা তার ট্র্যাজেডি, তার সৌন্দর্যের, তার তৃপ্তির ও তার সৃজনীশক্তির উৎস। আদিম সংস্কৃতিতে সেটা হল বলবান ও বর্বর পশুর ট্র্যাজেডি গোচারণকারী সমাজে তা হল দেবতার ও পৌরাণিক কাহিনীর ট্র্যাজেডি, সমস্ত শ্রেণীবিভক্ত সমাজে তা হল নায়কের ইচ্ছার ট্র্যাজেডি। প্রথম দিকের বুর্জোয়া সমাজে তা হল যুবরাজদের ইচ্ছার ট্র্যাজেডি শেষ-দিকের বুর্জোয়াসমাজের ট্র্যাজেডি হল জয়েসের "ইয়ুলিসিসের ইচ্ছার" ট্র্যাজেডি এবং প্রুস্তের "আমি"র ট্র্যাজেডি যা হল পুরাপুরি ব্যক্তিগত অলীককল্পনার জগতে বসবাসকারী "আমি"র ট্র্যাজেডি। ট্র্যাজেডি নিজেই ট্র্যাজিক নয়, তা হল সুন্দর, কোমল ও সন্তোষদায়ক—আরিস্ততলের অর্থে বিরেচক। কিন্তু সংস্কৃতি ট্র্যাজিকভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এ দৃশ্যও রয়েছে—কারণ সেই সংস্কৃতির ম্যাট্রিক্স বা ধাত্রী, সমাজ বিক্ষিপ্ত ও বন্ধ্যা হয়ে উঠেছে। এটা হল শিল্পীর বেদনা যা ট্র্যাজিক হতে পারে না; কারণ তার সমস্যাগুলির সমাধান সে ট্র্যাজিকভাবে করতে পারে না সমাধানহীন সংঘাতে তা ছিন্নবিচ্ছিন্ন এবং সব রকমের অবাস্তব অলীককল্পনার দ্বারা তা বিমূঢ়। তার সমস্ত বিলয় ও অপচয়ের মধ্যে আজকের শিল্পের ট্র্যাজেডি। এ হল সেই ইচ্ছার ট্র্যাজেডি যে ইচ্ছা চেনে না আপনাকে, সেই অচেতন ব্যক্তির ট্র্যাজেডি যে জানেনা যে সে কিসের দাস। শিল্প হল স্বাধীন মানুষের বিশেষ সুযোগ সুবিধা।

কোনও সমাজ যেসব শিল্প সৃষ্টি করে তা যে স্বাধীনতা সেই সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে সেই স্বাধীনতার ধারণার দ্বারা সাপেক্ষীকৃত হয়; শিল্প হল স্বাধীনতার একটা রীতি বা প্রকার, আর কোনও শ্রেণীবিভক্ত সমাজে কোনও শ্রেণী যেটুকু আপেক্ষিক স্বাধীনতা অর্জন করে সেটাকেই সেই শ্রেণীবিভক্ত সমাজ অনপেক্ষভাবে স্বাধীনতা বলে মনে করে। বুর্জোয়া শিল্পে মানুষ বহির্বাস্তবের প্রয়োজন সম্পর্কে

সচেতন, কিন্তু তার নিজের প্রয়োজন সম্পর্কে নয়; যেহেতু যে সমাজ তাকে সে যা তাই করে গড়ে তুলেছে সেই সমাজ সম্পর্কে সে অচেতন। সে কেবল অর্ধ-মানব। সাম্যবাদী কাব্য হবে পূর্ণাঙ্গ, কারণ সেখানে মানুষ তার নিজের প্রয়োজন সম্পর্কে এবং সেই সঙ্গে বহির্বাস্তব সম্পর্কেও সচেতন হবে।

যা কিছুর জন্ম হয় তারই মৃত্যু হবে, সব কিছুই ক্ষণস্থায়ী, সব কিছুই মরণশীল; অস্তিত্বের অর্থ হল ঝরণার মত হওয়া এবং একটা আকারলাভ করা, কারণ কেউ কখনও স্থির নয়—এই হল সমস্ত শিল্পের বিষয়বস্তু, যেহেতু বাস্তবের বুননটাই হল এই রকম। মানুষ জীবনের দিকে আকৃষ্ট হয়, কারণ জীবন তার কাছ থেকে সরে যাচ্ছে; তার আকাঙ্ক্ষাগুলি সুপ্রাচীন ও সময়নিষ্ঠ নক্ষত্রের মত; প্রেমের এক তীব্র মাধুর্য আছে এবং তরুণ প্রাণ প্রাচীনকে পাশে সরিয়ে দেয়; সত্তার এইসব গুণগুলি মানুষের মতই স্থায়ী। মানুষকেও অবশ্য চলে যেতে হবে।

সেই কারণে মানুষ যতদিন টিঁকে থাকবে, শিল্পের সারবস্তুও ততদিন টিঁকে থাকবে। সেই ঝরনা তখনই শুকিয়ে যায় যখন এক বন্যা সংঘাতে মানুষ হয় ছিন্নভিন্ন, তার অপচয় ঘটে এবং সমাজের স্পন্দিত চলন থেমে যায়। এই সমগ্র চলনটাই সৃজনশীল, যেহেতু তা একটা নিছক দোলন নয়, তা হল এক বিকাশ, যে বিকাশ সেই চলনের অস্থিরতা থেকেই প্রকাশ পায়। চিরন্তন সরলতাগুলি নিজের বুকের থেকে শিল্পের সমৃদ্ধি ঘটায়। সেগুলি চিরন্তন হওয়ার কারণেই যে এটা ঘটে তা নয়, এটা ঘটে এই কারণেও যে সেগুলির অস্তিত্বের সর্তই হল পরিবর্তন। সুতরাং শিল্প হল মানুষের নিজেকে বাস্তব রূপ দেওয়ার একটা সর্ত এবং সেই সর্ত আবার পাল্টা মানুষের একটা বাস্তবও বটে।

কয়েকটি সমার্থক শব্দ

abreaction অভিস্ফোট
absolute অসাপেক্ষ
Absolute State নিরঙ্কুশ রাষ্ট্র
absolutism সর্বাত্মকবাদ
abstraction বিমূর্তন
accomodation উপযোজন
acquired অর্জিত
adjustment উপযোজন
aesthetics নন্দনতত্ত্ব
affect আবেগোদ্দীপক
agnosticism অজ্ঞেয়তাবাদ
alienation of self আত্ম-বিচ্ছিন্নতা
alliteration অনুপ্রাস
all-sufficient সমগ্র-পর্যাপ্ত
amalgamation সংযুক্তিকরণ
analytical psychology সমীক্ষণ-মূলক মনোবিদ্যা
animism সর্বপ্রাণবাদ
antithesis বিরোধালংকার
apparatus সরঞ্জাম
appearance অবভাস
appetite স্বাভাবিক স্পৃহা
appropriation ভোগ
arbitrary বিধিবহির্ভূত
aristocracy অভিজাততন্ত্র
association অনুষঙ্গ
assonance স্বরসংগতি
assumption অনুমান/অনুমিত সত্য
astronomy জ্যোতির্বিজ্ঞান
attitude প্রতিভাস
automatic reflex স্বয়ংক্রিয় প্রতিবর্ত
autonomous স্বয়ংশাসিত
average গড়পড়তা
behaviour ব্যবহার/আচরণ
biology জীববিদ্যা
cash-nexus নগদ-মুদ্রার স্বরূপ
category বিধেয়
catharsis বিরেচন
causality কার্যকারণতা
censor মনের প্রহরী
classification বর্গীকরণ
cleavage ভাঙন
coercive দমনমূলক
cognition চিন্তন
cohesion সংসক্তি
coincidence সমাপতন
collective যৌথ
'commercialised' market নিছক লেনাদেনাভিত্তিক বাজার
'commodity-fetishism' পণ্যের উপর অন্ধভক্তি
commonness সাধারণধর্মিতা
communicate ভাব বিনিময় করা
company prmoting নতুন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সংগঠিত করা
complex সংগ্রহ

component উপাদান
comprehensive সার্বিক
compulsive action অনুবর্তী ক্রিয়া
concentrate কেন্দ্রীভূত করা
concrete মূর্ত
condensation ঘনীভবন
conditioned reflex সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া
connative চেষ্টাশক্তিমূলক
conscious সচেতন

consistency সংগতি
constant স্থির
constant capital স্থির পুঁজি
construct নির্মিতি
contrapuntal বিপরীত স্বরধর্মী
convergence অভিসৃতি
converse প্রতিলোম/বিপরীত
cosmogony সৃষ্টিরহস্য
craft কারিগরিবিদ্যা
criterion নির্ণায়ক
critical Idealist সবিচার ভাববাদী
crystallised কেলাসিত
death instinct আত্মধ্বংসবৃত্তি
desocialised বিসামাজিকীকৃত
determinism নির্বন্ধতাবাদ
development বিকাশ
differentiation পৃথকীভবন
diffusion পরিব্যাপন
displacement অতিক্রমণ
dissociation বিবন্ধ
dissolution বিলয়
distributed middle পূর্ণব্যাপক হেতু
dream-work স্বপ্ন-নির্মাণ
drive নোদনা/চালিকাশক্তি
eclecticism সারসংগ্রহবাদ
efferent nerves ক্রিয়াবাহী স্নায়ু

egoistic আত্মসর্বস্ব
empirical অভিজ্ঞতামূলক
endo-psychic censor মানসনিহিত মনের প্রহরী
engram স্মৃতিপথ-চিহ্ন
environment পরিবেশ
epiphenomenon উপবস্তু
epistemology জ্ঞানতত্ত্ব
equally সমভাবে
equation সমীকরণ
equilibrium ভারসাম্য
ethics নীতিশাস্ত্র
ethnology জাতিতত্ত্ব
extrapolate (যুক্তিকে) প্রসারিত করা
extravert বহির্মুখী
faculty বিশেষবৃত্তি
fancy কপোলকল্পনা
favoured function অনুকূল ক্রিয়া
feeling-judgement অনুভূতি-বিচার
feeling-tone অনুভূতি-স্বর
felt-ego অনুভূত অহং
finite সসীম
formalism আচারবাদ
formality আচারধর্মিতা

free-market অবাধ বাজার
free verse মুক্তছন্দ
functional ক্রিয়াগত
gene জনি
generalisation সামান্যীকরণ/সাধারণীকরণ
genotype জনিরূপ
germplasm জননকোষের প্রোটোপ্লাজম
goodness সংগুণ
heightened উন্নীত
hierarchy ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ
historical materialism ঐতিহাসিক বস্তুবাদ
homogeneity সমসত্ত্বতা
hypertrophy অতিবৃদ্ধি
hypnosis সংবেশন
hypostatisation স্বতন্ত্র সত্তা কল্পনা করা
hypothesis প্রকল্প
Id অদস
illusion বিভ্রম
illusory প্রাতিভাসিক
image প্রতিরূপ
imagery চিত্রকল্প
immediate অব্যবহিত
implicit অন্তর্নিহিত
implied সংশ্লিষ্ট/জড়িত
indeterminacy অনির্ণেয়তা
individual psychology ব্যষ্টিগত মনোবিদ্যা
individuality ব্যক্তিসত্তা
individuation ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যভবন
industry যন্ত্রশিল্প
in excelsis চরম মাত্রায়
infinite অসীম
initiation ceremony কুলপ্রবেশক অনুষ্ঠান
innate সহজাত
instinct সহজপ্রবৃত্তি
instrument উপকরণ
integration সমন্বয় সাধন
interpenetrate পরস্পরকে ভেদ করা
introspection অন্তর্দর্শন
introversion অন্তর্বৃত্তি/অন্তর্মুখিনতা
intuiting স্বজ্ঞানুভব
intuition স্বজ্ঞা
invariant অপরিবর্তনীয়
inverse ব্যস্তবিপরীত
inverted বিপ্রতীপ
irrational যুক্তিনিরপেক্ষ
kinaesthetic sensation চেষ্টাবেদন
latent সুপ্ত
latent content সুপ্ত অর্থ
legislative maxim পরিষদীয় প্রবচন
libido কাম.
life instinct জীবনাকাঙ্ক্ষা

logistic সংখ্যাবিদ্যা
Mammon কুবের
manic খেপোন্মত্ত
manifest content পরিস্ফুট অর্থ
manufacture হস্তশিল্প
market-denominator বাজার-বিনির্ণায়ক
mass জন
mass production ব্যাপক হারে উৎপাদন
material বস্তুনির্ভর
matrix ধাত্র
matter পদার্থ/জড়
means of production উৎপাদনের উপায়
mechanical materialism যান্ত্রিক বস্তুবাদ
mechanism কর্মপদ্ধতি
meditation ধ্যান
metaphor রূপক
metaphysics তত্ত্ববিদ্যা
metre মাত্রা
metrical মাত্রাবদ্ধ
microcosm অণুবিশ্ব
mimesis অনুকরণ
mnemonic স্মৃতিসহায়ক
Mock-ego নকল অহং
modified রূপান্তরিত
mould ছাঁচ
movement চলন
mysticism অতীন্দ্রিয়বাদ
myth পুরাণকাহিনী
nascent জায়মান
negation প্রতিষেধ
nervous system স্নায়ুতন্ত্র
neurosis স্নায়ুরোগ
non-organic অ-দেহযন্ত্রগত
obsession আবেশিক বায়ু
oligarchy স্বল্পসংখ্যকের শাসনতন্ত্র
ordering ক্রমবিন্যাসকারী
'Organ-language' 'দেহযন্ত্রের ভাষা'
organisation সংগঠন
organism দেহধারী জীব
orientated বিন্যস্ত
oscillation দোলন
overlapping অধিক্রমণ
pantheism সর্বেশ্বরবাদ
pantomime মূকাভিনয়
participation mystique অংশগ্রহণগত রহস্য
particularity বিশেষধর্মিতা
passion অভিরাগ
pathological ব্যাধিগ্রস্ত
pattern ছক/সামগ্রিক আকার
penetrating ভেদতামূলক
percept প্রত্যক্ষ
periodicity পর্যাবৃত্তি

persuade প্রত্যয় উৎপাদন করা
phantasy অলীককল্পনা
phenomena প্রতিভাস
phobia আতঙ্ক
phototropism আলোক-গতিবৃত্তি
physiology শারীরবিদ্যা
pitch শব্দগ্রাম
plastic force আকারদানকারী শক্তি
pleasure principle সুখ-সূত্র
poetics কাব্যশাস্ত্র
poetry কাব্য
pole মেরু
position অবস্থান
positivism প্রত্যক্ষবাদ
potential সুপ্ত
practice প্রয়োগ
precision যথাযথতা
pre-logical প্রাক-তর্কশাস্ত্রসম্মত
presupposition পূর্বসিদ্ধান্ত
primitive accumulation প্রাথমিক পুঁজি-সঞ্চয়
probability সম্ভাব্যতা
product উৎপন্ন
production relation উৎপাদন সম্পর্ক
productive force উৎপাদিকা শক্তি
prognosis প্রাথমিক লক্ষণ
projection প্রক্ষেপণ
proposition নির্ণয়-বাক্য
prosody ছন্দঃশাস্ত্র
psyche মানস
psychiatry মনোরোগবিদ্যা
psychoanalysis মনঃসমীক্ষণ
psychology মনোবিদ্যা
psychosis বাতুলতা
pun যমক
range পরিসর
rational যুক্তিভিত্তিক/যুক্তিসাপেক্ষ
rationalisation যৌক্তিকীকরণ/ছাটাই
recognition প্রত্যভিজ্ঞা
repression অবদমন
response প্রতিক্রিয়া
rhetoric শব্দালংকার
rhyme মিল
rhythm ছন্দ
rigidity অনমনীয়তা
rite অনুষ্ঠান
ritual আচার অনুষ্ঠান
scaffolding কাঠামো-মঞ্চ
scale মানক
scale and chord স্বরগ্রাম ও স্বরসংগতি
scepticism সংশয়বাদ
scheme ছক
schizophrenic চিত্তভ্রংশী
scholasticism অতিসূক্ষ্মবিচারবাদ
self-conditioning আত্মসাপেক্ষীকরণ
sense ইন্দ্রিয়বোধ

sensing ইন্দ্রিয়বেদিতা/ইন্দ্রিয়ানুভব
sensory organ জ্ঞানেন্দ্রিয়
sensuousness ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি
set গুচ্ছ/সেট
skill দক্ষতা
sociology সমাজবিদ্যা
solipcism আত্মকেন্দ্রিকতাবাদ
somatic দেহকোষগত
space স্থান
specialisation বিশেষীকরণ
species প্রজাতি
speculation ভাবনাচিন্তা
standard deviation আদর্শ বিচ্যুতি
stress ঘাতাঘাত
structure কাঠামো
stupor বিহ্বলতা
subjective বিষয়ীগত
sublimation ঊর্ধ্বগতি
super-ego অতি-অহং/অধিশাস্তা
superstructure উপরিকাঠামো
surplus value উদ্বৃত্ত মূল্য
suspended নিরালম্ব
syllable শব্দাংশ
syncresis বহুমতের সমন্বয়
synthesis সংশ্লেষণ
system ব্যবস্থা/গঠনতন্ত্র
systematic প্রণালীবদ্ধ
tapestry নক্সী-পর্দা
technique করণকৌশল
tension চাপ
term বাচ্য/আখ্যাসূচক পদ
theogony দেবতাদের জন্মতত্ত্ব
theology ঈশ্বরতত্ত্ব
therapy আরোগ্য পদ্ধতি
thing-in-itself বস্তু-নিজেই-যা/স্বতত্ত্ব
thinking চিন্তন
time কাল
tools যন্ত্রপাতি/হাতিয়ার
type জাতিরূপ
tyranny স্বৈরতন্ত্র
unconscious অচেতন
understanding বোধ
unified একীভূত
unit একক
use-value উপযোগ-মূল্য
valid বৈধ
value মূল্য
variable ভেদ্য
variation প্রকরণ
wealth সম্পদ
will ইচ্ছা
wish fulfilment ইচ্ছা-পূরণ
wish-pattern ইচ্ছার ছক
world জগৎ
world-view বিশ্ব-দৃষ্টি

॥ পরিচিতি ॥

Anacreon (?৫৭২—?৪৮৮ খৃঃ পূঃ) গ্রীক কবি।

Apollinaire, Guittauma. (১৮৮০—১৯১৯) ফরাসী কবি।

Aristophanes (৪৪৮ ?—৩৮০ ? খৃঃ পূঃ) প্রাচীন গ্রীক নাট্যকার। কমেডি রচনার ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলে স্বীকৃত। তিনি ছিলেন রক্ষণশীল, যুদ্ধবিরোধী এবং 'বুদ্ধিজীবি'-বিরোধী।

Aragon, Louis (১৮৯৭-) ফরাসী সুররিয়ালিস্ট কবি ও লেখক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় অধিকৃত ফ্রান্সের প্রতিরোধ যুদ্ধের সৈনিক ও কবি। ফরাসী কমিউনিষ্ট লেখকদের নেতৃস্থানীয়।

Arnold, Mathew (১৮২২—১৮৮৮) ইংরেজ কবি ও সমালোচক। ক্লাসিকাল বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তাপূর্ণ ও বিষাদাচ্ছন্ন কবিতা রচনা করেন। সমালোচনামূলক প্রবন্ধের জন্য বিশিষ্ট।

Aristotle (৩৮৪-৩২২ খৃঃ পূঃ) গ্রীক দার্শনিক। তৎকালীন ও পূর্বসূরি নাট্যকারদের নাটকগুলির বিশ্লেষণ করে নাট্য সম্পর্কে যে আলোচনা Poetics গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন তা আজও আলোচনা সমালোচনা ও শিক্ষার সামগ্রী।

Auden, W. H. (১৯০৭—) ইংলণ্ডে জন্ম, মার্কিন নাগরিক। কবি। ত্রিশের দশকের আধুনিক কবিদের নেতৃস্থানীয়। বামপন্থী চিন্তাধারায় বিশ্বাসী হলেও পরবর্তীকালের রচনায় রহস্যবাদী লক্ষণ দেখা দেয়।

Bacon, Sir Francis (১৫৬১—১৬২৬) ইংরেজ কবি ও দার্শনিক। এলিজাবেথ ও প্রথম জেমসের কালের বিখ্যাত রাজপুরুষ। ইংরেজি প্রবন্ধ সাহিত্যের পথিকৃৎদের অন্যতম।

Baudelaire, Charles Pierre (১৮২১—১৮৬৭)। ফরাসী কবি। জন্ম প্যারিসে। ১৮৫৭ সালে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। নাম Les Fleurs du mal। এই একমাত্র কাব্যগ্রন্থটি বদলেয়রকে 'অসুন্দরের কবি হিসাবে' বিখ্যাত করলেও ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত গদ্য-কবিতার সংকলন Le Spleen de Paris কিছু কম উল্লেখযোগ্য রচনা নয়। রোমান্টিক আর্ট এবং নন্দনতত্ত্বগত আলোচনাগুলি গুরুত্বপূর্ণ।

Bergson, Henri (১৮৫৯—১৯৪১) ফরাসী দার্শনিক। ১৮৮৯ সালে

প্রকাশিত Donnees Immediates de la Conscience পুস্তকে হার্বাট স্পেন্সারের দর্শনের বিরোধিতা করেন। ১৯২৭ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

Blake, William (১৭৫৭—১৮২৭) ইংরেজ কবি, শিল্পী ও রহস্যবাদী। Songs of Experience, Songs of Innocence তাঁর বিখ্যাত রচনা।

Brooke, Rupert (১৮৮৭—১৯১৫) ইংরেজ কবি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিহত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার দিকে স্বদেশ প্রেমিক উচ্ছ্বাস ও আত্মাহুতির দৃষ্টিতে যুদ্ধকে দেখার যে রোমান্টিক প্রবণতা দেখা গিয়েছিল তার প্রবক্তা।

Browning, Robert (১৮১২-১৮৮৯) ইংরেজ কবি। প্রেমের কবিতার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট। প্রেমিক মানুষের আত্মার আশাআকাঙ্ক্ষা ও ব্যর্থতা তাঁর প্রধান উপজীব্য। ড্রামাটিক মনোলোগ রচনায় সিদ্ধহস্ত। আশাবাদী ঈশ্বরবিশ্বাসী দার্শনিক চিন্তার প্রবক্তা।

Byron, George Gordon (১৭৮৮-১৮২৪)। ইংরেজ রোমান্টিক কবি ও অমিত্রাক্ষর ট্র্যাজেডির রচয়িতা। তীব্র ব্যঙ্গাত্মক রচনায় সিদ্ধহস্ত। Don Juan শ্রেষ্ঠ-ব্যঙ্গাত্মক কাব্য। Childe Harold'sPilgrimage অন্যতম রচনা।

Cervantes Saavedra, de Miguel (১৫৪৭-১৬১৬)। স্প্যানিশ লেখক। শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গাত্মক রচনা Don Quixote পরবর্তী কালের ব্যঙ্গলেখকদের অনুপ্রেরণা।

Ce'zanne Paul (১৮৩৯-১৯০৬) ফরাসী চিত্রকর। 'ইম্প্রেসনিজম পরবর্তী' যুগের' জনক, যদিও জীবিতকালে ইম্প্রেসনিস্টদের সঙ্গেই তাঁর চিত্রের প্রদর্শনীগুলি হত। ইমপ্রেসনিস্টদের বর্ণতত্ত্ব স্বীকার করলেও পুরাপুরি তাঁদের প্রিজমধর্মি-বর্ণলেপন গ্রহণ করেননি। সেজানের প্রয়াস ছিল শাশ্বত সত্যগুলি ধরে রাখার দিকে। ছবিতে তিনি ব্রাউন রঙের প্রাধান্য রাখেন। টিল লাইফগুলি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

Commedia dell'arte ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকের এক ধরনের ইতালীয় কমেডি যাতে প্রথাগত পরিস্থিতি ও ছকে ফেলা চরিত্রকে আশ্রয় করে সঙ্গে সঙ্গে বানিয়ে তোলা ঘটনা ও আচরণের সাহায্যে হাস্যরসের সৃষ্টি করা হয়।

Cromwell, Oliver (১৫৯৯-১৬৫৮)। ইংরেজ সেনাপতি ও রাষ্ট্রনায়ক। ১৬৫৩-৫৮ ইংলণ্ডে যে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার লর্ড প্রোটেক্টর ছিলেন।

Chapman, George (১৫৫৯?—১৬৩৪)। ইংরেজ নাট্যকার ও অনুবাদক কবি। মূল গ্রীকভাষা থেকে হোমারের মহাকাব্য ইংরেজিতে অনুবাদ করেন।

Chaucer, Geoffrey (১৩৪০?—১৪০০)। ইংরেজ কবি। আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যের প্রবর্তক বলা হয়। ক্যান্টারবেরি টেলস, ট্রয়লাস অ্যাণ্ড ক্রেসিড, লিজেণ্ড অব গুড উইমেন বিখ্যাত রচনা।

Coleridge S. T (১৭৭২-১৮৩৪) ইংরেজী সাহিত্যে রোমান্টিক কবিতা ও তত্ত্বালোচনার জন্য বিখ্যাত।

Crashaw, Richard (১৬১৩ ?—১৬৪৯) জটিল মনন ও চিত্রকল্পের অভাব থাকলেও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও উদ্ভট চিত্রকল্পের প্রতি আকর্ষণ তাঁকে মেটাফিজিক্যাল কবিদের অন্তর্ভুক্ত করেছে।

Dali, Salvator (১৯০৪—) স্প্যানিশ চিত্রকর। সুররিয়ালিস্ট চিত্রকলার নেতৃত্ব দেন। কিন্তু পরে সেই ধারা ত্যাগ করে রোমান ক্যাথলিক ধর্মের দিকে ঝোঁকেন এবং ধর্মীয় চিত্র আঁকতে থাকেন।

Dante, Alighieri (১২৬৫-১৩২১)। ইতালীয়ান কবি। রেনেসাঁস যুগের শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কাব্য ডিভাইন কমেডির রচয়িতা।

Danton, Georges Jacques (১৭৫৯—১৭৯৪) ফরাসী বিপ্লববাদী।

Davies, W. H. (১৮৭১-১৯৪০)। ভবঘুরেদের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় তাঁর কবিতায় প্রকাশিত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা ওয়ার্ডসওয়ার্থের অকৃত্রিমতাকে মনে করিয়ে দেয়।

de Vinci, Leonardo (১৪৫২—১৫১৯)। ফ্লোরেন্সের চিত্রকর, ভাস্কর, স্থপতি ও ইঞ্জিনিয়ার। রেনেসাঁস যুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হিসাবে স্বীকৃত। ম্যাডোনা বা মাতৃমূর্তিগুলি এবং অপরূপ রহস্যময় শ্রীমণ্ডিত চিত্রগুলি মানুষের বিস্ময়ের সামগ্রী।

Diderot, Danis (১৭১৩-১৭৮৪)। বিখ্যাত ফরাসী এনসাইক্লোপিডিস্ট। প্রথম খণ্ড এনসাইক্লোপিডিয়া প্রকাশিত হয় ১৭৫১ সালে। পুরাতনপন্থীরা রুষ্ট হন এবং পরবর্তী খণ্ডগুলি গোপনে প্রকাশ করতে হয়।

Day-Lewis, Cecil (১৯০৪—) । ইংরেজ কবি ও লেখক ।

Descartes René (১৫৯৬—১৬৫০) ফরাসী গণিতবিদ ও দার্শনিক । বিখ্যাত গ্রন্থ Discours de la Methode ।

Donne, John (১৫৭২—১৬৩১) । ইংরেজ 'মেটাফিজিকাল কবি' । ইংরেজ অ্যাঙলিকান ধর্মযাজকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গদ্য রচনার জন্য বিখ্যাত ।

Dostoievsky F. M. (১৮২১—১৮৮১) প্রথম সারির রুশ ঔপন্যাসিক । দরিদ্র ও মৃগীরোগগ্রস্ত ছিলেন । সমাজতন্ত্রীদের সভায় যোগ দেওয়ার অপরাধে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয় । চার বছর সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত থাকেন । ফিরে এসে ঋণের জন্য কারাদণ্ড এড়াতে বিদেশে যান । নিপীড়িত ও লাঞ্ছিতদের প্রতি বিস্ময়কর সহানুভূতি । মানবমনের —বিশেষতঃ রোগগ্রস্ত মনের গভীর রহস্য বর্ণনায় সুদক্ষ । Poor Folk, Crime and Punishment, The Idiot, অসমাপ্ত Brothers Karamazov অন্যতম রচনা ।

Dryden, John (১৬৩১-১৭০০) । ইংরেজ কবি ও নাট্যকার । ১৬৭০-৮৯ ইংরেজ রাজকবি । Macflecknoe, Absolom and Achitophel এর মত তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ রচনার পাশাপাশি কবিতায় লেখা দীর্ঘ Fableগুলি কাহিনী হিসাবে অননুকরণীয় ।

Eliot, T. S. (১৮৮৮-১৯৬৫) । জন্ম মার্কিন দেশে, ইংরেজ নাগরিক । কবি ও সমালোচক । আধুনিক কবিদের অন্যতম । Wasteland ও অন্যান্য কবিতা, Four Quartets প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও, Cocktail Party কাব্যনাট্য এবং সমালোচনামূলক Prelude বিদগ্ধ মনীষার স্বাক্ষর বহন করে ।

Einstein, Albert (১৮৭৯-১৯৫৫) জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী । আপেক্ষিকতা তত্ত্বের প্রবর্তক । আলোক ও স্থান-কাল নিরবচ্ছিন্ন প্রসার সম্বন্ধে যুগান্তকারী তত্ত্বের স্রষ্টা । ১৯১৯ সালে আপেক্ষিকতার সাধারণসূত্র প্রতিষ্ঠিত হয় । ১৯২১ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান । ভর ও শক্তির পারস্পরিক পরিবর্তনীয়তা সম্পর্কিত গবেষণা পরবর্তীকালে পারমাণবিক অস্ত্রের আবির্ভাবকে সম্ভব করে ।

Euripides (৪৮০-৪০৬ ? খৃ. পূ.) গ্রীক নাট্যকার । পঁচাত্তরটি

নাটকের রচয়িতা হলেও মাত্র আঠারটি বর্তমান। Media সব থেকে বেশি পরিচিত ট্র্যাজেডি।

Engels, Frederich (১৮২০-১৮৯৫)। জার্মান সমাজতন্ত্রবাদী। কার্ল মার্কের সহযোগী তাত্ত্বিক ও সহকর্মী সুহৃৎ।

Fitzgerald, Edward (১৮০৯-১৮৮৩) ইংরেজ কবি ও অনুবাদক। ওমর খৈয়ামের রুবাই অনুবাদ করেন।

Flecker, James Elroy (১৮৮৪-১৯২৫)। কেমব্রিজে প্রাচ্য ভাষার ছাত্র ছিলেন। The Golden Journey to Samarkand, Hassan (নাটক) প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত রচনা।

Frazer, J. G. (sir) (১৮৫৩-১৯৩৯) স্কটল্যাণ্ডের বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ।

Freud, Sigmund (১৮৫৬—১৯৩৯) অষ্ট্রিয়াদেশীয় স্নায়ুরোগচিকিৎসক ও মনোসমীক্ষণবিদ্যা প্রবর্তক।

Galileo Galilei (১৫৬৪-১৬৪২) ইতালির পিশা সহরে জন্ম। জ্যোতির্বিদ ও পদার্থবিজ্ঞানী। সৌরজগৎ, আলোক প্রভৃতি সম্পর্কে নতুন নতুন আবিষ্কারে আধুনিক যুগের প্রবর্তক। তদানীন্তন ধর্মবিশ্বাসের পরিপন্থী আবিষ্কারের কারণে ইনকুইজিশনের সম্মুখীন হতে হয় এবং নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হন। নির্বাসিত অবস্থাতেও বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কারে ব্যাপৃত থাকেন এবং দেশবিদেশের জ্ঞানপিপাসুর কাছে আদর্শমানের চরিত্র হিসাবে মানব সভ্যতার অন্যতম পথিকৃতের মর্যাদা লাভ করেছেন।

Georgian Poets : ১৯১২-১৯২২ মধ্যে Harold Monro প্রকাশিত পাঁচ-খণ্ডে সম্পূর্ণ কাব্যসংকলনে কয়েকজন তরুণ কবির রচনায় এক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এই কবিকুলকে জর্জিয়ান কবিকুল বলা হয়। ব্রুক, ব্লণ্ডেন, ড লা মার, ডেভিস এঁদের অন্যতম।

Godwin, William (১৭৫৬-১৮৩৬) ইংরেজ দার্শনিক ও ঔপন্যাসিক।

Gide, André (১৮৬৯-১৯৫১) ফরাসী ঔপন্যাসিক, সমালোচক ও প্রবন্ধকার। বেনামে প্রকাশিত Le Cahiers d'André Walter (১৮৯১) থেকে ফরাসী সাহিত্যে নতুনত্বের জোয়ার নিয়ে আসেন। ১৯২৫ এ প্রকাশিত The counterfeitres অন্যতম উপন্যাস।

Goethe, Johann Wolfgang Von, (১৭৪৯-১৮৩২)। জার্মান কবি ও নাট্যকার। শেকসপীয়রকে যদি ইংরেজী সাহিত্যের মুকুটমণি

বলা হয় তাহলে গ্যেটেকে জার্মান সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতা বলতে হয়। পঁচিশ বছর বয়সে Sorrows of Werther গল্প প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাড়া পড়ে যায়। সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য রচনা Faust এর আগেই সুরু হলেও প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ হয় ১৮০৬ সালে এবং দ্বিতীয় খণ্ডটি ১৮৩১ সালে। শ্রেষ্ঠ গদ্য রচনা Wilhelm Meister ফাউস্ট সুরু করার চার বছর পরে সুরু হয় এবং শেষ হয় মৃত্যুর মাত্র তিন বছর আগে।

Greene, Robert (১৫৫৮-১৫৯২) ইংরেজ কবি ও নাট্যকার। শেকসপীয়রের পূর্বসূরী 'ইউনিভার্সিটি উইটস' সম্প্রদায়ভুক্ত ট্র্যাজেডি রচয়িতা হিসাবে বিশিষ্ট। মার্লো রহস্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। শক্তিশালী কল্পনাশক্তি, রস ও বুদ্ধির বিশিষ্টতায় নাটকের চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে অনেক সময়।

Homer (৮৫০ খৃঃ পূ ?—) গ্রীক মহাকবি। ইউরোপীয় সভ্যতার প্রাচীনতম চিত্র তাঁর রচিত ইলিয়াড এবং ওডেসি মহাকাব্যে পাওয়া যায়। প্রকৃতি এবং বীরত্ব বর্ণনায় ব্যবহৃত তাঁর চিত্রকল্প এবং শৈলী পরবর্তীকালের বিস্ময়ের সামগ্রী। যুগে যুগে সাহিত্যিকদের সৃজনশক্তির প্রেরণা দিয়েছেন।

Hafiz, Shamsuddin Mohammed। চতুর্দশ শতকের বিখ্যাত ফারসী কবি। জন্মের তারিখ বিতর্কিত। মৃত্যু ১৩৮৮ খৃষ্টাব্দে। প্রধানতঃ প্রেম ও অতীন্দ্রিয়বাদের কবি। বিষণ্ণতা বা বিষাদ তাঁর কবিতায় ছায়া ফেলেনি। অপার আনন্দের কবি, ঈশ্বরকেও আনন্দস্বরূপ জ্ঞান করতেন। ভণ্ড ও অত্যাচারীদের প্রতি ছিল প্রবল ঘৃণা।

Hardy, Thomas (১৮৪০-১৯২৮)। ইংরেজ কবি ও ঔপন্যাসিক। ভিক্টোরীয় যুগে রচনাকর্ম সুরু হলেও আধুনিক উপন্যাসের সামাজিক বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্য প্রবর্তন করেন। গ্রামীণ জীবন, প্রকৃতি ও অমোঘ নিয়তিতাড়িত ভাগ্যহত মানুষের কাহিনী তাঁর উপজীব্য। Far from the madding crowd, The Mayor of Casterbridge, Tess of the D'Urbervilles প্রভৃতি বিখ্যাত রচনা।

Heisenberg, Werner (১৯০০-) জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী। 'অনির্দেশ্যতা নীতি' নামে আধুনিক পদার্থবিদ্যার বিখ্যাত তত্ত্বের আবিষ্কারক। ১৯৩২ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

Hollback, P. H. D (১৭২৩-১৭৮০) জন্ম সূত্রে জার্মান হলেও প্যারিতে জীবনযাপন করেন। ফরাসী দার্শনিক ও লেখক হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। রসায়ন ও খনিজবিদ্যা-বিষয়ক প্রবন্ধ অনুবাদ করেন। খৃষ্টধর্ম ও সাধারণভাবে সমস্ত ধর্মই হল সমস্ত মন্দের মূল-এই মর্মে ধর্মের উপর আক্রমণাত্মক মতবাদের স্রষ্টা।

Herbert, George (১৫৯৩-১৬৩৩) ইংরেজ কবি। মেটাফিজিক্যাল কবিকুলের অন্যতম। অ্যাংলিকান মতাবলম্বী কবিতার মধ্যে এঁর দি টেম্প্‌ল্‌ কবিতাটি সব থেকে জনপ্রিয়। জেমসের (প্রথম) মেদ্‌ধন্ত সভাসদ ও রাজনীতিবিদ। ধর্মীয় বিশ্বাস ও উচ্ছ্বাস থাকলেও সূক্ষতা, অলঙ্কার ও তীক্ষ্ণ বাক্যাংশ প্রয়োগের জন্ত বিশিষ্টতা লাভ করেছেন। ডনের শিষ্যদের মধ্যে সব থেকে বেশি ডনের কাছাকাছি কবি এবং মেটাফিজিক্যাল গোষ্ঠীর মধ্যে সব থেকে বেশি ধর্মানুরাগী।

Herrick, Robert (১৫৯১-১৬৭৪) ইংরেজ কবি। অন্যান্ত ক্যাভেলিয়র কবিদের মতই যুদ্ধ ও প্রেম বিষয়ক কবিতার রচয়িতা। একমাত্র কাব্যগ্রন্থ Hesperides ১৬৪৮-এ প্রকাশিত। উভয়পক্ষীয় কবিদের মধ্যেই সব থেকে বেশি কাব্যগুণসম্পন্ন।

Hesiod খৃঃ পূ অষ্টম শতকের গ্রীক কবি। গ্রীক পুরাণের সৃষ্টিরহস্তের কথা মুখ্যতঃ হেসিয়দের রচনা থেকেই গৃহীত। গ্রীক পুরাণের 'পাঁচটি ঘৃণ্যতম পাপ' হেসিয়দের কল্পনা থেকেই তৈরি।

Hopkins, G. M. (১৮৪৪-১৮৮৯)। কার্ডিনাল নিউম্যানের প্রভাবে জেস্যুইট গোষ্ঠিভুক্ত হন। ধর্মীয় জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা কবিতায় প্রভাব ফেলে। ভাষা ও ছন্দোবন্ধের বিশিষ্টতা তাঁর কীটসীয় ইন্দ্রিয়বেদিতাকে সমৃদ্ধ চিত্রকল্পের সাহায্যে প্রকাশ করতে সাহায্য করেছে। আধুনিক কবিদের মধ্যে সব থেকে বিতর্কিত কবি।

Housman, A. E. (১৮৫৯-১৯৩৬)। কবি ও প্রাচীনসাহিত্যে পণ্ডিত ইংরেজ। ভিক্টোরীয় যুগের শেষভাগের, বিশেষতঃ হার্ডির সঙ্গে মেজাজের মিল তাঁর কাব্যে দেখা যায়। হার্ডিকে যদি ওয়েসেক্সের কবি বলা যায় তাহলে এঁকে ওয়েলসের কবি বলতে হয়। এক পরিশীলিত মোহভঙ্গ ও ব্যঙ্গাত্মক সুর তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য।

Johnson, Samuel. (১৭০৯-১৭৮৪) ইংরেজ অভিধান রচয়িতা ও

লেখক। কৃত্রিম, জমকালো এবং বাগাড়ম্বরযুক্ত গদ্য রচনার লেখক বলে সাধারণভাবে উপহসিত হলেও প্রকৃতপক্ষে সেটা লাতিনপন্থী রচনার ধারা। The lives of the Poets, The Rambler, ও শেকসপীয়রের রচনা সম্পাদনার জন্য খ্যাত।

Joyce, James (১৮৮২-১৯৪১) আইরিশ ঔপন্যাসিক। আধুনিক সমাজের ক্ষুদ্রতা ও নীচতা সম্পর্কে তীব্র সজাগতা ও যৌন জীবন সম্পর্কে স্পষ্টবাদিতা তাঁর উপন্যাসে লক্ষণীয়। সমকালীন মনঃসমীক্ষণবিদ্যা দ্বারা প্রভাবিত মানব মনের বিশ্লেষণ উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। Stream of consciousness পদ্ধতির প্রবক্তা।

Jung, C. G. (১৮৭৫-১৯৬১) সুইস মনোবিজ্ঞানী।

Keats, John (১৭৯৫-১৮২১)। ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের মধ্যে অন্যতম। র‍্যাডিকালপন্থী কবি ও সাংবাদিক লেহ্ হান্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কারণে কোয়ার্টার্লি রিভিউ ও ব্ল্যাকউড্‌স্ জার্নাল প্রভৃতি টোরি পত্রিকায় তাঁর কাব্যগ্রন্থের কঠোর বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হলেও পরবর্তীকালে শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম বলে স্বীকৃত। নিজে এলিজাবেথীয় কাব্য, বিশেষতঃ স্পেন্সারের দ্বারা প্রভাবিত। সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়বেদী চিত্রকল্পের জন্য বিশিষ্ট।

Lawrence, T. E. (১৮৮৮-১৯৩৫)। বিস্ময়কর ঘটনাপূর্ণ জীবন নানা দুঃসাহসিক ভ্রমণ ও অভিযানে কাহিনী হয়ে উঠেছে। ভ্রমণবিষয়ক রচনা The Seven Pillars of Wisdom বিষয়গুণে ও রচনাশৈলীতে বিশিষ্ট। লরেন্স অব আরাবিয়া নামে ইনি বিখ্যাত।

Laforgue, Jule (১৮৬০-৮৭) ফরাসী প্রতীকবাদী কবি। মৃত্যু ও একাকীত্ববোধ নানাভাবে তাঁর কবিতায় উপজীব্য হয়েছে। আধুনিক ইংরেজ কবিদের উপর কম বেশি প্রভাব আছে। টি এস এলিয়ট ও এজরা পাউণ্ডের প্রশংসালাভ করেছেন।

Lawrence, D. H (১৮৮৫-১৯৩০)। ইংরেজ ঔপন্যাসিক। মানব অস্তিত্বের মৌলিক সমস্যা তাঁর উপন্যাসের উপজীব্য। মননের থেকে হৃদয়ের প্রতি আবেদনই তাঁর লক্ষ্য। আদিম সহজপ্রবৃত্তি ও অতিরাগের উপর গভীর আস্থায় যৌন জীবনকে এক আত্মিক ধর্মীয় বোধের দৃষ্টিতে চিত্রিত করেছেন।

Lovelace, Richard (১৬১৮-১৬৫৮)। ইংরেজ ক্যাভেলিয়ার কবি।

রাজসমর্থক এবং শেষ পর্যন্ত নিদারুণ দারিদ্র্যে জীবনের পরিসমাপ্তি। শিল্পগুণের অভাবে কবিতাগুলি বিস্মৃতপ্রায় হলেও তাঁর কয়েকটি গান তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কারাগার থেকে লুকাস্টাকে লেখা এই ধরনের গানগুলি স্মরণীয়।

Mallarmé, Stéphane (১৮৪২-১৮৯৮) ফরাসী কবি। অন্যতম প্রতীকবাদী কবি। ভার্লেন ও র‍্যাঁবোর থেকে বেশি চিন্তাশীল; জীবনযাপন পদ্ধতিতেও বেশি সংযত। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক হিসাবেই সারাজীবন কাটান। অস্বাচ্ছন্দ্য ও আর্থিক অনটনের মধ্যেও কবিতা রচনার প্রয়াস শিল্পের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ত্যাগস্বীকারের প্রমাণ। L'Aprèsmidi d'un Faune (১৮৭৬), Les Poésies (১৮৮৭) এবং Divagations (১৮৯৭) অন্যতম রচনা।

Malraux, Andre (১৯০১-) ফরাসী ঔপন্যাসিক ও রাজনীতিবিদ La condition Humaine, L'Espoir, Les Noyers de l Altenburg প্রভৃতি বিখ্যাত উপন্যাসের লেখক। স্পেনের গৃহযুদ্ধে প্রথম আন্তর্জাতিক বিমান বহরের সংগঠক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ট্যাঙ্ক বাহিনীতে যোগ দেন। জার্মানদের হাতে বন্দী হন এবং গোপনে পলায়ন করে গুপ্তসংগঠন F. F. I-তে ক্যাপটেনের কাজ করেন। পরবর্তীকালে ফরাসী সরকারে ক্যাবিনেট পর্যায়ের মন্ত্রী হন। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় দীর্ঘকাল চীন, পারস্য ও আফগানিস্তানে ও পরে আরব মরুভূমিতে নানা আবিষ্কার করেন।

Marlowe, Cristopher (১৫৬৪-১৫৯৩)। কবি ও নাট্যকার। শেকসপীয়রের পূর্বসূরী নাট্যকারদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডিয়ান। অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রচণ্ড আবেগ প্রকাশের ক্ষমতা বিস্ময়কর। Tamburlaine, Dr. Faustus বিশিষ্ট ট্র্যাজেডি। ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে যেটুকু তথ্য পাওয়া যায় তা সমকালীন রাজনীতির সঙ্গে তাঁর যোগসূত্রকেই প্রকাশ করে।

Mayakowsky, V (১৮৯৩-১৯৩০)। ভবিষ্যৎ-বাদ ও বিপ্লবের কবি। চৌদ্দ বছর বয়সে গোপনে বলশেভিক পার্টিতে যোগ দেন এবং কারাবাস করেন। বিপ্লবের পর কবিতা রচনা করতে থাকেন। রাজনৈতিক কবিতার পাশাপাশি আবেগপ্রবণ ব্যর্থ প্রেমের করুণ

কবিতাও লিখতে থাকেন। বিদেশ ভ্রমণ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ করতে যান ১৯২৫ সালে। শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করেন।

Melville, Herman (১৮১৯-১৮৯১) মার্কিন ঔপন্যাসিক। বিখ্যাত কাহিনী Moby Dick।

Michaelangelo Buonarroti (১৪৭৫-১৫৬৪) ইতালিয় চিত্রকর, ভাস্কর, স্থপতি ও কবি। ফ্লোরেন্সের কাছে ছোট শহর Castel Capreseতে জন্ম। শিক্ষানবিশীকালেই ভাস্কর্যের প্রতি অনুরাগ দেখা যায়। লোরেঞ্জো দ মেদিসি ছিলেন ফ্লোরেন্সের শাসনকর্তা। তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত Garden School এ অ্যাঞ্জেলোকে নিয়োগ করেন। লোরেঞ্জোর মৃত্যুর পর নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে কাজ করতে হয়। ফ্লোরেন্সে ফিরে আসেন ১৫০১ সালে। কিন্তু 'ডেভিড' মূর্তি গড়লেও অতৃপ্ত ও অসুখী। ১৫০৫ এ পোপ (২য় জুলিয়াস) তাঁকে রোমে ডেকে পাঠান। শেষ পর্যন্ত সিস্তিন চ্যাপেলের সিলিংয়ে ছবি আঁকতে বাধ্য হন এবং অমর সৃষ্টির স্বাক্ষর রাখেন সেখানে। উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে শেষ জীবন কাটলেও শ্রেষ্ঠ ভাস্কর হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

Milton, John (১৬০৮-১৬৭৪)। শেকস্পীয়রের পর দ্বিতীয় মহাকবি বলে ইংরেজি সাহিত্যে পরিচিত। গৃহযুদ্ধের কালে প্রখ্যাত রাউণ্ডহেডপন্থীদের যে নির্যাতন করা হচ্ছিল কোনও মতে তা থেকে নিষ্কৃতি পান। কমনওয়েলথের বিদেশীভাষা বিষয়ক দপ্তরের সেক্রেটারি হিসাবে কাজ করেন। প্যারাডাইস লস্ট মহাকাব্য বা স্যামসন আগনিস্তেসের মত নাটক রচনা ছাড়াও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে আরিওপাজিটিকা নামক বিখ্যাত গদ্যপুস্তিকার রচয়িতা।

More, Sir Thomas (১৪৭৮-১৫৩৫) ইংরেজ লেখক ও রাজপুরুষ। ইরাসমাস, কলেৎ প্রভৃতি মনীষিদের সংস্পর্শে এসে সে যুগের মানবতাবাদের অন্যতম প্রবক্তা হয়ে ওঠেন। অগ্রসর রাজনৈতিক চিন্তার জন্য কারাদণ্ড ভোগ করেন ও মৃত্যুদণ্ড ভোগ করেন। কাল্পনিক রাষ্ট্রের আদর্শ রচনা করেন Utopia গ্রন্থে।

Morris, William (১৮৩৪-১৮৯৬) ইংরেজ কবি, শিল্পী ও সমাজতন্ত্রবাদী। শিল্পকলা, শিক্ষা, রাজনীতি ও সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে

সুচিন্তিত ও মৌলিক চিন্তাধারার জন্য বিশিষ্ট। সমাজতান্ত্রিক আদর্শবাদে উদ্বুদ্ধ কবি এবং সম্ভবতঃ ইংলণ্ডে প্রথম শিল্পীদের কমিউন স্থাপয়িতা। এক অসুখী বিবাহ তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য।

Nietzsche, F. W. (১৮৪৪-১৯০০) জার্মান দার্শনিক ও সমালোচক। বন ও লাইপজিগে পড়াশুনা করেন। ১৮৭২ সালে 'দ্য বার্থ অফ্ এ ট্র্যাজেডি' প্রকাশিত। গ্রীক সংস্কৃতির দুটি বিশিষ্ট ধারার—ডায়োনিসিয়ান ও অ্যাপোলোনিয়ন—মধ্যকার বিরোধিতা এই পুস্তকের আলোচ্য বিষয়। অন্যান্য পুস্তকের মধ্যে 'দাস স্পেক জরথুস্ত্র', 'বিয়ণ্ড গুড অ্যাণ্ড এভিল' অন্যতম। শেষজীবনে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে উন্মাদাশ্রমে দিন কাটাতে হয়। জার্মানীতে নাৎসীবাদের আবির্ভাবের দর্শনগত উপাদান নীট্‌শের দর্শন থেকে পাওয়া বলে অনেকে মনে করেন।

Ovid (খৃঃ পূ ৪৩-১৮ খৃষ্টাব্দ) রোমান কবি। মেটামরফসিসের রচয়িতা। ভার্জিলের সমকালীন কবি। সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের বাইরে থাকার সিদ্ধান্ত নিলেও রোম থেকে নির্বাসিত হয়ে কৃষ্ণসাগরের উপকূলে একটি শহরে জীবন কাটাতে বাধ্য হন।

Pater, Walter Horatio (১৮৩৯-১৮৯৪) ইংরেজ সমালোচক ও প্রবন্ধকার। শিল্প ও সাহিত্যে নান্দনিক সমালোচনার প্রবক্তা। বিষয়বস্তু অপেক্ষা রূপবিচারেই তাঁর বেশি আগ্রহ।

Patmore, Coventry K.D. (১৮২৩-১৮৯৬) ইংরেজ কবি। Angel in the House কবিতায় বিবাহিত জীবনের প্রেম ও গার্হস্থ্য শান্তির ছবি এঁকেছেন। সম্ভাবতঃ এটিই তাঁর সব থেকে বেশি সুপরিচিত কবিতা। Rod, Root and flower পুস্তকে তাঁর রোমান ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাস ও জীবনাভিজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে।

Picasso, Pablo (১৮৮১-১৯৭৩) স্প্যানিশ চিত্রকর ও ভাস্কর। জন্ম মালাগায়। গত শতাব্দীর শেষ দিকে প্যারিসে চলে আসেন যখন তখনই রেখাঙ্কনে পারদর্শী। জর্জ ব্রাক না পিকাসো কে যে কিউবিজমের জনক তা নিয়ে মতভেদ আছে। প্যারিসে নিত্য নতুন চিত্রাঙ্কন ধারার উদ্ভব ঘটতে থাকে। পিকাসো তার স্বীকৃত নেতা। স্পেনের বর্বর গৃহযুদ্ধে ছোট্ট বাস্ক শহরের উপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগামী বীভৎসতার যে মহড়া হয়ে গেল তাকে বিদ্রূপ

ধরে চিরকাল অম্লান থাকবে 'Guernica' চিত্রটি; বেঁচে থাকবেন পিকাসো।

Pope, Alexander (১৬৮৮-১৭৪৪) রোমান ক্যাথলিক মতবাদ ও দৈহিক বিকৃতির কারণে সংসারে প্রতিষ্ঠালাভ না করতে পারলেও সাহিত্যের জন্ত নিজেকে সমর্পণ করেন। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গাত্মক কবিতায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ইলিয়াড ও ওডেসির অনুবাদ করেন।

Pound, Ezra Loomis (১৮৮৫-) মার্কিন কবি। জর্জিয়ান কবিতার বিরুদ্ধে T.E.Hulme (১৮৮৩-১৯১৭) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে নিয়েই মাত্র কবিতা রচনার কথা প্রচার করেন। তখন পাউণ্ড সেই মতবাদের নাম দেন 'ইমেজিজম'। মার্কিন দেশে পাউণ্ড ও ডুলিটল এই মতবাদের প্রবক্তা।

Proust, Marcel (১৮৭১-১৯২২) ফরাসী ঔপন্তাসিক। A la Recherche du Temps Perdu উপন্তাসের প্রথম খণ্ডটি ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঠক সমাজ দুপক্ষে বিভক্ত হয়ে যায়—প্রুস্তপন্থী ও প্রুস্তবিরোধী। জীবিত কালে মোট চারটি খণ্ড প্রকাশ হয়, বাকি চারটি মৃত্যুর পরে।

Rembrandt van Ryn (১৬০৭-১৬৬৯) ডাচ চিত্রকর। Leyden ও আমাস্টারডামে শিক্ষা। ল্যাণ্ডস্কেপ ও পোর্ট্রেট অঙ্কনে অসামান্ত প্রতিভা। মানবচরিত্র সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান পোর্ট্রেটগুলিকে বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। নানা দুঃখ দুর্দশা ও ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রায় লোকচক্ষুর অগোচরে তাঁর মৃত্যু হয়। আমস্টারডামের ওয়েস্টকার্ক গির্জায় অতি সাধারণভাবে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

The parnassians। প্রাচীন গ্রীসে আপোলো ও মিউসদের পবিত্র অধিষ্ঠানক্ষেত্র হিসাবে পারনাসাস পর্বত ছিল প্রসিদ্ধ। স্বভাবতঃই সেটি কবিতারও পবিত্র পীঠস্থান বলে স্বীকৃত। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে Le Parnasse Contemporain নামে একটি কাব্য সংকলন প্রকাশিত হয়। এই সংকলনের কবিদের একটি গোষ্ঠী হিসাবে পরে খ্যাতিলাভ হয়। কবি Leconte De Lisle (১৮১৮-১৮৯৪) কে এই গোষ্ঠির নেতা হিসাবে গণ্য করা হয়।

Pavlov, Ivan Petrovitch (১৮৪৯-১৯৩৬) রুশ শারীরবিভার প্রখ্যাত বিজ্ঞানী। বিভিন্ন শরীর যন্ত্রের ক্রিয়া সম্পর্কে নতুন চিন্তার প্রবক্তা।

সাপেক্ষ প্রতিবর্তক্রিয়া সম্পর্কে তাঁর আবিষ্কৃত তত্ত্ব আধুনিক কালের এক বিস্ময়কর অগ্রগতি। মনোবিতার ক্ষেত্রে নতুন চিন্তার দিক-প্রবর্তক।

Plato (? ৫২৭-৩৪৭ খৃঃ পূঃ) খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকের প্রথম দিকে গ্রেসের বিখ্যাত দার্শনিক। সক্রাতেসের শিষ্য। দার্শনিক হলেও সাহিত্যিক কর্মে বিশেষ পারদর্শী। সৌন্দর্য ও জীবন সম্পর্কে প্রাচীন গ্রীসের সংস্কৃতির বাহক। বিখ্যাত Republic গ্রন্থে আদর্শ রাষ্ট্রের প্রথম কল্পনা। Dialogues ও Laws রাষ্ট্র ও দর্শন বিষয়ে প্রাচীন-কালের শ্রেষ্ঠ পুস্তকগুলির অন্যতম। Phoedo পুস্তকে সক্রাতেসের মৃত্যুর যে বর্ণনা দিয়েছেন তা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মর্যাদায় মহীয়ান। তাঁর Theory of Ideas ইউরোপের ভাববাদী দর্শনের উৎস।

Poincare´, J. Henry (১৮৫৪-১৯১২) ফরাসী গণিতবিদ।

Rimbaud, (Jean Nicholas) Arthur (১৮৫৪-১৮৯১) ফরাসী কবি। প্রতীকবাদী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। Les Illumination ও Une Saison en Enfer রচনার পর (১৮৭১-৭৩) কবিতা লেখা ছেড়ে দেন এবং আফ্রিকা ও প্রাচ্যদেশে ব্যবসায়ের কাজে লিপ্ত থাকেন।

Rolland Romain (১৮৬৬-১৯৪৪)। ফরাসী লেখক। দশ খণ্ডে সমাপ্ত জাঁ ক্রিস্তফ পৃথিবীর বৃহত্তম উপন্যাস। মহৎ সুরকারদের সম্পর্কে নানা চিন্তাশীল প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৯১৫ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। যুদ্ধবিরোধী ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা ও সংগঠক। শেষ জীবনে সুইজারল্যাণ্ডে বসবাস করেন।

Rossetti, D. G. (১৮২৮-১৮৯২) ইংরেজ কবি ও চিত্রকর। প্রি-র‍্যাফেলাইট সঙ্ঘের স্রষ্টা। বাস্তব চিত্রণ অপেক্ষা সৌন্দর্য সৃষ্টিই ছিল এঁদের প্রধান লক্ষ্য। মধ্যযুগীয় পটভূমি ও ধর্মচিন্তার পরি-প্রেক্ষিতে আবেগপ্রবণ সৌন্দর্যপ্রীতি সুললিত পদমাধুর্য ও রেখার বিন্যাস প্রকাশ পেয়েছে এঁর কবিতায় ও চিত্রকর্মে।

Shakespeare, William (১৫৬৪-১৬১৬)। এলিজাবেথীয় যুগের এবং ইংরেজি সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার। কমেডি, ট্র্যাজেডি ও ঐতিহাসিক নাটক রচনায় অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। সমস্ত

মানুষকে শেকসপীয়রের নাটক ও কাব্যগুলিতে প্রকাশিত জীবনের বিভিন্ন স্বাদ বিস্ময়করভাবে আকৃষ্ট করেছে। সারা পৃথিবীতে বাইবেল ভিন্ন অন্য কোনও রচনা এত আগ্রহ ও আলোচনার সামগ্রী হয়ে ওঠেনি আজও।

Solon (৬৩৮-খৃঃ পূঃ ৫৫৯) বিখ্যাত এথেনীয় আইনপ্রণেতা।

Spengler, Oswald (১৮৮০-১৯৩৬) জার্মান দার্শনিক।

Spinoza, B. (১৬৩২-৭৭) ডাচ ইহুদী দার্শনিক। স্বীয় [illegible] অন্ধ প্রথা ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করায় ধর্মীয় সংস্থা কর্তৃক সমাজ থেকে বহিষ্কৃত।

Tyndale, William (১৪৯১ ?-১৫৩৬) ইংরেজ ধর্মসংস্কারক ও শহীদ।

Thales (৬৪০ ?-৫৪৬ খৃঃ পূঃ) গ্রীক দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ। ইউরোপীয় দার্শনিকদের মধ্যে সব থেকে প্রাচীন নাম। Thales of Miletus নামে খ্যাত। পৃথিবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রথম চিন্তানায়কদের অন্যতম। জলকেই সকল কিছুর উৎপত্তির মূল হিসাবে তিনি সিদ্ধান্ত করেন।

Socrates (? ৪৭০-৩৯৯ খৃঃ পূঃ) খৃষ্ট পূর্ব পঞ্চম শতকের শেষভাগে এথেন্সের প্রধান দার্শনিক। প্লাতোর Dialogues-এর মধ্যে তাঁর শিক্ষাগুলির উল্লেখ আছে। ৩৯৯ খৃঃ পূর্বাব্দে গ্রীক যুবসমাজকে ভ্রষ্ট করার কল্পিত অভিযোগে বিষ পানে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন।

Shelley, P. B. (১৭৯২-১৮২২)। রোমান্টিক যুগের অসাধারণ গীতিধর্মী কবিতার রচয়িতা। ভবিষ্যদ্বাণীমূলক রচনায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষের চূড়ান্ত সংগ্রামে সাফল্যের কথা ঘোষণা করেছেন। ছাত্রাবস্থায় The Necessity of Atheism নামক পুস্তিকা রচনার জন্য অক্সফোর্ড থেকে বহিষ্কৃত হন। The Defence of Poetry নামক প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য।

Sidney, Sir, Philip (১৫৫৪-১৫৮৬) ইংরেজ কবি, রাজপুরুষ ও নিবন্ধকার। মৃত্যুর পর রচনা প্রকাশিত। প্রেম বিষয়ক সনেটগুচ্ছ Astrophel and Stella প্রথম সারির রচনা। Apologie for Poetrie ইংরেজী সাহিত্যের অন্যতম বিখ্যাত গদ্যরচনা।

Sophocles (৪৯৬ ?-৪০৬ খৃঃ পূঃ) গ্রীক নাট্যকার। ইসকাইলাস এবং ইউরিপিদিসের মধ্যবর্তীকালীন মহান ট্র্যাজেডির রচয়িতা।

সৌন্দর্য ও সুখ তাঁর উপাস্য। শতাধিক নাটক রচনা করলেও মাত্র সাতটি বর্তমান, Oedipus the king, Antigone, Electra, Philoctetes, Oedipus Colonus, Ajax ও Trachiniae।

Spender, Stephen (১৯০৯—) ইংরেজ কবি ও সমালোচক। কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন এবং অডেনের মত গৃহযুদ্ধের সময় স্পেনের রিপাবলিকান বাহিনীতে কাজ করেন। পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট বিরোধিতার জন্ম পরিচিত।

Suckling, Sir John (১৬০৯-১৬৪২) ইংরেজ ক্যাভেলিয়ার কবি। প্রেম ও যুদ্ধ মুখ্য উপজীব্য। ডনের অত্যুক্তি তাঁর রচনায় দেখা গেলেও ডনের তত্ত্বাবিস্তাধর্মী চিন্তা এঁর কবিতায় অনুপস্থিত। অনায়াস চটুলতায় ফরাসী কবিদের সঙ্গে বেশি মিল।

Swinburne. A. C. (১৮৩৭-১৯০৯) ইংরেজ কবি নাট্যকার ও লেখক। সুললিত শব্দঝংকার ও ছন্দচাতুর্যের জন্ম খ্যাতিলাভ করলেও শেষ পর্যন্ত তার কুফল দেখা দেয়। নাটকগুলি বর্তমানে গবেষকদের মহলের বাইরে অপরিচিত। এলিজাবেথীয় ও জ্যাকোবিয়ান নাট্যকারদের উপর গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলি তাঁর সার্থক রচনা।

Tennyon, Alfred Lord (১৮০৯ ৯২)। ইংরেজ রাজকবি (১৮৫০-৯২)। প্রথম যুগের কবিতায় গীতিধর্মী ও পৌরাণিক বিষয়বস্তুকে ভিত্তি করে দক্ষ শিল্পকর্মের পরিচয় দেন। পরবর্তী রচনায় নীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাধান্য থাকলেও গভীরতা ও মৌলিক চিন্তার অভাব।

Themas, Edward (১৮৭৮-১৯০৭)। "জর্জিয়ান" কবি হলেও গ্রাম সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থেকেই কবিতা লিখেছেন। মধ্য বয়সে কবিতা রচনা সুরু করেন। তার আগে গল্প লিখতেন। Lights Out বিখ্যাত কবিতা।

Tolstoi, Oount Leo (১৮২৮-১৯১০)। শ্রেষ্ঠ রুশ ঔপন্যাসিক বলে স্বীকৃত। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে এবং সিবাস্তোপল আক্রমণে উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তী জীবনে বিষয়সম্পত্তি ত্যাগ করে কৃষকের জীবন যাপন করতে থাকেন। নেপোলিয়নের রাশিয়া আক্রমণের কালে দুই রুশ পরিবারের দীর্ঘ ইতিহাসের পটভূমিতে লেখা War and Peace রাশিয়ার মানুষের জীবন্ত চিত্র। Anna Karenina, Resurr-

ection ইত্যাদি উপন্যাসে তাঁর ধর্মীয় ও সংস্কারমূলক চিন্তার প্রকাশ আছে। ছোট গল্পেও অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

Tourneur, Cyril (১৫৭৫ ?—১৬২৬) ইংরেজ নাট্যকার। 'প্রতিহিংসা' ভিত্তিক নাটক রচনা করেন। সেগুলি সচরাচর স্থুল জিঘাংসামূলক আবেদনকে কাটিয়ে উঠতে পারেনি, ফলে মেলোড্রামায় তার পরিণতি ঘটেছে।

Voltaire (১৬৯৪-১৭৭৮)। মহান ফরাসী লেখক। বিদ্রূপাত্মক রচনায় বিশ্বরেণ্যদের সগোত্র। বিশ্লেষণধর্মিতায় অনন্য। ফরাসী বিপ্লবের চিন্তানায়কদের অন্যতম। এনসাইক্লোপিডিয়া রচনায় দিদেরোকে সাহায্য করেছিলেন। 'কাঁদিদ' এর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি।

Valery, Paul Ambroise (১৮৭১-১৯৪৮) ফরাসী কবি ও দার্শনিক। প্রতীকবাদী কবিতাকে বিমূর্ততার স্তরে নিয়ে গেছেন। সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়বেদী প্রতীক ও চিত্রকল্পের সাহায্যে ভাববাদকে প্রকাশ করার আগ্রহী। পূর্ণাঙ্গ চিন্তাকে রূপের মধ্যে প্রকাশ করতে গেলে তা পূর্ণতা থেকে বিচ্যুত হয় বলে তিনি মনে করতেন। জিদের উৎসাহে ১৯১৭ থেকে আবার কবিতা রচনা সুরু করেন।

Vaughan, Henry (১৬২২ ?—১৬৯৫). সুন্দর শব্দে গাঁথা প্রেমবিষয়ক কবিতা লিখলেও ধর্মীয় রচনাগুলি শিল্পকর্ম ও কল্পনামাধুর্যে বিশিষ্ট। প্রকৃতি সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী পরবর্তীকালের ওয়ার্ডসওয়ার্থকে মনে করিয়ে দেয়। প্রকৃতিপ্রেম ও ধর্মীয়ভাব তাঁর রচনায় নিপুণভাবে মিশ্রিত।

Verlaine Paul (১৮৪৪-১৮৯৬) ফরাসী কবি। কুশ্রী চেহারার জন্য নারীদের কাছে প্রিয় ছিলেন না। সর্বদা মদ্যপান করতেন, বার দুয়েক জেল খেটেছেন। অভাবে শেষ জীবন কাটে। কিন্তু কবি হিসাবে বিপজ্জনক আত্মিক সন্ধানের বদলে অপরূপ গীতিধর্মী কবিতার স্রষ্টা। বিশ্লেষণ বা অনুবাদে সেই অস্পষ্ট মাধুর্য ধরা প্রায় অসম্ভব।

Webster, John সপ্তদশ শতকের প্রথম কুড়ি বছর নাট্য রচনার জন্য বিশেষভাবে স্বীকৃত। শেকস্‌পীয়রের পরবর্তী নাট্যকারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ব্যক্তিজীবনের প্রায় কোনও সংবাদই পাওয়া যায় না এবং বেশির ভাগ রচনাও হারিয়ে গেছে। বিষাদময় ও অতিপ্রাকৃত বিষয়বস্তু এবং প্রচণ্ড আবেগসমন্বিত ট্রাজেডি রচনায় মার্লো'র সমগোত্রীয়। The Duchess of Malfi, The White Devil।

Wilde, Oscar (১৮৫৬-১৯০০)। জন্ম আয়ার্ল্যাণ্ডে। নন্দনতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হিসাবে সাধারণভাবে পরিচিত। কাব্য, নাটক, উপন্যাস সমস্ত ধরণের রচনা সত্ত্বেও শিল্পকলা সম্বন্ধে আলোচনাগুলি তাঁকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। সামাজিক দুর্নামের কারণে তাঁর সমালোচনাগুলি প্রায় অপাংক্তেয়তার পর্যায়ে পর্যবসিত।

Wordsworth, William (১৭৭০-১৮৫০)। রোমান্টিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। ফরাসী বিপ্লবের দ্বারা প্রথমে অনুপ্রাণিত হলেও পরে রক্ষণশীলদের প্রবক্তা। প্রকৃতিপ্রেমের চূড়ান্ত প্রবক্তা। লিরিক্যাল ব্যালাডস কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় যে কাব্য-বিষয়ক তত্ত্ব প্রকাশ করেন তা বিশিষ্ট চিন্তাধারার প্রবর্তন করে। কবিতার ভাষা ও স্টাইল সম্পর্কে তাঁর মতামত সেযুগে বিপ্লবাত্মক। সাধারণ মানুষের প্রতি সহানুভূতি তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য।

Yessenin,S. (১৮৯৫-১৯২৫)। রুশ কবি। প্রথমদিকে বিপ্লবকে স্বাগত জানালেও পরে গ্রামাঞ্চলগুলিতে দ্রুত শিল্পায়ন দেখে মর্মাহত হন এবং অরণ্যবেষ্টিত রুশ বনানীর সৌন্দর্যের এই দ্রুত অবলুপ্তি বিষয়ে বেদনার্ত কবিতা রচনা করতে থাকেন। মস্কোর সরাই-খানায় বোহেমিয় জীবনযাত্রার বিষয়টিও তাঁর উপজীব্য। ইসাডোরা ডানকানের সঙ্গে স্বল্পকালস্থায়ী বিবাহ হয় (১৯২২-২৩)। ব্যর্থ হতাশায় মদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং শেষ পর্যন্ত লেনিনগ্রাদের এক হোটেলের নির্জন কক্ষে শিরা কেটে রক্ত বার করে তাই দিয়ে শেষ কবিতাটি লিখে নিজের গলায় ফাঁস লাগিয়ে জীবনের উপর ছেদ টেনে দেন।